১২শ বর্ষ, ২য় খণ্ড, ১ম সংখ্যা
মাঘ ১৩৪১

পরিচয়

'বর্ত্তমান বাংলা সাহিত্য'

গত কার্ত্তিক মাসে 'শনিবারের চিঠি'র নূতন বর্ষপ্রবেশ উপলক্ষ্যে শ্রীমোহিতলাল মজুমদার মহাশয় উক্ত পত্রিকার নববর্ষের 'বোধন-মঙ্গলাচরণ কল্পে' 'বাংলা সাহিত্যের বর্ত্তমান রূপ সম্বন্ধে কিছু' বলিয়াছেন, এবং ঐ বক্তব্য পরের সংখ্যা 'শনিবারের চিঠি'তেও শেষ করিয়াছেন। মোহিতবাবুর এই নিবন্ধটি নানা কারণে বিশেষভাবে আলোচ্য। একটি কারণ এই। 'এতদিন যাহা মাসিক-সাহিত্য বা বৈঠকখানাবিলাসের সামগ্রী ছিল, এক্ষণে তাহা বিদ্বৎ-সভার বিচারাধীন হইয়াছে;......অথচ তাহাতেও সেই বৈঠকখানা সুলভ বক্তৃতা'র ছড়াছড়ি দেখিয়া তাহার প্রতিরোধকল্পে বর্ত্তমান বাংলা-সাহিত্য সম্বন্ধে 'কিঞ্চিৎ বৈঠকী আলাপ' করিবার প্রলোভন সম্বরণ করিতে পারেন নাই। তবে তাঁহার আসল উদ্দেশ্য 'যে কয়জন সাহিত্যিক আজ এই "বন্ধ্যা সন্ধ্যা"র দিনেও বাংলা সাহিত্যের মান মর্য্যাদা কিঞ্চিৎ বজায় রাখিয়াছেন, তাঁহাদিগকে অভিনন্দিত করা।' এই অভিনন্দন ব্যাপারে তাঁহারই পক্ষপাতনির্ব্বিশেষ 'সাহিত্যিক বিচারবুদ্ধি ও আদর্শ' দ্বারা পরিচালিত হইবেন এইরূপ আশ্বাস আমরা ভূমিকাতে পাই।

সাহিত্য সমালোচনার চরম মূল্যের কথা না তুলিয়াও বলা যাইতে পারে, তাহার আপেক্ষিক মূল্য সাহিত্য সম্বন্ধে সজাগতা ও উৎসাহ সঞ্চার। দেশের সাহিত্য প্রাণবান কি না, বহু লোকে সে সাহিত্যকে আপনার বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে কি না, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় সমালোচনা হইতে। সমালোচনার

প্রকৃতি যাহাই হউক না কেন, সাহিত্য যথাস্থানে পরিবেশিত হইলেই তাহা সমালোচনার উপজীব্য। এই হিসাবে আধুনিক কালে বাংলা সাহিত্যের বহুল সমালোচনা মূল্যবান। মোহিতবাবুর আলোচ্য বর্ত্তমান বাংলা সাহিত্যের সহিত আমরা এতই বিজড়িত যে তাহার সম্যক পর্য্যালোচনার মূল্য নিশ্চয়ই আছে। মোহিতবাবুর সমালোচনার অপর একটি মূল্য মোহিতবাবুকে আমরা শ্রদ্ধা করি।

বাংলা সাহিত্যের বর্ত্তমান রূপ সম্বন্ধে সমগ্রভাবে আলোচনা না করিয়া তিনি বাংলা সাহিত্যে বিভিন্ন অংশ বাছিয়া লইয়া আলোচনা করিয়াছেন, কিন্তু প্রারম্ভেই তিনি বলিয়াছেন যে কবিতার আলোচনা তিনি করিবেন না; —কারণ বাংলা কবিতা, তাঁহার মতে, 'মরিয়া ভূত' হইয়াছে। আধুনিক কবিতা, বাংলা এবং ইংরাজী, অনেকের ভাল লাগে না; আধুনিক কবিতার বিরুদ্ধে দুর্ব্বোধ্যতার অভিযোগও অনেকে করিয়াছেন। নমনীয় বাংলা ভাষায় মিঠা ছন্দের নিটোল কবিতা রচনা করা দুঃসাধ্য নহে; তথাপি সেই ভাষায় কর্কশ ছন্দের, এবং রূপহীন 'গদ্য কবিতা'র প্রবর্ত্তনে অনেকে ক্ষুব্ধ হইয়াছিলেন। বাংলা কবিতার প্রতি এই শ্রেণীর পাঠক ও সমালোচকের মনোভাব উপেক্ষা করিয়া আধুনিক বাংলা কবিতা আপনার পরীক্ষার পথে বহুদূর অগ্রসর হইয়াছে। সাহিত্যের এবং অপর যে কোন সুকুমার শিল্পের কোনও নিদর্শন পাঠক বা রসগ্রাহীর মনে ব্যক্তিগত রুচি এবং শিক্ষা অনুযায়ী প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করিবে। সমালোচকও একেবারে নিরাসক্ত দার্শনিক মন লইয়া বিচার করিতে সক্ষম না হইতে পারেন, তাহার বহু দৃষ্টান্ত সমালোচনার ইতিহাসে পাওয়া যায়। কিন্তু, নাট্যরসবঞ্চিত যাঁহারা তাঁহাদের নাটকের আলোচনায় প্রবৃত্ত না হওয়া যেমন সুবুদ্ধির পরিচায়ক, তেমনি আধুনিক কবিতার আদর্শই যদি মোহিতবাবুর নিকট বামপন্থী বলিয়া মনে হইয়া থাকে, তাঁহার আলোচনার বামেতর মার্গে সে পথ নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে না বুঝিয়া তিনি নীরবতা অবলম্বন করিলেন না কেন? পিণ্ডাধিকারীদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও যদি ভূত দৌরাত্ম্য ত্যাগ না করে তাহা হইলে দৌরাত্ম্যের পিছনে দেহীর অবস্থিতি কল্পনা করা অসঙ্গত নহে। কিম্বা, পিণ্ডাধিকারীরা মাসিক-মাদুলিতে বলীয়ান হইয়া নীরন্ধ্র গৃহাভ্যন্তরে কালযাপন করিতেও পারেন।

উনবিংশ শতাব্দীতে আধুনিক বাংলা সাহিত্যের পত্তনকালে ইংরাজী সাহিত্যের প্রভাব হিতকর হইয়াছিল। আজিকার দিনে ইংরাজী ভাষার সাহায্যে আমরা সমস্ত পৃথিবীর শুধু সাহিত্য নয়, সমগ্র চিন্তাধারা, জ্ঞান-বিজ্ঞানের সকল খবরই পাইতেছি। বর্ত্তমান বাংলা সাহিত্যে তাহার চিহ্ন দেখিতে পাইলে আতঙ্কিত হইবার কারণ নাই। আধুনিক জগতের চিন্তাধারা স্বভাবত সংবেদনশীল কবিমনে নূতন চেতনা দান করিয়াছে। উনবিংশ শতকের কবিরা বাহ্যজগৎ যে দৃষ্টিতে দেখিতেন আধুনিকের দৃষ্টি সেরূপ নহে। অবশ্য পূর্ব্বে যাহা নিঃসংশয়ে বর্জ্জিত হইত, এখন তাহা অনায়াসে কবিতায় স্থান পাইতেছে, আধুনিক কবিতার ইহাই লক্ষণ নহে। শিল্পী এবং সাহিত্যিকেরা এখন বাস্তবকে নূতনরূপে অনুভব করিতেছেন। আধুনিক জীবনের দৈন্য, নিঃস্বতা ও কর্কশ কোলাহল কিছু তাঁহারা কুরূপ বলিয়াই বর্জ্জন করেন নাই। একান্ত সহনীয় বিষয়ের অভাবে এই জীবন তাঁহাদের কাছে একটি বিরাট waste বলিয়া মনে হইতেছে। তাই বিশ্বাসযোগ্য, নির্ভরযোগ্য কিছুর সন্ধানে তাঁহারা নিজেদের নিয়োগ করিয়াছেন। যশ এখনও সকলে লাভ করেন নাই বটে, কিন্তু নিরলস চেষ্টার চিহ্ন সর্ব্বত্র দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। আধুনিক বাংলা কবিতাতেও এই সুর দেখিয়া তাহাকে অনুকরণ বলিয়া পরিহার করিতে গেলে আমোহিতলাল বাংলার কাব্যকেও ইংরাজী 'লিরিকে'র তর্জ্জমা বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া যায় না কি? অনেকে বলিতে পারেন যে আমাদের সমাজের বাস্তব সমস্যা ইউরোপের সমতুল্য নহে। ধনিক সভ্যতার পূর্ণ প্রভাব আমাদের দেশে দেখা দেয় নাই বটে, কিন্তু এক ধনিক সাম্রাজ্যের উপনিবেশ হিসাবে সে সভ্যতার গ্লানি হইতে আমরা মুক্ত নহি। ঔপনিবেশিক সভ্যতাসৃষ্ট সমস্যার ব্যাপক পরিচয় আমাদের সাহিত্যে দেখা গিয়াছে কিনা সে সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠিতে পারে; কিন্তু সেই সমস্যাকে রূপ দিতে হইলে যে আয়োজন দরকার তাহার অসদ্ভাব আছে এ কথা বলা চলে না। আজিকার দিনে আমাদের জাতীয় জীবনেরর সহিত ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বেকার জীবনেরও মিল নাই। ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে আমাদের সাহিত্যে যে সকল কর্ম্ম অনুসৃত হইত তাহার পুনরাবৃত্তিতেই অনুকরণের অভিযোগ সার্থক হইবে। মোহিতবাবু নিশ্চয়ই অস্বীকার

করিবেন না যে ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে বাংলা ভাষায় যে ছন্দের টুংটাং বা ভাবালুতার আতিশয্য লক্ষিত হইয়াছিল, তাহাতে কাব্য কমই ছিল। আধুনিক কাব্যের রীতি সেই অভ্যস্ত গুঞ্জনের সম্মোহন হইতে পরিত্রাণ চাহিয়াছে। কোনও কবি এই সাধনায় সিদ্ধিলাভ না করিয়া থাকিলেও তাঁহার অক্ষমতাতে রীতি বা আদর্শের পরাজয় সূচিত হয় না। বাস্তবের রূঢ়তা আধুনিক নিজে অনুভব করে, অনুভব করিতে দেখে, তাই তাহার মন উনবিংশ শতকের নিশ্চয়তার সংস্কারে বাঁধিতে পারে না। পূর্ব্বাচার্য্যদের ব্যবহৃত শব্দসমষ্টি পরিচিত প্রিয় অনুষঙ্গ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া আধুনিক কবিরা উহাতে নূতন প্রাণের সঞ্চার করিতেছেন। আধুনিক বাংলা কবিতাতে প্রথম শ্রেণীর স্রষ্টা আবির্ভূত হইয়াছে কিনা তাহা তর্কের বিষয়বস্তু হইলেও, এই সকল দিক হইতেই আধুনিক কবিদের পরীক্ষার মূল্য বিচার করিতে হইবে। অনভ্যস্ত আস্বাদ হইতে রসগ্রহণে অক্ষম হইয়া বিকৃত মুখে কোনও বস্তুর দিকে চাহিলে চক্ষুর লেন্স হইতে প্রতিসৃত ছায়া রেটিনায় যথাযথ সংস্থাপিত হয় না, এবং বস্তুর স্বাভাবিক রূপ তাহাতে চেনা দুঃসাধ্য হইয়া পড়ে। মোহিতবাবু সমালোচক নন, কবিও। সুতরাং কবির প্রাণধর্ম্ম তাঁহার নিকট আদরের বস্তু। তাঁহার কবিতার স্বকীয় ষ্টাইল পরিকল্পনায় তিনি যে অপূর্ব্ব নিষ্ঠার সহিত অ-বাংলা ভাষা ও ইংরাজী কাব্যবস্তুর রহস্য মন্থন করিয়াছিলেন, সেই নিষ্ঠাই তাঁহাকে আধুনিক কবিদের প্রাণ ধর্ম্মের সাধনা সম্বন্ধে সচেতন করিবে ইহাই আমরা আশা করিয়াছিলাম। এ বিষয়ে তাঁহার ব্যক্তিগত রুচি তাঁহার বিচারশক্তিকে পরাভূত করিয়াছে।

মোহিতবাবু বিশেষ করিয়া বর্ত্তমান বাংলা সাহিত্যের উপন্যাস ও ছোট গল্পের সমালোচনাই করিয়াছেন। সমালোচনার প্রারম্ভে এই বিভাগের অপর দুইজন সমালোচকের সমালোচনা করিয়াছেন। গ্রন্থকারদ্বয়ের নামোল্লেখ না করিয়াও ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের 'বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা' এবং সুবোধ সেনগুপ্ত মহাশয়ের 'শরৎচন্দ্র' বই দুইখানির প্রতি তাঁহার মনোভাব অকপটে ব্যক্ত করিয়াছেন। ডক্টর বন্দ্যোপাধ্যায়ের বইখানি সম্ভব হইলে মোহিতবাবুর রোষবহ্নিতে দগ্ধ হইয়া বিলীন হইয়া যাইত। ডক্টর সেনগুপ্তকে তিনি আংশিক কৃপা করিয়াছেন এই বলিয়া যে,

তাঁহার পুস্তকে 'বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে ভুল ধারণার উৎপত্তি হইয়াছে।' বোধ হয় এই ভুল ধারণা দূরীকরণ মানসেই এই প্রবন্ধের অবতারণা করিয়াছেন। অতএব তাঁহার বক্তব্যের অংশ-বিশেষ আলোচনা করিলেই চলিবে। ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় না হয় 'কেবল অর্জ্জিত বিদ্যা'র বলেই তাঁহার পুস্তক লিখিয়াছেন, মোহিতবাবু 'তাহার অন্য কিঞ্চিৎ মূলধনের' অধিকারী হইয়াও লিখিতেছেন—'উপন্যাস বলিতে যদি বস্তুনিষ্ঠ কল্পনার একরূপ সাহিত্য-সৃষ্টি বুঝিতে হয় এবং সেই মাপকাঠিতে মাপিতে মাপিতে যতই বর্ত্তমানের দিকে আসি, ততই উৎকৃষ্টতর উপন্যাসের সন্ধান পাই বলিয়া বিচারকর্ম্ম আরও সহজ হইয়া উঠে, এবং শেষ পর্য্যন্ত অতি-আধুনিক উপন্যাসের তুলনায় বঙ্কিম-চন্দ্রের উপন্যাসও কোন হিসাবে নিকৃষ্ট হইয়া পড়ে—তবে বুঝিতে হইবে, সমালোচকের দিকভ্রম হইয়াছে, তাঁহাকে আবার গোড়া হইতে পথ বাহিতে হইবে।' অর্থাৎ বঙ্কিমচন্দ্রের পরে আজ পর্য্যন্ত যত বাংলা উপন্যাস প্রকাশিত হইয়াছে তাহার সব কয়টিই বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের তুলনায় হীন ত বটেই, এবং অদূর ভবিষ্যতে যে উপন্যাস রচিত হইবে তাহা পাঠান্তে যদি মনে হয় উহার বিষয়বস্তু, ষ্টাইল অথবা চরিত্রাঙ্কন বঙ্কিমচন্দ্রের অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর তাহা হইলে গোড়াতেই ভুল হইয়াছে বুঝিতে হইবে। ইহা সমালোচনা, না 'বৈঠকী আলাপ'? শ্রীকুমার বাবুর পুস্তকে বহু ত্রুটি আছে, কিন্তু ঈদৃশ অন্ধভক্তিপ্রসূত কোনও প্রমাদ নাই। বাংলা সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্রের কথা বাঙ্গালী মাত্রেই চিরকাল শ্রদ্ধাবনত শিরে স্মরণ করিবে; কিন্তু তাই বলিয়া ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র সর্ব্ব বিষয়ে অনতিক্রম্য ইহা 'ঘোষণা' করিতে অনেকের বাধিবে। প্রসঙ্গত বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষার বিষয় উল্লেখ করা যাইতে পারে। বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষার অননুকরণীয় নিজস্ব মাধুর্য্য আছে, কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের পরে বাংলা গদ্যরীতির উন্নতি হয় নাই কি করিয়া বলা সম্ভব? এমন কি মোহিতবাবু নিজের প্রকাশভঙ্গীকে কোনও কোনও অংশে বঙ্কিমচন্দ্রের রীতি অপেক্ষা অধিক গতিশীল ও প্রাণবান বলিয়া কখনও মনে করেন না কি?

শরৎচন্দ্রের মৃত্যুর কিছুকাল পূর্ব্বে তাঁহার সম্বন্ধে বিভিন্ন দিক হইতে নানারূপ আপত্তি উত্থাপিত হইয়াছিল। শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের পটভূমি ব্যাপক নহে, অনেক সময়ে ভাবানুভূতিও খুব গভীর নহে, পুরুষ চরিত্রগুলি

দুর্ব্বল, এবং স্ত্রী চরিত্র সম্বন্ধেও মতদ্বৈধ আছে। এ সব সত্ত্বেও শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে 'বাংলা ভাষায় রচিত বাঙালীর নিজের জীবন, তথা নিজেরই প্রাণ মনের গূঢ় ও গভীর পরিচয়' পাওয়া গিয়াছে বলিয়াই উপন্যাসগুলি 'বহুজন পঠিত ও জনপ্রিয়।' এই উপন্যাসগুলি সম্বন্ধে সহরের প্রত্যন্তবাসী সাহিত্যিক ও সমালোচক'মণ্ডলীর' একান্ত চেষ্টা সত্ত্বেও 'অনেক ভুল ধারণার' উৎপত্তি হয় নাই। শ্রীকুমারবাবু ও সুবোধবাবু শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে তাঁহাদেরই 'সাহিত্যিক বিচারবুদ্ধি ও আদর্শ অনুযায়ী আলোচনা' করিয়াছেন। যদিও তাঁহাদের 'বক্তব্যের অন্তত কিছুও এ সাহিত্যের ভবিষ্যৎ বিচার সভায় প্রতিধ্বনিত হইবে' বলিয়া দম্ভ প্রকাশ করেন নাই।

বাংলা উপন্যাস হঠাৎ একদিন সাহিত্য-ক্ষেত্রে আত্মপ্রকাশ করে নাই। প্রাক্-বঙ্কিম উপন্যাসগুলির সাহিত্য হিসাবে যাহাই মূল্য হউক না কেন, সাহিত্যের একটি কর্মের ক্রমপরিণতির ইতিহাসে সেগুলি নগণ্য নহে, এবং তৎপূর্ব্বে কাব্যে যে সকল বাস্তব-আশ্রয়ী কাহিনী রচিত হইত তাহাও উপন্যাসের আদি হিসাবে নিশ্চয়ই গ্রাহ্য। বঙ্কিমচন্দ্রের হাতে বাংলা উপন্যাস শুধু রূপই লাভ করে নাই, প্রাণ লাভ করিয়াছে। কিন্তু তাহাকেই বাংলা উপন্যাসের চরম পরিণতি না বলিয়া, যদি কোনও সমালোচক পরবর্ত্তী উপন্যাস-গুলিতে বঙ্কিম-প্রবর্ত্তিত উপন্যাসরূপের বিকাশ দেখিতে পাইয়া তাহার মধ্যে একটি ধারাবাহিক পরিণতি লক্ষ্য করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তিনি ভ্রান্ত, এবং নূতন করিয়া 'তাঁহাকে পথ বাহিতে হইবে'—এইরূপ রায় প্রকাশ করায় 'স্পর্দ্ধা'র পরিচয় পাওয়া যায় বৈ কি।

মোহিতবাবু প্রবন্ধের শেষের দিকে 'প্রথম গণনীয়' যে কয়জন ঔপন্যাসিকের বিচার করিয়াছেন, প্রথমেই তাহার আলোচনা করিব। যাঁহাদের নাম তিনি সযত্নে বর্জ্জন করিয়াছেন তাঁহাদের কাহারও রচনা উপন্যাসপদবাচ্য কি না, এবং তাঁহারা যে ভাষায় লেখেন তাহা সত্যই 'ইংরেজীর আক্ষরিক প্রতিধ্বনি' কিনা, তাহা 'সাহিত্যের ভবিষ্যৎ বিচারসভা'তেই আলোচিত হইবে। অতএব এইস্থলে উহার আলোচনা না তুলিলেও চলিবে। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের 'পথের পাঁচালী' বাংলা সাহিত্যের একটি নূতন সম্পদ; অপুর বাল্যজীবন ও Jean Christophe-এর বাল্যজীবনের একাধিক

ঘটনায় আশ্চর্য্যজনক মিল থাকিলেও তাহাকে চুরি বলিব না কারণ ঐ পুস্তকটির অনেক গুণ আছে, কাজেই এই বিদেশী গ্রন্থখানির প্রভাব সত্ত্বেও রসিক সমাজের নিকট উপস্থিত হইবার যোগ্য। 'পথের পাঁচালী' ও 'অপরাজিতে'র প্রথমাংশ যে কারণে পাঠক সমাজে প্রিয় হইয়াছিল, বিভূতি বাবুর পরবর্ত্তী উপন্যাস ও গল্পগুলিতে তাহার অভাব সকলে লক্ষ্য করিয়াছে, এবং একদিন তিনি যে ক্ষমতার দীপ্তিতে দেখা দিয়াছিলেন তাহা বহুলাংশেই ম্লান হইয়া গিয়াছে। ভবিষ্যতে তিনি আবার স্বীয় ক্ষমতার পরিচয় দিয়া পাঠক সমাজের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে পারিবেন কিনা, আজ সে আলোচনা নিষ্ফল। কিন্তু আজ তিনি যে স্তরে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন তাহা দেখিয়া আধুনিক ঔপন্যাসিকদের মধ্যে তাঁহার স্থান কোথায় তাহা বিচারে প্রবৃত্ত না হওয়াই ভাল। মোহিতবাবুও বলিয়াছেন যে 'তিনি বড় ঔপন্যাসিক নহেন, একজন শক্তিমান সাহিত্যশিল্পী মাত্র।' বিভূতিবাবু সম্বন্ধে এরূপ ধারণা থাকা সত্ত্বেও প্রথম গণনীয় ঔপন্যাসিকদের মধ্যে তাঁহাকে তিনি যে স্থান দিয়াছেন তাহা ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিগত পরিচয়হেতু 'পক্ষপাতপ্রসূত নয়··· সাহিত্যের প্রতি শ্রদ্ধাই তাহার কারণ।'

'কিন্তু', মোহিতবাবু বলিতেছেন, 'শ্রীযুক্ত তারাশঙ্কর বা "বনফুলে"র প্রতিভা খাঁটি ঔপন্যাসিকের প্রতিভা।' উপন্যাস বলিতে মোহিতবাবু ছোট ও বড় গল্প বুঝিলেও সকলে তাহা বুঝিবে না, কারণ ছোট গল্প সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র জাতের। লিরিক ও এপিকের মধ্যে যে পার্থক্য ছোট গল্প ও উপন্যাসের মধ্যে তদপেক্ষা কম প্রভেদ নহে। ছোট লিরিক রচয়িতার এপিকের মত বস্তুকে কল্পনায় আয়ত্ত করিবার শক্তি না থাকাই স্বাভাবিক। তারাশঙ্কর বাবু ও বনফুল দুইজনেই ছোট গল্প লেখায় যে মুন্সীয়ানার পরিচয় দিতে পারিয়াছেন, উপন্যাসে তাহা এখনও দেখিতে পাওয়া যায় নাই, যদিও দুইজনেই বহু উপন্যাস রচনা করিয়াছেন। বাংলা ভাষায় 'কথা সাহিত্য' বলিয়া একটি শব্দ চলিত হইয়াছে, গল্প ও উপন্যাস দুইটি উহার অন্তর্ভুক্ত। কাজেই উপন্যাস অর্থে ছোট ও বড় গল্প না বুঝিয়া কথা সাহিত্য শব্দটি ব্যবহার করিলে তাহা সুপ্রযুক্ত হইত।

বনফুল এবং তারাশঙ্কর দুইজনেরই গল্প বলিবার ষ্টাইল চিত্তাকর্ষক।

তাঁহারা যে জগৎ হইতে গল্পের বিষয়বস্তু নির্ব্বাচন করেন তাহা নিম্ন মধ্যবিত্তের জগৎ। উহার পরিধি স্বল্প। এই স্বল্পপরিধির জগতে উপস্থিত গ্লানির দিকটাই দুইজনের দৃষ্টিতে পড়িয়াছে, উহার গভীরতার পরিচয় তাঁহারা পান নাই। আধুনিক বাংলার ভূস্বামীদের সাধারণের উপর প্রভাব ক্রমশঃ অপসৃত হইতেছে, সেই সঙ্গে এই শ্রেণীর প্রাচীন গরিমাও ধীরে ধীরে লুপ্ত হইতেছে। তারাশঙ্করবাবু এই শ্রেণীভুক্ত। লুপ্তপ্রায় ঐশ্বর্য্যের অতীত স্মৃতি সন্তর্পণে আবৃত করিয়া বহির্জ্জগতের দিকে চাহিয়া চতুর্দ্দিকের কুশ্রীতা ও গ্লানিই তিনি দেখিতে পাইয়াছেন। এই দৃষ্টি লইয়া তিনি যে গল্প রচনা করিয়াছেন তাহাও অন্ধকার ও পুতিগন্ধময়। ক্ষয়ের চিহ্ন তিনি নিপুণ কৌশলে অঙ্কিত করিয়াছেন, কিন্তু ক্ষয়ের কারণ বুঝিতে পারেন নাই। উহাতে ভবিষ্যতের কোন্ সম্ভাবনা সূচিত হয় তাহাও তাঁহার নিকটে অপরিজ্ঞাত। তাঁহার রচিত গল্পে 'মানব মনের গূঢ় পরিচয়' দূরের কথা, সমাজের বাস্তবরূপও দেখিতে পাওয়া যায় নাই। বহিরাবরণের কয়েকটি চিহ্নই তাঁহার শিল্পের একমাত্র উপজীব্য। তাঁহার রচিত কাহিনী এবং চরিত্রে প্রাণের সহজ প্রকাশ পাওয়া যায় না। অদ্ভুত ক্ষমতার অধিকারী হইয়া তিনি অন্ধকারে অনায়াসে দেখিতে পান, কিন্তু যাহা স্বতঃস্ফূর্ত, তাহা তাঁহার দৃষ্টি এড়াইয়া যায়। বিকার ব্যতীত অপর কিছু তিনি অবলম্বন করিতে পারেন না। স্বভাবের বিকার ও আকারের বীভৎসতা তিনি চমৎকার বর্ণনা করেন।

বনফুলের জগৎ তারাশঙ্করের অনুরূপ নহে। বাংলা দেশের বাহিরে উৎসাহবর্দ্ধক আবহাওয়ায় জীবিকা সমস্যা বর্ত্তমানের ন্যায় তীব্র হইয়া উঠিবার পূর্ব্বেই তিনি জীবন আরম্ভ করিয়াছিলেন। নিম্ন মধ্যবিত্ত বাঙালীর কাম্য সাফল্য আয়ত্ত করিয়া তিনি পারিপার্শ্বিকের সহিত সন্ধি স্থাপন করিয়া, এবং অবসর সময়ে সাহিত্য চর্চ্চা করিয়া তিনি অনায়াসেই কালাতিপাত করিতে পারিতেন। কিন্তু পারিপার্শ্বিক উত্তরোত্তর এমন পরিবর্ত্তিত হইয়া উঠিল যে তাঁহাকে জীবনপরম্পরায় ইহার মধ্যেই থাকিতে হইবে, এই চিন্তাতেই তিনি শিহরিয়া উঠিলেন। তাঁহার আত্মতৃপ্ত ঔদাসীন্যে রূঢ় আঘাত লাগিল। এজন্য তিনি আধুনিক কালকে, এবং বয়সের হিসাবে আধুনিকদের দায়ী করিলেন। আধুনিক কালের স্বরূপ তিনি বুঝিতে চেষ্টা করেন নাই, আধুনিক সমস্যা

তাঁহার ন্যায় চিত্তবৃত্তির অধিকারীদের পক্ষে অনধিগম্য। তথাপি তিনি নানা-ভাবে আধুনিককে আক্রমণ করিয়াছেন।

জীবনের প্রতি যে গভীর অনুরাগ থাকিলে জীবনজিজ্ঞাসায় আগ্রহ জন্মে, যে অন্তর্দৃষ্টি থাকিলে জীবনের বিক্ষিপ্ত বিচ্ছিন্ন ঘটনাস্রোত রূপসম্বন্ধ হইয়া উঠিয়া উহার অর্থ দর্শকের কাছে উদ্‌ঘাটিত করে, তাহার পরিচয় বনফুলের অথবা তারাশঙ্করের উপন্যাসে আমরা আজও পাই নাই। যে কল্পনা স্থাপত্য-রীতিতে খণ্ড খণ্ড অভিজ্ঞতার সমাবেশে সৌধরূপে পরিণত হইয়া রূপ পরিগ্রহ করে, সে কলা কৌশলের অভাবও দুইজনেরই আছে। এই কারণে একাধিক প্রথম শ্রেণীর ছোট গল্প রচনা করিয়াও আজিও কেহই উল্লেখযোগ্য উপন্যাস লিখিতে পারেন নাই।

দুইজনের সম্বন্ধেই আর একটি কথা বলিবার আছে। তাঁহাদের বীভৎসরস-প্রীতি সার্থক সাহিত্যসৃষ্টির পথে অন্তরায়। জীবনের সমগ্রতার মধ্যে বীভৎসও আছে; কিন্তু তাহাকে শোধন করিবার জন্য বলিষ্ঠ কল্পনার প্রয়োজন। রুগ্ন কল্পনায় বীভৎস অত্যাচারী হইয়া দাঁড়ায়, এবং উগ্রবোধ নীতিবোধ বা অসুস্থ স্বপ্নসম্মোহনের বশে বীভৎসকে দেখিলে দৃষ্টিসাম্যের অভাব ঘটে। অন্যথায় নিছক macabre সার্থক সাহিত্য বলিয়া গণ্য না হইয়া লেখকের ক্ষয়িষ্ণু মনের পরিচয়েরই সাক্ষ্য হইয়া থাকিবে। সীজারিয়ন অপারেশ্যন অথবা পোষ্ট মর্টেম পরীক্ষার পুঙ্খানুপুঙ্খ সুদীর্ঘ বর্ণনা, কিম্বা গল্পের পর গল্পে বিকলাঙ্গ, বিকৃতরুচি ও বীভৎস আচরণকারী প্রাণীদের অবতারণা রূপ সৃষ্টি না করিয়া বিবমিষা উদ্রেক করে।

মোহিতবাবু তারাশঙ্করের পুস্তকাবলীতে mysticism এবং বনফুলের রচনায় paganism এর সন্ধান পাইয়াছেন। সমালোচকের অন্যতম কাজ নবতর রসের সন্ধান দেওয়া, যাহা সাধারণ পাঠকের অনবধান দৃষ্টি অনায়াসেই এড়াইয়া যায়। মোহিতবাবু তারাশঙ্কর ও বনফুলের রচনা হইতে যে এই দুইটি লক্ষণ আবিষ্কার করিয়াছেন তাহা বোধ হয় নূতন রসের সন্ধান দিতে। প্রশ্ন উঠিবে ঐ দুই লেখকের কোন্ কোন্ রচনায় উহার অস্তিত্ব দেখিলেন যে তাহাদের রচনার উহা অন্যতম বৈশিষ্ট্য বলিয়া পরিগণিত হইল? মোহিতবাবু বলিয়াছেন 'ক্রিটিককে কতকটা prophet এর মত কাজ করিতে হয়।' Prophet শুধুই

ভবিষ্যদ্বক্তার-কাজ করেন না, তিনি দ্রষ্টা ; যাহা সকলের দৃষ্টি এড়াইয়া যায় তিনি তাহা অনায়াসেই দেখিতে পান। প্রফেটোচিত দিব্য দৃষ্টিতে তিনি তারাশঙ্করের রচনায় mysticism এবং বনফুলের pagan মনের সন্ধান পাইয়াছেন, যাহা অপরে চেষ্টা করিয়া কোন কালে দেখিতে পাইবে না। [প্রসঙ্গত, রবীন্দ্রনাথের 'কাব্যসাধনার মূলমন্ত্র ছিল—সহজ ও সর্ব্বব্যাপ্ত যাহা (Joy in widest commonalty spread) তাহারই রসরূপ সৃষ্টি করা' ?]

'তিনজন অপেক্ষাকৃত বড় শিল্পীর পরিচয় স্থগিত' রাখিয়া অপর কয়েকজন সাহিত্যিক সম্বন্ধে মোহিতবাবুর বক্তব্য পরীক্ষা করিয়া দেখা যাইতে পারে। প্রত্যেকের সম্বন্ধে মোহিতবাবুর মন্তব্য বিশ্লেষণ করিবার প্রয়োজন নাই। মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় সম্বন্ধে তিনি বলিতেছেন 'দিবারাত্রির কাব্য' ও 'পুতুল-নাচের ইতিকথায়' 'এই তরুণ লেখকের যে প্রতিভা আশান্বিত করিয়াছিল, দুঃখের বিষয়, পরে তাঁহার রচনাগুলিতে যে ভঙ্গী, ও কল্পনার দৈন্য উত্তরোত্তর প্রকট হইতে লাগিল, তাহাতে তাঁহার শক্তির অপচয় লক্ষ্য করিয়াছি।...... চিন্ময় বাস্তবকে ত্যাগ করিয়া জড় বাস্তবের উপাসনা তাঁহাকে পাইয়া বসিয়াছে।' এই 'অপচয়' যে তিনি লক্ষ্য করিলেন, তাহার কারণ কি কিছুদিন পূর্ব্বে শনিবারের চিঠিতে প্রকাশিত শ্রীযুক্ত নলিনী ভট্টশালী মহাশয়ের পত্র ? 'অতিশয় কুশ্রী-কুরূপ ও অকিঞ্চিৎকর'-এর 'পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা এবং ভাষারও অনুরূপ অপরিচ্ছন্নতা' মোহিতবাবু মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসে লক্ষ্য করিয়াছেন ; কিন্তু তারাশঙ্কর এবং বনফুলের রচনায় যাহা অপর বহু পাঠকের কাছে কুরূপ ও বীভৎস বলিয়া মনে হইয়াছে, তাহাতেই তিনি mysticism এবং paganism এর সন্ধান পাইয়া উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছেন। ইহার কারণ মাণিকবাবু 'বিদ্রোহী কর্ম্মকারের পদবীতে নামিয়াছেন' এবং শেষোক্ত দুইজন লেখক প্রথম গণনীয়ের তিনজনের দুইজন। 'পদ্মানদীর মাঝি' কি গুণে কোন্ পাঠক সমাজে প্রিয় হইয়াছে তাহার বিচারে প্রবৃত্ত না হইয়া, অথবা মাণিকবাবুর অপর উপন্যাসের স্বরূপ বিশ্লেষণ না করিয়া এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে তাঁহার সৃষ্ট চরিত্রের subtlety তারাশঙ্কর ও বনফুলের রচনায় এখনও দেখা দেয় নাই।

সম্বুদ্ধের (শ্রীঅমূল্যকুমার দাশগুপ্ত) শিকার-কাহিনীগুলি পাঠ করিয়া

আনন্দ লাভ করিয়াছিলাম। পরে 'মৃত্যু' নামক গল্পটিতে এই লেখকের ক্ষমতার আরও একদিকের পরিচয় পাইয়াছিলাম। সম্প্রতি মাসের পর মাস অলকায় তাঁহার গুরুগম্ভীর সামাজিক সমস্যার আলোচনা পাঠ করিতেছি। 'High seriousness' পন্থীদের মত 'সাহিত্যের খালে বিলে শৌখীন মৎস শিকারী'র এ্যামেচারত্বের প্রতি কোনও অবজ্ঞা প্রকাশ না করিয়া একটি কথা বলা চলে যে, তিনি সম্প্রতি সমাজ-সংস্কারের যে পদে আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিতেছেন, তাহা লেখকের পথ নহে। আত্মবিস্মৃতির মোহে নিজের শক্তির অপচয় না করিয়া, যে পথে তিনি অনায়াসে মহিমায় চলিতে পারেন, তাহাই অনুসরণ করা ভাল। তাহা ছাড়া সম্প্রতি তিনি শনিবারের চিঠিতে আপনার বয়সের যে হিসাব দিয়াছেন, এই বয়সে 'চলন্তিকা'র সুরে ক্রমাগত বকিয়া চলিলে লোকে তাঁহার বয়স স্মরণ করিয়াও তাঁহার বয়সাতিরিক্ত গাম্ভীর্য্যকে অমৃতং বলিয়া ক্ষমা করিতে পারিবে না। যৌবনোচিত উৎসাহ কিয়ৎপরিমাণে না-কমিলে ভূয়োদর্শন থাকিলেও সমালোচক হওয়া চলে না। কথাগুলি অপ্রাসঙ্গিক হইলেও বলা হইল এই কারণে যে, সমুদ্ধের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা এখনও আছে। যদি শিকার কাহিনীর অনুরূপ গল্পে তিনি আপনার কল্পনার পরিচয় দিতে পারেন তাহা হইলে 'এ্যামেচার'ত্ব সত্ত্বেও উত্তরকালে তিনি খ্যাতি অর্জ্জন করিতে পারিবেন ; Lewis Caroll-এর কথা স্মরণ করিলেই তিনি উৎসাহ পাইবেন ; আমাদের সুকুমার রায়ের কথাও তিনি ভাবিতে পারেন।

শ্রীযুক্ত প্রমথ বিশী সাহিত্যসাধনার প্রথম যুগে satire রচনা করিতেন, যেমন শনিবারের চিঠির অপর অনেক লেখকেই করিতেন। কিন্তু প্রমথ বিশী শ্রেষ্ঠ কবি ও শ্রেষ্ঠ সাহিত্য satire, এই কথা কোনখানে বলিয়াছেন স্মরণ হইতেছে না ; সত্যই যদি তিনি তাহা বলিয়া থাকেন, পরবর্ত্তীকালে তিনি যে serious কবিতা রচনা করিয়াছেন তাহা হইতে ইহা প্রতীয়মান হয় যে, তাঁহার এই উক্তি অপরাপর অনেক উক্তির মত seriously ধর্ত্তব্য নহে ; এবং 'পণ্ডিত-ভাবুক, সমালোচক ও কবি বলিয়া তাঁহার খ্যাতি আছে', সেই খ্যাতির বিস্তার কামনা করিয়াই তিনি নাটক উপন্যাস রচনা করিয়াছেন এইরূপ ধারণা করা অসঙ্গত। একজন লেখক তাঁহার শিল্পীজীবনের প্রারম্ভে যে দৃষ্টি লইয়া

সাধনা আরম্ভ করিয়াছিলেন, তাহারই পুনরাবৃত্তি সর্ব্বত্র দেখিতে যাওয়া সমালোচকের কর্ত্তব্য নহে। প্রমথ বাবুর উপন্যাসগুলি উপন্যাস হিসাবে কতখানি সার্থক তাহাই বিচার্য্য, কিন্তু এককালে লেখক satire লিখিয়াছেন বলিয়া satire হিসাবেই উপন্যাসগুলি বিচার করা কি সমালোচনা ?

প্রবন্ধটির উপসংহার কালে মোহিতবাবু আপনার ভুল-ত্রুটি সম্বন্ধে সচেতন হইয়া উঠিয়াছেন, অস্পষ্টভাবে তাঁহার আলোচনার নানা দৈন্য ও অপূর্ণতার বিষয় তাহার মনে হইয়াছে। কি ভুল, ত্রুটি কোথায় তাহা সঠিক না বুঝিতে পারিয়াও রবীন্দ্র মৈত্রের কথা তাঁহার স্মরণ হইয়াছে, কিন্তু তাঁহার পরিচয় দিবার কথা আর স্মরণ রাখিতে পারেন নাই। মনে হয় কোনও স্মারক তাঁহাকে মাঝে মাঝে সাহায্য করিয়াছে। অনুরাগ স্মারকের তাগিদেই জগদীশ গুপ্তের উপর তাঁহার দৃষ্টি পড়িয়াছিল তাহাও হয়ত মোহিতবাবুর স্মরণ হইয়া থাকিবে, তাই প্রসঙ্গত জগদীশবাবুর অনেক সমালোচকের উপর এক হাত লইয়া পরে তাঁহার কিঞ্চিৎ জ্ঞাতসারেও তিনি একজন লেখককে বাদ দিয়াছেন—তিনি শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র। কারণ তাঁহার লেখা তিনি অল্পই পড়িয়াছেন, এবং যাহা পড়িয়াছেন সে সম্বন্ধেও মোহিতবাবুর সুস্পষ্ট ধারণা মনে নাই। ছোট বেলাকার একটি ঘটনা মনে পড়িল। ফোর্থ ক্লাশে পাঠকালে 'নভেল পড়া উচিত কিনা', এই বিষয়ে একটি বিতর্কে যোগ দিয়াছিলাম। আমাদের ফার্ষ্টবয় নভেল পাঠের বিরুদ্ধে খুব কড়া মতামত প্রকাশ করিতেছিল, 'তুমি নভেল পড় কিনা' প্রশ্নের উত্তরে সে সগর্ব্বে উত্তর দিয়াছিল,—'না; আমি নভেল পড়ি না।' অথচ নভেল পাঠ বিষয়ে তাহার মতামত বেশ দৃঢ়। মোহিত বাবুর প্রবন্ধ পাঠান্তে মনে হয় আধুনিক সাহিত্য সম্বন্ধেও তাঁহার কাছ হইতে অসতর্ক মুহূর্ত্তে আমাদের ফার্ষ্টবয়ের মত উত্তর পাওয়া যাইবে। আধুনিক সাহিত্য সম্বন্ধে মোহিতবাবুর মতামতও বেশ দৃঢ়।

আলোচ্য প্রবন্ধটির শেষে আছে apologia,—হয়ত তাহাও কোনও স্মারকের কীর্ত্তি। মোহিতবাবু সমালোচক হিসাবে অপরের কোনও শৈথিল্য সহ্য করিতে পারেন না। তাঁহার বর্ত্তমান বাংলা সাহিত্যের এই সমালোচনার অনেক ত্রুটি আছে, সে সম্বন্ধেও তিনি নিজেই (অথবা স্মারকের প্রভাবে) অবহিত হইয়াছেন। সম্পূর্ণ ত্রুটিহীন হইবার দাবী কেহই প্রকৃতিস্থ অবস্থায়

করিতে পারে না, অপরের ত্রুটির প্রতি মার্জ্জনাহীন অকরুণ হওয়া অশোভন। আদি ও অন্ত বিদ্রূপ-আবৃত, এবং বিদ্রূপ দ্বারাই খণ্ডিত কোনও প্রবন্ধ প্রকাশ করা এইরূপ কোন কঠোর সমালোচকের পক্ষে নিশ্চয়ই দুঃসাহসের কাজ।

মোহিতবাবুর ষ্টাইল প্রায় অনিন্দ্য। কিন্তু সমালোচনার ভাষা তীক্ষ্ণ ও অব্যর্থ না হইয়া উপমা, প্রতীক, রূপক, উৎপ্রেক্ষা প্রভৃতি অলঙ্কারের উক্ত আশ্লেষে বাষ্পে পরিণত হইলে সমালোচনার উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হইয়া যায়, ইহা 'কিঞ্চিৎ মূলধনের' অধিকারী মোহিতবাবুর স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য, যদিও এই দীন লেখকের মতে একমাত্র 'মূলধন' সম্বল করিয়া সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইলে অনেক প্রমাদ ঘটিতে পারে। অত্যন্ত অন্তরঙ্গ আলোচনা 'মূলধন' সম্বল করিয়াও অবশ্য সমালোচনার গৌরব অর্জ্জন করিতে পারে, যেমন Lamb এবং Hazlitt-এর সমালোচনা করিয়াছে। কিন্তু সাহিত্যকে উপলক্ষ্য করিয়া সাহিত্যের আলোচনা করাই যাঁহার আদর্শ, তাঁহার পক্ষে মূলধনই যথেষ্ট নয়। যে অর্জ্জিত সঞ্চয়ের প্রতি তিনি কটাক্ষ করিয়াছেন তাহাকে কিঞ্চিৎ শ্রদ্ধা করিতে পারিলে তাঁহার সাহিত্য-আলোচনা এমন অকপট ভাবে ব্যক্তিগত প্রীতি ও বিরাগে নিঃশেষিত হইত না। তাহাতে 'ঘোষণা'র গুরুগম্ভীর নিনাদ ধ্বনিত না হইলেও হয়ত তাহা সমালোচনা বলিয়া পরিগণিত হইত।

করালীকান্ত বিশ্বাস

পরস্মৈপদী

'পরস্মৈপদী' কথাটির প্রকৃত অর্থ যাহাই হউক, চলিত ভাষায় উহার একটি অর্থ এই যে কোন কাজ বা দায়িত্ব কৌশলে অন্যের দ্বারা সম্পন্ন করাইয়া লওয়া। নিজের কর্তব্য কৌশলে অন্যকে দিয়া করাইয়া লওয়া ব্যাপারটা অবশ্য খুব শোভন নয়, হয়তো ন্যায়ধর্ম সম্মতও নয়। কিন্তু সামাজিক ব্যাপারে এবং ব্যবহারে সর্বদা অতটা 'খুঁতখুঁতে' হইলে বোধ হয় আমাদের চলে না।

দূরসম্পর্কীয় কাহারও বাড়ি হইতে নিমন্ত্রণ করিয়া গিয়াছে। নিজে যাওয়াই উচিত। কিন্তু ব্যক্তিগত বা অন্য কোন কারণে যাইবার ইচ্ছা নাই। এস্থলে অনেক সময়ে আমরা বাড়ীর কোন একটি ছেলেকে পাঠাইয়া দিয়া নিমন্ত্রণ রক্ষা করি। কলেজের ক্লাশে রাম অনুপস্থিত শ্যামের পক্ষে 'উপস্থিত' হইয়া শ্যামের পারসেন্টেজ রক্ষা করে।

অধ্যাপক রাম ভাল নোট বই লেখেন, কিন্তু সব বইয়ের নোট লিখিবার তাঁহার শক্তি নাই, সময়ও নাই। এস্থলে শ্যামকে দিয়া, যদুকে দিয়া, মধুকে দিয়া নোট লিখাইয়া তাহার দুএক স্থলে একটু আধটু পরিবর্তন করিয়া অথবা না করিয়া সেই নোটগুলি সবই রাম-নামে চালান যাইতে পারে। শুধু নোট নহে, অন্যান্য বিষয়ের পুস্তকও সম্পূর্ণ অন্যকে দিয়া লেখাইয়া যে কোন পরিচিত বা বিখ্যাত লেখকের নামে প্রকাশ করা যাইতে পারে।

ডাক্তার রাম প্রকাণ্ড ডেন্টিষ্ট। প্রকাণ্ড আলখেল্লা পড়িয়া প্রকাণ্ড সাঁড়াশী দিয়া রোগীর দাঁতগুলিকে প্রকাণ্ড টান দিয়া তুলিয়া ফেলিতে তিনি সিদ্ধহস্ত। তাঁহার ফি বাড়িতে বাড়িতে একটা প্রকাণ্ড ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। খ্যাতি শুনিয়া ক্ষতি স্বীকার করিয়াও রোগী যায় তাঁহার দ্বারা দাঁত তুলাইতে। গিয়া দেখেন, যিনি তাঁহার দাঁত তুলিলেন, তিনি হয়তো ইতিপূর্বে প্লায়াস দিয়া একটা পেরেকও তোলেন নাই। ডাক্তার রাম ইঁহার দ্বারাই পরস্মৈপদী কর্ম সমাধা করিয়া ফি-টা নিজের প্রকাণ্ড পকেটে নিক্ষেপ করিলেন। রোগী পরম পরিতোষ লাভ করিলেন।

মস্ত কারখানা। মস্ত মস্ত মেসিন সাহায্যে কারখানার কর্তার নিজের তত্ত্বাবধানে ছোট বড় সব কাজ করানো হয়। ইঁহাদের বিলও হয় মস্ত মস্ত। কিন্তু অধিকাংশ কাজই এ পাড়ায় ও পাড়ায় গলিতে গলিতে বিহারী বা উড়িয়া মিস্ত্রী দিয়া কোনমতে সমাধা করিয়া কারখানার লেবেল লাগাইয়া চালাইয়া দেওয়া হয়। এইরূপ পরস্মৈপদী কলকারখানার লাভ কম নহে।

তেলের আড়ৎ। চোখের সামনে চোখে ঠুলি পড়িয়া বলদ ঘানি ঘুরাই-তেছে। টাট্‌কা সরিষা হইতে টাটকা তৈল বাহির হইতেছে। খরিদ্দারেরা পরম হৃষ্টচিত্তে টাটকা ঘানির তৈল ক্রয় করিতেছে। সামান্য একটু পাটিগণি-তীয় ভুল হয়তো কাহারও কাহারও মনে উদয় হয়। সারাদিন বলদে ঘানি ঘুরাইয়া তেল প্রস্তুত করে আধ মণ, কিন্তু দোকানের বিক্রয় তিন মণ। অর্থাৎ এই তিন মণের মধ্যে আড়াই মণই পরস্মৈপদী। অবশ্য ইহাতে কিছুমাত্র আসে যায় না, কারণ চোখের সামনে দেখিতেছি, চোখে ঠুলি পরিয়া আস্ত একটা বলদ টাট্‌কা সরিষা হইতে টাট্‌কা তৈল প্রস্তুত করিতেছে।

বিরাট ল্যাবরেটরি। এখানে সবই প্রস্তুত হয়। যে কেহ ভিতরে গিয়া স্বচক্ষে দেখিয়া আসিতে পারেন, অনবরত কল চলিতেছে, কত প্রকার কত জিনিষ প্রস্তুত হইয়া বাহির হইতেছে। মনে করুন, একটা দামী ঔষধ এই কারখানায় প্রস্তুত হয়। বাজারে খুব নাম। সকলেই কারখানার নাম দেখিয়া ঔষধ কিনিয়া থাকে। একটু অনুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে, উক্ত কারখানায় প্রস্তুত হয় মাসে দশ গ্রোশ শিশি, কিন্তু বাজারে বিক্রয় হয় মাসে চল্লিশ গ্রোস শিশি। এ স্থলে তিরিশ গ্রোস শিশির ঔষধ পরস্মৈপদী, কার-খানার লেবেল পরিয়া ক্রেতার পকেটে ঢুকিতেছে।

প্রকাণ্ড লেখক। লিখিতে বসিয়া দেখেন, ভাব ও ভাষা কিছুই জোগাইতেছে না। কল্পনা কেমন যেন ভোঁতা হইয়া গিয়াছে। কলমের ডগা দিয়া কালি ব্যতীত আর কিছু বাহির হইতে চায় না। কিন্তু প্রকাণ্ড লেখক, লিখিতে তো হইবে! এ মত অবস্থায় বাঁ দিকের এবং ডান দিকের শেল্‌ফ হইতে নামকরা বিদেশী লেখকের দু চার খানি বই হইতে বাছিয়া বাছিয়া ভাব ও ভাষা তুলিয়া লইয়া নিজ নামে নিজ কলমে লিখিয়া নিজ পুস্তকে প্রকাশ করাটা একটা বিরাট পরস্মৈপদী ব্যাপার।

বহুপ্রকার আইনঘটিত ব্যাপারে স্বীয় নামের পরিবর্তে আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধবের নাম ব্যবহার করা হইয়া থাকে। এগুলি কখনও কখনও "বেনামী"-নামে অভিহিত হইয়া থাকে। অবস্থা বিশেষে পরস্মৈপদী হইতে আত্মনেপদীতে অথবা আত্মনেপদী হইতে পরস্মৈপদীতে পরিবর্তন, সংশোধন প্রভৃতিও হইয়া থাকে। এতৎসংক্রান্ত বিতর্ক, কলহ, মোকদ্দমা প্রভৃতি জনসমাজে সুপরিজ্ঞাত।

রাম রোহিণীকে ভালবাসে; রাম রোহিণীকে একথা বলিয়াছে। রোহিণী রামকে ভালবাসে। রোহিণী একথা রামকে বলিয়াছে। এই বলাবলি অনেকভাবে অনেকবার হইয়া গিয়াছে। ইহাঁদের বিবাহ স্থির হইয়াছে। এখন, রাম এবং রোহিণীর পরস্পর ভালবাসার কথা বা চিরদিন একত্র বাস করিবার কথা শুধু পরস্পবকে বলিলেই চলিবে না। 'তোমার আত্মা এবং আমার আত্মা অভিন্ন'; 'তোমার হৃদয় আমার হৃদয় অভিন্ন'; ইত্যাদি বাক্য বাংলা, সংস্কৃত, ইংরাজি, প্রভৃতি ভাষায় পরস্মৈপদী বলিতে এবং বলাইতে হইবে।

মধু বাবু ধার্মিক ব্যক্তি। তাঁহার বাড়ীতে বার মাসে তের পার্বণ লাগিয়াই আছে। ভগবানের পাদপদ্মে অচলা নিষ্ঠা। ভগবানের নানা ভাবের নানা প্রতিমূর্তি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন আকারে, বিভিন্ন পদ্ধতিতে পূজা করা ইঁহার জীবনের একটি প্রধান ব্রত। পুষ্প, চন্দন, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য, প্রভৃতি সর্বপ্রকার পূজোপকরণ অতি সুনিপুণ রূপে সংগৃহীত ও সজ্জিত হয়। পূজার কোন অঙ্গই কোনরূপে অসম্পূর্ণ থাকে না। তবে প্রকৃত পূজাটি নিষ্পন্ন হয় পরস্মৈপদী। মধুবাবু স্বয়ং তাস, পাসা, গান, বাজনা, সিনেমা, থিয়েটার, অতিথিগণের আদর আপ্যায়ণ প্রভৃতি ব্যাপারে নিমগ্ন থাকিয়া পাঁচ সিকার কন্ট্রাক্টর পূজারীর মারফত তাঁহার হৃদয়ের ব্যাকুল আবেদন ভগবৎ পাদপদ্মে পৌঁছাইয়া দিবার ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। আপাতত এই পরস্মৈপদী ব্যাপারটিকে হাস্যকর মনে হইলেও ইহার নিগূঢ় আধ্যাত্মিক তাৎপর্য আছে।

শ্যাম বাবুর মনপ্রাণ জগন্মাতার চরণকমলে সমর্পিত। যথাকালে, যথারীতিতে আপন দেহের সারবস্তু শোণিত দ্বারা মাতৃচরণ বিধৌত করিয়া

নিজের ভক্তির এবং ত্যাগের যৎকিঞ্চিৎ বাহ্য প্রমাণ প্রয়োগ করিয়া নিজেকে ধন্য মনে করিবেন। নিজের দেহাভ্যন্তরস্থিত কামক্রোধাদি রিপুনিচয় এবং বর্তমান ও অতীত জীবনের সংস্কারসমূহ সমূলে বিনাশ করিবার পরম পবিত্র আকাঙ্ক্ষা লইয়া নিজ দেহের শোণিত দ্বারা মাতৃচরণে তর্পণ করিবেন। মাতা তৃপ্ত হইবেন, সন্তান ধন্য হইবেন। এই ব্যাপারে পরম সঠিক শ্যামবাবু যৎকিঞ্চিৎ পরস্মৈপদীর ব্যবস্থা করিলেন। নিজ রুধিরের পরিবর্তে গোটা কয়েক পাঁঠা-নামক অসহায় ক্ষীণজীবী জীবকে মাতৃসমক্ষে হত্যা করিয়া পরস্মৈপদী আত্মবলিদান করিয়া নিজে উক্ত নিহত পাঁঠাবৃন্দের মাংসের একটা সুচারু কোর্মারূপে পরিণতির জন্য আদা এবং পেঁয়াজ বাটার ব্যবস্থায় নিযুক্ত হইলেন। এই পরস্মৈপদী ব্যবস্থার মূলে কোনরূপ স্বার্থপরতা, লোভ বা আত্মপ্রবঞ্চনা না থাকায় ইহার মর্যাদা মানবসমাজে ক্রমশ বর্ধিত হইতেছে।

পরস্মৈপদী বিধানের কয়েকটি স্থূল দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইল। ধীমান্ পাঠকবৃন্দ কিঞ্চিৎ চিন্তা করিলেই বহু পরস্মৈপদী বিধান নিজের এবং অন্যের জীবনে এবং কার্যে প্রতিনিয়তই প্রত্যক্ষ করিতে পারিবেন।

"ভাস্কর"

জীবনের পটভূমি

প্রথম অঙ্ক

তৃতীয় দৃশ্য

[দ্বিতীয় দৃশ্যের ঘটনার পরদিন। প্রায় সন্ধ্যা হ'য়ে এসেছে। ঘরের মধ্যে আলো জ্বলছে। ঘরের সাধারণ চেহারায় কোনো উল্লেখযোগ্য পরিবর্ত্তন হয় নি। তবে আগের বারের মত এবার সুমিত্রা দেবী আর জয়ন্তী উপস্থিত না থাকবার জন্য আবহটা সৃষ্টি হ'য়েছে একটু অন্য ধরণের। এবং ঘরের ভেতর অনিরুদ্ধের উপস্থিতিটা আবার একটা উপরি গুণ যোগ ক'রেছে যেন সেই আবহে।

অনিরুদ্ধ জানালার কাছে অন্যমনস্ক ভাবে দাঁড়িয়ে ছিল। তার মুখের একটা অংশ মাত্র দেখা যাচ্ছে,—অধিকতর গম্ভীর, এবং চিন্তাযুক্ত ব'লে মনে হচ্ছে যেন। তার গায়ে কালো গলাবন্ধ কোট।

কিছুক্ষণ জানালার কাছে আড় হ'য়ে দাঁড়িয়ে থাকবার পর বাহিরে পায়ের শব্দ পেয়ে সে ফিরে চাইল। সঙ্গে সঙ্গে ভেতরের দরজার পর্দ্দা সরিয়ে সুমিত্রা দেবী ঘরে ঢুকলেন। লালপাড় ফিকে সবুজ রঙের একখানা সাড়ী পড়েছিলেন তিনি, আর গায়ে দিয়েছিলেন বেগনি সার্জ্জের পুরোহাতা জামা। মুখের ভাব অনিরুদ্ধকে দেখে বেশ খুশী হ'য়ে উঠল ব'লে মনে হ'ল।

অনিরুদ্ধ তাঁকে দেখতে পেয়ে ধীরে ধীরে গম্ভীর ভাবে চেয়ারগুলোর দিকে এগিয়ে এল। কাছে আসতে লক্ষ্য হ'ল তার মাথার চুল কিছু এলোমেলো, চোখের দৃষ্টি বিষণ্ণ।]

সুমিত্রা (টেবিলের ওপাশে একটা চেয়ারের পিঠে হাত রেখে) কবে ফিরলে তুমি? শরীর ভাল আছে তো?

অনিরুদ্ধ (ফিকে ভাবে একটু হেসে) হ্যাঁ। আজই এই কিছুক্ষণ আগে ফিরেছি।

সুমিত্রা আসাম মেলে বুঝি? বস। (অনিরুদ্ধ বসল।) খাওয়া হ'য়েছে তোমার?

অনিরুদ্ধ　(অন্যমনস্ক ভাবে) হ'য়েছে। প্রিয়ব্রত আসবে নাকি আজ ?

সুমিত্রা　(মুখোমুখী ব'সে, সস্মিত মুখে) আসতে পারেন হয়ত। রোজই তো প্রায় আসছেন আজকাল। (আন্তরিকতার সঙ্গে) শরীর ভাল আছে তো তোমার ?

অনিরুদ্ধ　আছে এক রকম। তোমার খবর কি ?

সুমিত্রা　(ঈষৎ লজ্জিত অথচ স্পষ্টভাবে) আমি ভালই আছি। (তারপর কণ্ঠস্বরে অনুযোগের সুর ফুটিয়ে) না ব'লে ক'য়ে চলে গেলে এখান থেকে, এ কয়দিন যা ক'রে কাটছিল আমার—!

(অনিরুদ্ধ বিমনা ভাবে একটু হাসল।)

সুমিত্রা　এবার থেকে একটু সুবোধ হও, বুঝলে ? (অন্তরঙ্গ ভাবে) এ রকম ছন্নছাড়া ভাবে ঘুরে বেড়ালে লোকে বড় নিন্দে করে !

(অনিরুদ্ধ কোনো উত্তর দিল না, অন্য দিকে চেয়ে রইল)

সুমিত্রা　(একটু চুপ ক'রে থেকে, তাকে কিছুক্ষণ লক্ষ্য ক'রে) কি, ভাবছ কি বলত ? (অনিরুদ্ধের উত্তর দেবার কোনো লক্ষণ না দেখে) সত্যি বল না, কি হ'য়েছে ? ভাবছ কি ?

অনিরুদ্ধ　ভাবছি নে কিছুই। তবে একটা কথা তোমাকে জানানো দরকার মনে করছি। (ব'লে একটু চিন্তা ক'রে) আমার ছন্নছাড়া স্বভাব যে লোকের নিন্দে কুড়োয় তা আমি জানি। কিন্তু তা সত্বেও দুঃখের সঙ্গে জানাতে হ'চ্ছে, সুবোধ হবার আমার কোনো উপায় নেই। শহরতলীর একটা মিলে মজুররা ধর্মঘট সুরু ক'রেছে ; মিল-মালিক-এর মধ্যেই সেখানে পুলিশ আমদানী করেছে ; পার্টি থেকে চিঠি দিয়েছে যে কোনো মুহূর্ত্তেই সেখানে আন্দোলন পরিচালনা করবার জন্য আমাকে যেতে হ'তে পারে। সুতরাং (সামান্য একটু হেসে) কিছু দিনের মত এই বোধহয় তোমার সঙ্গে আমার শেষ দেখা।

সুমিত্রা　কিন্তু, (প্রয়োজনের মুখে লজ্জাকে সরিয়ে দেবার ভঙ্গীতে) আমি তোমাকে এই সময়ে কি ক'রে ছাড়ব বলত অনিরুদ্ধ ? আমি ভেতরে ভেতরে যে কতটা অসহায় হ'য়ে প'ড়েছি, তা তুমি জান

না। এ অবস্থায় তোমাকে ছেড়ে—(বলতে বলতে গলার স্বর ভেঙে পড়ল, কিন্তু সামলে নিয়ে পরক্ষণেই ব্যগ্রভাবে জুড়ে দিলেন) আমার এখন বিশেষ দরকার তোমাকে।

অনিরুদ্ধ (মনকে অটল রেখে) বুঝলাম। কিন্তু তোমার চেয়েও বেশী দরকার হচ্ছে ওই অপরিচালিত মজুরদের। আর, সত্যি কথা বলতে কি সুমিত্রা, এ সব ব্যক্তিগত কথা বিবেচনা করবার মত যথেষ্ট সময়ও আমার নেই। যাক, রূঢ় হ'য়ে থাকলে মাপ ক'রো। (উঠে দাঁড়িয়ে) আপাতত আমি উঠছি। বাসায় গিয়ে দেখতে হবে কোনো চিঠিপত্র কিছু এল কি না। পারি তো কিছুক্ষণ পরে বরং আরেকবার আসব না হয়। (ব'লে সে বাহিরের দরজার দিকে অগ্রসর হ'ল)

(সুমিত্রা দেবী যেন বাকরুদ্ধ হ'য়ে পড়েছিলেন, অত্যন্ত ম্লান চোখে তার গমন পথের দিকে নীরবে চেয়ে রইলেন।)

(অনিরুদ্ধ দরজা দিয়ে বারান্দায় বের হ'চ্ছে এই সময় প্রিয়ব্রতের সঙ্গে তার মুখোমুখী দেখা। তাকে দেখে ঈষৎ শ্লেষের হাসি হেসে)

অনিরুদ্ধ এই যে, কবি যে! এস, বস। আমিও কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘুরে আসছি। (ব'লে সে পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে গেল।)

প্রিয়ব্রত (ঈষৎ বিস্ময়ের সঙ্গে ঘাড় ফিরিয়ে বাহিরের দরজার দিকে চেয়ে থেকে, ঘরের মধ্যে এগিয়ে আসতে আসতে) কি হ'ল আবার ওর? (অনিরুদ্ধের পরিত্যক্ত চেয়ারে বসে) এল কখন?

সুমিত্রা (হাসবার চেষ্টা ক'রে, ক্ষীণকণ্ঠে:) আজই।

প্রিয়ব্রত (সুমিত্রা দেবীর দিকে ভাল ক'রে চোখ পড়তে, অন্তরঙ্গতার সুরে:) তারপর? আপনাকে এত বিমনা দেখাচ্ছে যে? ও কিছু বলল নাকি?

(সুমিত্রা দেবী কথা না ব'লে মুখের হাসি অম্লান রাখবার চেষ্টা ক'রে মাথা নাড়লেন,—না।)

প্রিয়ব্রত (অধিকতর আন্তরিকতার সঙ্গে :) না, কিছু একটা হ'য়েছে নিশ্চয়ই। আপনি আমাকে লুকোচ্ছেন।

সুমিত্রা (একটু দ্বিধা ক'রে ভারী গলায় :) অনিরুদ্ধ আজ আমাকে শুনিয়ে দিয়ে গেল আমার দরকারের চেয়ে মজুরদের দরকার বেশী। সুতরাং সে আমাকে উপেক্ষা ক'রে—(বলতে বলতে তাঁর চোখে জল দেখা দিল ; তিনি মুখ লুকোলেন। কয়েক মুহূর্ত্ত পরে আঁচলে চোখ মুছে ব্যথিত সুরে :) কোথায় একটা মিল-এ নাকি ধর্ম্মঘট সুরু হ'য়েছে, পুলিশও এসে গেছে, অনিরুদ্ধ যাচ্ছে মজুরদের পরিচালনার ভার নিয়ে।

প্রিয়ব্রত (কিছুক্ষণ মুখ নীচু ক'রে থেকে, সুমিত্রা সংযত হ'লে মৃদু কণ্ঠে :) অনিরুদ্ধ যা বলেছে, তার কর্কশতাটুকু বাদ দিলে কথাটা মোটা-মুটি প্রায় ঠিক। কেন না, (তার বক্তব্যের ধার কমিয়ে দেবার জন্য একটু হেসে :) মজুরদের, মানে, জনমণ্ডলীর দরকার কোনো একজন বিশেষ লোকের দরকারের চেয়ে সব সময়েই বড়। (কিছুটা সান্ত্বনা দেবার সুরে :) দেখুন, এর জন্য হয়ত আপনার ছাড়তে হবে অনেকখানিই, আর কষ্টও পেতে হবে অনেকটা, কিন্তু অনিরুদ্ধকে যদি সত্যিই আপনি ভালবেসে থাকেন তবে এ কষ্টটা আপনার এই ভেবে সহ্য করা উচিত যে অনিরুদ্ধ আরো কত গভীর কষ্টের মধ্যেই না ঝাঁপিয়ে পড়ল। (হেসে) আমি অধ্যবসায়ী ; কিন্তু আমার ধারণা এই যে, প্রেমের ব্যাপারে একটু প্রতিযোগিতার ভাব উপকারী।

(ভেতরের দরজা দিয়ে জয়ন্তী এল। তার মুখের ভাব কিছুটা গম্ভীর। ঘরে ঢুকে সে প্রিয়ব্রতের দিকে না চেয়ে সোজা সুমিত্রাদেবীর সামনে এসে দাঁড়াল।

জয়ন্তী অনিরুদ্ধবাবুর গলার স্বর শুনলাম না ? কোথায় গেলেন তিনি ?

সুমিত্রা বাসায় গেছে। কেন ? বস, আসবে এখনি।

জয়ন্তী না, আমার কাজ আছে ভাই। তিনি এলে আমাকে ডেকো।

(বলে সে যেমন এসেছিল তেমনি প্রিয়ব্রতের দিকে না চেয়ে বেরিয়ে গেল।)

(সে গেলে প্রিয়ব্রত একটা সিগারেট ধরাল। তারপর সুমিত্রাদেবীর চোখের দিকে চেয়ে হাসতে লাগল।)

সুমিত্রা (অনেকটা সহজ সুরে) হাসছেন যে ?

প্রিয়ব্রত (হাসির রেশ টেনে :) জয়ন্তী দেবী যেভাবে ক্রমাগত আমাকে অবহেলা করতে সুরু করেছেন তাতে ওঁর সম্বন্ধে রীতিমত আমি সন্দিহান হ'য়ে উঠছি।

সুমিত্রা (হেসে :) কেন ? ও, আপনার সেই থিওরীর কথা ? বিপরীত ভাবাপন্ন নরনারী পরস্পরকে আকর্ষণ ক'রে, এই তো ? ওতে আর এত শঙ্কিত হবার কি আছে।

(প্রিয়ব্রত কিছু না ব'লে নীরবে সিগারেট টানতে লাগল।)

(হঠাৎ যেন সুমিত্রা দেবীর মাথায় একটা রোখ চাপল। রীতিমত আন্তরিক কৌতূহলের সঙ্গে প্রশ্ন করলেন তিনি :)

সুমিত্রা আচ্ছা, সত্যিই কি আপনি ওর প্রতি আকৃষ্ট নন ?

প্রিয়ব্রত (সিগারেটের দগ্ধাবশেষ মেঝেয় ফেলে জুতোয় চেপে :) না। তবে ওঁকে ভাল লাগে।

সুমিত্রা আপনাকে কারো ভাল লাগতে পারে না, ওর এই পরোক্ষ স্বীকৃতির পরও ?

প্রিয়ব্রত (সহজ সুরে :) হ্যাঁ। (একটু চিন্তান্বিত ভাবে) ওঁর মধ্যে একটা ক্ষমতার ছাপ দেখতে পাই যেন।

সুমিত্রা (স্বাভাবিক হবার চেষ্টা করে) আপনি সত্যিই কবি। আচ্ছা, (চোখের দৃষ্টি তীব্রভাবে কৌতূহলাক্রান্ত ক'রে :) আমার মধ্যে কোনো ক্ষমতার ছাপ দেখতে পান না কি ?

প্রিয়ব্রত (হেসে, এই প্রসঙ্গের মধ্যে অনেক কিছু নিহিত আছে বুঝতে পেরে :) আজ থাক। সময় হ'লে জানাব সে কথা।

(বাইরের বারান্দায় জুতোর শব্দ শোনা গেল। অনিরুদ্ধ আর জয়ন্তী এক সঙ্গে ঘরে ঢুকল।)

সুমিত্রা (ঈষৎ রহস্যের সুরে :) যাক জয়ন্তী, তোমাকে আর ডাকতে হ'ল না দেখছি।

জয়ন্তী (রহস্য বোঝবার চেষ্টা না ক'রে, ছাঁটাকাটা গলায় :) হ্যাঁ ভাই, গরম বড্ড বালাই। তোমরা বস ; দেখি ঝিকে চায়ের কথাটা বলি।

(জয়ন্তী চ'লে গেল।)

অনিরুদ্ধ (সুমিত্রা আর প্রিয়ব্রতের মাঝে একটা চেয়ারে ব'সে :) তারপর প্রিয়ব্রত, তোমার খবর কি ? নতুন আর কিছু লিখছ ?

প্রিয়ব্রত (অনিরুদ্ধের শ্লেষ গায়ে না মেখে :) হ্যাঁ, শ্রমিক সমস্যাকে প্লট ক'রে একটা উপন্যাস লিখব মনে করছি।

অনিরুদ্ধ (সশ্লেষ হাসির সঙ্গে চোখ টান ক'রে :) এ্যাঁ, সর্ষের মধ্যে ভূত ? আরে আমাদের সদাশয় পুঁজিদাররা তো মনে মনে তোমাদের ওপরই বিশ্বাস ক'রে ব'সে আছে,—স্বাধীনতা স্বাধীনতা ব'লে আর সকলে গলা ফাটালেও তোমরা অন্তত স্বপ্নের বাড়ি তৈরী থেকে বিরত হবে না। তাদের ধারণা, এতে যে কয়টা লোক লেখাপড়া জানে তারা আর দেশ-টেশ নিয়ে মাথা ঘামাবে না। কিন্তু তাদের সে আশায় ছাই পড়ল দেখছি। তা তোমার প্লটটা কি বল দেখি ?

প্রিয়ব্রত (পূর্ব্ববৎ অনিরুদ্ধের শ্লেষে বিচলিত না হ'য়ে ঈষৎ দৃঢ়তার সঙ্গে হেসে হেসে :) জনকতক বাতিকগ্রস্ত লোক মাঝে মাঝে শ্রমিক-আন্দোলনের নামে কি রকম বিপদ ঘটায়, সেইটে।

অনিরুদ্ধ অর্থাৎ, তুমি প্রমাণ করতে চাও তুমিও শ্রমিক-আন্দোলনে বেশ গভীরভাবে আগ্রহান্বিত ?

প্রিয়ব্রত তা খানিকটা তো বটেই।

অনিরুদ্ধ কি করে ? উপন্যাস আর কবিতা লিখে ?

প্রিয়ব্রত (হেসে) আপাতত তো সেই পর্য্যন্তই দেখা যাচ্ছে।

অনিরুদ্ধ উপন্যাস কবিতা লিখে শ্রমিক-আন্দোলনে সহানুভূতি দেখাবে, আর নিরাপদ দূরত্ব থেকে যারা সত্যিকার কর্ম্মী তাদের খুঁত ধরবে, এই তাহ'লে তোমাদের বর্ত্তমানের কর্ম্মসূচী ?

প্রিয়ব্রত (হেসে) দেখ, তুমি সত্যি-সত্যিই যদি আমার সম্বন্ধে কৌতূহলী হ'তে তবে হয়ত আমার বর্ত্তমান এবং ভবিষ্যৎ কর্ম্মসূচীর কিছু কিছু আভাস তোমাকে দিতে পারতাম। কিন্তু তুমি যে নেহাৎ-ই ঠাট্টা করছ, দুঃখের সঙ্গে আমাকে স্বীকার করতে হচ্ছে, সেটা আমি বুঝতে পারছি অনিরুদ্ধ।

অনিরুদ্ধ (যেন প্রিয়ব্রতের অধঃপতনে দুঃখিত হ'য়েছে এই ভঙ্গীতে :) না, ঠাট্টা ঠিক নয় প্রিয়ব্রত। আমি সত্যিই বুঝে উঠতে পারি না, দেশের এই চরম দুর্দ্দিনেও তোমরা কি ক'রে নিশ্চিন্তে কাব্য করতে পার। তোমরা কি সত্যিই বিশ্বাস কর যে ঐ কাব্য ক'রেই দেশের একটা কোনো মহৎ কাজ করতে পারছ তোমরা ?

প্রিয়ব্রত দেশের মহৎ কাজ জিনিসটা একটা আপেক্ষিক ব্যাপার। কেউ কেউ হয়ত মনে করেন সাহিত্যের ভেতর দিয়েও এখনো দেশের অনেকটা কাজ করা যেতে পারে। কেউ-কেউ তা মনে করেন না, তাঁরা কাজে নেমে পড়েছেন। যাঁরা মনে করেন না, তাঁরাও হয়ত একদিন কেউ কেউ মনে করবেন, হয়ত তখন কাজেও নামবেন। আবার এমন লোকও হয়ত থাকতে পারেন যাঁরা কোনোদিনই কাজে নামবেন না, কিন্তু তাঁরা এমন সাহিত্যই সৃষ্টি করতে সুরু করবেন যা কাজে নামার বাড়া। সুতরাং এ নিয়ে বাদ বিতণ্ডা একেবারেই নিরর্থক। যাব যখন সময় হবে, কাজে নামবে। জোর ক'রে এ সব জিনিস হয় না।

অনিরুদ্ধ (তার যুক্তিতে ধরা না দেবার ভঙ্গীতে) মতামতগুলো জয়ন্তী দেবী জানতে পারলে খুব উপকৃত হ'তেন। (সুমিত্রা দেবীর দিকে) গেলেন কোথায় ?

সুমিত্রা চায়ের তদ্বিরে তো গেল তখন। কিন্তু, সে জানতে পারলে উপকৃত হত কেন ? এ সব বিষয়ে সে কি খুব আগ্রহান্বিত নাকি ?

অনিরুদ্ধ বিশেষ রকম। আমার কাছ থেকে টাটকা খবর সব জানতে পারবেন মনে ক'রে সন্ধ্যার পর থেকেই না কি বারান্দায় অপেক্ষা করছিলেন।

(সুমিত্রা দেবী আর প্রিয়ব্রতের চোখাচোখী হল।)

সুমিত্রা ও, তাই তখন তোমার খোঁজ করছিল। আশ্চর্য্য তো। এত সঙ্গে থাকি, অথচ আমি কিছুই টের পাই নি।

(জয়ন্তী ঝিয়ের হাতে চায়ের ট্রে দিয়ে প্রবেশ করল। ঝি টেবিলের ওপর ট্রে রেখে চলে গেল। জয়ন্তী খালি চেয়ারখানায় ব'সে চা ঢালতে ঢালতে—)

জয়ন্তী কি টের পাও নি, সুমিত্রাদি ?

সুমিত্রা (ঈষৎ লজ্জিতভাবে :) আমার পাশের ঘরেই যে একজন পাকা স্বদেশসেবিকা থাকেন সেইটে।

জয়ন্তী দেখ, আমাকে পাকা স্বদেশসেবিকা বলা তোমার খুব অন্যায় হ'য়েছে সুমিত্রাদি। কেননা, প্রত্যক্ষভাবে কাজে নামি নি এই অজুহাতে অনিরুদ্ধ বাবু আমাকে সে সম্মান দিতে চাইবেন না, আর কবিতা লিখতে পারি না বলে প্রিয়ব্রত বাবুও আমাকে আমল দেবেন না। সুতরাং এই দুটো প্রধান পথ হারিয়ে কোন উপায়ে আমি স্বদেশসেবিকা হয়েছি বল তো ? (ব'লে সকলকে এক-এক কাপ চা দিল।)

সুমিত্রা (চায়ে এক চুমুক দিয়ে) তুমি অত্যন্ত ভুল ক'রেছ জয়ন্তী। প্রকারান্তরে কবিতা লেখেন ব'লে যে আঘাতটা তুমি প্রিয়ব্রত বাবুকে দিলে, উনি তার উত্তরটা একটু আগেই আমাদের শুনিয়ে দিয়েছেন।

অনিরুদ্ধ (টিপ্পনী যোগ করবার ভঙ্গীতে জয়ন্তীর প্রতি) মানে প্রিয়ব্রত বলতে পারত, কবিতা লিখে স্বদেশসেবিকা হওয়া যায় না আপনার এই প্রচ্ছন্ন শ্লেষটা একেবারেই ব্যর্থ। কেননা ওর মতে, এমন কবিও থাকা খুব আশ্চর্য্য কিছু নয় যিনি কবিতার ভেতর দিয়েই প্রত্যক্ষ কাজের চেয়ে অনেক বেশী দেশের কাজ করে যেতে পারেন।

প্রিয়ব্রত (সংযত গাম্ভীর্য্যের সঙ্গে) এবং আমি এখনও বলছি, কথাটা মিথ্যে নয়। কিন্তু আমার মনে হয় (কণ্ঠস্বরে সদাশয়তা ফিরিয়ে এনে)

এ আলোচনা অন্য কোনো দিনের জন্যে সরিয়ে রেখে আপাতত খোশ গল্প করাই আমাদের সকলের পক্ষে উপকারী হবে।

জয়ন্তী (হেসে) তার মানেই, আপনি হাতে হাতে প্রমাণ করতে চান যে কাজের চেয়ে অকাজ অনেক উপকারী।

প্রিয়ব্রত (ঈষৎ ক্ষুণ্ণভাবে, সিগারেট ধরিয়ে) না সে রকম দুরভিসন্ধি আমার ছিল না। আমি শুধু গল্প করবার ইচ্ছেটাই নিবেদন করেছিলাম। ইচ্ছে করলে আপনারা আরো অনেকক্ষণ জটিল সব তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা চালাতে পারেন। (সে চেয়ারে হেলান দিয়ে সিগারেট টানতে লাগল।)

(কোথায় যেন একটা ছেদ পড়ে গেল। সকলেই চায়ের পেয়ালা হাতে ক'রে চুপচাপ বসে রইল।

কয়েক মুহূর্ত এইভাবে ব'সে থাকবার পর অনিরুদ্ধ সশব্দে চেয়ারটা পেছনে ঠেলে দিয়ে উঠে দাঁড়াল। তারপর পকেট থেকে রুমাল বের ক'রে মুখ মুছে :)

অনিরুদ্ধ যাক্। আমি চলছি। কাল ভোরেই আমাকে রওনা হ'তে হবে। (পকেট থেকে একখানা চিঠি বের ক'রে সেখানা আবার যথাস্থানে রেখে দিয়ে) পার্টি থেকে চিঠি দিয়েছে, ওদের ধর্ম্মঘটের সমস্ত দায়িত্ব আমাকে বুঝে নিয়ে কাল থেকে আমাকে কাজ আরম্ভ করতে হবে। আশে পাশের আরো কয়টা মিলেও নাকি ধর্ম্মঘট সুরু হয়েছে। (ব'লে সে দরজার দিকে পা বাড়াল।)

(জয়ন্তী উঠে তাকে বারান্দা পর্য্যন্ত এগিয়ে দিতে গেল।)

(প্রিয়ব্রত কেবল উঠে দাঁড়াল।)

(সুমিত্রা দেবী চেয়ারের ভেতর আরো ঢুকে পড়লেন যেন। তাঁর মাথা নেমে এল টেবিলের ওপর।)

প্রথম অঙ্ক

চতুর্থ দৃশ্য

[দিন পনের পরের ঘটনা। সকালের প্রখর রৌদ্রে সুমিত্রা দেবীদের বসবার ঘর উদ্ভাসিত। ঘরের মধ্যে এখন জয়ন্তী ও সুমিত্রা দেবী উপস্থিত। উভয়েরই বেশভূষা আটপৌরে ; স্নান এখনো হয়নি,—খোপার ও বেণীর বাঁধন থেকে কয়েকটি চূর্ণালক রাত্রে অব্যাহতি লাভ করেছিল, যা এখন কপালে ও মাথার ওপর অদ্ভুত একটা কমনীয়তার সৃষ্টি করেছে।

সুমিত্রা দেবী বসে আছেন সোফার ওপর। তাঁর পাশে ও মেঝের ওপর খবরের কাগজ ছড়ানো রয়েছে। মুখের ভাব বিধুর।

জয়ন্তী বসেছিল এ পাশের একখানা চেয়ারে। তার মুখের ভাবে গাম্ভীর্য আছে, কিন্তু কাঠিন্য নেই। বরং সামান্য একটা কোমলতার আভা-ই যেন লক্ষ্য করা যায়।

কিছুক্ষণ এইভাবে ব'সে থাকবার পর—]

জয়ন্তী কিন্তু, শ্রমিকদের এ রকম বিশ্বাসঘাতকতা করাটা সত্যই একেবারে অপ্রত্যাশিত ব্যাপাব।

সুমিত্রা (হাসবার চেষ্টা করে) অপ্রত্যাশিত আর বলা যায় কি ক'রে? (খবরের কাগজের একটা পাতা তুলে নিয়ে তার একটা জায়গায় চোখ বুলিয়ে জয়ন্তীর দিকে চেয়ে) কাগজে তো স্পষ্টই লিখেছে, অনিরুদ্ধের কৌশলের অভাবেই এমনতর ঘটনাটা ঘটেছে। এই (একটু থেমে) মিল-মালিকরা যে সমস্ত রকম চেষ্টাই করবে এতো জানাই ছিল। কিন্তু তা সত্বেও মজুরদের ওপর এতটা নির্ভর করা তার ঠিক হয় নি,—আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে প্রতি মুহূর্তে তাদের সঙ্গে সংযোগ রাখা উচিত ছিল। তার ফলে মালিকদের পক্ষের লোকে এসে একটা কথা বুঝিয়ে দিয়ে যাবার পরই অনিরুদ্ধের সহকর্মীরা সে সব যুক্তির অসারতা দেখিয়ে দিতে পারত।...... ভেতরের ব্যাপারটা তো ঠিক এখনো বোঝা যাচ্ছে না,—তবে অনিরুদ্ধের ভুলের ফলেই যে শ্রমিকেরা মিটমাট করেছে এটা ঠিক।

জয়ন্তী কিন্তু অনিরুদ্ধের কেন জেল হ'ল ? নিশ্চয়ই মজুররা তাকে ধরিয়ে দিয়েছিল।

সুমিত্রা সেইটেই ঠিক এখনো বোঝা যাচ্ছে না। (খবরের কাগজ তুলে, পড়ে) 'পনর মাস সশ্রম কারাদণ্ড।'......(ম্লানভাবে হাসবার চেষ্টা ক'রে) এক বছর তিন মাস। (তাঁর চোখে জল দেখা দিল।)

(বাহিরের দরজা দিয়ে প্রিয়ব্রত এসে ঘরে ঢুকল। তার হাতে গোল পাকানো খবরের কাগজ। ঘরের মধ্যে ঢুকে ধীরে ধীরে কয়েক পা এগিয়ে আসবার পর সুমিত্রা দেবী তাকে দেখতে পেলেন। তাড়াতাড়ি চোখ মুছে ফিকে ভাবে হেসে মনের উত্তেজনা চাপবার জন্য উঠে দাঁড়ালেন।

সুমিত্রা দেবী পুনরায় সোফাতে না ব'সে এগিয়ে আসতে আসতে)

সুমিত্রা (যেন কি ক'রে স্বাভাবিক হবেন বুঝতে না পেরে, অত্যন্ত খাপ-ছাড়া ভাবে) অনিরুদ্ধের পনের মাস সশ্রম জেল হয়েছে।

(এই অদ্ভুত বলবার ভঙ্গীতে জয়ন্তী ও প্রিয়ব্রত উভয়েই বিস্মিত হয়ে তাঁর মুখের দিকে চাইল। তারপর সুমিত্রা দেবী এক-খানা চেয়ারে বসলে—।)

প্রিয়ব্রত (মৃদু কণ্ঠে) সেই খবরটা দেখেই তো সকাল বেলাতেই চলে এলাম। ওদের পার্টির একটা ছেলের সঙ্গে দেখা হ'য়েছিল। সে বলল, মিলের মালিকরা নাকি শ্রমিকদের এই আশ্বাস দিয়েছিল যে তারা যদি পুলিশের কাছে বলে অনিরুদ্ধই তাদের উস্কানি দিয়ে এই ধর্মঘট করিয়েছে তাহ'লে সব রকম দাবীই তাদের মিটিয়ে দেওয়া হবে। আর যে কথা সেই কাজ। অনিরুদ্ধের জেল হ'য়ে গেল পনের মাস।

(ভেতরের দরজা দিয়ে ঝিকে দেখা গেল।)

ঝি (সুমিত্রা দেবীকে) ধোপা এসেছে কাপড় নিয়ে।

(ঝি চ'লে গেল।)

জয়ন্তী (উঠে দাঁড়িয়ে) তুমি বস সুমিত্রা দি। আমি যাচ্ছি।

সুমিত্রা　(উঠে যেতে যেতে) না না, তুমি বস। আমিই যাচ্ছি। গোটাকতক গরম জামা আজ দিতে হবে। (ব'লে তিনি বেরিয়ে গেলেন।)

জয়ন্তী　(পুনরায় বসে, একটু অপেক্ষা ক'রে প্রসঙ্গ ঘুরিয়ে দেবার জন্য :) কাল আপনার একটা কবিতা পড়লাম 'বিশ্বচক্রে'। দৃষ্টিভঙ্গীর কিছুটা পরিবর্ত্তন দেখা গেল যেন।

প্রিয়ব্রত　(হেসে :) কিম্বা, পাঠকের দৃষ্টিভঙ্গীটাই কিছু বদলেছে। (তারপর ব্যাখ্যা করবার সুরে :) কেননা, যে পরিবর্ত্তনটা আপনি দেখেছেন সেটা লেখকের দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্ত্তনের মত অতটা আমূল ব্যাপার বোধ হয় নয়। আমার আগের কবিতাগুলো দেখলে বুঝতে পারতেন পরিবর্ত্তনটা পূর্ব্বের লক্ষণেরই ক্রমবিকাশ মাত্র।

জয়ন্তী　(হেসে :) যাই হোক, অন্য রকম মনে হ'ল। (একটু থেমে :) আপনার উপন্যাসের কথা শুনেছিলাম। শেষ হ'য়েছে কি ?

প্রিয়ব্রত　(ঈষৎ আত্মতুষ্ট ভাবে :) না, দু'একদিনের মধ্যেই সেরে ফেলব আশা করছি।

জয়ন্তী　কি রকম ভাবে শেষ করবেন মনে করছেন ? বিষয়বস্তু তো শ্রমিক সমস্যা। ব্যর্থতায় শেষ হবে, না সাফল্যে ?

প্রিয়ব্রত　সাফল্যে।

জয়ন্তী　কিন্তু আমাদের দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় সেটা কি খুব অবাস্তব ব'লে মনে হবে না,—বাস্তবে যখন সাফল্য নেই তখন ?

প্রিয়ব্রত　(সহজ সুরে :) না। বাস্তবে যা থাকে না সাহিত্যে তা থাকলে কিছু দোষের হয় না। কেবল লক্ষ্য রাখা দরকার যে, রচনাটা রসোত্তীর্ণ হ'য়েছে কিনা।

(সুমিত্রাদেবী ফিরে এসে নীরবে তাঁর পূর্ব্বের চেয়ারখানায় বসলেন।)

জয়ন্তী　কিন্তু ধরুন, বিপ্লবপূর্ব্ব রুশীয় সাহিত্য আর বিপ্লবোত্তর রুশীয় সাহিত্য,—এ দুটোর ভেতর কি সুরের একটা পরিবর্ত্তিত ভঙ্গী দেখতে পাওয়া যায় না ? এখনকার লেখা যত সতেজ, স্বচ্ছন্দ এবং আশাবান আগেকার লেখা সে রকম ছিল না নিশ্চয়ই ?

সেখানে ছিল সংশয়, সংগ্রাম এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই একটা অলব্ধ আশার সঙ্কেতমাত্র।

প্রিয়ব্রত (সহাস্যে:) তা হ'তে পারে। কিন্তু তা দিয়ে কিছু প্রমাণিত হবে না। কোনো একটা দেশে যা হ'য়েছে অন্য সব দেশের সাহিত্যেও যে হুবহু তাই হবে তার কোনো ধরা বাঁধা নিয়ম নেই। ইতিহাসের পুনরাবর্ত্তনটা প্রাকৃতিক নিয়ম নয়, ওটা একটা নিছক ব্যতিক্রম মাত্র।...সাহিত্য কখনো কিছুকে অনুসরণ করে না, অনুকরণ তো করেই না, তার একমাত্র লক্ষ্য হ'চ্ছে সৌন্দর্য্যসৃষ্টি, এবং সেই কারণে রসসৃষ্টি। যেভাবে সেটা হয়, হ'লেই হল।

জয়ন্তী (আন্তরিক বিস্ময়ের সঙ্গে) তাহ'লে কি আপনি বিষয়বস্তু বা উদ্দেশ্যকে ছোট মনে করেন? তা যদি হয় তবে শ্রমিকদের নিয়ে উপন্যাস না লিখে পরী নিয়েও তো লিখতে পারতেন?

প্রিয়ব্রত (হেসে) খুবই পারতাম। কিন্তু পারি নি। সেই জন্যই সে আলোচনা নিরর্থক।...যদি কেউ সার্থক ভাবে পারে, তাকে প্রশংসা করবই। এমন পরীর গল্পও হওয়া কিছু আশ্চর্য্য নয়, যা প্রথম শ্রেণীর সাহিত্য হ'তে পারে।

জয়ন্তী (একটু চুপ ক'রে থেকে) তা পারুক আর না-ই পারুক, আপনি যে পারেন নি তার প্রধান কারণ আমার মনে হয় এই যে, আপনি আধুনিক হবার চেষ্টা করেছেন।

প্রিয়ব্রত (মস্ত একটা মার খেয়েছে এমনি ভঙ্গীতে, হেসে হেসে) অমনতর গাল আমাকে দে'বেন না।...আধুনিক হওয়ার মত পাপ আর নেই। আজ হোক কাল হোক সে প্রাচীন হবেই। শ্রেষ্ঠ আধুনিক হ'চ্ছে খবরের কাগজের প্রবন্ধ যা পরের দিনই পুরনো।

সুমিত্রা (ধীর, মৃদু গলায়) কিন্তু দক্ষিণপন্থী লেখক তো নিশ্চয়ই আপনি হ'তে চান না। তবে কি আপনি মধ্যপন্থী?

প্রিয়ব্রত দেখুন আরিস্তত্‌ল সাহেব মধ্যপন্থার সুবর্ণসুযোগের কথা বার বার উল্লেখ করা সত্ত্বেও আমি বলতে বাধ্য, সাহিত্যের ক্ষেত্রে অন্তত, মধ্যপন্থাটা কোনো একটা বিশেষ ধরণের পন্থাই নয়। ওটা হচ্ছে

জনতার পন্থা। সুবিধা বেশী ব'লে ভিড়ও বেশী। কিন্তু কোরাসে গান গেয়ে যে নিজের গলার বৈশিষ্ট্য প্রমাণ করা যায় না এ তো প্রায় পরীক্ষিত সত্য ?...তা নয়। 'অনাগত কাল' কথাটা বড্ড বেশী পুরোনো হয়ে গেছে—আমি হ'তে চাই অসম্ভাব্য কালের লেখক। অর্থাৎ যে কাল কোনোদিনই আসা অম্ভব নয়, তার লেখক,—যাতে কোন দিনই আমি তোলো না হই। (একটু থেমে) সেই জন্যই আমার উপন্যাসের বিষয়বস্তু শ্রমিকসমস্যা, আর শেষ হবে সাফল্যে,—এমন ধরণের পরিপূর্ণ সাফল্য যা কোন দিনই বাস্তবে সম্ভব নয়, যা চিরদিনের আদর্শ, এবং সেই কারণেই রোমান্টিক।

জয়ন্তী (বিশেষ আশ্চর্য্য হ'য়ে) রোমান্টিক ? শ্রমিক আন্দোলনের মত নেহাৎ কাঠখোট্টা রিয়ালিষ্টিক ব্যাপার নিয়ে করবেন রোমান্টিসিজমের আকাশকুসুম রচনা ?

প্রিয়ব্রত (হেসে মাথা নেড়ে) তা ছাড়া আর উপায় কি ? আকাশকুসুম ব্যাপারটা নিতান্তই কাব্যকলার ফসল কিনা। বরং বলা যায় আকাশকুসুমই হ'চ্ছে সাহিত্যিকদের শ্রেষ্ঠ আবিষ্কার।

জয়ন্তী (ঈষৎ ঠাট্টার সুরে) হ্যাঁ, প্রায় মানবসভ্যতায় সাহিত্যিকদের 'অবদান' গোছের।

প্রিয়ব্রত (ঠাট্টাকে ঠিকভাবে গ্রহণ ক'রে) ঠিক তাই। (কিছুটা সংযত হ'য়ে) খাঁটি রিয়ালিজম্-এ কখনো সাহিত্য হয় না। সেটা হচ্ছে হাড়, প্রচ্ছন্ন ভাবে থেকে কাঠামোটাকে খাড়া ক'রে রাখে, সৌন্দর্য্য যা কিছু তা আসে কল্পনার রক্তমাংসে। বিশুদ্ধ রিয়ালিজম্ দিয়ে যদি সাহিত্য করা যেত তবে আদালতের জমানবন্দীর বিবরণগুলোই হ'ত শ্রেষ্ঠ সাহিত্য, কেন না সেইগুলোই হ'চ্ছে বাস্তবের সবচেয়ে হুবহু নকল। (হেসে) আমি শ্রমিক আন্দোলন নিয়ে রোমান্টিক হ'তে পারি জন্যই বলতে পারি, আমার বিষয়বস্তু পরীর গল্পও হ'তে পারত। কারণ হ'চ্ছে এই যে, সে জিনিসটাও বাস্তবে সম্ভব নয়,— অসম্ভাব্য কালের সাহিত্য হ'তে বাধা ঘটায় না।

জয়ন্তী কিন্তু ইতিমধ্যে সাহিত্যিককে বর্ত্তমান কালেই বাস করতে হয় কিনা, সেইটুকুই যা অসুবিধে।

প্রিয়ব্রত অসুবিধে তো কিছু নেই। সাহিত্যিকও অন্যান্য দশজনের মতই মানুষ। সুতরাং সেও বর্ত্তমানের প্রতি উদাসীন না হ'তে পারে।

জয়ন্তী আপনার মত অনুসারে তার উদাসীন না হ'য়ে আর উপায়ান্তর আছে বলে তো মনে হয় না।

প্রিয়ব্রত উপায় আছে কি না সেটাও আবার ক্ষেত্রে উপস্থিত না হ'লে বোঝা যায় না। আমার ভেতর যা আদর্শ, যাকে আমি সাহিত্যে স্থায়ী রূপ দিতে চাই, সেটা থাকবে চিরদিনের সাধনার বস্তু হ'য়ে, কিন্তু ইতি-মধ্যে তো স্থূলভাবে আমি আর দশজনের মতই প্রতিমুহূর্ত্তে বেঁচে চলছি; তার স্থূল কর্ত্তব্য ও লোভ অবহেলার নয়,—মোটামুটি আমার কথাটা ছিল এই ধরণের। যাক, (ঘড়িতে সময় দেখে উঠে দাঁড়িয়ে) আপনাদের স্কুলের সময় হল। (হেসে) গল্প সুরু হ'লে আমার আর সময়জ্ঞান থাকে না। (সে অগ্রসর হল।)

(সুমিত্রা দেবী তাকে অনুসরণ ক'রে যেতে যেতে)

সুমিত্রা কাল আবার আসবেন কিন্তু।

প্রিয়ব্রত দেখি তো। (বেরিয়ে গেল।)

(জয়ন্তী যেমন বসে ছিল তেমনি বসে রইল। তার চোখের দৃষ্টি ঈষৎ চিন্তাযুক্ত।

ক্রমশঃ

মণীন্দ্র রায়

ভারতীয় সমাজ-পদ্ধতির উৎপত্তি ও বিবর্ত্তনের ইতিহাস

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

বোধ হয় মনুর পুত্র, অতএব 'মানব' এবং এক মনু ক্ষত্রিয় ছিলেন, তজ্জন্য এই গোত্র এই বংশে ব্যবহার করিলে কার্য্যকরী হইবে—এইরূপ গোজা-মিল দেওয়া হইয়াছে। পুনরায় রাঠোরদের গোত্র হইতেছে 'গৌতম'। বৈদ্য মহোদয় এই গোত্রও মনুতে খুঁজিয়া পান নাই * কিন্তু পুরাণে উক্ত নামের উল্লেখ আছে। এই সকল সংবাদ হইতে ইহা বোধগম্য হয় যে রাজপুতদের গোত্র সকল সময় 'আর্ষেয়'নয়। রাজপুত জাতির বিবর্ত্তনের সময় নানাবিধ গল্পের অবতারণা করা হইয়াছে এবং তৎকালীন অবস্থানুযায়ী কেহ বা পুরাতন গোত্র রাখিয়াছেন, আবার কেহবা ব্রাহ্মণ্য গোত্র গ্রহণ করিয়াছেন।

এক্ষণে কায়স্থদের বিষয় বিবেচনা করিয়া দেখা যাউক। তাহাদের সবই ব্রাহ্মণ্য গোত্র; কিন্তু কথিত হয় যে শূদ্রের গোত্র নাই; তাঁহারা পুরোহিতের গোত্র গ্রহণ করিয়াছেন। যেমন একাদশ শতাব্দীতে বিজ্ঞানেশ্বর বলিয়াছেন, ক্ষত্রিয়দের পৃথক গোত্র নাই। কিন্তু প্রাচীন ক্ষত্রিয়দের নিজস্ব গোত্র ছিল,—ইহা আমরা দেখিয়াছি এবং পুরাণেও বৈশ্যদের কুলের কথা আছে। কায়স্থদের এই ব্রাহ্মণ্য গোত্র কোথা হইতে আসিল তাহা নিয়া অনেক বিতর্ক আছে। এই বিতর্কমূলক বিস্তারিত আলোচনায় প্রবেশ না করিয়া ইহা বলিলেই এই-স্থলে যথেষ্ট হইবে যে তাঁহাদের উৎপত্তি ও বর্ণ নিয়া অনেক বাদানুবাদ আছে এবং বাংলার কায়স্থদের উদ্ভব বিষয়ে কিছুদিন পূর্ব্বেও বিতর্ক উত্থাপিত হইয়াছিল। ডাঃ ভাণ্ডারকর তাহাদিগকে বাঙ্গলায় ঔপনিবেশিক প্রাচীন নাগর ব্রাহ্মণদের সহিত এক বলিয়া মনে করিতে চাহেন; কারণ, তাহাদের বংশগত পদবী, গোত্র ও প্রবর উক্ত ব্রাহ্মণদের সহিত মিলে (১)। কিন্তু

* Vaidya—Vol. III.

১। Dr. Bhandarkar in Indian Antiquary, March, 1932, Pp 45, 52

নগেন্দ্রনাথ বসু বলেন যে গৌড়ীয় কায়স্থদের কতকগুলি গোত্র বিহারের অম্বষ্ঠ কায়স্থ ও বঙ্গের বৈদ্যদের সহিত মিলে (২)। পুনঃ বাঙ্গলায় বৈদ্য ও কায়স্থদের মধ্যে বিবাহও হইয়াছে এবং পূর্ব্ববঙ্গে (ত্রিপুরা, শ্রীহট্ট ও চট্টগ্রাম প্রভৃতি জেলায়) এখনও এই দুইটি শ্রেণীর মধ্যে বিবাহ প্রচলিত রহিয়াছে। ৺দীনেশ-চন্দ্র সেন বলেন, "ধন্বন্তরী গোত্রের সেন ভূমির রাজা বিমল সেনের বহু পুত্রের মধ্যে কয়েকটি বৈদ্য এবং অবশিষ্ট কয়েকজন কায়স্থ পর্য্যায়ভুক্ত হইয়াছিল (৩); বৈদ্যজাতীয় মহাকুলীন কায়স্থ জাতীয় শোভাকর নাগের কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন।" (৪)। নগেন্দ্রবাবু বলিয়াছেন, পাঁচটি নাম ও গোত্র ব্যতীত নাগর ব্রাহ্মণ ও কায়স্থদের এই বিষয়ে সাধারণতঃ মিল নাই (৫)। অন্যপক্ষে ডাঃ ভাণ্ডারকর বলেন, এই নামগুলি মুসলমান বিজয়ের পূর্ব্বে উত্তর ভারতের অনেক ক্ষত্রিয় রাজবংশের পদবীর সহিত মিলে (৬)। তিনি আরও বলেন, বর্ত্তমান বাঙ্গলার কায়স্থ পদবীর অন্ততঃ চব্বিশটি খৃষ্টীয় সপ্তম ও অষ্টম শতাব্দীর বঙ্গের ব্রাহ্মণদের মধ্যে প্রচলিত ছিল; তাহার মধ্যে অন্ততঃ দশটি পদবী খৃষ্টপূর্ব্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে ক্ষত্রিয়দের মধ্যে প্রচলিত ছিল। তিনি বলেন, এতদ্বারা বোধগম্য হয় যে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় একই মূল জাতি (race) হইতে উৎপন্ন (৭)। এই বিষয়ে নগেনবাবু বলিয়াছেন, এতদ্বারা প্রমাণিত হয় যে কায়স্থগণ প্রথমে প্রাচীন ক্ষত্রিয় বর্ণেরই অন্তর্গত ছিল। তিনি আরও বলেন, এই পদবীগুলি উত্তর-পশ্চিমের গৌড় ব্রাহ্মণ, উদীচ্য ব্রাহ্মণ ও গৌড় রাজপুতদের মধ্যে এখনও প্রচলিত আছে (৮)। কিন্তু বংশগত নাম বা পদবী লইয়া বর্ণ অথবা জাতির বিচার চলে না, কারণ বিহারের কায়স্থদের মধ্যে পাঁড়ে, তেওয়ারী, মিশ্র প্রভৃতি পদবীও আছে (৯)।

২। N. N. Vasu—Social History of Kamrupa, Vol. III, P. 161

৩। এই পুথির বিষয় নগেন্দ্রবাবুও গৌড়ীয় কায়স্থদের বিষয়ে তাহার এক পুস্তকে উল্লেখ করিয়াছেন।

৪। পূর্ব্বে উক্ত প্রকারের বিবাহ সম্বন্ধে "দীনেশ চন্দ্র সেন—বৃহৎ বঙ্গ", ১ম খণ্ড, পৃঃ ৫১৭-৫১৮ দ্রষ্টব্য।

৫। N. N. Vasu—Op. cit. p 162

৬-৭। Bhandarkar—Op cit, Pp 63-65

৮। N. N. Vasu—Op. cit. Pp. 175-176

৯। N. N. Vasu—Ethnology of the Kayasthas, p 51

এই প্রকারের তথ্যাদি দ্বারা আমরা বিশেষ লাভবান হই না—কেবল এইটুকু মাত্র তথ্যই সংগৃহীত হয় যে পূর্ব্বে লোকে পদ বা বর্ণ অথবা জাতি (caste) পরিবর্ত্তন করিলেও তাহার গোত্র পরিবর্ত্তন করে নাই*। বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের পৃষ্ঠপোষক গুপ্ত সম্রাটদের গোত্র ছিল—'ধরণ' বা 'ধরণি'। ইহা আর্ষেয় নয় এবং তাহারাও ব্রাহ্মণ গোত্র গ্রহণ করে নাই। এতদ্বারা ইহাই বুঝা যায় যে 'গোত্র' হইল লোকের কুল-পরিচায়ক। দক্ষিণ ভারতের দৃষ্টান্ত নিলে দেখা যায় যে মহীশূরের (১০) অব্রাহ্মণ জাতিদের এগারটি গোত্রের মধ্যে প্রথম তিনটি ব্রাহ্মণ্য-গোত্র এবং বিভিন্ন অব্রাহ্মণ জাতিদের মধ্যে ইহার সংখ্যাও কম নয়। আবার "আগাসা" জাতির গোত্র হইতেছে "আরাসিনা" এবং "আরসিনা" অর্থ হইতেছে "হরিদ্রা" (turmeric)। "আরাসিনা" গোত্র টটেম-জাত উৎপত্তির কথাই বিশেষভাবে স্মরণ করাইয়া দেয় এবং এতদ্বারা অন্ততঃ মহীশূরের "আগাসা" জাতিকে সম্পূর্ণভাবে দ্রাবিড়ীয় বলিয়া চিহ্নিত করে (১১)।

পূর্ব্ব ভারতের কতকগুলি তথাকথিত আদিম জাতি সমূহের বিষয়ে অনুসন্ধান করিলে উহাদের মধ্যে টটেমবাদের চিহ্ন প্রাপ্ত হওয়া যায় (পশ্চিমবঙ্গের বাউরীদের মধ্যেও ঐরূপ চিহ্ন প্রাপ্ত হওয়া যায়)। তাহারা কাস্তবক (spriped heron) এবং কুকুরকে আঘাত করে না (১২)। রিজলী বলেন, কাস্তবককে তাহারা তাহাদের

* রাহুল সংকৃত্যায়ন লেখককে বলিয়াছেন গোরক্ষপুর জেলার অন্তর্গত 'বাভন' জাতীয় লোকদের গোত্র ও প্রবরের সহিত ঐ স্থানের প্রাচীন ভিক্ষুণীদের গোত্র ও প্রবরের মিল আছে। যদিও প্রথমোক্তেরা বর্ত্তমানে ব্রাহ্মণত্বের দাবী করিতেছেন এবং শেষোক্তেরা ব্রাত্যক্ষত্রিয় ছিলেন। এই প্রকারে অনেক জাতি যে নাম ও পদ পরিবর্ত্তন করিয়াছে তাহার অনেক নজীর আছে। শ্রীযুত গুপ্তে 'চিৎপাবন' ব্রাহ্মণদের সম্পর্কে বলিতেছেন, "Foreigners at first, Konkanasthas at the second stage and Poona Brahmans or Deccanese Brahmans of the present generation, they illustrate how caste denominations do undergo change." মহারাষ্ট্রীয় কায়স্থদের বিষয়েও এই প্রকারের কথা তিনি উল্লেখ করিয়াছেন। Appendix to Duffs 'A History of the Mahrattas', Vol. I. P. II

১০-১১। Census of India, Vol. V, Mysore—Part I, Report, Pp 507, 512

১২। B. N. Datta—Traces of Totemism in some tribes and castes of N.-E. India, "Man in India", Vol. 13, 1933.

জাতির প্রতীক স্বরূপ বলিয়া মনে করে। পুনঃ খেরিয়াদের সম্বন্ধে তিনি বলিতেছেন "এই জাতির বিভিন্ন বিভাগগুলি (Septs) (১৩) টটেম-জাত (tetemistic)। মানভূমের 'দলমা' পাহাড়ের খেরিয়াদের ভেড়া হইতেছে টটেম।' আবার কোরা বা কেউরা বা খয়রাদের বেলায় তিনি বলিতেছেন, তাহারা মুণ্ডাদের ন্যায় বিশিষ্টভাবে টটেমিক বিভাগে বিভক্ত (১৪)। আবার রিসলি বলেন, সাওতালদের টটেম হইতেছে—নীল গাই, বন্য হংস, বাজপক্ষী, মারিন্দা ঘাস, শঙ্খ, পান ইত্যাদি (১৫)। অন্যদিকে রেভারেণ্ড এনডেল কাছারীদের বিষয়ে বলিতেছেন "১৭৯০ খৃঃ তাহাদের রাজা কৃষ্ণচন্দ্র ও তাঁহার ভ্রাতা গোবিন্দ চন্দ্র ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম গ্রহণ করায় ব্রাহ্মণেরা তাহাদিগকে ক্ষত্রিয় বর্ণের হিন্দু বলিয়া মানিয়া নেন এবং তাহাদিগকে মহাভারতের ভীমের বংশোদ্ভব বলিয়া ঘোষণা করা হয়"। তিনি বলেন, পূর্ব্বে তাহাদের কৌমপদ্ধতি টটেম-জাত ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত ছিল। তাহাদের বিভিন্ন বিভাগের নাম হইতেছে—স্বর্গ, পৃথিবী, ব্যাঘ্র, মঙ্গল, তৃণ, পাট, বংশ, কাঠ-বিড়াল, ক্ষাদাম বৃক্ষ"। মোসা—অ' রই বা বাঘ-ল-অ' রই (ব্যাঘ্র লোকে) বিভাগ ব্যাঘ্রের সহিত সম্পর্ক দাবী করে। আর তাহাবা সিজি (Eupharbia splendens) গাছ পূজা করে" (১৬)। লেখক অনুসন্ধান করিয়া অবগত হইয়াছেন যে আসামের কাছাড়ীরা নিজদিগকে হিন্দু বলিয়া স্বীকার করে না, কিন্তু শ্রীহট্টের কাছাড়ীরা বৈষ্ণব এবং হিন্দু বলিয়াই পরিচয় প্রদান করে। লেখক পশ্চিমবঙ্গে বাঁকুড়া জেলায় নরতাত্ত্বিক অনুসন্ধানকালে একদল তথাকথিত আদিম জাতীয় লোকের সাক্ষাৎলাভ করেন। ইহারা নিজদিগকে দেশওয়ালী মাঁঝি (বেহারী সাওতাল বা খেরওয়াল) বলিয়া পরিচয় প্রদান করেন। ইহারা বাঙ্গলায় বাস করিতেছেন এবং রামায়ৎ সম্প্রদায়ের শিষ্য। ইঁহারা বলিলেন, ইহাদের গোত্র—সবশুদ্ধ, হংস ঋষি, মাণ্ডিল্য শুকপক্ষি। উক্ত তালিকার একটিও ব্রাহ্মণ্য-গোত্রের নহে, বরঞ্চ টটেম গোত্রগুলি রূপান্তরিত হইয়া এই নাম ধারণ করিয়াছে বলিয়াই অনুমিত হয়।

১৩। Risley—The Tribes & Castes of Bengal, p 79

১৪-১৫। Risley—Op. cit., Vol. I. (১৫)

১৬। Sidney Endle—The Cacharis, Pp 6-35

এই সকল দৃষ্টান্ত হইতে এই তথ্য প্রাপ্ত হওয়া যায় যে বর্ণাশ্রমের বাহিরের লোকেরা টটেম গোত্রীয় ছিল এবং এখনও আছে, আর যাহারা হিন্দু সমাজের বর্ণাশ্রম-পদ্ধতি মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে তাহাদের কাহারও কাহারও অনার্য্য গোত্র এখনও ধরা পড়ে। তবে অনেক অনার্য্যভাষী জাতি আর্যেয় গোত্র গ্রহণ করিতেছে ; যথা—আসামের অহম জাতিদের ব্রাহ্মণ্য-গোত্র আছে (১৭)। বাঙ্গলার তথাকথিত অন্ত্যজ জাতিদের গোত্র-পরিবর্ত্তন সম্পর্কে রিসলী বলেন, "যে সব জাতি পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া বিবর্ত্তিত হইতেছে তাহারা উচ্চ জাতিদের নিকট হইতে যেসব ব্রাহ্মণ্য গোত্র ধার করিয়া গ্রহণ করিয়াছে তন্মধ্যে শাণ্ডিল্য একটি বৈদিক ঋষি হইতে পক্ষিতে পরিণত হইয়াছে" (১৮)। পুনঃ কলিকাতার কোন একস্থানের ডোম জাতীয় লোকেরা লেখককে বলিয়াছেন যে তাহাদের আর্যেয় গোত্র আছে এবং ব্রাহ্মণও আছে। পুনশ্চ উচ্চ জাতিসমূহের কোন কোন গোত্র দেখিলে এই সন্দেহ হয়। বাঙ্গলার বাঁকুড়া জেলার কোন ছত্রি (সামন্ত) তাহার গোত্র 'শাগ ঋষি' (শাক) বলিয়া লেখককে জানাইয়াছেন। বাঙ্গলার গোপ জাতির মধ্যে 'কর্কট' গোত্র আছে ; বাঙ্গলার কলু জাতীয় কোন ভদ্রলোক তাহার জাতির গোত্রসমূহের মধ্যে 'লিকছিনী' (নিঃকছিণী ?) নামে একটি গোত্রের উল্লেখ করিয়াছেন। আবার বাঙ্গলার কায়স্থ জাতির কোন বংশের গোত্র হইতেছে 'বাস্কুকী'। এইসব গোত্রের নাম আর্যেয় নয়—বরঞ্চ টটেম্-উদ্ভূত বলিয়া সন্দেহ হয়। যেসব ঋষি-গোত্রের নাম পুরাণ সমূহে উল্লিখিত হইয়াছে তাহা পাঠে সন্দেহ উপস্থিত হয়। ঋষি গোত্রের মধ্যে কাম্বোজ (মৎস্য, ১৯৫—১৮) সৈরন্ধ্রী জলন্ধর (বিষ্ণু, ১২৯।১৫—১৮) প্রভৃতি নাম আছে। আর আছে সাহিত্যিক নাম—যথা, বিনয় লক্ষণ, মৃণময়, জ্ঞান সংজ্ঞেয়, সৈরন্ধ্রী, রৌপসেরকি। একটি ঋষি গোত্রের নাম হইতেছে 'উষিজ', আবার 'ঔষিজ' নামটিও ব্রাহ্মণদের গোত্র প্রবরের মধ্যে পাওয়া যায়। পুরাণে এই উষিজকে বৃহস্পতি ঋষির ভ্রাতা এবং দীর্ঘতমার ক্ষেত্রজ পিতা বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে (মৎস্য ৪।৩২—৮৮)। কিন্তু বেদে

১৭। B. N. Datta—"Anthropological Notes on some Assam Castes—Anthrop. Papers, New series, No V. P 12, 1938.

১৮। Risly—Op. cit. p XIV.

উষিজকে বলি রাজা কর্ত্তৃক দীর্ঘতমাকে প্রদত্ত একটি দাসী বলা হইয়াছে এবং এই উষিজেরই গর্ভে কক্ষিবন্তের জন্ম হয় বলিয়া ইনি ঔষিজ নাম প্রাপ্ত হন। কিন্তু পুরাণে আসল কাহিনীটি লুকাইয়া একজন দাসীপুত্রকে ঋষি করা হইয়াছে এবং কক্ষিবন্তের একটি অনামা শূদ্রা জননী সৃষ্টি করা হইয়াছে (১৯)।

এতদ্বারা আমরা এই তথ্যও অবগত হই যে, প্রাচীন আদিম জাতীয়গণ যতই অন্ত্যজ হিন্দুতে বিবর্ত্তিত হইয়া ক্রমশঃ ব্রাহ্মণ্যবাদীয় আচার, রীতি-নীতি গ্রহণ করিতেছে ততই তাহারা হিন্দু সমাজের উচ্চস্তরে উন্নীত হইতেছে। এই বিষয়ে বঙ্গপ্রদেশই বিশেষ অগ্রগামী; এইস্থানে ব্রাহ্মণ্যবাদ সকল স্তর দ্বারাই গৃহীত হইয়াছে। সেইজন্য ব্রাহ্মণ্যপ্রথা সকলেই গ্রহণ করিতেছে। তবে ইহাও শোনা যায় যে বাঙ্গলায় এমন অসৎ শূদ্র জাতি আছেন যাঁহাদের গোত্র নাই এবং ইহাও শোনা যায় যে হালে অনেক উচ্চস্তরের সৎ শূদ্র জাতি তাহাদের পুরোহিতদের গোত্র গ্রহণ করিয়াছেন ও করিতেছেন।

এই সকল অনুসন্ধান কার্য্য হইতে আমরা এই সংবাদ প্রাপ্ত হই যে আজ কালকার শূদ্রেরা ব্রাহ্মণ্যগোত্র-বিহীন নয়। এইস্থলে কথা উঠে—শূদ্র কাহাকে বলে? ইতিপূর্ব্বেই এই বিষয়ে আলোচিত হইয়াছে এবং দেখা গিয়াছে যে শ্রেণী-সংগ্রামের দ্বারা অনেক উচ্চজাতি নিম্নস্তরে অবনমিত হইয়াছে এবং ইহার বিপরীত ঘটনাও ঘটিয়াছে। কাজেই আর্ষেয় গোত্র শূদ্রদের মধ্যে প্রাপ্ত হওয়া আশ্চর্য্যের কথা নয়। পুনঃ নাগর ব্রাহ্মণদেরও শাকদ্বীপি (শকদ্বীপি?) ব্রাহ্মণদের অনেক গোত্র আর্ষেয়, অর্থাৎ স্মৃতি ও পুরাণের সহিত মিলে না, যেমন,—বৎসপাল, গোপাল, কপিস্থল, শুনঃশেপ, সরকারসা, গৌরীশ্রবা, ছান্দোগ্য, গজান, বৈজবাপ (২০) (নাগর ব্রাহ্মণ); ঘৃতকৌশিক (শাকদ্বীপি ব্রাহ্মণ); অথচ এ-বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ আছে যে,

১৯। দীর্ঘতমার কাহিনীর বিষয় ঋগ্বেদ, শৌনক লিখিত 'বৃহৎ দেবতা' এবং Vedic Index দ্রষ্টব্য।

২০। N. N. Vasu—The Social History of Kamrupa, Vol. III, Pp. 118-121

এই দুই শ্রেণীর ব্রাহ্মণ অভারতীয় ছিলেন (২১)। স্কন্দপুরাণে উক্ত হইয়াছে, "নাগরস্য সমস্তস্য দেশান্তর গতস্য। দেশান্তর প্রজাতস্য অজ্ঞাত পিতৃবর্গস্য সামান্যং পদমিচ্ছতি" (২০১।৮।৩—৪), অর্থাৎ দেশান্তরগত; দেশান্তর প্রজাত অন্যত্র অজ্ঞাত পিতৃবর্গ ও সামান্য পদেচ্ছু—এই সকল নাগর ব্রাহ্মণের পরিচয় জানিবার উপায় কি ? পুরাণে কথিত আছে যে শ্রীকৃষ্ণের পুত্র শাম্ব বাহ্লিক হইতে সূর্য্য মূর্ত্তি ও তাহার উপাসক ব্রাহ্মণদের ভারতে নিয়া আসে। পূর্ব্বে ইহাদের এইদেশে মগ ব্রাহ্মণ বলিত। (Epigriphica Indica, Vol. XIV. No. 38, p 278—279 :) [পুরাণসমূহে শাকদ্বীপে (Scythia ?) মগ, সুমগ প্রভৃতি চারি প্রকার ব্রাহ্মণের উল্লেখ আছে।] আল-বেরুণী যখন ভারতে আগমন করেন তখন তিনি ইহাদিগেব নাম "মগ ব্রাহ্মণ" বলিয়া শুনিয়াছেন। গয়ার পাণ্ডাদের সহিত অন্য কোন ব্রাহ্মণদের বিবাহাদি চলে না : তাঁহারা বলেন যে, ব্রহ্মা তাঁহাদের সৃষ্টি করিয়া গয়াক্ষেত্রের অধিকার প্রদান করিয়াছেন। ইঁহাদের বিভিন্ন পদবীব মধ্যে একটি হইতেছে "সেন।" ইহাদের উৎপত্তি সম্বন্ধে নানাপ্রকার সন্দেহ হয়—কেহ কেহ ইঁহাদিগকে বৌদ্ধযুগের পরে সৃষ্ট ব্রাহ্মণ বলিয়া অনুমান করেন।

এই প্রকারে দেখা যায় যে গোত্র নিয়া বর্ত্তমানের একটা জাতির বর্ণ নিরূপিত করা যায় না। কিন্তু গোত্রগুলি প্রথম হইতেই বিভিন্ন বর্ণ হইতে গৃহীত। পুনঃ যথেষ্ট সন্দেহ হয় যে অনেক গোত্র কল্পিত ও মন-গড়া। এইজন্য পুরোহিততন্ত্রের দাবীর কোন মূল্য নাই। প্রথমেই দেখা গেল যে ব্রহ্মার মানস পুত্রদের তালিকা ঠিক নাই, তৎপর উহা ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণের সংযুক্ত তালিকা। তৎপর দেখা যায় যে বৈদিক ঋষিদের মধ্যে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য বর্ণের লোকও ছিলেন এবং কোন কোন ঋষি শূদ্রানী অথবা দাসী গর্ভজাত। মৎস্য পুরাণ বলিতেছে "ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য বংশীয় এই তিনবতি সংখ্যক ঋষিপুত্র বিবিধ মন্ত্র আবিষ্কার করিয়াছেন। ইঁহারা ঋষিগণের সন্তান শ্রুত ঋষি পদবাচ্য" (১৪৫।১১৫—১১৮)। স্বভাবতঃই, ইহারা গোত্র প্রবর্ত্তক ছিলেন এবং ইঁহাদের বংশগত গোত্র ছিল, আর সেই গোত্র তাঁহাদের সন্ততিগণ পরে বহন করে।

ক্রমশঃ

শ্রীভূপেন্দ্রনাথ দত্ত

২১। Dr. Guha-এর মতে বাঙ্গালী কায়স্থ, নাগর ব্রাহ্মণ ও গুজরাটী বেনিয়া এবং মধ্য এশিয়ার তাজিকদের Co-efficient of Racial Likeness এক। Census 1930-Ethnological Report দ্রষ্টব্য।

উপনিষদে জড়তত্ত্ব

নবম অধ্যায়

ত্রিগুণ

জগতের নির্বিশেষ মূল-উপাদান যে 'অব্যাকৃত'—যাহাকে আমরা কারণার্ণব বলিয়া উল্লেখ করিয়াছি—সাংখ্যেরা উহাকে মূল প্রকৃতি বলেন। সাংখ্য মতে প্রকৃতি ত্রিগুণময়ী—সত্ত্ব রজঃ তমঃ এই ত্রিগুণের সাম্যাবস্থা।

সত্ত্বরজস্তমসাং সাম্যাবস্থা প্রকৃতিঃ—সাংখ্য সূত্র, ১।১৬

প্রলয়ে এই গুণত্রয় সাম্যাবস্থায় (equilibrium-এ) থাকে, সৃষ্টির সময়ে এই সাম্যাবস্থার বিচ্যুতি ঘটে। এ সম্বন্ধে উপনিষদের উপদেশ কি?

মৈত্রায়ণী উপনিষদ্ এ সম্বন্ধে সাংখ্যমতের অনুমোদন করিয়া বলিতেছেন—

তমো বা ইদমগ্র আসীদ্ একম্। তৎ পরে স্যাৎ। তৎপরেণ ঈরিতং বিষমত্বং প্রয়াতি। এতদ্রূপং বৈ রজঃ। তদ্ রজঃ খলু ঈরিতং বিষমত্বং প্রয়াতি। এতদ্ বৈ সত্ত্বস্য রূপম্। তৎ সত্ত্বম্ এব ঈরিতং রসং সংপ্রাস্রবৎ।—মৈত্র, ৫।২

'আদিতে ইহা একমাত্র তমঃ ছিল। তাহা পরে (ঈশ্বরে) নিহিত ছিল। (ইহা প্রলয়ের অবস্থা)। সেই (সাম্যাবস্থাপন্ন) তমঃ ঈশ্বর-কর্তৃক ঈরিত হইয়া বিষমত্ব প্রাপ্ত হইল। উহাই রজসের রূপ। সেই রজঃ ঈরিত হইয়া বিষমত্ব প্রাপ্ত হইল। উহাই সত্ত্বের রূপ। সেই সত্ত্ব ঈরিত হইয়া রসে পরিণত হইল।'

অন্যত্র মৈত্রায়ণী বলিয়াছেন—

ভোক্তা পুরুষঃ, ভোজ্যা প্রকৃতিঃ তৎস্থো ভুঙ্‌ক্তে ইতি। প্রাকৃতম্ অন্নং ত্রিগুণভেদ-পরিণামত্বাৎ * * পুরুষোঽব্যক্তমুখেন ত্রিগুণং ভুঙ্‌ক্তে ইতি।—৬।১০

'পুরুষ ভোক্তা, প্রকৃতি ভোগ্য; প্রকৃতিস্থ হইয়া পুরুষ প্রাকৃত অন্ন (যাহা ত্রিগুণের পরিণাম হইতে উৎপন্ন) ভোজন করেন। * * পুরুষ প্রকৃতির মুখে ত্রিগুণ ভোগ করেন।'

জীবের এই ভোগ লক্ষ্য করিয়া শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্ বলিয়াছেন—

স বিশ্বরূপ স্ত্রিগুণ স্ত্রিবর্ত্মা।—শ্বেত, ৫।৭

'তিনি বিশ্বরূপ ত্রিগুণী, ত্রিমার্গী।' বস্তুতঃ কিন্তু তিনি নির্গুণ।

সাক্ষী চেতা কেবলো নির্গুণশ্চ—শ্বেত, ৬।১১

'তিনি সাক্ষীমাত্র, চিন্ময়, কেবল, নির্গুণ।'

জীব গুণের বশ, প্রকৃতির ভোক্তা। কিন্তু ভগবানের বশে ঐ প্রকৃতি ; তিনি গুণাতীত, তিনি গুণেশ।

প্রধান ক্ষেত্রজ্ঞপতি গুণেশঃ—শ্বেত, ৬।১৬

সৃষ্টিমূলে যে ত্রিগুণময়ী প্রকৃতি, শ্বেতাশ্বতর অন্যত্র এ বিষয়ের স্পষ্ট উল্লেখ করিয়াছেন—

অজাম্ একাং লোহিতশুক্লকৃষ্ণাং
বহ্বীঃ প্রজাঃ সৃজমানাং স্বরূপাঃ—শ্বেত, ৪।৫

'প্রকৃতি একা, প্রকৃতি অজা; প্রকৃতি লোহিত-শুক্ল-কৃষ্ণা, প্রকৃতি সজাতীয় বিবিধ বিকারের সৃষ্টিকর্ত্রী।'

প্রকৃতিকে 'লোহিত শুক্ল কৃষ্ণা' বলিলে কি বুঝিব ? লোহিত রজোগুণের বর্ণ, শুক্ল সত্ত্বগুণের বর্ণ এবং কৃষ্ণ তমোগুণের বর্ণ। প্রকৃতি যখন ত্রিগুণময়ী, তখন তাহাকে 'লোহিতশুক্লকৃষ্ণা' বলা অসঙ্গত নহে। শ্রীশঙ্করাচার্য কিন্তু এই শ্লোকের ভাষ্যে 'লোহিতশুক্লকৃষ্ণা অজা' অর্থে ত্রিগুণময়ী প্রকৃতি না বুঝিয়া ক্ষিতিঅপতেজঃ-লক্ষণা প্রকৃতি বুঝিয়াছেন। তাঁহার ভাষ্য এইরূপ—

ইদানীং তেজোপ্‌ অন্নলক্ষণাং প্রকৃতিং ছান্দোগ্যোপনিষৎপ্রসিদ্ধাম্ অজা-রূপকল্পনয়াদর্শয়তি। অজামেকা মিতি। অজাং প্রকৃতিং লোহিতশুক্লকৃষ্ণাং তেজোবন্নলক্ষণাং বহ্বীঃ প্রজাঃ সৃজমানাম্ উৎপাদয়ন্তীং ধ্যানযোগানুগত দৃষ্টাং দেবাত্মশক্তিং বা, সরূপাঃ সমানাকারা অজো হ্যেকো বিজ্ঞানাত্মাহনাদিকামকর্ম বিনাশিতঃ স্বয়মাত্মানং মন্যমানো জুষমাণঃ সেবমানোহনুশেতে ভজতে। অন্যঃ আচার্যোপদেশ-প্রকাশ অবসাদিতাবিদ্যান্ধকারো জহাতি ত্যজতি।
—শ্বেত, ৪।৫

'সম্প্রতি তেজঃ-অপ্‌-অন্ন-লক্ষণা ছান্দোগ্য উপনিষৎ-প্রসিদ্ধা প্রকৃতিকে অজা (ছাগী)-রূপে কল্পনা করিতেছেন।

অজা প্রকৃতি—লোহিতশুক্লকৃষ্ণা, তেজঃ-অপ্‌-অন্ন-লক্ষণা, সরূপা অর্থাৎ সমানাকারা বহু সন্ততির প্রসবিত্রী অথবা ধ্যানযোগ-উপলব্ধা ভগবানের আত্মশক্তি। এক অজ,

বিজ্ঞানাত্মা অনাদিকামকর্মজড়িত আত্মবিস্মৃত (জীব) সেই অজাতে অনুরক্ত হইয়া তাহাতে উপগত হয়, কিন্তু আচার্য-উপদেশের দ্বারা তাহার অবিদ্যারূপ অন্ধকার তিরোহিত হইলে তাহাকে পরিত্যাগ করে।'

পুরুষ মায়াবশে আত্মবিস্মৃত হইয়া প্রকৃতিতে কিরূপে সংলিপ্ত হন, এ স্থলে তাহার বিচার অনাবশ্যক। কিন্তু আমাদের লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, শ্রীশঙ্করাচার্য লোহিতশুক্লকৃষ্ণা প্রকৃতির ব্যাখ্যান উপলক্ষে ছান্দোগ্য উপনিষদের উল্লেখ করিলেন। অতএব দেখা যাইতেছে যে, এই 'লোহিত শুক্লকৃষ্ণের' সহিত ছান্দোগ্য উপনিষদের ত্রিবৃৎকরণের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। সেই জন্য সেই অংশ এখানে উদ্ধৃত করিলাম—

সৎ ত্বেব সোম্য ইদমগ্র আসীদ্ একমেবাদ্বিতীয়ম্। তদ্ ঐক্ষত বহু স্যাং প্রজায়েয় ইতি। তত্তেজোঽসৃজত তত্তেজ ঐক্ষত বহু স্যাং প্রজায়েয় ইতি তদপোঽসৃজত।

তা আপ ঐক্ষন্ত বহ্ব্যঃ স্যাম প্রজায়েমহীতি তা অন্নমসৃজন্ত।—ছা, ২।৩-৪

সেয়ং দেবতৈক্ষত হন্তাহমিমাস্তিস্রো দেবতা অনেন জীবেনাত্মনানুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরবাণীতি। তাসাং ত্রিবৃতং ত্রিবৃতমেকৈকাং করবাণীতি সেয়ং দেবতেমাস্তিস্রো দেবতা অনেনৈব জীবেনাত্মনানুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরোৎ।

তাসাং ত্রিবৃতং ত্রিবৃতমেকৈকামকরোদ্ যথা নু খলু সোম্যেমাস্তিস্রো দেবতাস্ত্রিবৃৎ ত্রিবৃদেকৈকা ভবতি তন্মে বিজানীহীতি।—ছা, ৬।৩

যদগ্নে রোহিতং রূপং তেজসস্তদ্রূপং যচ্ছুক্লং তদপাং যৎ কৃষ্ণং তদন্নস্যাপাগাদগ্নেরগ্নিত্বং বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং ত্রীণি রূপাণীত্যেব সত্যম্।

যদাদিত্যস্য রোহিতং রূপং তেজসস্তদ্রূপং যচ্ছুক্লং তদপাং যৎ কৃষ্ণং তদন্নস্যাপাগাদাদিত্যাদাদিত্যত্বং বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং ত্রীণি রূপাণীত্যেব সত্যম্॥

যচ্চন্দ্রমসো রোহিতং রূপং তেজসস্তদ্রূপং যচ্ছুক্লং তদপাং যৎকৃষ্ণং তদন্নস্যাপাগাচ্চন্দ্রাচ্চন্দ্রত্বং বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং ত্রীণিরূপাণীত্যেব সত্যম্॥

যদ্বিদ্যুতো রোহিতং রূপং তেজসস্তদ্রূপং যচ্ছুক্লং তদপাং যৎ কৃষ্ণং তদন্নস্যাপাগাদ্বিদ্যুতো বিদ্যুত্বং বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং ত্রীণি রূপাণীত্যেব সত্যম্।

এতদ্ধ স্ম বৈ তদ্বিদ্বাংস আহুঃ পূর্বে মহাশালা মহাশ্রোত্রিয়া ন নোঽদ্য কশ্চনাশ্রুতমমতমবিজ্ঞাতমুদাহরিষ্যতীতি হ্যেভ্যো বিদাঞ্চক্রুঃ॥

যদু রোহিতমিবাভূদিতি তেজসস্তদ্রূপমিতিতদ্বিদাঞ্চক্রুর্যদু শুক্লমিবাভূদিত্যপাং রূপমিতি তদ্বিদাঞ্চক্রুঃ।—ছান্দোগ্য, ৬।৪

ইহার ভাবার্থ এইরূপ,—

"আদিতে কেবল একমেবাদ্বিতীয় সৎই বিদ্যমান ছিলেন। তাঁহার "ঈক্ষা" হইল, 'এক আমি বহু হইব। আমি প্রসূত হইব।' তিনি তেজঃ সৃষ্টি করিলেন। সেই তেজঃ ঈক্ষা করিলেন,—'আমি বহু হইব, আমি প্রসূত হইব।' তিনি অপ্ সৃষ্টি করিলেন। সেই অপ্ ঈক্ষা করিল,—'আমরা বহু হইব, আমরা প্রসূত হইব।' তাহারা অন্ন সৃষ্টি করিল। সেই দেবতা (পরমাত্মা) ঈক্ষা করিলেন,—'আমি এই তিন দেবতাতে (তেজঃ, অপ্ ও অন্নে) জীবরূপ আত্মাদ্বারা অনুপ্রবেশ করিয়া নামরূপে প্রভিন্ন করি। ইহাদের প্রত্যেককে ত্রিবৃৎ ত্রিবৃৎ করি'। সেই পরমাত্মা সেই তিন দেবতাকে এই জীবরূপ আত্মার দ্বারা অনুপ্রবেশ করিয়া নামরূপে বিভিন্ন করিলেন। তাহাদের প্রত্যেককে ত্রিবৃৎ ত্রিবৃৎ করিলেন। কিরূপে প্রত্যেকে ত্রিবৃৎ ত্রিবৃৎ হয়, তাহা অবগত হও।" ইহার পর উপনিষদ্ অগ্নি, আদিত্য, চন্দ্রমা, বিদ্যুৎ—ইহাদিগের প্রত্যেকের মধ্যে তেজঃ, অপ্ ও অন্নের বিকার ও প্রকার প্রদর্শন করিয়াছেন; এবং তেজের রূপকে রোহিতরূপ, অপের রূপকে শুক্লরূপ এবং ক্ষিতির রূপকে কৃষ্ণরূপ বলিয়াছেন। পরে শ্রুতি এই উপদেশের প্রশংসা করিয়া বলিতেছেন যে, পূর্বতন মহাশ্রোত্রিয় মহাগৃহস্থ পণ্ডিতেরা সেই একমাত্র সতের বিজ্ঞান অবগত হইয়া বলিয়াছিলেন যে, 'অতঃপর আমাদিগকে কেহ কোন বিষয়ে অশ্রুত অমত বা অবিজ্ঞাত বলিতে পারিবে না'। কারণ সতের এই ত্রিবৃৎ-বিজ্ঞান সকল বিজ্ঞান ও প্রজ্ঞানের মূলীভূত।

এখানেও আমরা রোহিতশুক্লকৃষ্ণের উল্লেখ পাইলাম। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, ছান্দোগ্যের তেজঃ, অপ্ ও অন্ন কি? আমরা দেখিলাম যে, সেই অদ্বিতীয় পরমাত্মা এই তেজঃ, অপ্, অন্নকে সৃষ্টি করিয়া তাহার মধ্যে অনুপ্রবেশ করেন। তাহার ফলে অব্যাকৃত নামরূপে ব্যাকৃত হইল এবং প্রত্যেক পদার্থেই এই তেজঃ, অপ্ ও অন্নের 'ত্রিবৃৎ' রূপ (লোহিত, শুক্ল ও কৃষ্ণরূপ) বিদ্যমান রহিল। অতএব বোধ হয়, যে এই তেজঃ, অপ্, অন্নই সাংখ্যদিগের সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এবং ছান্দোগ্যের ত্রিবৃৎকরণ ঐ গুণত্রয়েরই সমবায়। কারণ শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্ প্রকৃতির পরিচয় স্থলে বলিয়াছেন,—

তম্ একনেমিং ত্রিবৃতম্ * * বিশ্বরূপৈকপাশং।—১।৪

'সেই একনেমি (অখণ্ডমণ্ডলাকার) ত্রিবৃৎ বিশ্বরূপাকার রজ্জু।'

তেজঃ, অপ্ ও অন্ন যদি ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ এই তিন মহাভূত হইত, তাহা হইলে উপনিষদ্ তেজের পূর্বে আকাশ ও বায়ুর নিশ্চয়ই উল্লেখ করিতেন ; কারণ উপনিষদ্ অন্যত্র পঞ্চ মহাভূতের উল্লেখ করিয়াছেন, যথা তৈত্তিরীয় উপনিষদ্ ২।১ এবং ঐতরেয় ৩।৩। সুতরাং ছান্দোগ্য ক্ষিতি অপ্ তেজঃ—মাত্র এই তিন ভূতের উল্লেখ করিয়াই নিবৃত্ত হইতেন না। অপেক্ষাকৃত অর্বাচীন পৈঙ্গল উপনিষদের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে এ সম্বন্ধে সন্দেহ থাকে না। পৈঙ্গল উপনিষদ্ বলিতেছেন যে, আদিতে একমাত্র অদ্বিতীয় ব্রহ্ম বিদ্যমান ছিলেন। তস্মিন্ * *. লোহিত-শুক্ল-কৃষ্ণ-গুণময়ী গুণসাম্যা অনির্বাচ্যা মূলপ্রকৃতিরাসীৎ। * * সা পুনর্বিকৃতিং প্রাপ্য সত্ত্বোদ্রিক্তা অব্যক্তাখ্যা আবরণ-শক্তিরাসীৎ।—পৈঙ্গল, ১

"সেই ব্রহ্মে লোহিতশুক্লকৃষ্ণ অর্থাৎ রজঃ সত্ত্ব তমোগুণময়ী মূল প্রকৃতি লীনা ছিল। সে অবস্থা গুণের সাম্যাবস্থা—অনির্বাচ্যা। সেই প্রকৃতি বিকৃতি প্রাপ্ত হইয়া সত্ত্বোদ্রেকবশতঃ আবরণ শক্তি হইল। সে অবস্থার নাম 'অব্যক্ত'।"

এখানে ঋষি স্পষ্ট বলিলেন যে, ত্রিগুণময়ী যে মূল প্রকৃতি, যাহার বিকারে সমস্ত বিশ্ব—সেই প্রকৃতি 'লোহিত-শুক্ল-কৃষ্ণা'—সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ এই গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থা। অতএব আমরা বলিতে চাই—শ্বেতাশ্বতরের লোহিতশুক্লকৃষ্ণা অজা এবং ছান্দোগ্যের ত্রিবৃৎ-কৃত তেজ অপ্ ও অন্ন—সাংখ্যোক্ত ত্রিগুণ ভিন্ন অন্য কিছু নহে।

এ মত যে ভিত্তিহীন নহে, ব্রহ্মসূত্রের প্রথম অধ্যায়ের চতুর্থ পাদীয় অষ্টম সূত্রের শাঙ্কর ভাষ্যে ধৃত পূর্বপক্ষের প্রতি লক্ষ্য করিলে তাহা উপলব্ধি হইবে। ঐ সূত্রের ভাষ্যে শঙ্করাচার্য "অজামেকাং লোহিতশুক্লকৃষ্ণাং" এই শ্রুতি উদ্ধৃত করিয়া এইরূপে পূর্ব পক্ষ উপস্থিত করিয়াছেন,—

অত্র হি মন্ত্রে লোহিতশুক্লকৃষ্ণ শব্দৈঃ রজঃ সত্ত্ব তমাংসি ইত্যভিধীয়ন্তে। লোহিতং রজঃ রঞ্জনাত্মকত্বাৎ। শুক্লং সত্ত্বং প্রকাশাত্মকত্বাৎ। কৃষ্ণং তমঃ আবরণাত্মকত্বাৎ। তেষাং সাম্যাবস্থা অবয়ব ধর্মৈ র্ব্যপদিশ্যতে লোহিতশুক্লকৃষ্ণেতি। ন জায়তে ইতি চ অজা স্যাৎ মূলপ্রকৃতি রবিকৃতিঃ ইতি অভ্যুপগমাৎ। * * * *

সা চ বহ্বীঃ প্রজাঃ ত্রৈগুণ্যান্বিতা জনয়তি। তাম্ প্রকৃতিম্ অজঃ এক পুরুষো জুষমানঃ

ম্রিয়মাণঃ সেবমানঃ বা অনুশেতে * * অজঃ পুনরন্যঃ পুরুষ উৎপন্নবিবেক জ্ঞানো বিরক্তো জহাতি এনাং প্রকৃতিং ভুক্তভোগাম্ কৃত ভোগাপবর্গাং পরিত্যজতি মুচ্যতে ইত্যর্থঃ। তস্মাৎ শ্রুতিমূলৈব প্রধানাদিকল্পনা ইত্যেবং প্রাপ্তে ব্রুমঃ।

অর্থাৎ "অজামেকাং" ইত্যাদি মন্ত্রে কেহ কেহ লোহিতশুক্লকৃষ্ণ শব্দের দ্বারা রজঃ সত্ত্ব তমঃ—এই ত্রিগুণকে লক্ষ্য করিয়াছেন। রঞ্জনাত্মক বলিয়া রজঃ লোহিত, প্রকাশাত্মক বলিয়া সত্ত্ব শুক্ল এবং আবরণাত্মক বলিয়া তমঃ কৃষ্ণ। তাহাদিগের সাম্যাবস্থাকে অবয়ব ধর্মের প্রতি লক্ষ্য করিয়া লোহিতশুক্লকৃষ্ণা বলা হইয়াছে। যাহার জন্ম নাই সেই অজা অর্থাৎ অবিকৃতি মূল-প্রকৃতি। সেই প্রকৃতি ত্রিগুণান্বিত বহু প্রজার জননী। সেই প্রকৃতিকে কোন পুরুষ (অবিদ্যামোহে) অনুরক্ত হইয়া উপগত হয়েন। অন্য পুরুষ (বিবেকজ্ঞান উৎপন্ন হইলে) বিরক্ত হইয়া ভুক্ত ভোগা প্রকৃতিকে পরিত্যাগ করিয়া মুক্ত হন। অতএব সাংখ্যোক্ত প্রকৃতিকল্পনা শ্রুতিসিদ্ধ।"

এই পূর্ব পক্ষ উপস্থিত করিয়া শঙ্করাচার্য বলিতেছেন,—ন অনেন মন্ত্রেণ শ্রুতিমত্ত্বং সাংখ্যবাদস্য শক্যম্ আশ্রয়িতুম্। * * *
ন অস্মিন্ মন্ত্রে প্রধানমেব অজাভিপ্রেতা ইতি শক্যতে নিয়ন্তুম্।

অর্থাৎ 'এই মন্ত্রের দ্বারা সাংখ্যমতের শ্রুতিমূলত্ব সিদ্ধ হয় না, কারণ এ মন্ত্রে যে অজা শব্দের দ্বারা প্রধান (প্রকৃতিকে) লক্ষ্য করা হইয়াছে ইহার স্থিরতা কি?' শঙ্করাচার্য যে পূর্ব পক্ষীর মত এইভাবে নিরাস করিবার চেষ্টা করিলেন, সেই পূর্বপক্ষী অনায়াসে বলিতে পারেন যে, 'আপনি স্বয়ংই অজা-মেকাং ইত্যাদি মন্ত্রের ভাষ্যে অজা অর্থে প্রকৃতি স্থির করিয়াছেন।' 'অজা' 'প্রকৃতিং' লোহিতশুক্লকৃষ্ণাং ইত্যাদি।'

অতএব লোহিতশুক্লকৃষ্ণ শব্দের দ্বারা সত্ত্ব, রজঃ ও তম এই ত্রিগুণকে লক্ষ্য করা হইয়াছে যদি আমরা এরূপ বলি, তবে তাহা অসঙ্গত বলা হয় না।

প্রকৃতিকে যে 'ত্রৈগুণ্য' বলা হয়—ইহা খুব সঙ্গত—কারণ, প্রকৃতি সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—এই গুণত্রয়ের ব্যতিরিক্ত কোন কিছু নহে—'Prakriti is the triad of the Gunas—it is a string of three strands'*

গুণা এব প্রকৃতিশব্দবাচ্যাঃ, ন তু তদতিরিক্তা প্রকৃতিরস্তি

—২।১৮ সূত্রের যোগবার্তিক

---

* যাঁহার এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা আছে, তিনি আমার সাংখ্যপরিচয়ে' 'ত্রৈগুণ্য' অধ্যায়ের প্রতি দৃষ্টি করিবেন।

বিজ্ঞানভিক্ষু ১।৬৯ সাংখ্যসূত্রের ভাষ্যে নিম্নোক্ত বচন উদ্ধৃত করিয়া ঐ বিষয় আরও বিশদ করিয়াছেন—

সত্ত্বং রজস্তম ইতি প্রাকৃতং তু গুণত্রয়ম্।
এতন্ময়ী চ প্রকৃতির্মায়া যা বৈষ্ণবী শ্রুতা।
লোহিত-শ্বেত-কৃষ্ণেতি তত্তাস্তাদৃশ্ বহ্ব প্রজাঃ॥

'সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ—ইহারা প্রকৃতির গুণ বা ধর্ম নহে। প্রকৃতি ঐ তিন গুণময়ী—লোহিতশুক্লকৃষ্ণা—যাহাকে বিষ্ণুমায়া বলে। উঁহার বহু প্রজা বা সন্ততি,—তাহারাও ঐরূপ, অর্থাৎ, গুণময়।

প্রাচীন অথর্ববেদে প্রকৃতির নাম নাই, কিন্তু ঐ গুণত্রয়ের প্রতি লক্ষ্য আছে :—অসুংতে আয়ুঃ পুনরভিরামি, রজস্তমো মোপগা মা প্রমেষ্ঠা—অষ্টম কাণ্ড, প্রথম অনুবাক্, তৃতীয় সূক্ত।

এ মন্ত্রের ভাষ্য এইরূপ—তবর্থং তে তব অসুং প্রাণং মৃত্যুনা অপহৃতম্ আয়ুশ্চ পুনঃ অভিরামি আহরামি। তং চ রজঃ রাগম্ অস্মাকম্ সত্ত্বগুণ-প্রতিবন্ধকং মোপগা মা প্রাপ্নুহি, এবং তমঃ আবরকং হিতাহিত-বিবেক-প্রতিরোধকং তম-আখ্যগুণম্ মোপগাঃ। ন কেবলং রজস্তমসোঃ অপ্রাপ্তিরেব প্রার্থ্যতে কিং তু মৃতিনিবারণমপি মা প্রমেষ্ঠা ইতি। হিংসাং চ হি মা প্রাপ্নুহি। মীঙ্ হিংসায়াম্।

এই অথর্ব মন্ত্রের ভাবানুবাদ এই :—"তোমার প্রাণ ও আয়ুকে (যাহা মৃত্যু কর্তৃক অপহৃত হইয়াছে) পুনরায় আহরণ করি,—তুমি রজঃ ও তমঃকে (যাহা সত্ত্বগুণের প্রতিবন্ধক) প্রাপ্ত হইও না।—অপিচ মৃত্যুকে প্রাপ্ত হইও না"। এই মন্ত্রে আমরা স্পষ্টতঃ সাংখ্যোক্ত রজঃ ও তমঃ গুণের উল্লেখ পাইলাম। অথর্ববেদের অন্যত্রও ত্রিগুণের উল্লেখ আছে—

পুণ্ডরীকং নবদ্বারং ত্রিভির্গুণেভিরাবৃতম্।
তস্মিন্ যদ্ যক্ষম্ আত্মন্বৎ তদ্বৈ ব্রহ্মবিদো বিদুঃ॥
—১০।৮।৪৩

'দেহস্থ যে নবদ্বার পুণ্ডরীক—যাহা তিনগুণের দ্বারা আবৃত—সেই পুণ্ডরীকে যে 'যক্ষ' অধিষ্ঠিত আছেন, ব্রহ্মবেত্তারা তাঁহাকে জানেন।'

ঐ পুণ্ডরীকের কথা আমরা অন্যত্র সবিশেষ বলিব। এখানে আমাদের লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, তৎপ্রসঙ্গে অথর্ববেদের ঋষি ত্রিগুণের উল্লেখ করিলেন।

হীরেন্দ্রনাথ দত্ত

"গৃহ-যুদ্ধ"

অবশেষে সকাল হ'ল। আজ চতুর্থ দিন। ইতিমধ্যে সবই গেছে। তারা পরাজিত কিন্তু আত্মসমর্পণ না-করতে কৃতসংকল্প। গুঁড়ি মেড়ে দু'জনে ছাদে গিয়ে উঠেছে। সকাল হলেই সৈন্যরা আসতে আরম্ভ করবে। সেই জন্য অপেক্ষা। আসবার আর দেরী নেই। দূরে মেশিন্-গানের শব্দ। আকাশের একটা ধার লাল হ'য়ে উঠেছে; বসন্তের উদীয়মান সূর্যের ম্লান আভায় নয়, ঘরপোড়া ধোঁয়া আর আগুনের শিখায়। ধোঁয়ার আর আগুনের হল্‌কা অদ্ভুত আকারে এঁকে বেঁকে উপরের দিকে উঠেছে, আর বড়ো বড়ো কাঠের কড়ি বরগা পড়ার উৎকট শব্দ আসছে ডান দিকের বড়ো রাস্তা থেকে—যেখানে সাধারণতন্ত্রীদের সদর কাছাড়ি ঘেরাও হয়ে গেছে; পতনের আর দেরি নেই।

এধারে একটা বস্তির মধ্যে একটা সরাইখানার ছাদে এই দুটি মানুষ অপেক্ষমাণ, মৃত্যুর অপেক্ষায়। ভয়ানক, বড়ো ভয়ানক।

চারটি দিন মাত্র। অথচ কী পরিবর্তন! চারদিকে উঁচু নিচু ছাদের নিরবচ্ছিন্ন আবরণের নিচে সহরের কত রকমের লোক নিদ্রিত, শান্ত। তারা নিশ্চিন্তভাবে ঘুমোচ্ছে, নাক ডাকাচ্ছে কেউ কেউ—আর কি; এইবার তো শেষ; সাধারণতন্ত্রীরাও পরাভূত। চার দিন, ব্যস্ এরই মধ্যে বিপ্লবী উন্মত্ততা নিয়ে ব্যগ্রভাবে যারা সব এসেছিল লড়াই করতে তারা সব কে কোথায় ছত্রভঙ্গ, বন্দী, নিহত ও আহত, কেউ কেউ বা পাহাড়ে জংগলে পলাতক।

পিস্তল বাগিয়ে ধরে তারা দুজনে ছাদের উপর গুঁড়ি মেড়ে বসে সৈন্যদের আসার জন্য অপেক্ষা করতে লাগল। তাদের মধ্যে একজন হচ্ছে লেফ্‌টেনান্ট জিম্ ডোলান্—ছিপছিপে যুবক, বছর বাইশ বয়স; বিদ্রোহের সময়ের জন্য যে নীল পোষাকটি সে কিনেছিল সেটা ছেঁড়াখোঁড়া; কাদা মাখা; মৃত্যুর ভয়ে এবং অনিদ্রায় শুকনো মুখ,—একজন কেরানি। দ্বিতীয়টি হচ্ছে—কোয়ার্টার মাষ্টার টিম্ মর্ফি, বেঁটে মোটা শ্রমিক; ষাঁড়ের মতো গলা, প্রকাণ্ড বাদামি রঙের মুখ, চৌকো লাল চিবুক, ছোট ছোট পাটল-বর্ণ চোখ

গালের মাংসের চাপে অদৃশ্য, বড়ির মতো নাক, উন্মত্ত সৈনিক; বিচারহীন ও অদম্য।

মর্ফি ছাদের নলের উপর উপুড় হ'য়ে শুয়েছিল, মাথাটা চিমনির গায়ে হেলান দিয়ে, ডান হাতে পিস্তল ডান চোখের কাছে; প্রথম যে মাথাটা দেখা যাবে গলির মোড়ে তারই জন্য সে অপেক্ষা করছে, মনে মনে রাগে ও ঘৃণায় মরিয়া হয়ে উঠেছে। তিরিশ বার গুলি চল্‌বে। তারপর মৃত্যু। সবই গেছে। বাঁচবার আর কোনও প্রয়োজনই নেই। মৃত্যু......

ডান পায়ের হাঁটু গেড়ে পিস্তল হাতে ডোলান্ বসেছিল। কিন্তু পিস্তলের মুখ ছাদের নলের দিকে; তার দাঁত ঠকঠক করছে। সে মরতে চায় নি। রাগে ঘৃণায় তার মাথা দপ্ দপ্ করছিল, যারা ঘুমোচ্ছে তাদের প্রতি, যে সৈন্যরা দূরে বড়ো রাস্তায় আগুন দিয়েছে এবং যারা দিনের আলোর সঙ্গে সঙ্গেই এধারেও আসবে। কিন্তু সে মরতে চায় না। মৃত্যুর ভয়েই তার দাঁত কাঁপছে।

উল্‌টো পাল্‌টা ভাবনা ভাবছিল সে—সিঁড়িতে দুজনের মৃতদেহ পড়ে, গত-কাল যখন এক লরি ভরতি সৈন্য যেতে যেতে একটা বোমা ছুড়ে মারে তখনই ঐ সহকর্মী দু'জন মারা যায়। কী ভীষণ শব্দ বোমা ফাটার! আর চিৎকার। দলের মধ্যে আতঙ্ক। তিনজন তো রাস্তায় ঊর্ধ্ববাহু হয়ে আত্মসমর্পণ করল। তারও ইচ্ছে ছিল। কিন্তু উপরতলার ঘরে ঠিক তার পাশেই ছিল মর্ফি। মর্ফি গুলি করতে লাগল, একবার, দুবার, তিনবার তিনজনই রাস্তায় মরে পড়ে রইল। আবার গুলি করলে মর্ফি, লরির মধ্যে থেকে একটা আর্তনাদ শোনা গেল। লরিটা জোরে ছুটে গেল। একটা সবুজ উর্দিপরা লোক তার শিরদাঁড়া ভেঙে গেছে, লাফিয়ে উঠে আবার গড়িয়ে পড়ল অন্য সব সৈন্যদের পিঠে, যারা গুঁড়ি মেরে আশ্রয় খুঁজছিল।

এখন তারা মাত্র দু-জন। সে একা; মর্ফি-কে সে ভয় করে। সেই অবশ্য এখানে এই ঘাঁটির কর্তা, কিন্তু আসল কর্তা ওই বৃষ-স্কন্ধ শয়তানটা। এখন আবার কর্তৃত্ব কি। তারা মাত্র দু-জন। আর মর্ফি তো একটা দানব।

একবার মর্ফি তার বুকের উপর, পিস্তলটা রেখে চিৎকার করে বলেছে

"বুঝলে বাপু, আমার সংগে থাকতে হবে। আমার হুকুম। আত্মসমর্পণ চলবে না।" থুতু এসে লেগেছে ডোলানের মুখে, মার্কিন থুতু।

কাল রাত্রির কথা। কী রাতই না গেল! দুঃসহ নৈঃশব্দ্য; দূরে গুলির আওয়াজ; সিঁড়িতে ইঁদুরের; মাঝে মাঝে মনে পড়ে স্ত্রীকে; দুটো মাতাল শরাবখানায় লুটের আশায় ঢুকবার চেষ্টা করে; দু-চারটা গুলি চলে; গালাগালি; ঘন্টাখানেক আগে গুঁড়ি মেরে ছাদে ওঠা; তারপর এখন এই অপেক্ষা ······মৃত্যুর জন্য। আত্মসমর্পণ চলবে না।

ডোলান তার স্ত্রীর কথা ভাবে। হে ঈশ্বর! কী আশ্চর্য পরিবর্তন! চার দিন মোটে, না চার হাজার? তার স্ত্রীকে কই সে তো আর ভালবাসে না। একটু-ও না। তার জীবন থেকে তার স্ত্রী লোপ পেয়ে গেছে। শুধু দু-একটা স্মৃতি অবশিষ্ট—তার নরম দু-খানি হাত, তার গোলাপি নরম গাল, ফ্যাকাশে নীল রঙের বড়ো বড়ো চোখ, আর তাকে কোন কিছু বোঝানোর অসম্ভবতা। স্ত্রীকে ডোলান কিছুই জানায় নি। চার দিন আগে ঘাঁটির চার্জ নেবার জন্য যখন সে তার অফিস থেকে বেরিয়ে আসে তখনো স্ত্রীকে কোন খবর পাঠায় নি। স্ত্রী কিছুই বুঝত না······কোন কিছুই। ডোলানের কাছে সেই স্ত্রীই এখন জীবন্ত জগতের প্রতীক হয়ে উঠেছে—যে বিপদের মধ্যে সে এসে পড়েছে তার তুলনায়, এই ছাদের উপর একটা শয়তানের সঙ্গে।

কেন, কেনই বা সে সাহায্যের জন্য চিৎকার করবে না? কেন সে দাঁতে দাঁতে চেপে এই শয়তানের শরীরে একের পর এক গোটা ছয়েক গুলি চালাতে পারছে না? তা হ'লেই তো হয়। সে মুক্ত হয়। তাহলেই তো সে সিঁড়ি দিয়ে নেমে যেতে পারে······ওরে বাবা! না! সে পারবে না, পারবে না ওই মৃতদেহ দুটোর পাশ দিয়ে নেমে যেতে। হে ভগবান! সিঁড়িতে যে তারই সহকর্মীদের শব!

আবার সে গুঁড়ি মেরে বসে। তার দাঁত ঠক্‌ঠক করতে থাকে। মাথায় ভয়ঙ্কর যন্ত্রণা, সারা গায়ে যেন আগুন জ্বেলে দিয়েছে, প্রত্যেকটা স্নায়ু ছিঁড়ে পড়ছে। পেটের ভেতরটা এতোই ভারী বোধ হচ্ছিল যেন অন্ত্রগুলি সব সীসা দিয়ে তৈরী। প্রত্যেক মুহূর্তেই তার মনে হচ্ছিল এই বার সে উন্মাদ হ'য়ে যাবে; অভিশপ্তের মতন সে ঘুরে বেড়াবে অনন্তকাল ধরে, এক অনন্ত গহ্বরে,

আর সেই গহ্বর ভরা যত সব শয়তানেরা গুলি করতেই থাকবে, আর্তনাদ করতেই থাকবে ; এর আর শেষ নেই ।

মর্ফি নিশ্চল হয়ে শুয়ে পড়ে ছিল—যেন একটা আহত জন্তু আক্রমণে উদ্যত হয়েছে। আলো বাড়তে লাগল, ফর্সা হয়ে এল ; উজ্জ্বল হয়ে এল ; ছাদের উপর ওদের শীতও কেটে এল। নানা রকমের আওয়াজ এগিয়ে আসতে লাগল ।

প্রথমে মোটরের ধ্বক্ ধ্বক্ আর রবারের চাকার শব্দ। চাকার শব্দ থপ্ করে থামলে পর অনেকগুলো বুট্‌পরা পায়ের শব্দ এলো। মর্ফি একটা অস্ফুট আওয়াজ করল, কনুই নেড়ে চেড়ে ঠিক করে অবস্থান নিল, পা দুটো ছড়িয়ে দিল। আস্তে আস্তে মুখ ঘুরিয়ে সে ডোলানের দিকে তাকাল। তার চোখ দুটি লাল, প্রায় বন্ধ, দেখাই যায় না ।

"ওরা এলো বলে," সে বলল। "বিদায়। নরকে ফের দেখা হবে তোমার সঙ্গে ।"

মুখ বন্ধ রেখেই সে নিঃশব্দে হাসতে লাগল, তার ফোলা ফোলা গালের মাংসপেশীগুলো কাঁপতে লাগল। আরও কিছুক্ষণ ডোলানের দিকে তাকিয়ে থাকার পর সে সামনের দিকে মুখ ফেরাল। দাঁতে দাঁত চেপে সে তার পিস্তল লক্ষ্য করলে যেদিক থেকে শব্দ আসছিল ।

ডোলানের শরীরও শক্ত হয়ে উঠল। চিবুক দৃঢ়নিবদ্ধ, চোখ খোলা। কিন্তু তাতে অবগতির আলো নেই, কিছুই সে দেখছে না। সমস্ত শরীর তার প্রতীক্ষারত। কিসের ?

ট্রপ্, ট্র্যাপ্, ট্রিপ্। তাদের পদধ্বনি অগ্রসর হতে থাকে। এখনো অবশ্য দেখা যাচ্ছে না। গলির মোড়টা ঘুরলেই দেখা যাবে। গলির মোড়ে একটা দোকানের সামনে কালোর উপরে শাদা অক্ষরে "জে. ওয়াল্‌শ, মুদির দোকান" লেখা রয়েছে। বাকি দেয়ালে কিছুই নেই। রাস্তায় ঘোড়ার বিষ্ঠা, গলিটা সরু, আর শাদা অক্ষরে লেখা "জে. ওয়াল্‌শ, মুদির দোকান"। ডোলান-এ সবই উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিল। কিন্তু কিছুই তার মাথায় ঢুকছিল না ।

হঠাৎ রাস্তার দু-ধারে দু-জন সবুজ উর্দি পরা লোককে দেখা গেল :

বন্দুক বাঁকা ভাবে ধরা; মাথার টুপি একধারে কাৎ করে একটু কুৎসিৎ চালিয়াত্তির ভংগীতে পরা ; একজন একটা খড় চিবুচ্ছে ; উভয়েই দোতালার জানালাগুলো লক্ষ্য করতে করতে ঊর্দ্ধ মুখ হয়ে হাঁটছে। তারা থামে, আস্তে আস্তে কথা কয়। পিছন দিকে চায়। হাত মাথার উপরে তুলে একবার ঘুরিয়ে আবার নামায়। আর-ও দু-জনকে দেখা যায়। তারপর আর-ও তিনজন। সবাই আস্তে আস্তে মার্চ্ করে আসে, রাইফেল বাঁকা ভাবে ধরা।

মর্ফি একটা ঘৃণাব্যঞ্জক অস্ফুট শব্দ করে, তারপর নিঃশব্দে হাসে, তার সারা শরীর ফুলে ফুলে ওঠে। এইবার ফাঁদে পা দিয়েছে বাছাধনেরা। এইবার শুধু কাছে আসার অপেক্ষা। ব্যস্, তারপরই চলবে তার গুলি···

কিন্তু ডোলান···সৈন্যদের দেখামাত্রই তার বুক টিপ্ টিপ্ করতে থাকে, তার জড়তা কেটে গিয়ে মাথা সাফ হয়ে যায়। সে তাদের আর ভয় করছে না। সে ভুলেই গেছে যে তারা তার শত্রু। সে চার দিন ধরে তাদের সঙ্গেই লড়াই করছে—এ কথাও তার মনে থাকে না। সে এখন আর বিপ্লবী নয়। তার মনে হতে লাগল যে সে এই খুনে পাগলটার হাতে বন্দী, আর ঐ সৈন্যরা তাকে উদ্ধার করতে পারে। সে একবার চেষ্টা করল হাত নেড়ে চেঁচিয়ে তার উপস্থিতি ওদের জানায়। কিন্তু ঐ ভয়ানক মানুষটার সান্নিধ্য তাকে এমনি কাবু করে ফেলেছে যে তার জিভ্ তালুর সংগে এঁটে রইল আর হাতটা মনে হল জীবনহীন। দুর্বল মনে হল নিজেকে ; শিউরে উঠ্তে থাকল তার সর্ব শরীর ; ফ্যাকাসে ঠোঁট নড়ল কিন্তু কথা বেরোল' না।

ওরা আরও কাছে আসতে থাকে। ওদের উর্দির চকচকে বোতামগুলো চোখে পড়ে, আর চোখে পড়ে তাদের মুখের এক অদ্ভুত নির্বিকার ভাব। যেন তারা বিনা কাজে বেড়িয়ে বেড়াচ্ছে আর কি। ভগবান। তাদের জানা উচিত যে জিম ডোলান্ এখানে বিপন্ন, মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়ে আছে। অত নির্বিকার ভাব কেন, যেন গ্রাহ্যই নেই···নরক। নরক। উচ্ছন্নে যাক্।

মর্ফি নড়ে চড়ে ঠিক হয়ে নিল। ডান হাত শক্ত করল। পিস্তলের নলটা খাড়া নিচের দিকে। গুলি করতে যায় আর কি এমন সময় ডোলান্

একটা চিৎকার করে তার গায়ের উপর গিয়ে পড়ল। একটা অস্ফুট আওয়াজ করে মর্ফি ঘুরে গেল এবং তার পাঁজরে দিল কনুই-এর ধাক্কা। ডোলানের দেহ ছেঁচড়ে গিয়ে পড়ল দূরে। চিৎ হয়ে পড়ে গেল সে, তার মুখ সামনের দিকে ঘুরিয়ে সে তাকিয়ে রইল মর্ফির দিকে। মর্ফি তার পিস্তলটা ডোলানের মুখের উপর তাক্ করল। 'হুম্', এখন? দুড়ুম করে একটা আওয়াজ হল। ডোলান ভাবল সে মরে গেছে। আসলে কিন্তু মর্ফির গায়েই লেগেছে গুলি। মর্ফি হাঁ করে নিঃশ্বাস নিতে চেষ্টা করল। চিৎ হয়ে পড়ে গেল এক মুহূর্তের জন্য; তার পরেই ডান দিকে জোর দিয়ে অদ্ভুত ভংগীতে তার শরীরটা ঘুরিয়ে নিল। বাঁ দিকটা তার অবশ। ঠিক বাঁ কাঁধের নিচেই একটা বুলেট তার বুকে বিঁধেছে। ওরা রাস্তা থেকে গুলি করেছে।

ডোলান মাথাটা নামিয়ে লম্বা হয়ে পড়ে রইল। তার এখনও মনে হচ্ছিল যে সে মৃত। তার মগজ অবিশ্বাস্য বেগে ঘুরছিল যেন। চক্ষে সরষে ফুল দেখছিল সে। তার হাত পাগুলো মনে হচ্ছিল অসম্ভব ভারে তাকে ছাদের মধ্যে দিয়ে নিচে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। ভয়াবহ নৈঃশব্দ্যের মধ্যে সে অপেক্ষা করতে লাগল, কোন কিছুই তার কানে ঢুক্‌ছিল না।

গুলি করেই সৈন্যরা দৌড় দিল একটা সরু গলির মধ্যে আশ্রয় নেবার জন্যে। অন্ধের মতো মর্ফি দু-রাউণ্ড্ গুলি চালিয়েছিল বটে, কিন্তু কারোর গায়ে একটাও লাগে নি। বুলেটগুলি গিয়ে সেই মুদিখানার কালো রং করা দেয়ালে লেগেছে। সাদা সাদা দাগ হয়েছে গোটা কয়েক, পাশাপাশি। তারপর সে থামল।

হঠাৎ আর একটা গুলির আওয়াজ এল। মর্ফির সমস্ত শরীর শিউরে উঠল। মাথাটা পিছন দিকে ঠেলে দিল সে। হাত দিয়ে নিজের গলাটা চেপে ধরল। আবার তার বাঁ কাঁধে গলার কাছে গুলি বিঁধেছে। তার নীল সোয়েটার ভেদ করে রক্ত বেরোতে লাগল। হাঁ করল সে, জিভ্‌টা বেরিয়ে এল, জিভটা বাইরেই রইল অথচ ঠোঁট দুটো বন্ধ হয়ে গেল। বাঁ চোখটা বন্ধ করে অতি কষ্টে সে তার পিস্তলটা বাগিয়ে ধরে দূরবর্ত্তী একটা চিম্‌নি লক্ষ্য করল। সব চুপ চাপ। দুড়ুম, দুড়ুম, দুড়ুম। তিনবার

তাড়াতাড়ি গুলি করল সে। একটা আর্তনাদ, একটা লোক হাত তুলে লাফিয়ে উঠে উপুড় হয়ে পড়ল, তখনো তার হাতে রাইফেলটা ধরা আছে। চিমনির গায়ে পড়ে লোকটা ছটফট করতে লাগল। আর একটা লোক লাফিয়ে উঠে, খুব নিচু হয়ে তাকে টেনে নিয়ে যাবার চেষ্টা করতে লাগল। মর্ফি আবার গুলি করল। সেই লোকটা বসে পড়ল। তার লেগেছিল কি না বোঝা গেল না।

ড-র্-র্-র্-র্-র্। দূরে একটা লুইস গান্ চলতে আরম্ভ করল। বুলেটের স্রোত এলো একটা, ঠিক মর্ফির মুখের উপর দিয়ে এ পাশ থেকে ওপাশ পর্যন্ত ঘুরে ঘুরে গেল। মর্ফি মাথা নিচু করে, চুপ করে রইল। দুড়ুম, দুড়ুম, ড-র্-র্-র্-র্, দুড়ুম। চার দিক থেকে তাকে লক্ষ্য করে গুলি আসতে লাগল। চিমনির গা থেকে ইঁটের টুকরো খসে এসে তার গায়ে লাগল, ছাদের স্লেটের টুকরোও দু-একটা। কিন্তু সে তবু আহত হল না। ছাদের নলের মধ্যে চুপচাপ পড়ে রইল।

চুপচাপ পড়ে থেকে তার মনে পড়ল ডোলানের কথা। এইবার ঐ বিশ্বাসঘাতকটাকে শেষ করতে হবে। ক্রমশ তার শরীর দুর্বল হয়ে আসছিল। শরীরের একটা পাশ শুধু প্রাণবান, অন্যদিকটা মৃতপ্রায়। মৃত্যুর পদক্ষেপ যেন দ্রুততর হয়ে আসছে। আস্তে আস্তে সে মুখ ফেরাল, সাবধানে যাতে দূর থেকে তাকে দেখা না যায়। তখনো বুলেট অজস্র ধারায় পড়ছে। অনেক, অনেক কষ্টে, গোঙাতে গোঙাতে সে ধীরে ধীরে তার ডান হাতটা ঘুরিয়ে এ ধারে আনল।

ডোলান তার নড়াচড়ার শব্দ পেয়ে চমকে উঠল। দুঃস্বপ্নগ্রস্ত লোক যেমন ঘরে কোন শব্দ হলে চমকে জেগে ওঠে তেমনি সে সংবিৎ ফিরে পেল। গলা বাড়িয়ে সে দেখল মর্ফির রক্তাক্ত মুখ তাকেই লক্ষ্য করছে, পিস্তলের লক্ষ্যও তারই দিকে। একটা আর্তনাদ করে সে তার শরীরটাকে ছেঁচড়াতে ছেঁচড়াতে পেছিয়ে নিয়ে গেল। মর্ফি একটা অস্পষ্ট শব্দ করে হঠাৎ উঠে বসতে গেল যাতে চট করে পিস্তলের লক্ষ্য ঠিক ক'রে তৎক্ষণাৎ গুলি করতে পারে। কিন্তু তার পূর্বেই সে যেন একটা ধাক্কা খেয়ে পড়ে গেল, তার মাথাটা নলের গায়ে ঠুকে গেল, তার হাতের পিস্তল থেকে একটা গুলি বেরিয়ে গিয়ে

শূন্য আকাশকেই বিদ্ধ করল শুধু। তার মগজের মধ্যেই এবার বুলেট বিঁধেছে। একেবারে নিশ্চল হ'য়ে পড়ে রইল সে।

কিছুক্ষণ বাদেই গুলি চলা বন্ধ হল। রাস্তার এপার থেকে সৈন্যেরা ওপারের সৈন্যদের ডাকাডাকি করতে লাগল। ডোলান সম্পূর্ণ স্তব্ধভাবে মর্ফির দেহের দিকে চেয়ে রইল। সে কি এবার লাফ দিয়ে উঠে মাথার উপরে দুহাত তুলে আত্মসমর্পণের ইঙ্গিত দেবে? কিন্তু না। যেই তার মনে সৈন্যদের কাছে আত্মসমর্পণের আশাটা বাস্তব হয়ে উঠল, অমনি তার ভয়ও ফিরে এল। পুনরায় তার হৃদয়ঙ্গম হল যে ওরা তার শত্রু। ভয়ে তার সর্বশরীর থেকে কাল-ঘাম বেরোতে লাগল; সে ছাদের স্লেটের আড়ালে তার শরীরটাকে লুকোবার চেষ্টা করতে লাগল। তারপর সে চুপ করে চোখ বন্ধ করে পড়ে রইল।

নৈঃশব্দ্য···দীর্ঘ, দীর্ঘ নৈঃশব্দ্য। সব কিছুই নীরব, নিস্পন্দ।

তারপর তার পিছন দিকে ছাদের উপর পায়ের আওয়াজ শোনা গেল। সে তাই শুনে লাফিয়ে উঠে মাথার উপর হাত তুলল। হাঁটু গেড়ে বসল সে, থর থর করে কাঁপতে লাগল তার শরীর, অসংলগ্ন ভাষায় কৃপাভিক্ষা করতে লাগল সে।

"আমাকে এখান থেকে নিয়ে যাও। নিয়ে যাও এখান থেকে। আমি গুলি করিনি, করি নি আমি। আমি গুলি করি নি। ঐ লোকটা পাগল। আমার স্ত্রী আছে। আমার স্ত্রী। আমাকে বাঁচাও। ভগবানের দোহাই, আমি একবারও গুলি করি নি। সিঁড়িতে দুজন মরে পড়ে আছে। এই লোকটা মর্ফি। আমাকে বাঁচাও।"

আলসের ও-ধারে দু-জন সৈন্য দাঁড়িয়ে ছিল। ফুট পাঁচেক দূরে মাত্র। শুধু তাদের মুখ, আর হাত, আর রাইফেল দুটোই দেখা যাচ্ছিল। দুটো নিষ্ঠুর মুখ। শয়তানের মতো নির্বিকার নিষ্ঠুর দৃষ্টি। ক্রমশ মুখ দুটির নিষ্ঠুর ভাবটা বাড়তে লাগল, ঠোঁটগুলি বেঁকে গেল, চোখ দুটো ছোট হয়ে এল। তারপর ওদের একজন বলল, "এই শূয়ারটাই বা বাদ যায় কেন।"

সোজা তার মাথায় এসে দুটো গুলি লাগল।

সঞ্জীব বন্দ্যোপাধ্যায়

[লিআম ও'ফ্লেহার্টির ইংরেজী থেকে]

'A penny for your thoughts, my love'

১

মেয়ে মানুষের খেয়াল কেন যে বদলায়।
তাকে ছাড়া যেন মানুষ কিছুই ভাববে না।
যখন গভীর অজানা স্বপ্ন জ্বলে
পুরুষের চোখে ; কতই ভয়-কাতর
স্ত্রীলোকের মন সন্দেহ-প্রতিকূল।
পৃথক্ সত্তা ঈর্ষ্যা ঘনায় মনে।

আমার ইচ্ছা—হাসুক অথবা কথা বলুক
যেন বেশ বুঝি পাশে বসে আছে সজীব প্রাণ।
হাত ধরে হায় কলম থামায় সে,
লেখা আসে যবে। ভেবেছিনু নির্ভর
মোর আশ্রয়-যষ্টি তাহার প্রেম
দেখছি এখন শাসন বেত্রাঘাত।

২

উত্তর নেই ; তবু নাম ধরে ডাকি।
স্পন্দন নেই ; জোরে নাড়া দিতে থাকি।
নিষ্প্রাণ দেহ শ্বাসহীন অবিরল।
ভয়োন্মত্ত কোথা আলো মরি খুঁজি'
হেসে ওঠে নটী শঠতায় বিহ্বল।
বিভীষিকা দেখি—মৃত্যুবিকার বুঝি।

সেই মুহূর্তে মগজে খুন চাপে
এটুকু মেয়ে ছলার অগ্নি তাপে
প্রমাণ-কবালো শুদ্ধ কঠিন হেম—
রহস্যঘেরা বিশাল ভীষণ মোর
অর্দ্ধসুপ্ত যে অনুভূতির ঘোর
জীবনে ধরে না—মরণনিষ্ঠ প্রেম।

বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

পুস্তক-পরিচয়

বাংলা সাহিত্য

BENGALI LITERATURE—by Annadasankar & Lila Roy. P E N All-India Centre, Bombay. (P E N Books No. II).

বাঙালার কাব্য—হুমায়ুন কবির প্রণীত (গুপ্ত রহমান অ্যাণ্ড গুপ্ত, কলিকাতা)।

বাংলা-সাহিত্য বিষয়ক এই দুইখানি পুস্তকই অতি সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত অন্নদাশঙ্কর রায়ের ইংরাজী ইতিবৃত্তিকা পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বে আর কোথায়ও ছাপা হয় নাই এবং স্বল্পকলেবর হইলেও ইংরাজী ভাষায় মোটামুটি আদ্যোপান্ত বাংলা সাহিত্যের ধারাবাহিক আলোচনা করিবার ইহাই প্রথম উদ্যম। কবির সাহেবের রচনার কিছু কিছু অংশ ইতিপূর্ব্বে "চতুরঙ্গে" প্রকাশিত হইয়াছিল কিন্তু তাহা হইলেও লেখকের অপূর্ব্ব বিচার-ভঙ্গির সমগ্র রূপটা এই আলোচনা-গ্রন্থেই পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে।

মুখবন্ধে শ্রীযুক্ত রায় লিখিয়াছেন যে পুস্তিকাখানি মুখ্যতঃ সাধারণ পাঠক-পাঠিকার (বোধ হয় বাংলা-অনভিজ্ঞ) জন্য রচিত। সেই হিসাবে গ্রন্থকারের কৃতিত্ব আছে; কেননা তাঁহার প্রকাশভঙ্গিতে কোন অস্পষ্টতা নাই, কোন মত-প্রকাশে দ্বিধান্বিতভাবের লেশমাত্র নাই, কোন সাহিত্যগুরুর রচনার বিষয়-বস্তু লইয়া কোন তাত্ত্বিক কিংবা রস-গত আলোচনার অবতারণাও তিনি করেন নাই—পুস্তকের শেষ অধ্যায়ের গৌড়-চন্দ্রিকা বাদ দিলে এ যে নিতান্ত অ-বাঙ্গালী পাঠক-পাঠিকার জন্য লিখিত বাংলা সাহিত্যের "হাসি-খুসি"। মুস্কিল এই যে বিচার-নিরপেক্ষ কিংবা সরাসরি বিচার-সর্ব্বস্ব সাহিত্যের যে ধারা-বিবৃতি তাহা তথ্য-পরিবেশন হিসাবে যতই মূল্যবান হউক না কেন, ইহাতে বিপদ আছে। বিচার-সমৃদ্ধ হইলে সাহিত্যের ইতিহাস পড়িয়া পাঠক পাঠিকা যে রস উপভোগ করিতে পারেন, একমাত্র তথ্য-বিবৃতিতে তাহা

ক্ষুন্ন হইতে পারে। সে যাহাই হউক, রায় মহাশয়ের বিবৃতি-পদ্ধতির বিরুদ্ধে আমাদের সব চাইতে বড় অভিযোগ এই যে তিনি যে শুধু বিচার-বিশ্লেষণ এড়াইয়া চলিয়াছেন তাহা নহে, বাংলা সাহিত্যের ধারাকে তিনি কোনও সাহিত্যিক আন্দোলন কিংবা যুগসংস্কার সঙ্গে সম্বন্ধ রক্ষা করিয়া তাহার তথ্য-পরিবেশনকেও নিয়ন্ত্রিত করেন নাই। নহিলে বিজয়গুপ্ত ও ভারতচন্দ্রকে একই অধ্যায়ে, প্রায় একই সঙ্গে, মাইকেল ও বঙ্কিমচন্দ্রকে একই যুগ-বিবর্ত্তনে, দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ও অক্ষয় বড়ালকে একই কাব্য-সান্নিধ্যে পাঠক পাঠিকার কাছে অবতারণা করার মত গুরুতর তত্ত্বহানি ও রসাভাসের কোন কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। আসল কথা শ্রীযুক্ত রায় মহাশয়ের সাহিত্য-ছবি সম্পূর্ণ Georgian, সাহিত্য হয়ত তাঁহার কাছে সম্পূর্ণই ব্যক্তি-কেন্দ্রগ; কিন্তু মনে রাখা আবশ্যক যে খেয়ালী মতবাদ কিংবা উগ্র ইচ্ছা লইয়া সাহিত্য সৃষ্টির নিরুদ্দেশ যাত্রায় বাহির হইলে হয়ত বা Brave New World জয় করা চলে কিন্তু সাহিত্য বিচারের ঐতিহ্য-আকীর্ণ রাজপথে একমাত্র ব্যক্তিগত ভাল লাগা-মন্দলাগার উপর নির্ভর করিয়া চলা নিতান্তই যেন "আগুন নিয়ে খেলা"। ইহা ছাড়া বিতর্ক-বিরল হইলেও রায় মহাশয়ের পুস্তিকার নানাস্থলে তাঁহার ব্যক্তিগত মন্দলাগার (bias) ছাপ এত তীব্রভাবে উঁকি মারিয়াছে যে তাহা শোভন হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না—বিশেষ করিয়া এই জন্য যে ইংরাজী ভাষায় বাংলা সাহিত্যের ঐতিহাসিক হিসাবে গ্রন্থকারের একটা বিশিষ্ট দায়িত্ব আছে। প্রথমত, রায় মহাশয় বাংলা গদ্য রীতিতে তাঁহার আশানুরূপ চলিত ভাষার প্রবর্ত্তন না হওয়াতে বিশেষ ক্ষুব্ধ, এ কথাও বলিয়াছেন যে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর নাকি "মৃত্যুঞ্জয়ী" ভাষাই ব্যবহার করিয়াছিলেন। যতদিন না কলিকাতার একমাত্র কৃষ্টিকেন্দ্রের পরিবর্ত্তে বাংলা দেশে আরও নূতন নূতন সঙ্কীর্ণ কৃষ্টি কেন্দ্রের পত্তন হইবে, রায় মহাশয়ের মতে ততদিন বাংলা সাহিত্যের ভাষা-সমস্যা থাকিয়াই যাইবে (৮-৯ পৃষ্ঠা), কেননা ততদিন সাহিত্যের বাহন পল্লী-জীবনের সুখ-দুঃখ কিংবা আশা-আকাঙ্ক্ষাকে রূপ দিতে পারিবে না। রায় মহাশয় বাম-পন্থী গণ-বাদী নহেন; যথার্থ গণ-বাদী হইলে বুঝিতেন যে গণ-সাহিত্যের অন্তরায় ভাষা-বাহন নহে, অন্তরায় গণ-মনোভাবের উপলব্ধির অভাব। দ্বিতীয়ত, বাংলা সাহিত্যে যতখানি ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির উপাদান আছে

রায় মহাশয় তাহার উপরই কটাক্ষপাত করিয়াছেন ; বাঙালীর কৃষ্টির বনিয়াদ নাকি ষোল আনা বৌদ্ধ, প্রাচীন লোক-সাহিত্যে বিশেষত মুসলমান সমাজের দ্বারা রক্ষিত লোক সাহিত্যেই নাকি খাঁটি বাংলা সাহিত্যের অবিমিশ্র নিদর্শন। বলা বাহুল্য যে ভাষা সাহিত্য নয়, সাহিত্যের আঙ্গিক মাত্র এবং বঙ্গদেশের বৌদ্ধ সাধনা কিংবা লোক-সাহিত্যও ভুঁইফোঁড় হইয়া বাংলার মাটিতে গজায় নাই। "সবুজপত্র" যুগের এই প্রাচীন বিতর্কের পুনরাবৃত্তি এখানে করিয়া লাভ নাই। তবে মজার কথা এই যে পঁচিশ বৎসরের পূর্ব্বেকার সংস্কৃত-বিরোধীরা ছিলেন ব্যক্তি-বাদী, "কর্ত্তার ইচ্ছায় কর্ম্ম", আর আজিকার সংস্কৃত-বিরোধীরা মুখোস পরিয়াছেন গণ-বাদীর। বলা বাহুল্য যে এ গণ-প্রেরণা নিতান্তই হালকা, আধুনিক ব্যক্তিবাদীর রচনায় তাহার যে রঙ তাহা distemper মাত্র।

পুস্তিকার শেষ অধ্যায়ের মুখবন্ধে রায় মহাশয় দুঃখ করিয়া বলিয়াছেন যে বিগত মহাযুদ্ধের পর হইতে সাহিত্য আর জমিয়া উঠিতেছে না, কেননা জীবনের সুর গভীর হইয়া আসিয়াছে, সাহিত্য সাধনায় সেই অনুপাতে গভীরতা নষ্ট হইয়াছে ; সাহিত্যিক আজ অবসাদে মুহ্যমান। আধুনিক সাহিত্যিক মনের এই যে নিঃসঙ্কোচ স্বীকারোক্তি হুমায়ুন কবির সাহেবের "বাঙলার কাব্য" সন্দর্ভের বহু প্রতিপাদ্য মত-নির্ণয়ের মধ্যে ইহাও অন্যতম। কাব্য সমালোচনা বলিলে সাধারণতঃ বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে যাহা বোঝা যায়, কবির সাহেবের বর্ত্তমান রচনা তাহা হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। সমালোচক কোন কবি-স্রষ্টাকে তাঁহার ব্যক্তিগত সৃজনী প্রতিভার উৎকর্ষ-অপকর্ষের তৌলদণ্ডে পরিমাপ করিবার চেষ্টা করেন নাই। অন্যপক্ষে তাঁহার কাব্য-প্রতীকে যে নৈসর্গিক ও পারিপ্রেক্ষিক প্রভাব, বিশেষত সমাজ চেতনার যে স্ফুরণ হইয়াছে, কবির সাহেবের সমালোচক দৃষ্টি তাহারই সন্ধান করিয়া বেড়াইয়াছে। তিনি সৃজনী প্রতিভার ব্যক্তিগত উৎসারণ কিংবা উপাদানের যাথার্থ্য অস্বীকার করেন নাই তবে সেই লোকোত্তর ব্যক্তি-প্রতিভার বিশ্লেষণে সমালোচকমাত্রই বিভ্রান্ত ও অসহায়, ইহাই মনে করেন। তাই 'বাঙলার কাব্যে' কবীর সাহেব যে কাব্যালোচনার অবতারণা করিয়াছেন তাহা সম্পূর্ণই সমাজতাত্ত্বিক এবং শুধু তাহাই নহে, এই আলোচনা একান্তভাবে

শ্রেণীবাদের কাঠামোতে আঁটা। বাংলার কাব্য ও সাহিত্যের ইতিহাসকে বিবর্তমান আর্থিক পরিস্থিতি-সঞ্জাত শ্রেণী-মানসের প্রতিচ্ছবি হিসাবে বিচার করিবার ইহাই সর্ব্ব প্রথম প্রয়াস। কবির সাহেবের এই প্রয়াসের সার্থকতা স্থলে স্থলে যতই সঙ্কুচিত হউক না কেন এবং যদিও আমাদের ধারণা যে সমালোচক তাঁহার বিচারপদ্ধতির জন্য Christopher Caudwell কৃত Illusion and Reality গ্রন্থে ইংরাজী সাহিত্যের একটী অনুরূপ আলোচনার নিকট অনেকাংশে ঋণী, তথাপি তিনি তাহার তত্ত্ববিবৃতিতে যে ধীশক্তি ও বিশ্লেষণ-প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন তাহা বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে বিরল না হইলেও যে একান্ত শ্লাঘনীয় সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। সাহিত্যাদর্শে যাঁহারা বামপন্থী নহেন—এবং আমরাও নহি—সাহিত্যামোদী হইলে তাঁহাদেরও এই আলোচনা-গ্রন্থ অবশ্য পঠিতব্য।

বাঙ্‌লা কাব্যের ধারা আলোচনা করিতে যাইয়া কবির সাহেবের মোটামুটি বক্তব্য এই : বাংলা কাব্যের দুইটী ধারা আছে, একটীর উৎপত্তি পশ্চিমবঙ্গের রাঢ় ভূমিতে যেখানে নৈসর্গিক প্রভাবের ফলে বাংলার কাব্য হইয়াছে মায়াবাদী, ধর্ম্মবিলাসী ও অন্তর্মুখী ; অপর ধারার উৎপত্তি হইয়াছে নদীমাতৃক পূর্ব্ববঙ্গে যেখানে নৈসর্গিক প্রভাবের ফলে বাংলার কাব্যে আসিয়াছে আত্ম-সচেতন ব্যক্তিত্ববোধ ও সামাজিক ক্রিয়াশীলতা। প্রাচীন ভারতে ব্রাহ্মণ্য আভিজাত্য যখন সাম্যবাদী বৌদ্ধধর্ম্মের সংঘাতে ভাঙ্গিয়া পড়িল তখন ধীরে ধীরে ভারতীয় সভ্যতার সঙ্গে যোগ হইল ইস্‌লামীয় সভ্যতার। দাক্ষিণাত্যেই প্রথম ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের পুনরভ্যুত্থান হইল কেননা কবির সাহেবের মতে দাক্ষিণাত্যেই প্রথম ইস্‌লামের সহিত ভারতীয় সভ্যতার যোগ—তাই প্রতিক্রিয়ার আবর্তে রূপ পাইল শঙ্কর, রামানুজ, মধ্বাচার্য্য, ও নিম্বার্কের দর্শন। এদিকে পূর্ব্ব ভারতে বৌদ্ধসাধনায় ওতপ্রোতভাবে অনুস্যূত বঙ্গদেশে যখন ইস্‌লামের পরশ লাগিল তখন পশ্চিম বঙ্গের উদার প্রান্তরে জাগিয়া উঠিল বৈষ্ণবগীতি এবং তাহার কিছুকাল পরে সেই ইসলাম কৃষ্টির সঙ্গে যখন সংযোগ হইল পূর্ব্ববঙ্গের তখন তাহার খালবিল মুখরিত করিয়া সৃষ্টি হইল এক নূতন ক্রিয়াশীল সামাজিক জীবনের সাহিত্য—মনসামঙ্গল, এমন কি চণ্ডীকাব্য, ময়নামতীর গান, “মৈমনসিংহ গীতিকা”, তাহা ছাড়া কবির

লড়াই, ভাটিয়াল ও জারিগান ইত্যাদি। ইংরাজ রাজত্বের আরম্ভ হইলে মুসলমান সামন্ততন্ত্রের অবসান হইল এবং ইংরাজ সরকারের "সক্রিয় সাহায্যে" বাংলার কৃষ্টির দরবারে স্থান পাইল এক নবীন ভূমিনিষ্ঠ ও চাকুরীজীবী মধ্যাবিত্ত সম্প্রদায়। রাজ্যবিপ্লবে এই সম্প্রদায়ের কোন প্রকার বিক্ষোভ হওয়া দূরে থাক, গণসমাজের শোষিত অর্থে এই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উত্তরোত্তর আর্থিক শ্রীবৃদ্ধি ও সম্প্রসারণ হইতে লাগিল। বাঙ্গালী হিন্দুর ব্যক্তি-চেতনা তীব্র হইয়া উঠিল। তাহা সর্ব্বপ্রথম রূপ পাইল মাইকেলের রচনায় ও তাহার পরিপূর্ণ বিকাশ হইল রবীন্দ্রনাথের অলৌকিক সৃজনী প্রতিভার বিস্ফোরণে। মধ্যবিত্তের মানসভূমিতে যে সাহিত্যের সৃষ্টি ঐতিহাসিক বিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাহার আয়ু ফুরাইয়া আসে, আর্থিক সঙ্কটের মরুভূমিতে সেই সৃজনীধারা আপনাকে হারাইয়া ফেলে। তাই রবীন্দ্রোত্তর বাংলা কাব্যে প্রেরণার ভাটা পড়িয়াছে। সমাজ-সত্ত্বার শিকড়ে আজ আর রস নাই, সাম্প্রতিক কবি-গোষ্ঠী আজ বিষাদভারে ভারাক্রান্ত।

উপরে বিবৃত কবির সাহেবের আলোচনা-ধারার সংক্ষিপ্ত পরিচয় যতটুকু দেওয়া গেল তাহার সঙ্গে আমাদেরও অনেকেরই মতানৈক্য জানাইবার প্রচুর হেতু রহিয়াছে। তবে তাহা করিয়া লাভ নাই, কেননা প্রভেদ যেখানে পরস্পরের দৃষ্টিকোণে সেখানে দৃষ্ট বস্তুর মূল্য যাচাই অপেক্ষাকৃত লঘু ব্যাপার। তাহা হইলেও দু'তিনটী ব্যাপারে কবীর সাহেবের সঙ্গে আমাদের বিরোধ না জানাইয়া থাকিতে পারিলাম না। প্রথমত, বৈষ্ণবকাব্যে কবির সাহেবের উল্লিখিত ইস্‌লাম-প্রভাব। বাংলা কাব্যের ইতিহাসে বৈষ্ণব কবিতার এমন কি প্রাক্-চৈতন্য বৈষ্ণব কবিতার বিশেষত্ব তাহার মানবিকতা; কিন্তু একথা বলা নিতান্ত ভ্রান্তি যে এই মানবিকতা ইস্‌লাম-লব্ধ। ভাগবতে যে কৃষ্ণতত্ত্ব আছে তাহার রূপক-মর্ম্মাশ্রিত মানবিকতা অস্বীকার করা যায় না। ইহা ব্যতীত দশম-একাদশ শতাব্দীতে বিকৃত বৌদ্ধ-সাধনায় অনুপ্রাণিত হইয়া যে বাউল সহজিয়া প্রভৃতি সম্প্রদায়ের উৎপত্তি হইয়াছিল তাহাতে ও তদানীন্তন বাংলা দেশের বহু লৌকিক ধর্ম্মাচারে মানবিকতার সুস্পষ্ট ছাপ পাওয়া যায়, তাহা কি কবির সাহেব অস্বীকার করিবেন? বাংলা দেশের কি শাক্ত-সাধনা কি বৈষ্ণব-সাধনালোকাচারিত ধর্ম্মানুষ্ঠানের সকল ক্ষেত্রেই মানবিকতার সন্ধান পাওয়া যায়।

প্রতিমা পূজা বাংলার ধর্ম্ম-কৃষ্টির বৈশিষ্ট্য, ইহা সম্পূর্ণ বৌদ্ধ সাধনার ঐতিহাসিক দান—ইস্‌লামের নহে। দ্বিতীয়ত, কবির সাহেব বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতি যে পক্ষপাতিত্ব দেখাইয়াছেন, তাহা শুদ্ধ বিস্ময়কর নহে অমার্জ্জনীয়ও বটে। ইহা সত্য যে বঙ্কিমচন্দ্র বাঙালীর কৃষ্টি-সমস্যা ও বৈষয়িক সমস্যা একই আদর্শের ভূমি হইতে সমাধান করিবার চেষ্টা করেন নাই—মার্কসবাদ প্রবর্ত্তনের পূর্ব্বেও তাহা কেহই করেন নাই। তাই বঙ্কিমচন্দ্র বাঙালী হিন্দুর কৃষ্টি-সঙ্কটকে সমাধান করিতে চাহিয়াছিলেন ধর্ম্ম-সাধনাকে পুনঃজাগ্রত করিয়া; সেই জাগৃতির স্বপ্নের মধ্যে মুসলমান সমাজের প্রতি তাঁর কোন দৃষ্টিই পড়ে নাই; ভাবের ক্ষেত্রে এই দৃষ্টি সম্পূর্ণ রোমান্টিক। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র যখন আবার আর্থিক সংগঠনের বাস্তব ভূমিতে দাঁড়াইয়াছেন, তখন তিনি হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে প্রভেদ করেন নাই। আজ যে বাংলার রাজনীতিক্ষেত্রে কৃষক-প্রজা দলের উদ্ভব, তাহার যদি কেউ ঐতিহাসিক নেতৃত্ব দাবী করিতে পারেন, তবে সে দাবী অমীমাংসিতভাবে "বাংলার কৃষক" শীর্ষক প্রবন্ধধারার রচয়িতা বঙ্কিমচন্দ্রের ক্ষেত্রেই গ্রাহ্য। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে তিনি চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করেন। বাংলার কৃষক-শ্রেণীর—শুধু রামা কৈবর্ত্ত নহে হাসিম সেখও সেই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত—দুর্দ্দশা দেখিয়া তিনি ইংরাজ রাজত্বের স্তুতিগান করিতে অসম্মতি জানাইয়াছিলেন। শিক্ষিত অশিক্ষিতের মধ্যে যে মারাত্মক প্রভেদ সৃষ্টি হইয়াছে তাহার বিরুদ্ধে বঙ্কিমচন্দ্রই সত্তর বৎসর আগে বাঙালীকে সতর্ক করিয়া দিয়াছিলেন। খিলাফৎ আন্দোলনের সময় মহাত্মা গান্ধী প্রতি সন্ধ্যায় একমাত্র মীরার ভজন শুনিতেন বলিয়া যেমন মহাত্মার স্বাজাতিক দৃষ্টিকে ক্ষুণ্ণ করা চলে না, তেমনি রোমান্সের ক্ষেত্রে বঙ্কিমের দৃষ্টি হিন্দু সাধনাকেই একান্ত বলিয়া গ্রহণ করায় তাঁহার দেশাত্ম-বোধকে নেতিবাদী বলিয়া বর্ণনা করা ন্যায্য হয় না। তৃতীয়ত, কবির সাহেব রবীন্দ্র-কাব্য আলোচনা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, "গত মহাযুদ্ধের সময় থেকেই আভাষে ইঙ্গিতে স্পষ্ট হয়ে এল যে মধ্যবিত্তের সৃজনী যুগের অবসান আসন্ন", সমাজ-বিবর্ত্তনের ধারায় মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের অবসান অবশ্যম্ভাবী এবং "রবীন্দ্র-প্রতিভার প্রাণশক্তির কৃতিত্ব এই যে সে পরিবর্ত্তনে তাঁর কাব্যপ্রবাহ সাড়া দিয়েছে।" আরও বলা হইয়াছে যে

জীবনের শেষ দশ বারো বৎসর কবি যে দেশের গণমানসকে আবিষ্কার করার সাধনা করিয়াছিলেন তাহা অস্বীকার করা চলে না। আমরা কিন্তু সে অস্বীকৃতি জানাইতে চাই। বিপ্লোবোত্তর রাশিয়ার সমাজ-গঠনের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করিলে কিংবা অবদমিত মানবসমাজের ধূমায়িত বিপ্লবকে আশা-নিরাশার যুগ্মভাবে আবিষ্ট হইয়া কল্পসৃষ্টিতে স্থান দিলেই কি গণমানসের কিংবা শ্রেণীদর্শনের প্রামাণ্য স্বীকার করা হইল? এই জড়-বাদী সমাজ-বিবর্তনের ভবিষ্যৎ স্বপ্নের সহিত রবীন্দ্রনাথের আজন্মের কাব্য ও জীবন-সাধনার বিরোধ এত সুস্পষ্ট যে বামপন্থী সাহিত্যিকেরা শুদ্ধ নিজেদের সাহিত্যাদর্শকে সাধারণ পাঠকের বিচারে গুরুত্ব দান করিবার জন্যই রবীন্দ্রনাথকে যতটা সম্ভব তাঁহাদের দলে টানিবার চেষ্টা করেন। কবির সাহেবও দেখিতেছি সেই চেষ্টাই করিয়াছেন, যদিও তাঁহার জানা আছে যে কবি "আত্মস্থ অভিজ্ঞতার কেন্দ্র থেকে কল্পনার চোখে জীবনকে উপলব্ধি করিয়াছেন" এবং এও স্বীকার করেন যে "প্রতিভার অর্থ এই যে ঐতিহ্যকে আত্মসাৎ করে ঐতিহ্যকে সৃষ্টি করা।" সত্তর বৎসর বয়সে রবীন্দ্রনাথের গণমানস-আবিষ্কার কি তবে নিছক কাল্পনিক, না ভারতীয় সাধনার যে ঐতিহ্য কবি আত্মসাৎ করিয়াছিলেন তাহার মধ্যে নিহিত রহিয়াছে শ্রেণী-চেতনার ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতর অঙ্কুর?

শ্রীক্ষেত্রমোহন পুরকায়স্থ

কৃষ্ণদ্বীপের রাণী—শ্রীপশুপতি ভট্টাচার্য্য। ডি. এম. লাইব্রেরী, কলিকাতা। মূল্য—দুই টাকা।

নিশিপদ্মা—শ্রীঅনিলকুমার ভট্টাচার্য্য। অর্চ্চনা পাবলিশিং হাউস, কলিকাতা। মূল্য—পাঁচ সিকা।

সমজদার বিদগ্ধজনের অনেকেই যেমন বাংলা সাহিত্যে ছোট গল্প সম্বন্ধে খুব উচ্চ ধারণা পোষণ করেন না, তেমনি রসোত্তীর্ণ ফলিত গল্পও যে ঠিক কি তাও স্পষ্ট কারুর মুখে তেমন শোনা যায় নি।

রুচি পরিবর্ত্তনশীল এবং বিভিন্ন রুচির মানুষ হলেও; বহুর ভালো লাগা মন্দ লাগার উপর একটা প্রমাণ খাড়া করা যেতে পারে। যে টানে আগের গল্প টানতো, আজকের গল্প তার চেয়ে টানে বেশী। এই প্রতিক্রিয়া কেবল বিষয়বস্তুকে নিয়েই নয়, ভাষা ও গল্প-বলার কৌশলের উপরও এ-টান নির্ভরশীল। একই গল্প বিভিন্ন কথকের মুখে কথিত হয়ে, শ্রোতার মনে বিভিন্ন ভাব-সংঘাত ঘটায়,—একই সুরের একই সঙ্গীত বিভিন্ন গায়কের মুখে যেমন। গলার কাজ, বলার কাজ এবং লেখার কাজ যদিও ঠিক এক জাতীয় নয় বিশ্বাস করি, কিন্তু একটা শিল্পিক মনই কাজ করে সবার মধ্যে। কৌশলী সুরে যে কাজ দেখান, কথক কথোপকথনে যা ব্যাখ্যাত করেন, গাল্পিক লৈখিক দক্ষতায় তা ফুটিয়ে তোলেন। কিন্তু গল্পশিল্পীর দক্ষতার মধ্যে মানসিক অবলোকন ছাড়াও একটি বিশেষ বাহ্যিক রূপ আছে, যেটি তার ভাষা ও টেক্‌নিক। কোত্থেকে ধরতে হবে, কোথায় শেষ করতে হবে, ধরি ধরি ক'রেও পাঠক সহজে যা ধরতে পারবে না; মনের কত অজানা জায়গার বিস্ময়ানুভূতি, ঘুরিয়ে ফিরিয়ে কত মজাদার ক'রেই বলার চেষ্টা, ভাষার সুষ্ঠু মারপ্যাঁচ, পরিমিত বাক্য অথচ প্রেগ্‌নেণ্ট ভাব,—এ-সব কি গল্পকে কম গতি দেয়!

পশুপতিবাবুর গল্প বলার টেক্‌নিক কেমন মনকে তাঁর বিষয়বস্তুর উপর শ্রদ্ধান্বিত ক'রে তোলে না। এ যেন চলেছি ত চলেইছি, একটানা একঘেয়ে যাত্রা। রাস্তার দু'ধারে যা দেখছি, আগাগোড়া সবই যেন বলতে হাব; লাউঝাড় পুঁইঝাড় বৈচিত্র্যহীন ডিকেন্সী বর্ণনা এ-যুগে মানুষের মনকে তেমন দোলা দেয় না। তাছাড়া বর্ত্তমান মানুষের সময়ও অল্প এবং ছোট গল্পের স্থানও সঙ্কীর্ণ; অতএব এই স্বল্প সময় এবং স্বল্প পরিসরের মধ্যেই অপরূপ কিছু দেখাতে হবে, বলতে হবে কিছু নতুন কথা। বাস্তবকে রঙিয়ে তুলতে হবে এবং রঙিন কল্পনাকে ক'রে তুলতে হবে বাস্তব;—তবেই ত মানুষের মনের অলিতে-গলিতে তা ঘা দেবে—গল্প হবে হৃদয়গ্রাহ্য!

ব্যক্তিগত দৃষ্টিতে লেখকের কোন কোন ঘটনা বা দৃশ্য হয়ত ভালো লাগতে পারে, কিন্তু সব সময় সেগুলিই যে পাঠকের মনে রসসঞ্চার বা বিস্ময় উদ্রেক করবে তা কি ক'রে বলা যায়। সে কারণ অভিজ্ঞ গল্পলেখক বিষয়বস্তু নির্ব্বাচনে বিশেষ সচেতন থাকেন এবং সকল বাস্তব অভিজ্ঞতাকেই গল্পের

বিষয়বস্তু করেন না। রসের দিক থেকে হক্‌কথাই যখন সব সময় ভালো কথা নয়, তখন গল্প বলার মধ্যে এই সত্তাবাদিতা অনেক সময় গল্পের রসভঙ্গ করে—তা গল্প হয় না, হয় ঘটনার ইতিবৃত্ত। হালফিল অনেক লেখকের মধ্যেই নতুন দৃষ্টিভঙ্গী দেখা দিয়েছে। নতুন নতুন সমস্যা নিয়ে তাদের নায়ক-নায়িকা সব দাঁড়াচ্ছে,—সামাজিক, রাজনৈতিক ও বৈজ্ঞানিক পটভূমিতে; সৃষ্টি করছে নতুন আদর্শ—আধুনিক যুগের আদর্শ, আধুনিক পরিপ্রেক্ষণায়। তাই সুবোধ ঘোষ নাম কচ্ছেন, শৈলজানন্দ পুরনো হচ্ছেন এবং মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় রয়ে যাচ্ছেন আধুনিকই।

পশুপতি বাবুর অধিকাংশ গল্পের বিষয়বস্তুও খুব চমকপ্রদ, অসাধারণ বা অভিনব নয়। বিষয়বস্তুতে উজ্জ্বল গল্পও একেবারে যে নেই তা বলছি না, কিন্তু টেক্‌নিকের স্বচ্ছতা না পেয়ে তাও ম্রিয়মাণ হয়ে আছে। তবে ভাষার গুণ তাঁর প্রশংসনীয়, এবং টেক্‌নিক ও বিষয়বস্তুর অসহায়তার মধ্যেও এই ভাষা কোন কোন গল্পকে গতি দিয়েছে। কিন্তু অপরদিকে ছোটখাটো অসঙ্গতিও দু'একটা গল্পের রসভঙ্গ করেছে যথেষ্ট। এখানে একটি গল্পের উল্লেখ করছি। 'পচা ডাকাত' গল্পে ডাকাতরা যে কখনও সিঁদ কেটে, ছিঁচ্‌কে চোরের মত ডাকাতি করতে যায় তা এই প্রথম শুনলাম। চোর ডাকাতদের সাইকোলজি সব সময় ঠিক ধরা না গেলেও, মনে হয়, এটা ডাকাতদের পক্ষে অত্যন্ত মর্য্যাদাহানিকর এবং লো-মেণ্টালিটির পরিচায়ক।

এই গল্পেরই আর এক স্থানে পাই, যেখানে তিনি বলছেন: 'সব চেয়ে মুস্কিল হোতো ঘা ধোয়াবার সময়। স্থির হয়ে কিছুতেই থাকবে না, দু'চার জন লোক দিয়ে চেপে ধরে তার ঘা ড্রেস করতে হোতো।' এর কয়েক লাইন পরেই ভিন্ন পরিচ্ছেদে পাই: 'সহ্যগুণ ওর অসাধারণ। ডাক্তারি চিকিৎসায় অনেক রকম যন্ত্রণাদায়ক প্রক্রিয়া আছে, বিশেষত কাটাকুটির ব্যাপারে তাতে ওর কোন অভিযোগ কিংবা কাতরতা ছিল না।' এক্ষেত্রে উপরের পঙক্তি কয়েকটি কি নিচের কয়েকটির বৈপরীত্য সৃষ্টি করে না? যাঁরা অনেকদিন ধরে লিখছেন, লেখক হিসাবে যাঁরা খ্যাতিবান, এ-ধরনের অনবধানতা তাঁদের পক্ষে যুক্তিযুক্ত নয় বলেই এখানে সামান্য দু' একটির উল্লেখ করলাম।

দ্বিতীয় গ্রন্থ অনিল ভট্টাচার্য্যের 'নিশি গন্ধা'য় কাঁচা হাতের ছাপ থাকলেও

কয়েকটি গল্পে লেখকের বক্তব্য অত্যন্ত স্পষ্ট। গার্হস্থ্য জীবনের সুখ দুঃখ, অভাব অভিযোগ, আশা নিরাশা ও প্রেম বিরহের মধ্যে লেখক একটি দরদী মন নিয়ে নায়ক নায়িকাদের পরিচালনা করেছেন। কিন্তু ক্ষেত্র বিশেষে আবার এই দরদ অতিরিক্ত এবং অহেতুক হওয়ায় বিশেষ রসাভাস সৃষ্টি করেছে। ভাষায় ভাবাবেগের অনুপান একটু সংযত করলে বহু স্থানেই গল্পের ইজ্জৎ রক্ষা হোতো এবং গল্পগুলিও উপঘাতদুষ্ট না হ'য়ে আশ্চর্য্য রকমে ভালো হ'য়ে উঠতো। মুদ্রণ ত্রুটি গ্রন্থের মর্য্যাদাহানিকর এবং প্রুফ্ সংশোধনে অবহেলা অমার্জ্জনীয়।

শ্রীবিশু মুখোপাধ্যায়

হে রুদ্র সন্ন্যাসী—বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়। ভারতী ভবন। মূল্য ॥৶০

আধুনিক বাংলা সাহিত্যে গল্প, উপন্যাস এবং কবিতার প্রাচুর্য্য লক্ষিত হ'লেও প্রবন্ধের স্বল্পতা নিঃসন্দেহে শোচনীয়। উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ স্বভাবতঃই আরও স্বল্প। এর কারণ হয়ত এই যে, আমরা কল্পনা করি বেশি, চিন্তা করি কম। কিন্তু পাঠকের রুচির তাগিদেই লেখকসম্প্রদায় আর অবিমিশ্র কল্পনার সমুদ্রে নিমগ্ন থাকতে পারছেন না—বিদেশী এবং স্বদেশী উপন্যাসগুলিই তা'র দৃষ্টান্তস্থল। কাব্য, জীবনের সমালোচনা তো হবেই; সাম্প্রতিক এবং পারিপার্শ্বিক সমাজ-বিস্মরণ কবিযশঃপ্রার্থীদের পক্ষে অতি গুরু অপরাধরূপেই বিবেচ্য। বাংলা সাহিত্যের প্রায় সব লেখকই আজকাল ভাবছেন এবং এঁদের মধ্যে যাঁরা শক্তিমান তাঁরা যখন প্রবন্ধ লেখার জন্য লেখনী ধারণ করেন, তখন পাঠকের পক্ষে কৃতজ্ঞ হওয়াটাই স্বাভাবিক। বুদ্ধদেব বসু অথবা অন্নদাশঙ্কর রায় অথবা সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার—এঁরা একই জাতির প্রবন্ধ লেখননি। এঁদের দৃষ্টিভঙ্গী বিভিন্ন। কিন্তু বুদ্ধদেবের কল্পনার প্রসার অন্নদাশঙ্করের মননশীলতা এবং সত্যেন্দ্রনাথের সাংবাদিকতা,—এ তিনটি বিভিন্ন গুণ-ই রচনাকে স্বাদু এবং সুপাচ্য করেছে। বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়ের "হে রুদ্র সন্ন্যাসী"ও উপাদেয়

পাঠকগোষ্ঠী

"ভারতীয় রাজনীতি ও বাংলার নেতৃত্ব"

'পরিচয়ের' ১৩৪৮ সালের কার্ত্তিক ও ১৩৪৯ সালের ভাদ্র সংখ্যায় আমি 'ভারতীয় রাজনীতি ও বাংলার নেতৃত্ব' সম্বন্ধে কিছু লিখেছিলাম। সে সম্বন্ধে এবারের শারদীয় সংখ্যার 'পরিচয়ে' শ্রীযুত দ্বিজেন্দ্রনাথ দত্ত কিছু মন্তব্য করেছেন। আমার মনে হয় তিনি আমার প্রবন্ধ সম্বন্ধে কিছু অবিচার করেছেন। সেইজন্যেই এই কৈফিয়ৎ।

এই বিষয়টীর আলোচনা সুরু হয় ১৩৪৮ সালের শ্রাবণ সংখ্যায় লিখিত শ্রীযুক্ত পুলকেশ দে সরকারের ঐ শিরোনামার একটী প্রবন্ধ হতে। তাতে তিনি বাংলার নেতৃত্ব হারানোর কতকগুলি কারণ নির্দ্দেশ করেছিলেন আমার বক্তব্য ছিল শ্রীযুত সরকার যে কারণ নির্দ্দেশ করেছেন তা ছাড়াও বাহ্য এবং আভ্যন্তরীণ কারণ আছে। আমার প্রবন্ধে সেই কারণগুলি আলোচনা করার চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু এগুলির মধ্যে এমন কোন ইঙ্গিত আমি দেবার চেষ্টা করিনি যে ভারতীয় রাজনীতি ও বাংলার নেতৃত্বের পুনঃপ্রতিষ্ঠাই আমাদের একমাত্র কাম্য। বরং শ্রীযুত দত্ত তাঁর মন্তব্যে যে কথা বলবার চেষ্টা করেছেন আমি আমার প্রথম প্রবন্ধটীতে সেই কথাটীই বলেছিলাম। তাতে বলেছিলাম শুধু প্রাদেশিকতা কেন, যেদিন আমাদের বর্ত্তমান অখণ্ড-জাতীয়তাবাদী কংগ্রেসও ধ্বংস হয়ে নতুন নেতৃত্ব ও নতুন গণ-আন্দোলনের জন্ম হবে, যে আন্দোলন বিশ্বের শ্রমিক-আন্দোলনের অংশ, সেদিনই আমাদের রাজনীতি সার্থক হবে। সেজন্য শ্রীযুত দত্ত মন্তব্য করেছেন 'প্রবন্ধের শিরোনামা ও বক্তব্যের মধ্যে যে মূল সুর তাহার সহিত লেখকের গণ-আন্দোলন প্রীতির থিসিসের অসঙ্গতি চোখে লাগে' তখন মনে হয় তিনি সম্ভবতঃ আমার প্রবন্ধের শিরোনামাতেই ক্ষুব্ধ হয়েছেন, বক্তব্য ভাল করে পড়েন নি। বাংলার নেতৃত্ব হারানো একটী সামাজিক ঘটনা। আমাদের সমাজ-বিবর্ত্তনের রীতি কি, তার পিছনে কি কি কারণ আছে, বিশেষ কোন

ঘটনাসংস্থানের জন্য ওদেশের সমাজ বিবর্ত্তনের রীতি এখানে পরিবর্ত্তিত হতে বাধ্য হয়েছে কিনা—বাংলার নেতৃত্ব হারানো যদি এই আলোচনার উপলক্ষ্য হয় তাহলে একথা নিশ্চয়ই বলা চলে না যে বাংলার নেতৃত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য আমি আক্ষেপ করছি। যদি আমার বক্তব্য পরিষ্কার না হয়ে থাকে তা হলে ত্রুটী নিশ্চয়ই আমার। কিন্তু যদি কেউ মনে করেন যেহেতু আমি মূলসূত্রগুলি বোঝবার জন্যে এমন একটী সামাজিক ঘটনাকে বিশ্লেষণ করছি যে ঘটনাটী প্রাদেশিকতার ছোঁয়াচ বর্জ্জিত নয়, তা হলে তো স্বয়ং মার্কসকেই বলতে হয় সব চেয়ে বুর্জোয়া, কেন না তিনি শ্রমিক বিপ্লবের জন্মকথা বলতে গিয়ে বলেছিলেন "The bourgeoisie, historically, has played a most revolutionary part." আমাদের সমস্যার আশু সমাধান করতে হলে মুসলমান সমাজের বিবর্ত্তনের বেগ বাড়ানো দরকার এ কথাও আমি লিখেছিলাম। লেখক আর একটী অভিযোগ করেছেন "প্রাদেশিকতার প্রকাশ যে প্রতিযোগিতা ও সংকোচের যুগের লক্ষণ এ সম্বন্ধে সন্দেহ নাই; কিন্তু প্রগতিবাদীর মুখে এ কথা অশোভন।" এ অভিযোগের অর্থবোধ হলো না। কোনো যুগে কি কি লক্ষণ দেখা যাচ্ছে সেগুলির আলোচনা করলেই কি প্রগতির পথ হতে চ্যুত হতে হবে? প্রগতির অর্থ তা হলে কি নিজের খেয়াল মাফিক একটী ভাবাদর্শ গড়ে নিয়ে আমাদের চারপাশে যা ঘটছে তার ছোঁয়াচ সযত্নে পরিহার করে চলা? যদি রোমান্টিক কবিকল্পনাই আমাদের সামাজিক আদর্শ ও পদ্ধতি না হয়, যদি ঐতিহাসিক পদ্ধতিতে আমাদের বিশ্বাস থাকে তা হলে তো, আমার ধারণা, আমাদের অতীত ও বর্ত্তমানকে পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার করলেই ভবিষ্যৎ বিপ্লব সহজ হয়, আমরা তার দিকে নির্ভুল ভাবে এগিয়ে চলতে পারবো। লেখক সোভিয়েট বা ডিক্টেটরী নীতিতে আমাদের দেশ শাসিত হলে কি হবে তা বলবার চেষ্টা করেছেন, কিন্তু এর অর্থও ঘনীভূত হওয়ায় তা বুঝবার ক্ষমতা হলো না। তবে যদি তার মর্ম্মার্থ এই হয় যে প্রগতিবাদী হতে হলে বাস্তবের বিশ্লেষণ করা চলবে না, তা হলে তাঁর সে উপদেশ গ্রহণ করতে পারলুম না বলে দুঃখিত। আমার ধারণা, বিপ্লব ঐতিহাসিক অনিবার্য্যতায় আসে, কিন্তু তার জন্যে আরও বেশী করে সমাজ-বিশ্লেষণ দরকার।

শ্রীযুত দত্ত পরিশেষে দু' একটি ত্রুটীর উল্লেখ করেছেন। তার মধ্যে প্রথমটীর কৈফিয়ৎ সম্পাদক মহাশয়ই দিয়েছেন, তার জন্ম আমি তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ। দ্বিতীয়তঃ, মানবেন্দ্রনাথ রায় বর্ত্তমানে যে কথা বলছেন কিছুদিন পূর্ব্বেও অতোটা চড়া সুরে কড়া গলায় প্রতিক্রিয়াশীল কথা বলতে ভয় পেতেন, সেইজন্যই কিছুদিন আগে প্রবন্ধটী যখন লিখেছিলাম তখন রায় মহাশয় সম্বন্ধে ও ভাবে লিখেছিলাম।

লেখক আর একটা ত্রুটীর উল্লেখ করেছেন; তাঁর মতে আমি কংগ্রেস, লীগ ও হিন্দুসভার উল্লেখ করেছি, কিন্তু কম্যুনিষ্ট দল কিষাণ-সভা ইত্যাদির উল্লেখ ও তাদের পরিণতি সম্পর্কে গবেষণা ভারতীয় রাজনীতির আলোচনার অঙ্গীভূত হওয়া উচিত। অবশ্যই উচিত, কিন্তু মুস্কিল এই যে আমার প্রবন্ধে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সর্ব্বাঙ্গীন আলোচনা করা উদ্দেশ্যই ছিল না। পূর্ব্বেই বলেছি, আমার প্রবন্ধটি ভারতীয় সমাজ ও রাজনীতির বিবর্ত্তনের মূল রীতি ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নয়। একটি ঘটনা হতে কতকগুলি সূত্র আবিষ্কারের চেষ্টা মাত্র। সেক্ষেত্রে ভবিষ্যতে কি হবে সে আলোচনা ঠিক প্রাসঙ্গিক নয়। সেজন্য যে কথা আমার আলোচনার পরিধির মধ্যে নয়, সেজন্য অভিযোগ দেওয়া অযথা বদনামের পর ফাঁসিলটকানোর মত। যিনি আমাদের ভবিষ্যৎ কিভাবে বিবর্ত্তিত হবে সে সম্বন্ধে বিচার করবেন তাঁকে কিষাণ সভা, কম্যুনিষ্ট দল ইত্যাদি বৈপ্লবিক শক্তি এবং জমিদার, মিলমালিক প্রভৃতি প্রতিবিপ্লবের দূতদের ঘাত প্রতিঘাতের কথাই আলোচনা করতে হবে। কিন্তু আমি তা করিনি বলে অভিযোগ করলে মনে হয় তিনি আমার মূল বক্তব্যটাই বোঝেন নি, হয়তো শিরোনামাতেই তিনি এত ক্ষুব্ধ হয়েছেন যে আর পড়বার ধৈর্য্য থাকে নি।

যাই হোক্, আমার প্রবন্ধটি সম্বন্ধে মন্তব্য করার জন্য আমি শ্রীযুত দত্তের কাছে কৃতজ্ঞই। তবু আর একটা কথা আছে। যাঁরা এদেশে কম্যুনিজমের কর্ণধার তাঁদের প্রতি আমার এইটুকু নিবেদন, প্রগতিবাদীদের এ হওয়া উচিত নয়, প্রগতিবাদীদের ও কথা বলা সাজে না, সোভিয়েট পদ্ধতিতে দেশ শাসন হলে এ হবে, ডিক্টেটরী প্রথায় তা হবে না—এ ধরণের আকস্মিক এবং সংক্ষিপ্ত উক্তি ছেড়ে তাঁরা যদি এদেশের বিবর্ত্তন রীতি কি, এবং এদেশের ঘটনা সংস্থানের বৈশিষ্ট্যের জন্য আমাদের বিপ্লব কোনও নতুন পন্থায় আসবে কিনা

এই তত্বটীর সর্ব্বাঙ্গীণ আলোচনা করেন এবং সেই দিক্ দিয়ে আমাদের সাহিত্য সমাজ, চিত্রকলা, আর্ট, আচারব্যবহার, অর্থনীতি, রাষ্ট্রনীতি, রাজনীতি প্রভৃতির অতীত ও বর্ত্তমানের পুনর্বিচার করেন তা হলে আমাদের মতো অদীক্ষিতেরা বাস্তবিকই কৃতজ্ঞ হবো। আমার মনে হয় শ্রীযুত মুলক রাজ আনন্দ সম্পাদিত Marx and Engels on India এ বিষয়ে একটা বিশেষ প্রয়োজনীয় বই হয়েছে। যাঁরা সক্ষম, তাঁরা নিজেরা ঐতিহাসিক পদ্ধতিতে এই ধরণের বিস্তৃত বিচার করেন না কেন?

শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ

শ্রীকুন্দভূষণ ভাদুড়ী কর্ত্তৃক পরিচয় প্রেস, ৮ বি, দীনবন্ধু লেন, কলিকাতা হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

১২শ বর্ষ, ২য় খণ্ড, ২য় সংখ্যা
ফাল্গুন ১৩৪৯

পরিচয়

উপনিষদে জড়তত্ত্ব

দশম অধ্যায়

তত্ত্ব-সৃষ্টি

আমরা দেখিয়াছি উপনিষদের মতে আদিতে একমাত্র সৎই বিদ্যমান ছিলেন।

সদেব সৌম্য ইদমগ্র আসীৎ—

এই শ্রুতি উদ্ধৃত করিয়া পৈঙ্গল উপনিষদ্ বলিতেছেন,—

তৎ নিত্যমুক্তম্ অবিক্রিয়ং সত্যজ্ঞানানন্দং পরিপূর্ণং সনাতনম্ একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম।

'সেই 'সৎ' কে—যিনি আদিতে বিদ্যমান ছিলেন? তিনি নিত্যমুক্ত, নির্বিকার, সচ্চিদানন্দ, পরিপূর্ণ, সনাতন, একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম।'

তিনি—যস্মিন্ বিলীনং সকলং জগদ্ আবির্ভাবয়তি—পৈঙ্গল, ১

'তিনি আপনাতে বিলীন সমস্ত জগৎ আবির্ভূত করান'—যে জগৎ সংকোচিত পটবৎ তাঁহাতে পরিস্থিত ছিল—তস্মিন্এব অখিলং বিশ্বং সংকোচিত পটবৎ বর্ত্ততে। কিরূপে?—মায়া-উপাধি অঙ্গীকার করিয়া।

অস্মান্ মায়ী সৃজতে বিশ্বমেতৎ—শ্বেত, ৪।৯

কারণ, আমরা জানি জগৎ-আবির্ভাবের পূর্বে নির্গুণ নির্বিশেষে নিরঞ্জন পরব্রহ্ম মায়া-উপাধিযুক্ত হয়েন। তখন তিনি হন মহেশ্বর। ইহাই সৃষ্টির প্রথম মুহূর্ত্ত। এই মহেশ্বর হইতেই সৃষ্টি।

স স্বাধীনমায়ঃ সর্বজ্ঞঃ সৃষ্টিস্থিতিলয়ানাম্ আদিকর্তা জগদঙ্কুররূপো ভবতি—পৈঙ্গল, ১

'তিনি মায়াধীশ হইয়া সর্বজ্ঞরূপে সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের আদিকর্তা জগৎ-যোনি হন।'

এইজন্য তাঁহাকে ভূতযোনি বলে।

অব্যয়ম্ যদ্ভূতযোনিং পরিপশ্যন্তি ধীরাঃ—মুণ্ডক, ১।১।৬

সেই একমেবাদ্বিতীয় মায়ী মহেশ্বরের যখন ইচ্ছা হইল, 'এক আমি বহু হইব'—

স ঐক্ষত একোঽহং বহু স্যাম্ প্রজায়েয়—ছা, ৬।২।৩

তখন—তস্মাদ্ বা এতস্মাৎ আত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ, আকাশাদ্ বায়ুঃ, বায়োরগ্নিঃ, অগ্নেরাপঃ অদ্ভ্যঃ পৃথিবী —তৈ, ২।১।১

তস্মাদ্ আত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ আকাশাদ্ বায়ুঃ, বায়োরগ্নিঃ, অগ্নেরাপঃ অদ্ভ্যঃ পৃথিবী
—পৈঙ্গল, ১

অর্থাৎ 'সেই পরমাত্মা হইতে যথাক্রমে আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল ও ক্ষিতি—এই পঞ্চ সূক্ষ্ম মহাভূত আবির্ভূত হইল।'

এ আবির্ভাবের মূলে ব্রহ্ম।

যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে।

'তাহা হইতেই এ সমস্ত 'ভূত' জাত হয়'।

মহেশ্বর যে আকাশাদি মহাভূত সৃষ্টি করেন, তাহার নাম কারণসৃষ্টি বা তত্ত্বসৃষ্টি। স্থূল হইতে সূক্ষ্মতরের গণনা করিয়া আমরা পাঁচটী তত্ত্বের উল্লেখ পাইলাম। যথা—পৃথিবীতত্ত্ব, অপ্‌তত্ত্ব, তেজস্‌তত্ত্ব, বায়ুতত্ত্ব ও আকাশতত্ত্ব। বস্তুতঃ কিন্তু আকাশের অপেক্ষাও দুইটী সূক্ষ্মতর তত্ত্ব আছে। সাধারণতঃ উহাদের নামোল্লেখ পাওয়া যায় না। তাহাদের নাম অনুপাদকতত্ত্ব ও আদিতত্ত্ব। সাংখ্য-পরিভাষায় উহাদিগের নাম অহঙ্কারতত্ত্ব ও মহত্তত্ত্ব। সাংখ্যাচার্যেরা সৃষ্টির ক্রম এইরূপে নির্দেশ করেন। প্রকৃতি হইতে মহত্তত্ত্ব, মহত্তত্ত্ব হইতে অহঙ্কারতত্ত্ব, অহঙ্কারতত্ত্ব হইতে পঞ্চ-তন্মাত্র অথবা সূক্ষ্মভূত—আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল ও ক্ষিতি। * এই পঞ্চ সূক্ষ্ম ভূত বা তন্মাত্রের সাংখ্য

* এ সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতের ২য় স্কন্ধ ২য় অধ্যায় ২০।২০ শ্লোক দ্রষ্টব্য রায় পূর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহ তাঁহার ভাগবত গ্রন্থে (১১ পৃঃ) ব্রহ্মাণ্ডের একটী চিত্র প্রদর্শন করিয়া এ বিষয় বিশদ করিয়াছেন। ভাগবতের মতে ব্রহ্মাণ্ডের পর পর সাতটী সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর আবরণ আছে।

পরিভাষায় নামান্তর শব্দতন্মাত্র, স্পর্শতন্মাত্র, রূপতন্মাত্র, রসতন্মাত্র এবং গন্ধতন্মাত্র।

মহত্তত্ত্বকে কখন কখন সমষ্টিবুদ্ধি (cosmic ideation) বলা হয়। ইহার অর্থ এই যে, মহেশ্বর ঐ মহত্তত্ত্ব উপাধিতে উপহিত হইয়া সৃষ্টির অধ্যবসায় (নিশ্চয়, resolve) করেন। আমরা দেখিয়াছি শ্রুতি "স ঐক্ষত" (তিনি নিশ্চয় করিলেন) এই বাক্য দ্বারা ঐ বিষয়ের ইঙ্গিত করিয়াছেন। মহতের পর অহঙ্কার,—অধ্যবসায়ের পর অভিমান; অভিমানই অহঙ্কারের লক্ষণ। "একোঽহং বহুঃ স্যাম্" এই বাক্যে শ্রুতি মহেশ্বরের সৃষ্টি-অভিমানের প্রতি বিশদ নির্দেশ করিয়াছেন। অতএব সৃষ্টির তিনটী মুহূর্ত—পাশ্চাত্য দর্শনের ভাষায় যাহাকে moments বলে।

প্রথম মুহূর্তে পরব্রহ্ম মায়ার উপহিত হইয়া মহেশ্বর হন। দ্বিতীয় মুহূর্তে মহেশ্বর মহত্তত্ত্ব উপাধি সংযুক্ত হইয়া ঈক্ষা বা অধ্যবসায় করেন। তখন তাঁহার নাম হয় হিরণ্যগর্ভ। এবং তৃতীয় মুহূর্তে তিনি অহঙ্কার সংযুক্ত হইয়া "বহুস্যাম্" এই অভিমান স্বীকার করেন। তখন তাঁহার নাম হয় বিরাট্। অতঃপর যথাক্রমে আকাশ প্রভৃতি পঞ্চ সূক্ষ্ম ভূতের উৎপত্তি হয়।

পৈঙ্গল উপনিষদ্ প্রকারান্তরে এই তত্ত্বের উপদেশ করিয়াছেন। মায়াকে তিনি আবরণ শক্তি বলিয়াছেন এবং মহত্তত্ত্বকে বিক্ষেপশক্তি ও অহঙ্কারতত্ত্বকে স্থূলশক্তি বলিয়াছেন। মহত্তত্ত্বাধিষ্ঠিত হিরণ্যগর্ভে রজোগুণ প্রবল এবং অহঙ্কার তত্ত্বাধিষ্ঠিত বিরাটপুরুষে তমোগুণ প্রবল।

ইহারা আমাদের আলোচ্য সপ্ততত্ত্ব ভিন্ন আর কিছুই নহে। প্রথমতঃ ক্ষিতি; তাহার পরে, পর পর জল, তেজঃ, বায়ু, আকাশ, অহঙ্কার, ও মহত্তত্ত্ব।

এ বিষয় আমি আমার 'সাংখ্য পরিচয়' গ্রন্থের 'সপ্ত প্রকৃতি-বিকৃতি' অধ্যায়ে বিশদ করিবার চেষ্টা করিয়াছি।

পৈঙ্গল উপনিষদ্ যে ভাবে প্রলয়ের ক্রম নির্দেশ করিয়াছেন, তাহাতে মনে হয় যে, তিনিও এই সপ্ত তত্ত্বের পক্ষপাতী।

সর্বাণি ভৌতিকানি কারণে ভূতপঞ্চকে সংযোজ্য ভূমিং জলে জলং বহ্নৌ বহ্নিং বায়ৌ বায়ুমাকাশে চাকাশমহঙ্কারে চাহঙ্কারং মহতি মহদ্ অব্যক্তেঽব্যক্তং পুরুষে ক্রমেণ বিলীয়তে।—প্রথম অধ্যায়।

ঈশাধিষ্ঠিতাবরণশক্তিতো রজোদ্রিক্তা মহদাখ্যা বিক্ষেপশক্তিরাসীৎ। তৎপ্রতিবিম্বিতং যত্তদ্ধিরণ্যগর্ভচৈতন্যমাসীৎ। স মহত্তত্ত্বাভিমানী স্পষ্টাস্পষ্টবপুর্ভবতি। হিরণ্যগর্ভাধিষ্ঠিত-বিক্ষেপশক্তিতস্তমোদ্রিক্তাহঙ্কারাভিধা স্থূলশক্তিরাসীৎ। তৎপ্রতিবিম্বিতং যত্তদ্বিরাট্‌চৈতন্য-মাসীৎ। স তদভিমানী স্পষ্ট-বপুঃসর্ব স্থূলপালকো বিষ্ণুঃ প্রধানপুরুষো ভবতি। তস্মাদাত্মন আকাশসম্ভূতঃ। আকাশাদ্বায়ুঃ। বায়োরগ্নিঃ। অগ্নেরাপঃ। অদ্ভ্যঃ পৃথিবী।—পৈঙ্গল, ১ম অধ্যায়।

"ঈশ্বরাধিষ্ঠিত আবরণশক্তি হইতে রজোদ্রিক্ত মহদাখ্য বিক্ষেপশক্তি আবির্ভূত হয়। তাহাতে প্রতিবিম্বিত চৈতন্য হিরণ্যগর্ভ। তিনি মহত্তত্ত্বাভিমানী স্পষ্ট অথচ অস্পষ্টবপু। হিরণ্যগর্ভাধিষ্ঠিত বিক্ষেপ শক্তি হইতে তমোদ্রিক্ত অহংকারাখ্য স্থূলশক্তি আবির্ভূত হয়। তাহাতে প্রতিবিম্বিত চৈতন্য বিরাট্‌। তদভিমানী সর্ব স্থূলপালক প্রধান পুরুষ বিষ্ণু স্পষ্ট-বপু। সেই পরমাত্মা হইতে আকাশ আবির্ভূত হয়, আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে অগ্নি, অগ্নি হইতে অপ্‌ এবং অপ্‌ হইতে পৃথিবী উৎপন্ন হয়।"

ইহারা তন্মাত্র বা সূক্ষ্মভূত।

এই পঞ্চভূতের আমরা উপনিষদের অন্যত্রও উল্লেখ পাই :—

আকাশোহবা এষ দেবো বায়ু রগ্নিঃ আপঃ পৃথিবী—প্রশ্ন, ২।২

পৃথিব্যাপস্তেজোবায়ুরাকাশম্‌—আত্মা, ২

পৃথিবীময় আপোময়ো বায়ুময় আকাশময়ঃ তেজোময়ঃ—বৃহ, ৪।৪।৫

এতস্মাৎ জায়তে প্রাণো মনঃ সর্বেন্দ্রিয়াণি চ। খং বায়ুর্জ্যোতিরাপঃ পৃথিবী বিশ্বস্য ধারিণী—মুণ্ডক, ২।১।৩

'তাঁহা হইতে প্রাণ, মন, সমস্ত ইন্দ্রিয় এবং পঞ্চ ভূত অর্থাৎ আকাশ, বায়ু, তেজঃ, অপ্‌ ও বিশ্বের ধারিণী পৃথিবী আবির্ভূত হয়।'

স প্রাণমসৃজত প্রাণাৎ শ্রদ্ধাং খং বায়ু র্জ্যোতিরাপঃ পৃথিবীন্দ্রিয়ং মনঃ—প্রশ্ন, ৬।৪

'তিনি প্রাণ সৃষ্ট করিলেন, প্রাণ হইতে শ্রদ্ধা, আকাশ, বায়ু, অগ্নি, অপ্‌, পৃথিবী, ইন্দ্রিয়, মন'। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্‌ও পঞ্চভূতের উল্লেখ করিয়াছেন :—

পৃথ্যাপ্‌তেজোঽনিলখে সমুত্থিতে পঞ্চাত্মকে যোগগুণে প্রবৃত্তে—২।১২

তেনেশিতং কর্ম বিবর্ততে হ পৃথ্যাপ্‌তেজোনিলখানি চিন্ত্যং—৬।২

মৈত্রায়ণী উপনিষদ্‌ বলিয়াছেন যে, ব্রহ্মরূপ বৃক্ষের শাখা—আকাশ, বায়ু, অগ্নি, উদক ও ভূমি :—

ঊর্ধ্বমূলং ত্রিপাৎ ব্রহ্ম শাখা আকাশবায়্বগ্ন্যুদকভূম্যাদয় একঃ অশ্বত্থনাম—৬।৪

ঐতরেয় উপনিষদেও এই পঞ্চভূতের স্পষ্ট উল্লেখ আছে।

পঞ্চমহাভূতানি পৃথিবী বায়ুরাকাশাপোজ্যোতীংষি—ঐত, ৫।৩

বৃহদারণ্যকেও কয়েক স্থলে পৃথিবী, অপ, অগ্নিঃ, বায়ুঃ ও আকাশ—এই পঞ্চভূতের, উল্লেখ দৃষ্ট হয়। *

এই পঞ্চ ভূতের গুণ যথাক্রমে আকাশের শব্দ, বায়ুর স্পর্শ, তেজের রূপ, অপের রস এবং ক্ষিতির গন্ধ। অতএব তাহারা গুণময়। ব্রহ্ম কিন্তু নির্গুণ। সেইজন্য কঠ উপনিষদ্ তাঁহার পরিচয়ে বলিয়াছেন :—

অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ং
তথারসং নিত্যমগন্ধবচ্চ।—৩।১৫

এই পঞ্চভূত অপঞ্চীকৃত সূক্ষ্মভূত বা তন্মাত্র পঞ্চীকৃত হইলে সূক্ষ্মভূত স্থূলভূতে পরিণত হয়। সূক্ষ্মভূত বা তন্মাত্র এবং স্থূল ভূতের প্রভেদ উপনিষদ্ অনেক স্থলে নির্দেশ করিয়াছেন।

পঞ্চতন্মাত্রা ভূতশব্দেন উচ্যন্তে অথ পঞ্চ মহাভূতানি ভূতশব্দেন উচ্যন্তে—মৈত্র, ৩।২

ভূতানি পঞ্চ তন্মাত্রানি পঞ্চমহাভূতানি—মহোপনিষদ্, ১

তন্মাত্রাণি সদন্তাঃ মহাভূতানি প্রবাসাঃ—প্রাণাগ্নিহোত্র, ৪

এই সূক্ষ্মভূত ও স্থূলভূতের প্রভেদ প্রশ্ন উপনিষদ্ বিস্পষ্টভাবে উল্লেখ করিয়াছেন :—

পৃথিবী চ পৃথিবীমাত্রা চ, আপশ্চ আপোমাত্রা চ, তেজশ্চ তেজোমাত্রা চ, বায়ুশ্চ বায়ুমাত্রা চ, আকাশশ্চ আকাশমাত্রা চ—প্রশ্ন, ৭।৮

সূক্ষ্মভূত বা তন্মাত্র কিরূপে পঞ্চীকৃত হইয়া স্থূলভূত উৎপন্ন করে, তাহার বিবরণ আমরা পৈঙ্গল উপনিষদ্ হইতে প্রাপ্ত হই :—

তানি পঞ্চতন্মাত্রাণি ত্রিগুণানি ভবন্তি। স্রষ্টুকামো জগদ্যোনিস্তমোগুণমধিষ্ঠায় সূক্ষ্ম-তন্মাত্রাণি ভূতানি স্থূলী কর্তুং সোঽকাময়ত। সৃষ্টেঃ পরিমিতানি ভূতান্যেকমেকং দ্বিধা বিধায় পুনশ্চতুর্ধা কৃত্বা স্বস্বেতরদ্বিতীয়াংশৈঃ পঞ্চধা সংযোজ্য পঞ্চীকৃতভূতৈরনন্তকোটি-ব্রহ্মাণ্ডানি তৎ-তৎ-অণ্ডোচিতচতুর্দশ ভুবনানি তৎ-তৎ-ভুবনোচিত গোলোক স্থূল শরীরাণি অসৃজৎ।

অর্থাৎ, ঐ যে পঞ্চ তন্মাত্র বা সূক্ষ্মভূত—উহারা প্রত্যেকে সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই ত্রিগুণান্বিত। মহেশ্বর সৃষ্টিকাম হইয়া তমোগুণ আশ্রয় করিয়া সূক্ষ্ম তন্মাত্রকে স্থূল করিতে

* এ প্রসঙ্গে বৃহদারণ্যক, ২।১।১৫-৮, ২।৫।১-৪, এবং ৩।৭।৩-৫, ৭ ও ১২ মন্ত্র দ্রষ্টব্য।

ইচ্ছা করিলেন। তিনি সৃষ্টির পরিমিত সূক্ষ্ম ভূত সকলের প্রত্যেককে প্রথমতঃ দ্বিধা বিভক্ত করিলেন। পরে সেই দ্বিধা বিভক্ত একাংশ এবং অপর চারি ভূতের প্রত্যেকের অষ্টমাংশ সংযোজিত করিয়া পঞ্চীকৃত বা স্থূলভূত সৃষ্টি করিলেন এবং তদ্দ্বারা অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড এবং ব্রহ্মাণ্ডান্তর্গত চতুর্দশ লোক এবং প্রত্যেক লোকের উপযোগী গোলক ও স্থূল শরীরাদি নির্মাণ করিলেন।

শ্রীশঙ্করাচার্যের নামে প্রচলিত 'পঞ্চীকরণ' গ্রন্থে পঞ্চীকরণের কথা এই ভাবে বিবৃত হইয়াছে—

মহাভূতানাম্ একৈকং দ্বিধা বিভজ্য চতুর্ধা কৃত্বা সার্ধভাগং বিহায়, ইতরেষু পঞ্চধা পঞ্চীকৃতেষু পঞ্চীকরণং ভবতি।

ইহার প্রতিধ্বনি করিয়া পঞ্চদশীকার বিদ্যারণ্য-স্বামী বলিয়াছেন—

দ্বিধা বিধায় চৈকৈকং চতুর্ধা প্রথমং পুনঃ।
স্বস্বেতর দ্বিতীয়াংশৈঃ যোজনাৎ পঞ্চ পঞ্চতে ॥—১।২৭

পঞ্চকরণ-বার্তিকে সুরেশ্বরাচার্য বিষয়টি আর একটু বিশদ করিয়াছেন—

পৃথিব্যাদীনি ভূতানি প্রত্যেকং বিভজেদ্ দ্বিধা।
একৈকং ভাগমাদায় চতুর্ধা বিভজেৎ পুনঃ।
একৈকং ভাগম্ একস্মিন্ ভূতে সংবেশয়েৎ ক্রমাৎ।
ততশ্চাকাশভূতস্য ভাগাঃ পঞ্চ ভবন্তি হি॥
বায়্বাদি ভাগাশ্চত্বারো বায়্বাদিষ্বেব মাদিশেৎ।
পঞ্চীকরণম্ এতৎ স্যাৎ ইত্যাহ তত্ত্ববেদিনঃ॥

অতএব এ মতে পঞ্চীকৃত (গৌণ) ভূতসৃষ্টি এইরূপ দাঁড়াইল। গৌণ আকাশ = ১/২ মুখ্য আকাশ + ১/৮ মুখ্যবায়ু + ১/৮ মুখ্য অগ্নি + ১/৮ মুখ্য অপ্ + ১/৮ মুখ্য ক্ষিতি। গৌণ বায়ু = ১/২ মুখ্য বায়ু + অন্য ৪ মুখ্য মহাভূতের ১/৮ করিয়া অংশ। গৌণ অগ্নি = ১/২ মুখ্য অগ্নি + অন্য ৪ মুখ্য মহাভূতের ১/৮ করিয়া অংশ। গৌণ জল = ১/২ মুখ্য জল + অন্য ৪ মুখ্য মহাভূতের ১/৮ করিয়া অংশ এবং গৌণ ক্ষিতি = ১/২ মুখ্য ক্ষিতি + অন্য ৪ মুখ্য মহাভূতের ১/৮ করিয়া অংশ।

অতএব দেখা যাইতেছে, প্রত্যেক স্থূল ভূতে অপর চারি ভূতের অংশ

সংমিশ্রিত আছে। তথাপি বিশিষ্টত্ব লক্ষ্য করিয়া স্থূল আকাশ প্রভৃতিকে আকাশাদি নামেই অভিহিত করা হয়। এ সম্পর্কে ব্রহ্মসূত্র এই :—

বৈশেষ্যাৎ তু তদ্বাদঃ তদ্বাদঃ—২।৪।২২

বিশেষ্যাৎ ভাবো বৈশেষ্যং ভূয়স্ত্বম্ ইতি যাবৎ—শঙ্করভাষ্য

অর্থাৎ, স্থূল আকাশে অন্য চারি ভূতের উপস্থিতি সত্ত্বেও আকাশের ভাগ অধিক বলিয়া স্থূল আকাশকে আকাশ বলা হয়।

আমরা পূর্ব অধ্যায়ে ছান্দোগ্য উপনিষদের ত্রিবৃৎ-করণের উল্লেখ করিয়াছি। সেখানে ঋষি তেজঃ, অপ্ ও অন্ন—এই তিনের উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন :—

তদ্ ঐক্ষত বহু স্যাং প্রজায়েয় ইতি। তৎ তেজঃ অসৃজত। তৎ তেজ ঐক্ষত বহু স্যাং প্রজায়েয় ইতি তদ্ অপঃ অসৃজত। তা আপ ঐক্ষন্ত বহ্ব্যঃ স্যাং প্রজায়েয় ইতি—তা অন্নম্ অসৃজন্ত। ×× সেয়ং দেবতা ঐক্ষত হন্তাহম্ ইমাঃ তিস্রো দেবতাঃ অনেন জীবেন আত্মনা অনুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরবাণি ইতি তাসাং ত্রিবৃতম্ একৈকাং করবাণি ইতি ×× তাসাং ত্রিবৃতং ত্রিবৃতং একৈকাম্ অকরোৎ—ছান্দোগ্য ৬।২-৩

অর্থাৎ তেজঃ অপ্ অন্ন প্রত্যেকে ত্রিবৃৎ হইল। তেজঃ অপ্ অন্ন-অর্থে আমরা ত্রিগুণ বুঝিয়াছি। যদি এই তিনের দ্বারা ক্ষিতি অপ্ ও তেজঃ—এই তিন সূক্ষ্ম ভূত লক্ষিত হইয়া থাকে, তবে এ ত্রিবৃৎ—কারণ পঞ্চীকরণেরই নামান্তর। * কেবল ঋষি এখানে পঞ্চভূতের উল্লেখ না করিয়া তিনটি মাত্র ভূতের উল্লেখ করিয়াছেন।

উপনিষদের অন্যত্রও তিনটি মাত্র ভূতের উল্লেখ আছে—যেমন বৃহদারণ্যক, ১/২/২—

তদ্ যদ্ অপাং শরঃ (সারাংশঃ) আসীৎ, তৎ সমহন্যত (সংঘাতম্ আপদ্যত)। সা পৃথিবী অভবৎ। তস্যাম্ অশ্রাম্যৎ (শ্রম যুক্তে বভূব)। তস্য শ্রান্তস্য তপ্তস্য তেজোরসঃ (তেজ এব রসঃ) নিরবর্তত অগ্নিঃ।

এখানে ক্ষিতি, অপ্ ও তেজঃ—মাত্র এই তিন ভূতের গণনা হইল—যেমন প্রসিদ্ধ বৈদিক মন্ত্রে—'আপো জ্যোতিঃ রসোঽমৃতম্।'

---

* অধ্যাপক ডয়সন এই ত্রিবৃৎ-করণ এই ভাবেই বুঝিয়াছেন—He alloyed each of them with constituent parts of the other three.—Philosophy of the Upanisads, p 192.

সে যাহা হউক, যে জগতের সহিত আমরা পরিচিত তাহা ঐ পঞ্চীকৃত পঞ্চভূতের দ্বারাই গঠিত। সেই জন্য তাহার নাম 'প্রপঞ্চ'।

এই পঞ্চভূতের স্বরূপ কি ?

অনেকে ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ, মরুৎ ও ব্যোম+এই পঞ্চ ভূতের+ক্ষিতি—অর্থে মাটি (Earth) বুঝেন। তাঁহাদের নিকট অপ্ এর অর্থ জল (water), তেজের অর্থ অগ্নি (fire), মরুৎ এর অর্থ বায়ু (air), এবং ব্যোম এর অর্থ শূন্য—(vacuum)। শাস্ত্রীয় ক্ষিতি, অপ্ প্রভৃতির যদি এই অর্থ হয় তবে এ মত সম্পূর্ণ অবৈজ্ঞানিক। আমরা পাশ্চাত্য বিজ্ঞানে জানিয়াছি যে মাটি, জল, বায়ু কেহই মূল ভূত (Element) নয়, ইহারা সকলেই যৌগিক পদার্থ (Compounds)। অতএব জগতের মূল উপাদান নির্ধারণে তাহাদের প্রসঙ্গই উঠে না।

বাস্তবিক কিন্তু, ক্ষিতি, অপ্ প্রভৃতি পঞ্চভূতের ঐ অর্থ নহে। গর্ভোপনিষদ্ বলিয়াছেন :—তত্র যৎ কঠিনম্ সা ক্ষিতি, যৎ দ্রবম্ তদ্ আপ, যং উষ্ণং তৎ তেজঃ ইত্যাদি। অর্থাৎ যাহা কিছু কঠিন (solid) তাহাই ক্ষিতি, যাহা দ্রব (liquid) তাহাই অপ্ এবং যাহা উষ্ণ (gaseous) তাহাই তেজ।

সকলেই জানেন পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের মতে ম্যাটার (matter-এর) তিনটি অবস্থা বা states—solid, liquid ও gaseous—কঠিন, দ্রব ও বাষ্পীয়। দেখা যায় একই পদার্থ অবস্থা ভেদে কখনও কঠিন, কখনও দ্রব, কখনও বাষ্পীয় আকার ধারণ করে—যেমন জল বরফের অবস্থায় কঠিন (solid), তরল অবস্থায় দ্রব (liquid) এবং বাষ্পের (steam-এর) অবস্থায় বাষ্পীয় (gaseous)। এইরূপ গন্ধক—কঠিন, দ্রব ও বাষ্পীয় এই তিন আকারই ধারণ করিতে পারে।* একই পদার্থের ঐ অবস্থার তারতম্য তাপের তারতম্য সাপেক্ষ। এমন কি, অধুনা বিজ্ঞানশালায় হাইড্রোজেনের মত গ্যাসকেও তরল ও কঠিন অবস্থায় পরিণত করা হইয়াছে। ঐরূপ করিবার প্রণালী আর কিছুই নয়—কেবল

* এ সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক Dolbear তাঁহার Matter Ether, & Motion গ্রন্থে এইরূপ লিখিয়াছেন—It will be shown how all substances may assume either of these condition (solid, liquid or gaseous), in as much as it is temperature that determine whether a given substance be solid, liquid or gaseous. p. 5.

কৌশলে হাইড্রোজেনের তাপ হরণ করা। অতএব আর্য ঋষিরা গ্যাসকে যে 'তেজঃ' আখ্যা দিয়াছেন তাহা অসঙ্গত নয়।

তবেই দেখা গেল শাস্ত্রীয় ক্ষিতি, অপ্ ও তেজঃ—পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের solid, liquid ও gaseous ভিন্ন আর কিছুই নহে।

কিন্তু মরুৎ ও ব্যোম এই দুইটি কি?

পাশ্চাত্য বিজ্ঞান অনেক দিন পর্যন্ত জড় বিজ্ঞানের solid, liquid and gaseous এই তিন অবস্থার অতিরিক্ত অবস্থা মানিতেন না। ক্রমশঃ তাঁহারা ইথার (Ether) নামক একটি পদার্থ মানিতে বাধ্য হইলেন। প্রথম প্রথম তাঁহারা ইথারকে Hypothetical Ether বলিতেন। কারণ, ইথারের মত কোন একটা কিছু না মানিলে অতি দূরস্থ সূর্য হইতে পৃথিবীতে আলোক সঞ্চরণ, বা শূন্যের মধ্য দিয়া তাড়িতের গমনাগমন সিদ্ধ করা যায় না। কিন্তু ক্রমশঃ তাঁহারা ইথারকে একটি সিদ্ধ পদার্থ বলিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন—যদিও তাহার সংস্থান ও গঠন সম্বন্ধে বহু বাগ্‌বিতর্ক চলিতে লাগিল। *

কিন্তু ইথার যে ম্যাটার, উহা যে বস্তুতঃ জড়ের চতুর্থ অবস্থামাত্র—তাহা প্রথমতঃ তাঁহারা ধারণা করিতে পারিলেন না। কিন্তু বিজ্ঞানচর্চার উন্নতির সহিত বৈজ্ঞানিকেরা ক্রমশঃ বুঝিতে পারিলেন যে কঠিন, দ্রব ও বাষ্পীয় অবস্থার উপরেও জড়ের আর একটি অবস্থা এবং সেই অবস্থাই ইথার—ঋষিদিগের মরুৎ। সেইজন্য লর্ড কেল্‌ভিন্ প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকেরা এখন জড়ের গুরু (ponderable) ও অগুরু (imponderable) এই দ্বিবিধ অবস্থার স্বীকার করিতেছেন। Solid, liquid ও gaseous ইহাদিগের গুরুত্ব বা ভার (weight) আছে, তাহারা ponderable matter এবং Ether ইহার ভার নাই, ইহা imponderable matter. *

* Quite within recent memory the ether was still referred to as a hypothetical medium in which light travelled. For the last fifty years or more, Science dropped the use of the adjective, but framed various conjectures concerning the constitution of the Ether.

* Lord Kelvin (August, 1901) British Association Meeting-এ এইরূপ বলিলেন "He had now become convinced that there did exist matter which

অতএব দেখা যাইতেছে যে আমাদের মরুৎ কাল্পনিক পদার্থ নহে, ইহা জড়ের ইথরীয় অবস্থা (Etheric State)

প্রথমতঃ বৈজ্ঞানিকেরা মনে করিতেন যে ইথার একটি নির্বিশেষ (homogeneous) পদার্থ। কিন্তু এখন ইহা প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, যাহাকে বিজ্ঞান ইথার বলেন, তাহা সূক্ষ্মতর পদার্থের 'সংহননে' রচিত। জড়ের ঐ সূক্ষ্মতর অবস্থাকে কেহ কেহ 'Ether-on' বা 'Super-Ether' নাম দিয়াছেন।

'The Russian Chemist (Mendellif) frankly treats the electron as an atom of ether, regarding either as in the nature of an ultra-rarified gas, *distinctly molecular in its composition*, and exhibiting the optical characteristics, with which we are familiar by reason of molecular-vibrations.

মার্কিন মুলুকের স্বনামধন্য বৈজ্ঞানিক ডাঃ ফেসেন্‌ডেনের মুখেও ঐরূপ কথাই শুনা গিয়াছে—

Dr R. A. Fessenden, one of the most eminent American physicists shews that the so called ether is a composite body, having a structure with elastic properties."

ইথার, যে ইথারোনের বিকার এই ইথারোনই আমাদের ব্যোম।*

ঐ Etheron ম্যাটারের ether অপেক্ষাও সূক্ষ্মতর অবস্থা। ঐ সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক প্রবর হিসেন্‌বর্গের (Heisenberg) উক্তি সবিশেষ প্রণিধানযোগ্য। সংক্ষেপে তাঁহার সিদ্ধান্ত এই—

The result of Heisenberg's work is fully confirmed by the new 'Wave-mechanics or Quantum-mechanics' as developed by Schrodinger de Broglie

---

was not subject to Newton's Law of Gravitation. This matter was not molar, as ponderable matter was, and was what was generally called Ether.

We distinguish ponderable matter which has weight and imponderable matter which cannot be weighed. This matter is generally termed ether. * * The Ether fills the space of the Universe, certainly as far as the most distant visible stars.—Dr. Landor's Human Physiology.

* Echoes of Science in the Globe Newspaper of December 7th, 1901.

* এ সম্পর্কে 'ব্রহ্মবিদ্যা' নামক মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত আমার 'বেদান্ত ও বিজ্ঞান' নামক প্রবন্ধে সবিশেষ আলোচনা আছে। এখানে মাত্র ইঙ্গিত করিলাম।

and others, which based on waves or ripples, not in the ether, (the seat of light-waves etc) but in a *sub ether* in which are vibrations one million times faster than those of light. * * * the inter-action of these waves in the *sub-ether* causes beats or splashes in the familiar ether of science and these beats are the electrons and atoms of matter, which affect our gross consciousness, the waves of the sub-ether being too rapid to affect the physical consciousness. *

অতএব দেখা যাইতেছে যে, বস্তুতঃ জড়ের তিন অবস্থা নহে ; পাঁচ অবস্থা —solid, liquid, gaseous, Ether ও Ether-on। ইহাই আমাদিগের ক্ষিতি, অপ্‌, তেজঃ, মরুৎ, ব্যোম।

স্থূল ভূতের উপাদানে কিরূপে লোক সৃষ্টি ও দেহ সৃষ্টি হয়, পরবর্তী অধ্যায়ে আমরা তাহার আলোচনা করিব।

হীরেন্দ্রনাথ দত্ত

* The Nature of the Physical World, pp, 211 and 215.

জীবনের পটভূমি

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

[বছর খানেক পার হ'য়ে গেছে।

পাবনার অখিলেশ বাবুর বাড়ীর বাহিরের ঘর। ঘরের চেহারার কোন রদ-বদল হয় নি, কেবল দেয়ালের সেই কালীমূর্ত্তিসহ ক্যালেণ্ডারের বদলে এ বছরের নতুন ভারতবর্ষের ম্যাপ-ওয়ালা ক্যালেণ্ডার টাঙানো হয়েছে, টেবিলটা কিছু অগোছালো মনে হচ্ছে, আর বিকালের স্বল্প আলোকে ঘরের আবহটা কিছু বিষণ্ণ।

অখিলেশ বাবু চেয়ারে ব'সে নাকের ডগায় চশমা এঁটে একখানা লম্বা লাল খাতায় চোখ বোলাচ্ছিলেন। গায়ে ছিল তাঁর টুইলের সাদা সার্ট। তাঁর বসবার ভঙ্গী বেশ ক্লান্ত, শরীরও যেন কিছুটা ভেঙে পড়েছে। কয়দিন ক্ষৌরকার্য্য না করায় মুখের চেহারাও কেমন যেন শোকাচ্ছন্ন।

কিছুক্ষণ নীরবে চোখ বুলিয়ে টেবিল থেকে একটা পেন্সিল তুলে নিয়ে খাতার একটা জায়গায় দাগ দিলেন তিনি। তারপর খাতা বন্ধ ক'রে টেবিলে রেখে একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন এবং সঙ্গে সঙ্গেই ডাকলেন :]

অখিলেশ গুরুচরণ।

(বাড়ীর ভেতর থেকে গুরুচরণের সাড়া পাওয়া গেল—'যাই'।)

(অখিলেশ বাবু চোখ বুঁজে ব'সে রইলেন। কিন্তু কয়েক মুহূর্ত্ত পরেই কি মনে পড়ায় চেয়ার থেকে পেছন ফিরে ভারতবর্ষের ম্যাপ আঁকা সেই ক্যালেণ্ডারটার তারিখগুলো হাত দিয়ে গুণতে লাগলেন। ক্যালেণ্ডারের গায়ে দেখা গেল, সময়টা মার্চ্চ মাসে, কোন সাল তা পড়া যায় না।

কিছুক্ষণ পর ভেতরের দরজার পরদা সরিয়ে খর্ব্বাকৃতির একজন বুড়ো মানুষ ঘরে ঢুকল। বোঝা গেল, সেই গুরুচরণ,—এ বাসার চাকর। তার পায়ের শব্দে মুখ ফিরিয়ে :)

অখিলেশ কে, গুরুচরণ ?···হ্যাঁ ছাখ, আজও রাতে আর কিছু খাব না আমি, বুঝলি ?

গুরুচরণ (বেশ পুরানো লোকের মত দরদের সুরে :) না খাইলে শরীর টিকবি ক্যামন কইরা কন তো। না হয় কয়খান লুচিই কইরা দেই। (সে যাবার উদ্যোগ করল।)

অখিলেশ (আত্মকরুণার ভঙ্গীতে হেসে :) না রে থাক। খেয়ে কি হবে, হজম হয় না যে। বুড়ো বয়সে যত কম খাওয়া যায় ততই ভাল।

(গুরুচরণ যাবার কোন লক্ষণ দেখাল না।)

অখিলেশ (তার মনের কথাটা বুঝতে পেরে, হেসে) আচ্ছা যা, না হয় দুধ-খই খাব'খন। তোর জ্বালায় একদিন পেট ফেঁপে মরব দেখছি।

গুরুচরণ (আন্তরিক সুরে) থাক, আর অমঙ্গল ডাকার কাম নাই। (বলে সে সুইচ টিপে আলো জ্বেলে দিয়ে বেরিয়ে গেল।)

(অখিলেশ বাবু পুনরায় চোখ বুজলেন।)

(কয়েক মিনিট পর বাহিরের দরজা দিয়ে ফতুয়া গায়ে চাদর কাঁধে নিকুঞ্জবিহারী এসে ঘরে ঢুকলেন।

তাঁর পায়ের শব্দে চোখ চেয়ে অখিলেশবাবু হাসলেন। তারপর তিনি এগিয়ে এসে ওপাশের চেয়ারে বসলে—)

অখিলেশ তোমার জন্যই অপেক্ষা করছিলাম। একা একা সময়ও কাটে না ; এদিকে আবার কোথায়ো নড়তে চড়তেও ভাল লাগে না। (করুণভাবে হেসে) বয়স বেশী হ'লে মরে যাওয়াই বাপু সবচেয়ে নিরাপদ।

নিকুঞ্জ বেশী বয়সের তো কথা নয়, কথা হচ্ছে শরীর খারাপ দিয়ে। বয়সে তো আমি প্রায় বছর দশেকের বড় হব তোমার, আমার তা হ'লে মরা উচিত ছিল দশ বছর আগেই। সে কিছু কথা নয়। মনকে একটু চাঙ্গা ক'রে তোল। এ রকম মন গুমরে থাকলে শরীর কখনো ভাল থাকতে পারে মানুষের ? (একটু থেমে) বুঝি, ছেলের জন্যে যে তোমার কতটা দুশ্চিন্তা, নিজের ছেলে-

পিলে না থাকলেও সেটা আমি বুঝি। কিন্তু উপায় কি বল ? সবই তো বরাত।

অখিলেশ বুঝি তো ভাই আমিও সব। কিন্তু মনে বুঝ মানে কই ?...আজ এক বছরের বেশী হ'ল অনিরুদ্ধকে চোখে দেখি নি আমি। তাকে ছাড়া যে কেমন করে এই একটা বছর কাটিয়েছি ভগবান জানেন। (একটু থেমে, যেন নিজকে শোনাচ্ছেন, এই রকম সুরে) লোকে ভাখে, একটা বুড়ো ব'সে ব'সে দিনরাত যখের মত টাকা আগলাচ্ছে। (সহসা অন্তরের বেদনায় বিদ্ধ হ'য়ে) কিন্তু এ যে কত ব্যর্থ, কত বেদনাময়, অনিরুদ্ধ ছাড়া আমার সমস্ত জীবনই যে কত নিরর্থক তা কেবল আমিই বুঝি।

(নিকুঞ্জবিহারী কোনো উত্তর দিলেন না, মাথা নিচু ক'রে ব'সে রইলেন।)

অখিলেশ (অনেকটা সামলে নিয়ে :) এসব বোঝে না ব'লেই লোকে আমাকে বলে অদ্ভুত, বুঝলে নিকুঞ্জ।

নিকুঞ্জ (ঈষৎ সান্ত্বনার সুরে, প্রসঙ্গান্তরে যাবার জন্যে) পাড়ার ছেলের দল কিন্তু তোমার ওপর আজকাল খুব প্রসন্ন। ওদের কি এক যুবসংঘের নাকি সভাপতিও করেছে তোমাকে। বলে যে, অনিরুদ্ধ বাবুর বাবা, এ সম্মান ওঁরই প্রাপ্য।

অখিলেশ শুনেছি। ওরা চায় যে সুমিত্রা না কি সেই মাষ্টারনীটার সঙ্গে অনিরুদ্ধ ছাড়া পেলে তার বিয়ে দেই আমি।......বলে দিয়েছি,—প্রাণ থাকতে নয়। কিন্তু এখন ভয় হ'চ্ছে যে, অনিরুদ্ধের বাবা হ'য়ে অনেক কষ্টই যেমন সহ্য করেছি, এটাকেও হয়ত হজম করতে হবে সেইভাবেই। (তিক্ত আত্ম করুণার সঙ্গে) বাস্তবিক, আজ-কালকার ছেলেদের বাপ হওয়া যে কী সাংঘাতিক অপরাধ তা ভুক্ত-ভোগী ছাড়া কেউ কল্পনাও করতে পারবে না।.. ...কিন্তু আমি আর পারছি নে নিকুঞ্জ।

নিকুঞ্জ (আন্তরিক সহানুভূতির সঙ্গে) ওর তো ছাড়া পাবার সময় হ'য়ে এল ভাই, কটা দিন একটু ধৈর্য্য ধর।

অখিলেশ (মাথা নেড়ে) না নিকুঞ্জ, ছাড়া সে আজ না হোক দু'দিন পরেই পাবে। সেজন্য আমি এতটা ব্যস্ত হই নি। সবচেয়ে আমাকে এইটেই বেশী লাগে যে যাকে বুকের কাছে নিয়ে মানুষ করেছি সেই ছেলেকে আজ আমি বুঝতে পারি নে। কতদূর যেন স'রে গেছে সে।

নিকুঞ্জ (কথাটার সত্যতা উপলব্ধি করা সত্ত্বেও জোর ক'রে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টায়) ওসব তোমার কল্পনা অখিলেশ। ছেলে তোমার অন্য সব ছেলের চেয়ে অনেক বেশী মান্য ক'রে চলে তোমাকে।

অখিলেশ (বিষণ্ণ সুরে) সেইটেই আমার সবচেয়ে কষ্টকর হয়েছে নিকুঞ্জ। ছেলে যদি পাজী হ'ত তবে সে কুপুত্র ভেবে সান্ত্বনা পেতাম। কিন্তু সবচেয়ে ভাল হ'য়েও যদি সে আমার মনে অতৃপ্তি রেখে যায়, তবে তো কোনো সান্ত্বনাই আর থাকে না। ভাবতে হয়, আমাদের আদর্শ আর আশা-আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে এদের কোথায় যেন মস্ত বড় একটা অমিল র'য়ে গেছে, যার ফলে সমস্ত চেষ্টা সত্ত্বেও পার্থক্যটা দূর হ'তে পারছে না।

নিকুঞ্জ কালের হাওয়াটাই বদলে যাচ্ছে ভাই। ও নিয়ে আর ক্ষোভ করে লাভ কি ?

অখিলেশ (হেসে) লাভ কিছুই নেই। তবে একটা জিনিস এর দ্বারা স্পষ্ট হ'য়ে যাচ্ছে যে, বর্ত্তমান যুগের চাহিদার কাছে আমরা অপ্রয়োজনীয়, অবাঞ্ছিত। এ সত্যটা, ছেলে থাকলে বুঝতে পারতে, কী নিদারুণ কঠিন।

(নিকুঞ্জবিহারী কিছুক্ষণ চুপ ক'রে রইলেন।)

অখিলেশ বাবু নিশ্বাস ফেলে আবার খাতায় মন দিলেন। তারপর কিছুক্ষণ নীরবতার ভেতর দিয়ে কাটবার পর পকেট থেকে একখানা চিঠি বের ক'রে নিকুঞ্জের হাতে দিয়ে।)

অখিলেশ অনিরুদ্ধ চিঠি দিয়েছে। আসছে বুধবারে সে দমদম থেকে ছাড়া পাবে, কিন্তু এখানে না এসে কলকাতাতেই থাকবে কয়দিন।

নিকুঞ্জ (চিঠিখানি হাতে নিয়ে করুণ বিষণ্ণ সুরে) ও।

(অখিলেশ বাবু আবার খাতায় চোখ ফেরালেন। তাঁর হাতের পেনসিলটা থরথর ক'রে কাঁপতে লাগল। খাতার ওপর আরো একটু ঝুঁকে পড়লেন তিনি।)

দ্বিতীয় অঙ্ক

দ্বিতীয় দৃশ্য

[অখিলেশ বাবুর বাড়ীর ঘটনার পর দিন পাঁচেক গত হয়েছে। আজ অনিরুদ্ধের ছাড়া পাবার কথা।

সন্ধ্যা গড়িয়ে গেছে। সুমিত্রা দেবীদের বসবার ঘরে নীল বাল্‌বের একটা স্নিগ্ধ আলো জ্বলছে। দেয়ালের গায়ে কয়খানা দেশনেতাদের নতুন ফটো আর রবীন্দ্রনাথের একটা বড় অয়েল পেনটিং ছাড়া গত এক বছরে ঘরে আর বিশেষ কোনো পরিবর্ত্তন হয় নি।

ওপাশের সোফার ওপর প্রিয়ব্রত একখানা সাময়িক পত্রের পাতা ওল্‌টাচ্ছিল। তার মুখের ভাব ঈষৎ চিন্তান্বিত, কিন্তু ঠোঁটের কোনে হাসির রেখা মিলায় নি। গায়ে আদ্দির পাঞ্জাবী।

এদিকে, অর্গানের সামনে ফিকে নীল রঙের শাড়ী পড়ে সুমিত্রা দেবী চাপা সুরে গান গাইছিলেন]—

সুমিত্রা (গান গেয়ে)

আমার পৃথিবী আমি জানি
নতুন আলোকে সাজে নিত্য ,
রাত্রির ঘটে পরাজয়।
আঁধার পথের যত গ্লানি
কাটায়ে প্রভাতে জাগে চিত্ত,
যাত্রীর নব-বরাভয়।
জাগো, আঁধার পথের শেষ যাত্রী,
দেখ, হ'ল শেষ ঘন দুখ রাত্রি।

পৃথিবী আলোতে আলোময়।
যাত্রার হয়েছে সময়॥

(গান শেষ হ'লে সুমিত্রা দেবী ধীরে ধীরে উঠে এসে একখানা চেয়ারে ঈষৎ ম্লানভাবে বসলেন। তাঁকে অনেকটা কৃশ দেখাচ্ছিল। প্রিয়ব্রত একবার মুখ তুলে তাঁর দিকে চেয়ে পুনরায় পাতা ওল্‌টাতে লাগল।

কিছুক্ষণ দু' জনেই চুপচাপ। এই নীরবতা দূরত্বসূচক নয়, নৈকট্যপ্রসূত।

অবশেষে এক সময় প্রিয়ব্রত পত্রিকা বন্ধ ক'রে একটা সিগারেট ধরাল। দেশ্‌লাই জ্বালবার শব্দে সুমিত্রা দেবী তার দিকে চাইলেন। হাত ঘড়িতে সময় দেখে—

প্রিয়ব্রত সাড়ে সাতটা। আজ আর অনিরুদ্ধ এল না তাহ'লে।

সুমিত্রা (মৃদু কণ্ঠে) বিকেলেই তো আসবার কথা ছিল। হয়ত জেল থেকে বেরিয়েই পার্টির আড্ডায় চলে গেছে আবার।

(জয়ন্তী এল। তার মুখের ভাব শান্ত। পরিধানে কালো রঙের শাড়ী। এসে একটা চেয়ারে ব'সে)

জয়ন্তী (সুমিত্রা দেবীর দিকে) গান হচ্ছিল শুনতে পেলাম। (প্রিয়ব্রতের দিকে চেয়ে) অনিরুদ্ধ বাবু এখনো আসেন নি?

প্রিয়ব্রত না; আসা তো উচিত ছিল এতক্ষণ।

জয়ন্তী (কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে, হেসে) এ ভালই হ'ল যে আমাদের মধ্যে একজন বাস্তব-অভিজ্ঞতাসম্পন্ন লোক পাওয়া গেল।...... অনিরুদ্ধ বাবু জেল থেকে কি রকম ধারণা নিয়ে আসেন সেটা লক্ষ্য করবার বিষয়, কি বলেন?

প্রিয়ব্রত (একটু হেসে) পরীক্ষাটা ভাল। তবে আপত্তি এই যে, মূল্যটা একটু বেশীই লেগে যাচ্ছে।

জয়ন্তী (সুমিত্রা দেবীর প্রতি; উঠে দাঁড়িয়ে) গান তো শোনালে। চায়ের ব্যবস্থা করেছ?

সুমিত্রা (তাড়াতাড়ি উঠে) যাচ্ছি ভাই।

জয়ন্তী (তাঁকে ধ'রে বসিয়ে দিয়ে, হেসে) আগে হ'লে চলত, এখন কনিষ্ঠ উপস্থিত থাকতে জ্যেষ্ঠ যাবে কি ক'রে? বস তুমি। তাছাড়া, (চকিতে প্রিয়ব্রতের দিকে কটাক্ষপাত ক'রে) উনি একা ব'সে থাকবেন।

সুমিত্রা (তার ইঙ্গিতটা বুঝেও অবুঝ হবার ভান ক'রে) কেন, তুমি কি মানুষ নও নাকি?

জয়ন্তী আমি? সব লোকই মানুষ না কি? বাঃ। (সে ভেতরে চ'লে গেল।)

(সুমিত্রাদেবী প্রিয়ব্রতের দিকে চাইলেন। প্রিয়ব্রতও তাঁর দিকে চাইল। তার দৃষ্টির সামনে থেকে চোখ ফিরিয়ে।)

সুমিত্রা (মৃদু কণ্ঠে) জয়ন্তী নিশ্চয়ই আমাদের ভেতর কিছু সন্দেহ করে, না?

প্রিয়ব্রত কি?...ও। (সিগারেট পায়ের নিচে চেপে) এ বিষয়ে ও তাহ'লে টিপিক্যাল মেয়েমানুষ।—একটা কিছু সন্দেহ না করতে পারলে ভাল লাগে না।

সুমিত্রা (কিছুক্ষণ নীরব থেকে, বিষণ্ণ ভাবে চোখ তুলে) অনিরুদ্ধ আজ আসবে, এতে কি তুমি সত্যিই খুশী?

প্রিয়ব্রত নিশ্চয়ই। (তারপর হঠাৎ ব্যস্তভাবে আরেকটা সিগারেট ধরিয়ে) কেন একথা জিজ্ঞাসা করছ যে?

সুমিত্রা এমনি, কেমন মনে হ'ল তাই। (বলে মেঝের দিকে চোখ নামাল)

(প্রিয়ব্রত ব'সে ব'সে সিগারেট টানতে লাগল।)

(কয়েক মিনিট এইভাবে কাটবার পর বাইরে জুতোর শব্দ পাওয়া গেল। দুজনে সেইদিকে তাকালেন।)

ষ্ট্রাইপ দেওয়া খদ্দরের কোট গায়ে অনিরুদ্ধ এসে ঘরে ঢুকল।

প্রিয়ব্রত (সিগারেট জুতোর নিচে চেপে উঠে দাঁড়িয়ে:) এই যে অনিরুদ্ধ, এত দেরি ক'রে এলে যে?

(সুমিত্রা দেবী নীরবে উঠে দাঁড়ালেন।)

(অনিরুদ্ধ তৎক্ষণাৎ কিছু না ব'লে আগে সোফার কাছে এগিয়ে এসে কোটটা খুলে তার ওপর রাখল—তার গায়ে এখন ছাই রঙের খদ্দরের সার্ট। তারপর একটা চেয়ারে ধীরভাবে বসে মুখের মলিনতায় কিছুটা ঔজ্জ্বল্য ফোটাবার চেষ্টা ক'রে,—)

অনিরুদ্ধ এই একটু দেরী হয়ে গেল। (সুমিত্রা দেবীর দিকে চেয়ে :) তারপর, তোমরা ভাল ছিলে তো ?

সুমিত্রা ছিলাম এক রকম। তোমাকে তো রীতিমত রোগা দেখাচ্ছে।

অনিরুদ্ধ অনেকে বলছিল মোটা হ'য়েছি। (ব'লে সে গম্ভীরভাবে জানালা দিয়ে বাইরে চাইল। তার ভ্রুকুঞ্চিত চোখের দিকে চেয়ে বোঝা কঠিন হলো না যে কি একটা যেন তার মনের মধ্যে কষ্ট দিচ্ছে।)

সুমিত্রা তা বলতে পারে। কিন্তু আমি দেখছি তুমি বেশ রোগাই হয়েছ।

(অনিরুদ্ধ একথার কোন জবাব দিল না।)

(ঝিয়ের হাতে চায়ের সরঞ্জাম দিয়ে জয়ন্তী এল।)

জয়ন্তী (খুশির সুরে) এই যে, আপনি এসে গেছেন দেখছি।

(অনিরুদ্ধ বিষণ্ণভাবে একটু হাসল।)

জয়ন্তী কিছু খাবার ব্যবস্থা করি, কেমন ?

অনিরুদ্ধ (তার আন্তরিকতায় গা না মেখে :) না, শুধু চা হ'লেই চলবে।

(ঝি চলে গেল)

(সকলে এক-এক কাপ চা পাবার পর)

প্রিয়ব্রত (হেসে) জয়ন্তী দেবী বলছিলেন যে এইবার তোমার আগমনে আমাদের ভেতর একজন সত্যিকার অভিজ্ঞতাসম্পন্ন কর্ম্মী পাওয়া গেল। উনি তোমার কর্ম্মিজীবনের অভিজ্ঞতা শোনবার জন্যে খুব উৎকণ্ঠিত।

অনিরুদ্ধ (না হেসে) অভিজ্ঞতা আমার যা হ'য়েছে তা এত সাধারণ যে, না বললেও চলে। আমার অভিজ্ঞতায় আর অন্য দশজনের অভিজ্ঞতায় বিশেষ কোনো পার্থক্য নেই।

জয়ন্তী তা হ'তে পারে কি করে ? অন্য দশজন লোক জিনিসটা দেখছে

বাহির থেকে। তা ছাড়া তাদের অধিকাংশই হয়ত বিরোধী স্বার্থের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। সুতরাং আন্দোলনে লিপ্ত হয়েছেন এমন একজন কর্মীর সঙ্গে তাদের পার্থক্য তো সব সময়েই থাকবে ?

অনিরুদ্ধ (তিক্ত হাসির সঙ্গে :) তা থাকবে। কিন্তু সেটা শুধু ডিগ্রীর পার্থক্য। বিরোধী স্বার্থের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হ'য়ে তাদের বিরূপতা যদি হয় এক, আন্দোলনে লিপ্ত হ'য়ে আমার বিরূপতা হয়েছে সেখানে চার গুণ বেশী। পার্থক্য শুধু এইটুকু।

প্রিয়ব্রত (সামনে ঝুঁকে ব'সে অগাধ বিস্ময়ের সুরে :) সে কি কথা !

অনিরুদ্ধ (কণ্ঠস্বরে রীতিমত জ্বালা ফুটিয়ে :) অতি সত্যি কথা কবি। এর চেয়ে অনাবিল সত্য আর পাবে না। (যেন সামান্য একটা কারণ দেখাচ্ছে এই ভঙ্গীতে) আমি জেলে গিয়েছিলাম কেন, জান ?

প্রিয়ব্রত হ্যাঁ! মজুররা মিটমাট করেছিল বলে। মানে—।

অনিরুদ্ধ (তার মুখ থেকে কথা কেড়ে নিয়ে :) মানে আর কিছুই নয়। মানে হ'চ্ছে জানোয়ারগুলো বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল।

প্রিয়ব্রত (রীতিমত আহত হ'য়ে :) ছি অনিরুদ্ধ, ও রকম হৃদয়হীন হ'য়ো না। ওরা যদি মিটমাট করেই থাকে, ভুলে গেলে চলবে না, সেও তোমারই কৌশলহীনতার জন্যেই সম্ভব হয়েছে।

জয়ন্তী (বিস্ময় কাটিয়ে উঠবার মত সুরে) তাছাড়া আপনার মত কর্মীর মুখে এ রকম ভাষা,—সত্যি কল্পনা করা যায় না।

অনিরুদ্ধ (খোলা বিদ্রূপের সুরে) কল্পনা করা সত্যিই কঠিন। কেননা ব্যাপারটা কল্পনার আওতার অনেক বাহিরে। বাস্তব ক্ষেত্রে গেলে বুঝতে পারতেন কাজের মূল্য দিয়ে যে অভিজ্ঞতা কিনতে হয় তার দাম কল্পনার চেয়ে অনেক বেশী।

(সুমিত্রা দেবী যেন আনন্দ ও দুঃখের বিপরীত দোলায় ধাক্কা খেতে লাগলেন। আনন্দ,—অনিরুদ্ধের এই প্রতিক্রিয়াশীলতার মধ্যে নিজের মুক্তি পাবার সম্ভাবনা, কেন না এরকম বিরোধী মতাবলম্বী লোককে ভাল না বাসা কারো কাছেই দোষের

মনে হবে না ; আর দুঃখ,—অনিরুদ্ধ কেন এতটা নেমে গেল, এই কারণে। তিনি সর্ব্বক্ষণ চুপ ক'রে রইলেন।)

প্রিয়ব্রত (চোখের দৃষ্টি বিষাদময় ক'রে) দেখ, অনিরুদ্ধ কল্পনার চেয়ে যে কাজ কঠিন একথা শুনতে শুনতে আমাদের এত অভ্যাস হ'য়ে গেছে যে কথাটাকে সত্য বলেই আমরা মনে ক'রে নিয়েছি। কিন্তু কথাটা সত্যিই ভুল। কল্পনার চেয়ে কাজ যে কেবল ছোট, তাই নয়, প্রকৃত কল্পনার খাদ না মিশলে কাজগুলো একেবারে নিরেট যান্ত্রিকতার সামিল হ'য়ে দাঁড়ায়। বক্তৃতা আমি দেব না। কিন্তু এ কথাটা তোমাকে স্বীকার করতেই হবে যে উপযুক্ত দৃষ্টির প্রসারতা না থাকলে কোনো কাজকেই চালনা করা যায় না।

অনিরুদ্ধ (শ্লেষের সুরে) অর্থাৎ, তুমি বলতে চাও আমার এ ব্যর্থতার জন্য দায়ী আমার দৃষ্টির সংকীর্ণতা ? (অত্যন্ত বীতশ্রদ্ধ ভাবে) খবরের কাগজটাও পড়না দেখছি।

প্রিয়ব্রত (দুঃখের হাসি হেসে) না ভাই, লজ্জার সঙ্গে স্বীকার করছি খবর আমি কিছু কিছু রাখি। বিশেষতঃ এ ব্যাপারটার সঙ্গে তুমি সংশ্লিষ্ট ছিলে বলে খুঁটিনাটি খবরও তোমাদের পার্টির ছেলেদের কাছ থেকে সংগ্রহ করেছি। তাতে যা দেখতে পেয়েছি তাতেও শ্রমিকদের চেয়ে দোষ ছিল তোমারই বেশী।

অনিরুদ্ধ (অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হ'য়ে) শোনা যাক, কারণটা কী ?

প্রিয়ব্রত (হাসবার চেষ্টা ক'রে, অন্তরঙ্গতার সুরে) তুমি যদি রাগ কর, সে কথা স্বতন্ত্র। কিন্তু মতপ্রকাশের স্বাধীনতা স্বীকার করলে আমাকে বলতেই হবে যে দোষ প্রায় সবটাই তোমার। (সংযত গাম্ভীর্য্যের সঙ্গে) তুমি জানতে যে মজুররা অশিক্ষিত ; তাদের আহার নেই, কাপড় নেই, আশ্রয় নেই ; তাদের সমাজ-বন্ধন শিথিল, নীতিজ্ঞান প্রায় শূন্যের কোঠায় ; আর অধিকাংশই নেশাখোর। এসব তুমি জানতে, কেননা একটু আগেই তুমি এদের জানোয়ার ব'লে সম্বোধন করেছ। কিন্তু তা জানা সত্ত্বেও উপযুক্ত সতর্কতা অবলম্বন করনি। তুমি ভুলে গেছ যে তাদের

সমস্ত দোষ সত্ত্বেও তারা আশ্চর্য্যরকম সরল ও বিশ্বাসপ্রবণ,—তাদের প্রতি সহানুভূতি ও মমতার সঙ্গে ব্যবহার করতে পারনি; দৃষ্টির প্রসারতার পরিচয় দাও নি।...তোমার ব্যর্থতা এসেছে এরই জন্য, এই কল্পনাহীন যান্ত্রিক কর্ম্মনিষ্ঠার জন্য।

অনিরুদ্ধ (কিছুটা চুপ ক'রে থেকে) আচ্ছা, আপাতত এই পর্য্যন্তই থাক্। কাল আবার পাবনা যেতে হবে। দিন দুই পরে না হয় এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা যাবে।

প্রিয়ব্রত (ঈষৎ দ্বিধার সঙ্গে) আসলে কি জানো অনিরুদ্ধ, এ সব ব্যাপারে আলোচনায় খুব বেশী সুফল দেয় না সব সময়ে। বিশেষত, প্রতিপক্ষ যখন যোগ্যতায় প্রায় সমান, সেসব সময়ে তো নয়ই। তাই ভয় হ'চ্ছে, পাছে আমাদের আলোচনাগুলো একটা ব্যর্থ দড়ি টানাটানি খেলায় পর্য্যবসিত না হয়।

অনিরুদ্ধ (উঠে দাঁড়িয়ে) তাতেই বা ক্ষতি কি? হারজিত হ'লেও খেলা তো!

প্রিয়ব্রত খেলা বটে, কিন্তু দড়িটা এক্ষেত্রে মনের যোগসূত্র কিনা। টানাটানি খেলায় দড়ি ছিঁড়ে যেতেই বা কতক্ষণ?

অনিরুদ্ধ (হেসে, তার পিঠে একটা ছোট চড় দিয়ে) একেবারে উপমা কালিদাসস্য। (তারপর গম্ভীর বিষণ্ণতার সঙ্গে) দড়ি যদি ছিঁড়েই যায় তাতেই বা ক্ষতি কি।

প্রিয়ব্রত (তার হাতে চাপ দিয়ে) ছিঃ, ছিঁড়বে কেন? (ঈষৎ আবেগের সঙ্গে) তুমি ছিঁড়লেও আমি আবার জোড়া দেবই। (সঙ্গে সঙ্গে হাসল।)

অনিরুদ্ধ এই তো সুবোধ বালকের কথা। (সুমিত্রাদেবীর দিকে চেয়ে) চললাম। (বলে সে ধীরে ধীরে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।)

(সুমিত্রা দেবী তাঁর দুঃখের ভাব কাটিয়ে উঠে একটু খুশিই হ'য়ে উঠেছেন এতক্ষণে। সস্মিত মুখে চুপ ক'রে ব'সে রইলেন।)

জয়ন্তী (অনিরুদ্ধর গমন পথের দিকে চেয়ে দুঃখের সঙ্গে মৃদু কণ্ঠে) কি আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন!

প্রিয়ব্রত (এতক্ষণ আবিষ্টভাবে ব'সে থাকবার পর, জয়ন্তীর কথায় সম্বিৎ ফিরে পেয়ে, একটা সিগারেট ধরিয়ে) সত্যি বড় দুঃখের কথা। যাক, (উঠে দাঁড়িয়ে, ঘড়িতে সময় দেখে) প্রায় দশটা বাজে। আমিও চলি। (সে অগ্রসর হল।)

(সুমিত্রা দেবী উঠে দাঁড়ালেন।)

ক্রমশঃ

মণীন্দ্র রায়

কবি ষ্টিফেন স্পেণ্ডার

(১)

অডেনের কল্পনার কাঠামো মোটা মজবুত হাড়ের গাঁথুনি : মজ্জায় স্তম্ভিত শক্তি। ~ স্পেণ্ডারে আবেগের পেশল তরঙ্গ।

সাম্প্রতিক জীবনযাত্রার অপরিমিত অপব্যয় সুরু হতে তাঁর কল্পনাকে বিক্ষুব্ধ করেছে। সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ আর আন্তর্জাতিক অর্থসংকটের ধাক্কায় শ্রেণীসমাজের ক্লৈব্য গোপন রইল না। শোষণ-নীতির স্বরূপ উপলব্ধি করে কবি আর পোড়ো জমির রূপান্তর ঘটানোর জন্য রাষ্ট্রের বর্ষণ-দাক্ষিণ্যের প্রত্যাশায় থাকতে পারলেন না।

কোন সান্ত্বনা নেই, নেই, নেই কোন
সেই রেখার গভীর করে কাটা সৌন্দর্যে
ইতিহাসের ছকগুলোর ওপরে যে রেখা টানা, যেখানে অত্যাচারী
দরিদ্রকে বঞ্চিত করে অনাহারে মারে।

এই রেখাকে বিলুপ্ত করার উৎসাহে স্পেণ্ডারের কল্পনা চঞ্চল। নতুন জীবনের ভিত্তি পত্তনের চেয়ে অবসিত ব্যবস্থার দ্রুত সমাধি তাঁকে বেশী আকৃষ্ট করেছে। স্পেণ্ডারের কল্পনাশক্তির বৈশিষ্ট্য তার বর্ণ বৈচিত্র্য আর গতিশীলতা। রেখাচিত্রের তীক্ষ্ণ নিস্পৃহ নিস্তরঙ্গতা নয়, মুঠো মুঠো রং দুরন্ত বাতাসে উড়ে যাওয়া। বিশ্বাসের যৌক্তিক কাঠামো প্রাসঙ্গিক হলেও, তার আবেগসমৃদ্ধ প্রতিক্রিয়াই কল্পনার জোয়ার আনে।

(২)

চীনের আত্মরক্ষার সংগ্রামে অডেন দেখেছেন মৃত অতীত এবং অজাত ভবিষ্যতের ভেতরে চিরন্তন দ্বন্দ্বের একটা ঢেউ। ভিয়েনার বিপ্লবী আন্দোলনে স্পেণ্ডার দেখলেন তারি আরেকটা ঢেউ। 'ভিয়েনা' কাব্য গ্রন্থ চার খণ্ডে বিভক্ত। প্রথম খণ্ডে আছে সহরে পৌঁছনর বর্ণনা, যেখানে

…যারা জীবিত তারা
প্রত্যুষে কাজ করতে যেয়ে দেখে, জগতের
চরম প্রত্যন্ত সীমা, যেখানে সব শুধু পাথর
আর লোহা আর ভুল।　　　　　　　　(ভিয়েনা পৃঃ ১৭)

দ্বিতীয় অংশে নগরকর্তাদের ফাঁকা ঐশ্বর্যের ওপরে সিল্যুট করা হয়েছে নগরের বেকারদের।

কোনো অস্পষ্ট তারার অলস বিন্দুর মত বিক্ষিপ্ত
বেঞ্চে সঙ্কুচিত বসে, স্নানের যায়গায় উলঙ্গ
শরীর ফোঁড়া সূর্য্যের আলোয় অস্পষ্ট
দিনের পর দিন, আর রাত্তে দুঃখের আগুনে লেলিহান
তারা লক্ষ্য করে না যা আমরা দেখাই।　　　　(ঐ, পৃঃ ১৯)

এরা শ্রমের ফসল হতে বঞ্চিত, এমন কি শ্রমের অধিকার হ'তেও। সে বঞ্চনা শুধু শারীরিক নয়, মনের বিশুদ্ধ সাহস এবং সংগ্রামের স্পৃহাকে পর্যন্ত পঙ্গু করে দিয়েছে। অডেন বার বার দেখিয়াছেন কেমন করে হতাশা বোধ মানুষের মনে বুদ্ধি আর কামনার গোপন কেন্দ্রকে ধ্বংস করে দেয়। স্পেণ্ডারের চোখেও সংগ্রামের এই দুর্বল দিকটা ধরা পড়েছে।

………আমাদের জীবন হ'ল
হাল্কা এল্যুমিনিয়ম শিকের খাঁচার মত
তবু শ্বাপদের শক্তির বাইরে, সব থেকে যা ভয়ঙ্কর
নৈতিক দুর্বলতার কাছে তা' পরাজিত।　　　　(ঐ, পৃঃ ২০)

তৃতীয় খণ্ডে পাই ব্যর্থ বিদ্রোহের কাহিনী। বিদ্রোহীদের নেতা ওয়ালিশ সহকর্মীর বিশ্বাসঘাতকতায় ডলফুশ, ফে আর বিপ্লববিরোধী খুনেদের হাতে ধরা পড়ল। মৃত্যুর সামনে দাঁড়িয়ে ওয়ালিশ জীবনের দাবী পেশ করে গেল। অডেন ও স্পেণ্ডারের ট্রাজিক প্রেক্ষিতের ভেতরকার পার্থক্য এখানে চোখে পড়ে। অডেনের জগতে জন নাওয়ার হতে সুরু করে এরিক থরহগলড্ পর্যন্ত সকলেই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের দৃষ্টিকোন হতে মৃত্যুর বিরুদ্ধে লড়াই করেছে।

যৌথ সংগ্রাম সেখানে পশ্চাদ্ ভূমিতে। স্পেণ্ডারে মৃত্যুর বিরুদ্ধে জীবনের সংগ্রাম যৌথ এবং সংঘবদ্ধ। সেখানে দুর্বলতা মাইকেল র‍্যানসমের মত ব্যক্তিমনের ব্যাপার নয়, যৌথ সংগঠনের। ওয়ালিশের হার ব্যক্তিগত নয়, কাব্যে তার স্থান প্রতীকেরও নয়। হার হ'ল জীবনশক্তির সংঘবদ্ধ প্রয়াসে দুর্বলতার জন্য।

আমাদের মারাত্মক আত্মঅবিশ্বাস চেষ্টা করেছিল সেতু গড়তে
বিপ্লব আর বর্তমানের সংস্থানশীল জগতের মাঝখানে।
আমরা বলেছিলাম, শিশুদের পেট-ভরাতে হবে
তাই ধর্মঘট ভরাডুবি হ'ল ; অনেক লোক, যারা সবচেয়ে সাহসী,
রাতে লড়াই করে, অপ্রসন্ন মনে অস্ত্র ছুঁড়ে ফেলে
ভোরে অবশেষে তারাও কাজ করতে গেল। (ভিয়েনা, পৃঃ ২৭)

অডেনের কাব্যের মত স্পেণ্ডারের ট্রাজিক দৃষ্টিকোন ব্যধিকেন্দ্রিক না হওয়ায় তীর্ধক বিদ্রূপ বা ক্ষমাহীন কর্তব্যবোধে তা আশ্রয় খোঁজেনি। যারা ভুল করেছে তাদের ভুলকে সহানুভূতির আলোয় বুঝতে পেরেছেন বলেই তাদের ব্যর্থতা তাঁকে হতাশ করেনি। তাই ওয়ালিশ ও বন্দী বিপ্লবীদের কণ্ঠের স্বাধীনতার আওয়াজ দড়ির মুঠোয় স্তব্ধ হয়ে ব্যর্থ হয়ে গেল না, বিজিত জনগণের হৃদয়ের আগুনে তা জ্বলতে লাগল পরবর্তী সুযোগের প্রতীক্ষায়।

আমাদের স্মৃতিতে ফুটে ওঠে কতগুলো ফুল
অনাবৃত আকাশকে কেটে কত পাখী ওড়ে
কারাগারে বসে আমরা পাহাড়ের নীল ফুলের কথা ভাবি—
জন্তুদের স্বাধীনতার ঈর্ষ্যায় ভয়াবহ আমরা
পাখীর মত ফুলের মত বিপজ্জনক হয়ে উঠি।

(ঐ, পৃঃ ৩০)

যৌথ জীবনের গতিশীল সংগ্রামের চেতনা ব্যর্থ মুহূর্তেও কবির মনে আশ্বাস এনেছে। চতুর্থ অংশে তাই অবস্থার বিশ্লেষণ ও বিবৃতির শেষে আমরা শুনি এই সংগ্রামের ভেতর দিয়ে জেতা সেই মহৎ ভবিষ্যতের কথা যখনকার ইতিহাস স্মরণ করবে তাদের, যারা,

প্রান্তিক মাটির নীচে সুরঙ্গ কেটেছিলো, গুপ্তচর বলে যাদের মেরেছে
নতুন রেখার চেতনায় তারা স্পন্দিত হয়েছিল বলে ; পতঙ্গের মত তারা
ধ্বংসের ভয়াবহ খোলসের নীচে জীবনের চাক বেঁধেছিল।

(ঐ, পৃঃ ৪২)

মৃত্যুর ভয়াবহ আক্রমণের নীচে জীবনের এই গঠনশীল সংহত অভিযান স্পেণ্ডারের কল্পনাকে প্রেরণা জুগিয়েছে।

(৩)

জীবন আর মৃত্যুর লড়াইয়ের মাঝখানে নিস্পৃহতার চৈনিক দেয়াল টেঁকেনা। উদারনৈতিক লোকেরা দায়িত্ব এড়াতে চায়। ভীরু চোখে জীবনের দিকে তারা চেয়ে থাকে, কিন্তু মারণ-শক্তির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার সাহস তাদের নেই। এদের ভঙ্গুর অস্তিত্বের প্রতি নির্মম বিদ্রুপ করেছেন অডেন। স্পেণ্ডার তাঁর স্বভাবসিদ্ধ সহানুভূতি দিয়ে এদের ট্রাজেডির রূপ দিয়েছেন 'দি ট্রায়াল অব্ এ জাজ' নাটকে।

প্রতিক্রিয়াশক্তি এবং সাম্যবাদীদের দ্বন্দ্বের মাঝখানে দাঁড়িয়ে উদার-নৈতিক বিচারক চাইলেন নির্বিকল্প ন্যায়ের মানদণ্ড খাড়া রাখতে। ফল হ'ল এই যে উভয়পক্ষ তাঁর নিরপেক্ষতাকে ব্যাখ্যা করল অপর পক্ষের প্রতি সহানুভূতি বলে। কিন্তু স্পেণ্ডার একথা অস্পষ্ট রাখেন নি যে ন্যায়ের প্রতি সততায় বিচারক সাম্যবাদীদের সমধর্মী। যেখানে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি চাইছে এক ভুয়ো সমগ্রতার কাছে ব্যক্তিকে নির্মমভাবে বলি দিতে, সেখানে সাম্যবাদী এবং বিচারক উভয়েই ব্যক্তিজীবনের কল্যাণের সাথে যৌথ জীবনের সমন্বয় করাতে চেয়েছেন। কিন্তু বিচারকের নিজের জীবনে ব্যক্তিগত সমস্যা, আদর্শ, ক্রিয়াকর্ম সামাজিক সমস্যা হ'তে বিচ্ছিন্ন হয়ে রইল ; এই ভুলের দাম দিতে হ'ল প্রতিক্রিয়াশক্তির নিষ্ঠুর খড়্গে ব্যক্তিজীবনের স্বাধীনতা ও শান্তিকে বলি দিয়ে। কারাগারের মুখোস-ছেঁড়া অন্তরঙ্গতায় বিচারক অবশেষে অনুভব করলেন, নির্বিকল্প ন্যায়ের আদর্শ বজায় রাখতে গিয়ে তিনি প্রতিক্রিয়াশক্তির

জয়েই সাহায্য করেছেন। জীবন-মৃত্যুর সংগ্রামে নিরপেক্ষতা মৃত্যুকে সমর্থনেরই সমান।

কিন্তু স্পেণ্ডার নিম্নমধ্যবিত্তদের ওপরে আস্থা হারাননি। স্পেণ্ডারের কল্পনা সাবধানতায় তীক্ষ্ণ নয়, বলিষ্ঠ আহ্বানে বিচ্ছুরিত। তাই তাঁর নাটকে তিনি নায়কের সততাকে অবিশ্বাস করেন নি। তাঁর মারাত্মক ভুল দেখানোর পেছনে এই ইঙ্গিত আছে যে এ ভুল বুঝতে পারলে নিম্নমধ্যবিত্তদের ভেতরে যারা খাঁটি তারা বিপ্লবের পথে এগিয়ে আসবে। নিজের মানসজীবনের উদাহরণ দিয়ে এই ইঙ্গিতকে তিনি ফুটিয়ে ধরেছেন 'ফরওয়ার্ড ফ্রম লিবেরালিজম্' গ্রন্থে। বর্তমান সঙ্কটের পটভূমিতে খাঁটি উদারনৈতিককে সাম্যবাদী হতেই হবে। য়ুরোপে ফাশিস্ত প্রতিক্রিয়ার ভয়াবহ অভিজ্ঞতা এ সত্যকে সুস্পষ্ট করে তুলেছে।

(৪)

১৯৩৪ সাল হতে ১৯৩৯ সালের গোড়া পর্য্যন্ত লেখা স্পেণ্ডারের অধিকাংশ কবিতা 'দি ষ্টিল সেন্টার' কাব্যগ্রন্থে সঙ্কলিত হয়েছে। ভূমিকায় কবি বলেছেন : নিজের অভিজ্ঞতা দিয়ে জানা বাস্তব জগতের সামান্য অংশ নিয়ে কবিতা লেখার সময়ও কবি তাঁর কাব্যবস্তুর বাইরে অপর এক জগৎ সম্বন্ধে সচেতন হতে পারেন। কবির সমস্যা হ'ল তাঁর অভিজ্ঞতার বাইরেকার (হয়ত যুক্তি দিয়ে জানা) বৃহত্তর জগতের চেতনার সাথে তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ক্ষুদ্র সত্যের সম্বন্ধ স্থাপন করা (পৃঃ ১০)। পারিপার্শ্বিকের চাপে এই সম্বন্ধ স্থাপন ক্রমশই কাব্যসৃষ্টির প্রধান সমস্যা হয়ে উঠেছে। স্পেণ্ডারের কবিতায় বৃহত্তর জগতের সূত্রে ব্যক্তি-অভিজ্ঞতার সকল বুনোনি প্রায়শই চোখে পড়ে।

ইমেজিষ্টরা একটুকরো ছবির ভেতরে একটা সমগ্র অভিজ্ঞতার প্রকাশ দিতে চেয়েছিল। তাদের প্রধান অভাব ছিল এই বৃহত্তর জীবনের চেতনা। 'স্পেক্যুলেশন্‌সে'র লেখক বরং "ছোট শুকনো জিনিষের" নিখুঁৎ বর্ণনার পরে সমস্ত ঝোঁক দিতে বলেছিলেন। স্পেণ্ডারের কল্পনায় বর্ণধর্মী মন সম্বন্ধচেতনার সাহায্যে অর্থের কাঠামো পেয়েছে। পরিপ্রেক্ষিতের আলোয় রূপক বৃহত্তর সত্যের সঙ্গতিতে ঐশ্বর্যবান হয়েছে।

On the chalk cliff edge struggles the final field
Of the barley smutted with tares and marbles
With veins of rusted poppy as though the plough had bled

*　　　*　　　*　　　*

Here the price and the cost cross on a chart
At a point fixed on the margin of profit
Which opens out in the golden fields
Waving their grasses and virile beards
On the laps of the dripping valleys and flushing
Their pulsing ears against negative skies.

(দি ষ্টীল সেন্টার, পৃঃ ৪৬)

এ কবিতাটিতে অর্থনৈতিক জীবনের একটা বিশিষ্ট সত্য রসে রূপে বিচিত্র ভাষা পেয়েছে। অ্যারিষ্টটল্ বলেছেন, কবিমনের খাঁটি প্রকাশ রূপকে। পাউণ্ডের অভিযোগ, য়ুরোপীয় মন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যের বর্ণনায় বিশ্লেষণে আশ্রয় নিতে চায়। (প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য পাউণ্ডের 'ক্যাণ্টোমে' তাঁর বর্ণধর্মী কল্পনা এবং বিশ্লেষণী বুদ্ধি পরস্পরবিরোধী রূপে প্রকাশ পেয়েছে।) স্পেণ্ডারে মনন-ক্রিয়া সর্বসময়েই চিত্রধর্মী কিন্তু তা বর্ণবিলাসী নয়। ছবির কাঠামো তথ্যের।

My will behind my weakness silhouettes
My territories of fear with a great sun.

(ঐ, পৃঃ ৭৮)

স্পেণ্ডারের চিত্রধর্মী মন গতিশীল (কীট্সে যা কদাচিৎ ঘটেছে)। এই গতিশীলতা সাম্প্রতিক জীবনযাত্রার সঙ্গে সক্রিয় অন্তরঙ্গতার ফল। কবি শুধু ইন্দ্রিয় দিয়ে গ্রহণ করেন নি, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যের রূপান্তরের কাজে সক্রিয়ভাবে হাত লাগিয়েছেন। কাব্যসৃষ্টি এবং আবর্তনধর্মী এই যৌথ সংগ্রামের ভেতরে গভীর যোগাযোগ রয়েছে। 'পোয়েম্স্ ফর স্পেন্' সঙ্কলন-গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত ভূমিকায় তাই স্পেণ্ডার লিখেছেন : "এই শিল্পীরা (যারা স্পেনের অন্তর্যুদ্ধে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের হয়ে লড়াই করেছিল) যেন বলে, যদি তারা না একসাথে লেখে এবং লড়াই করে তাহলে এমন এক ভবিষ্যৎ আসবে যখন তাদের আত্মিক

মৃত্যু ঘটবে" (পৃঃ ৮)। স্বাধীন কল্পনার সম্ভাবনাশীল সেই ভবিষ্যতের বিশ্বাসে কবিতা আজ জীবনের রূপান্তরে অংশ নিয়েছে।

রাতে ভবিষ্যতের এক অনুভূতি আমার মনে বন্যা আনে
অজানা এক শক্তির কূল ভাঙান স্রোত
ডুবিয়ে দেয় বর্তমানের সীমারেখাগুলোকে। (দি ষ্টীল সেন্টার, পৃঃ ৩১)

(৫)

জীবনের প্রতি কবির দায়িত্ব সম্পূর্ণ মেনে নিলেও স্পেণ্ডার একথা কখনো স্বীকার করেন নি যে সচেতন ভাবে কোনো কর্মপদ্ধতি প্রচারের ফরমাসে খাঁটি কাব্য সৃষ্টি হতে পারে। 'ডেষ্ট্রাকটিভ্ এলিমেন্টে' হেনরি জেমসের রচনা সমালোচনা প্রসঙ্গে স্পেণ্ডার শিল্পসৃষ্টিতে বিশ্বাসের প্রয়োজনীয়তার কথা স্বীকার করেও তার কোন নির্দিষ্ট রূপের কথা বলেন নি। বরঞ্চ বেশী জোর দিয়েছেন দেউলে বিশ্বাস ও রীতির দ্রুত ভাঙনের পরে। কবির স্বচ্ছ দৃষ্টির আলোয় এ সমাজব্যবস্থার রিক্ততা উলঙ্গরূপে দেখা দেয়। অবশ্য একথা সত্য যে এই উদ্‌ঘাটনে মার্ক্সবাদী পরিপ্রেক্ষিত বিশেষ সাহায্য করে। কিন্তু কাব্যসৃষ্টি কোনো প্রতিষ্ঠানের বাঁধাধরা কর্মপদ্ধতির সীমারেখায় আবদ্ধ থেকে বিকাশ লাভ করতে পারে না। মার্ক্সীয় পরিপ্রেক্ষিত এবং আদর্শবোধ কবির কল্পনার সাথে অঙ্গাঙ্গী ভাবে এক হয়ে গেলে কবি যে কোন অভিজ্ঞতা নিয়েই লিখুন না কেন, তার প্রকাশের সময় এই দৃষ্টিভঙ্গিই তার কাঠামো নিয়ন্ত্রণ করে। কিন্তু কারো বাইরে হতে নির্দেশে এ নিয়ন্ত্রণ সম্ভব নয়। কবির সমস্ত অস্তিত্বের সাথে নতুন জীবনবিজ্ঞান এক হয়ে গেলে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবেই এই দৃষ্টিভঙ্গি কাব্যরূপকে নির্দিষ্ট করবে।

যুদ্ধ বাধার পর স্পেণ্ডার যখন 'ফোলিওজ অব্ নিউ রাইটিং'-এ লিখলেন যে ব্রিটিশ সাম্যবাদী দলের অস্থির পদক্ষেপের সঙ্গে তাল রাখা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়, তখন তাঁর ভেতরে বুর্জোয়া ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য লক্ষ্য করে ক্ষুব্ধ হবার কারণ দেখিনে। তাঁর আদর্শের প্রতি সততা উইন্‌ট্রিংহ্যামের মত গণযুদ্ধে সক্রিয় অংশ গ্রহণেই প্রমাণিত হয়েছে। পার্টির ভ্রান্তপথ অনুসরণ না করা যে ঠিকই

হয়েছিল, পার্টির পরবর্তী মত পরিবর্তন-ই তার প্রমাণ। অপরপক্ষে যুদ্ধে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে কবি মাত্র সেই বিশিষ্ট অংশটুকুর ভেতরেই তাঁর কাব্যকে আবদ্ধ রাখেননি। তাঁর নতুন প্রকাশিত সাহিত্য-আলোচনা পুস্তক 'দি পোয়েট অ্যাণ্ড লাইফে' তিনি বলেছেন যে কবি যেমন শ্রেণীদ্বন্দ্ব বা সাম্যবাদী আন্দোলনকে বিষয়বস্তু করে কাব্যসৃষ্টি করতে পারে, তেমনি ভালবাসা বা ফুল বা এমনিতর কোন অভিজ্ঞতাকে কেন্দ্র করে কাব্যরচনা করলেও তা' মিথ্যা হয় না। জীবন বিচিত্র পথে নিজেকে বিকশিত করতে চাইছে। মানুষের নানা কামনায়, সৃষ্টিতে জীবনের প্রতিষ্ঠার এই প্রয়াস দেখি। অপর পক্ষে মৃত্যু নানা উপায়ে জীবনকে শৃঙ্খলিত করতে চাইছে। সামাজিক অসাম্যের মতই ব্যক্তিজীবনের বিকৃতি, সুন্দরের ও মহত্তের গ্লানি, প্রেমের পঙ্কীকরণ, মিথ্যার প্রচারের ভেতর দিয়ে মৃত্যু জীবনকে আহত করে। কবি তাই বিচিত্র পথে মৃত্যুর বিরুদ্ধে জীবনের অভিযানকে রূপ দিতে পারেন। তাঁর প্রেমের কবিতায় আজকের স্ত্রী পুরুষের অসরল সম্বন্ধের মৃত্যুরূপ উদ্‌ঘাটিত হবে, সেই কুৎসিৎ বিকৃতির বিরুদ্ধে সোজা হয়ে দাঁড়াবে প্রেমের বলিষ্ঠ সহজ সৌন্দর্য। জীবনের যে কোন অভিজ্ঞতাই তাঁর কাব্যের বিষয়বস্তু হোক, তার ভেতরে একধারে যেমন বর্তমান ব্যবস্থার অপরিমিত অপব্যয়ের বেদনা থাকবে অপরদিকে আবর্তনমুখী জীবনযাত্রার জন্য যৌথ সংগ্রামের স্বীকৃতি থাকবে।

অবশ্য স্পেণ্ডারের ক্ষেত্রে দুর্ভাগ্যবশত কোনো বড় প্রতিষ্ঠানের সাথে যৌথ কাজের সুযোগ না ঘটায় তাঁর সাম্প্রতিক কবিতায় মাঝে মাঝে হতাশার ধ্বনি কানে বাজে। মৃত্যুর বিচিত্র শক্তির সংঘবদ্ধতার সামনে জীবনের অভিযান এলোমেলো অস্পষ্ট। (এই গণযুদ্ধের নেতৃত্ব তারই একটা প্রমাণ নয় কী ?) সন্তানের উচ্চাকাঙ্ক্ষার ভেতরে মৃত পিতার শক্তি কামনা (wille der macht) কাজ করছে, তাকে ঠেলে দিচ্ছে মৃত্যুর দিকে।

দেখ, একটা তারা তোমার মৃত বুক হতে
ছুটে এল আমার রাত্রিময় জীবনে
তোমার দীর্ঘবিশ্রামকে আমার অশান্তিতে রূপান্তরিত ক'রে।
হতাশার আগুনে আমার মাথা জ্বলে। (রুইন্‌স অ্যাণ্ড ভিশানস্ পৃঃ ৪৮)

বিজিতের তীব্র প্রতিক্রিয়ার পেছনে আছে অতীত গৌরবের স্মৃতি আর বিজয়ীর অত্যাচারের বিরুদ্ধে সঞ্চিত আক্রোশ। যুক্তির পথে তার নির্বাণ কোথায়? ("রণদেবতা" এবং "জুন ১৯৪০" কবিতা দুটি দ্রষ্টব্য।) মিথ্যার আর মৃত্যুর ক্ষমাহীন প্রহারে জীবন ফুলের মত ঝলসে গেছে।

কেননা পৃথিবী পৃথিবীই
নিহত অথবা হন্তারক
কেউ ক্ষমা করে না
কামনাচঞ্চল ইতিহাসের
উচ্ছৃঙ্খল তীরভূমি
অনন্ত ভালবাসায় সমাপ্ত হয় না,
যদিও অশান্ত হতাশার
সাগরগুলোর নীচে
প্রেমের প্রয়োজন শেষ হয়নি।

(ঐ, পৃঃ ৩০-৩১)

'রুইন্‌স্ অ্যাণ্ড ভিশান্‌স্' কাব্যগ্রন্থের চার ভাগের তিন ভাগ ভাঙনের কথায় ভরা। প্রথম তিন ভাগের ক্রমিক নাম হচ্ছে, একটি বিচ্ছেদ, যুদ্ধের বিদ্রূপ, ও মৃত্যু। মাত্র চতুর্থ অংশে আমরা পাই কবির ভবিষ্যতের স্বপ্ন। এর ইঙ্গিত ঐ গ্রন্থের "জুন, ১৯৪০" কবিতায় কবি ইতিপূর্বেই আমাদের দিয়েছিলেন।

ইতিহাস হ'ল মাটির নীচে কোন ড্রাগন
বর্তমানকে সে পরেছে চামড়ার আবরণের মতো
স্বপ্নের সূচনায় মানুষ যে আবরণ তুলে ফেলে।

(রুইনস্ অ্যাণ্ড ভিশনস্, পৃঃ ৪১)

ইতিপূর্বে প্রেমের যে ব্যর্থতার কথা কবি বলেছিলেন আগত ভবিষ্যতে তা সার্থক হয়ে উঠবে। যে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের কথা স্মরণ করে তিনি হতাশ বোধ করেছিলেন, ("An 'I' can never be Great Man"), তা' যৌথ বোধে মহৎ হয়ে উঠবে।

কিন্তু রাত্রি
বিচিত্র কাঠামোগুলো সব গলে যায়—
নক্ষত্রের দিকে, অন্ধকারের এক কোমল দীপ্তিতে ।
(রুইন্‌স্ অ্যাণ্ড ভিশন্‌স্, পৃঃ ৬৭)

শুকনো ফুলের জায়গায় সিধে হয়ে দাঁড়িয়েছে সবুজ গাছ ।
একটা চারাগাছ এক ঝলক ঝলমলে
পাতা ছড়িয়ে, তার ডালপালার ধাক্কায় খারিজ করে
হাতের ঝরঝরে নীচু প্রান্তটাকে, প্রতিফলিত করে
টালিগুলোকে তার সবুজ পেয়ালায় ।   (ঐ পৃঃ ৭০)

মৃত পুরাতন আজ প্রেমের "রুদ্রশান্তিতে" নতুন অর্থ নিয়ে বেঁচে উঠল ।
যে কথাগুলো—

অতীত হতে পাথরের স্তূপের মত ভার হয়ে চাপান ছিল
হৃদয়ের ভূমিকম্পে আজ তারা স্থানচ্যুত হ'ল ।   (ঐ, পৃঃ ৮৪)

(৬)

স্পেণ্ডারের কল্পনায় গতিশীলতার কথা স্মরণে রেখেও তাঁর কবিতার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে একটা আশঙ্কা জাগে। অডেনের মত স্পেণ্ডারের কল্পনার কাঠামো যথেষ্ট চওড়া এবং শক্ত নয়। ফলে গোড়ায় ধাক্কা খেলে তা' আদিম বৃত্তির অনুসন্ধানে পথ হারাতে পারে। অর্থাৎ স্পেণ্ডারের কল্পনা ভাবসঙ্গতির চেয়ে আবেগকে বেশী প্রাধান্য দেওয়ায় তাঁর পক্ষে অস্পষ্ট অনুভূতিতে আশ্রয় খোঁজা অস্বাভাবিক নয়। দুর্ভাগ্যবশত সাম্যবাদী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে অন্তরঙ্গ সম্পর্ক রাখা কঠিন হওয়ায় এ সম্ভাবনা ক্রমশই প্রধান হয়ে উঠছে। 'রুইন্‌স্ অ্যাণ্ড ভিশান্‌স'-এর অনেক কবিতায় এই পিছুটানের ভাব চোখে পড়ে। কোথাও কোথাও অস্পষ্ট মরমীবাদও কল্পনাকে আচ্ছন্ন করেছে। কয়েকটি কবিতায় শৈশবে ফিরে যাবার বাসনাও ঐ সামাজিক ভাঙনের সম্ভাবনার ইঙ্গিত করে। কিন্তু এ সম্ভাবনা এখনো অস্পষ্ট। তাছাড়া বর্তমান সঙ্কটের জটিলতা স্মরণে

রাখলে এ জাতীয় বিচ্যুতিকে স্থায়ী আশঙ্কার বিষয় মনে করা সঙ্গত হবে না। আজকের এই যুগসন্ধিতে কল্পনাকে টিকিয়ে রাখতে হলে যে সাহস এবং শক্তির প্রয়োজন স্পেণ্ডারে তা' আছে।

Thinkers and airmen—all such
Friends and pilots upon the edge
Of the skies of future—much
You require a bullet's eye of courage
To fly through this age.

(রুইন্‌স্ অ্যাণ্ড ভিশান্‌স্ পৃঃ ৩১)

এই তীব্র দ্রুতগতির পথে নিশ্চিন্ততা আকাঙ্ক্ষনীয় হলেও সহজসাধ্য নয়। স্পেণ্ডার-কল্পনায় ত্রুটিবিচ্যুতির হয়ত এই যথেষ্ট কৈফিয়ৎ।*

শ্রীশিবনারায়ণ রায়

* এ প্রবন্ধের বাংলা উদ্ধৃতিগুলো কবির রচনা হতে যতদূর সম্ভব যথাযথ অনুবাদ।

ভ্রমণ-পথে

(রুশীয় গল্প)

ট্রেণ ছাড়ার পাঁচ মিনিট আগে বুড়ো ভদ্রলোকটি গাড়িতে উঠলেন। আমি ছাড়া কামরায় ছিল একটি খোঁড়া সোল্‌জার ও একটি তরুণী। অসংখ্য ছোট বড় পোঁটলা পুঁটলি, ব্যাগ প্রভৃতি গুছিয়ে রাখ্‌তে বুড়োর পুরো পনর মিনিট সময় লাগল; তারপর তিনি বিছানা করলেন, বুট খুল্‌লেন, একটি পোঁটলা থেকে শ্লিপার বের করলেন এবং অবশেষে তাঁর আসনে ঠেস দিয়ে ব'সে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে মৃদু হেসে আমাদের বল্‌লেন: 'যাক, অবশেষে গন্তব্য পথে চলেছি—এটা ভাল। তোমরা আছ তিনজন—আমি হবো তোমাদের চতুর্থ ভ্রমণ-সঙ্গী। আমার নাম ষ্টেপাম্ লিয়াপিস্ কিংবা আরও সহজ করতে গেলে ঠাকুর্দা ষ্টেপাম্। তোমাদের নাম কি?'

খোঁড়া সোল্‌জারটি ইতিপূর্বে তার বার্থে গা এলিয়ে দিয়ে পড়েছিল—জবাব দেবার জন্য সে পাশ ফিরল। মেয়েটি এবং আমি আমাদের নাম বল্‌লাম। মেয়েটির নাম ন্যাটাসা। এমনি ভাবে আমাদের সঙ্গে পরিচয় ক'রে বুড়ো লোকটি বাক্সের নীচ থেকে একটা বিরাট ঝুড়ি বের ক'রে তার থেকে খাবার বের কর্‌তে লাগলেন। তার মধ্যে কী না ছিল—শুক্‌নো সসেজ, মাংস, ডিম, শশা। আর ছিল কাগজে মোড়া বড় একটি চায়ের পাত্র।

এই রত্নভাণ্ডার উন্মুক্ত ক'রে ঠাকুর্দা আমাদের খাওয়ার জন্য জোর তাগিদ সুরু করলেন। তাঁর নিমন্ত্রণ গ্রহণ না ক'রে আমাদের আর উপায় ছিল না। ঠাকুর্দা সোল্‌জারটিকেও আমন্ত্রণ জানালেন কিন্তু সে উত্তর দিল না; সে হয় ঘুমাচ্ছিল কিংবা ঘুমের ভাণ করছিল।

'তোমরা কি কখনো ক্রিভোয়া-রোগে গেছ?' বৃদ্ধ প্রশ্ন কর্‌লেন।

আমরা মাথা নেড়ে জানালাম 'না'।

'আঃ, কী শহর!' বৃদ্ধ আনন্দে লবণ মাখানো বৃহৎ এক খণ্ড শশা চিবোতে চিবোতে বল্‌লেন। 'কী সৌন্দর্য! সেখানকার লোকেরা শুধু শাদা

রুটি খায়, প্রত্যেকেই মোটা সোটা সুন্দর দেখতে। প্রত্যেকেই গান গায়। আর কত গর্ভবতী মেয়ে সেখানে। একথাটা বলার জন্য আশা করি তোমরা আমায় ক্ষমা করবে।'

আমাদের সুন্দরী তরুণী সহযাত্রিণীর গাল দুটি একটু রাঙা হ'য়ে উঠল, কিন্তু বৃদ্ধ তার বিব্রত ভাব লক্ষ্য না ক'রে ক্রিভোয়া-রোগের মেয়েদের উর্বরতার কথা ব'লে চললেন—এক সঙ্গে দুটি এবং তিনটি ছেলেমেয়ের জন্মের গল্প—তাঁর মতে এ সব ঘটনা প্রায় দৈনিক সেখানে ঘটে। ইত্যবসরে ট্রেণটি গোঙ-রাতে গোঙরাতে এগিয়ে চলছিল আর ক্রমশই মস্কো থেকে দূরে উষ্ণ প্রদেশের দিকে আমরা স'রে আসছিলাম।

ভোজন শেষ ক'রে ঠাকুর্দা কোমরে জড়ানো বেল্ট্‌টাকে শিথিল ক'রে নিলেন এবং এত জোরে হাই তুললেন যে আমরা তাঁর চোয়ালের ঘর্ষণ-শব্দ শুনতে পেলাম। তিনি বললেন: 'বাছারা, আমার ঘুমানোর বিষয় কি মত?'

'ঘুমোন, ঠাকুর্দা', ন্যাটাসা জবাব দিল। 'আপনি শান্তিতে ঘুমোন, কেউ আপনার জিনিষ পত্রে হাত দেবে না।'

ঠাকুর্দা ষ্টেপান্ কোটটা খুললেন—তারপর পর পর তিনটে ওয়েষ্ট কোট। সযত্নে ওয়েষ্ট কোটগুলো ভাঁজ করে মাথার নীচে হাত দিয়ে শুয়ে তিনি আমাদের দিকে চেয়ে হাসলেন। সেই মুহূর্তে মেঘের পিছন থেকে সূর্য এল বেরিয়ে আর এক ঝলক আলোয় কামরাটি উজ্জ্বল হয়ে উঠল। ন্যাটাশা সূর্যের দিকে চেয়ে হাসতে লাগল—আমি হাসতে লাগলাম ন্যাটাশার দিকে চেয়ে। পাকা গোঁফের নীচে মৃদু হাসির ঢেউ খেলিয়ে ঠাকুর্দা ষ্টেপান্ ঝিমুতে লাগলেন।

'ঠাকুর্দা কি মিষ্টি', ন্যাটাশা ফিস্ ফিস্ ক'রে আমায় বলল। 'নয় কি?'

আমি উত্তর দিলাম: 'নিশ্চয়ই। এই গাড়ীতে ভ্রমণ করছি ব'লে আমি খুব সুখী', আমি ন্যাটাশার দিকে অর্থপূর্ণভাবে চাইলাম।

দুষ্টুমি ক'রে ন্যাটাশা বলল: 'ঠাকুর্দা সত্যি চমৎকার।'

তারপর আমরা যে-যার বই আর কাগজে দিলাম ডুব, মাঝে মাঝে আমি ন্যাটাশার দিকে ব্যগ্র তীক্ষ্ণ দৃষ্টির শর হানতে লাগলাম। রাত্রি হ'য়ে আসছিল, গরমও ছিল খুব।

'কি গুমোট !' স্যাটাশা বলল। 'আমি আর এক মিনিটও এখানে থাকতে পারছি না।'

'চলুন আমরা বারান্দায় যাই—ওখানে জানালাটা খোলা আছে।' বেরিয়ে গিয়ে জানালাটার সামনে দাঁড়ালাম। জানালাটা খুব ছোট ছিল—তাই আমাদের খুব কাছাকাছি দাঁড়াতে হ'ল। তার শাদা ব্লাউসের মধ্য দিয়ে আমি তার নরম কাঁধের উষ্ণতা অনুভব করতে পারছিলাম। নানা বিষয় নিয়ে আমাদের আলোচনা হচ্ছিল, তার জীবনযাত্রা, সে যে ইউক্রেনে তার পরিবারের সঙ্গে ছুটি কাটাতে যাচ্ছিল সে কথা, সন্ধ্যার সৌন্দর্যের কথা। বৃহৎ লাল চুলওয়ালা কণ্ডাক্টর কয়েকবার বারান্দা দিয়ে যাতায়াত করল। প্রত্যেকবারই সে কিঞ্চিৎ মাথা নেড়ে আমাদের দিকে চেয়ে পরিচিতের হাসি হাসছিল। প্রকৃত পক্ষে এমনভাবে হাসবার কোন কারণ তার ছিল না।

ভোরের দিকে একটা উষ্ণ নরম হাত ধীরে এসে আমার কাঁধের উপর পড়ল। হাতখানা আমার গালের নীচে রেখে আমি আবার ঘুমিয়ে পড়লাম। এ ব্যাপারটা সত্য না স্বপ্ন তা' আমি জানি না, কিন্তু আমি একটা চাপা হাসির শব্দ শুনেছিলাম।

যখন জেগে উঠ্‌লাম তখন দেখি স্যাটাশা ঘুমিয়ে আছে আর নীচে ঠাকুর্দা ষ্টেপান্ নীচু গলায় সোলজারটির সঙ্গে কথা বল্‌ছেন। ট্রেন্‌টা কুর্স্কের পাশ দিয়ে চলে গেল। সামান্য তুষারপাত হ'য়েছিল; তৃণভূমির ফাঁকে ফাঁকে ছোট নদীগুলো চক্ চক্ করছিল। আমি বার্থের থেকে নীচের দিকে চেয়ে সোলজারটিকে চিনতে পারলুম না। দাড়ি গোঁফ কামিয়ে তাকে রীতিমত তরুণ দেখাচ্ছিল।

'আর দেখুন', সে ঠাকুর্দাকে বল্‌ছিল, 'আমি খোঁড়া হ'য়ে কি ক'রে তার কাছে উপস্থিত হব, তাই ভেবে পাচ্ছি না। "তুমি শয়তানের কাছে যাও" সে আমাকে বল্‌বে······'

'কখনও হ'তে পারে না, এমন কখনও হ'তে পারে না', বৃদ্ধ উষ্মার সঙ্গে জবাব দিলেন। 'তুমি তোমার স্ত্রীর প্রতি অন্যায় করছ, নিশ্চয়ই অন্যায় করছ। তোমার পা কাটা গেল কোথায়? তুমি সীমান্তে আহত হ'য়েছিলে,

নয় কি? আর তোমার স্ত্রী বুদ্ধিমতী, তুমি ত তাই ব'লেছ, না? তবে সে বুঝবে। তুমি ভেবো না, সব ঠিক হ'য়ে যাবে, দেখ।'

ঠাকুর্দা ষ্টেপান্ হেসে তাঁর বিমর্ষ সঙ্গীর কাঁধে চাপড় দিলেন এবং তার কাণে ফিস্ ফিস্ করে কি যেন বল্লেন। আহত সোলজার ভীষণভাবে না হেসে পারল না, ফলে ন্যাটাশা জেগে উঠ্ল। সে তার মুঠোকরা হাত দিয়ে শিশুর মত চোখ রগ্ড়াতে রগ্ড়াতে আমার দিকে চেয়ে মধুর হাসি হাস্ল।

মৃদুস্বরে আমি তাকে বল্লাম: 'ভাখো স্বপ্ন দেখেছি যে তুমি আমার গালের নীচে হাত রেখেছিলে।'

সে রাঙা হ'য়ে জবাব দিল: 'কী অসম্ভব কথা!'

ঠাকুর্দা আমাদের কথা শুনে ফেলেছিলেন, তিনি দাঁড়িয়ে আমাদের একটা বার্থে হেলান দিলেন।

'আমি তোমাদের দুজনকে লক্ষ্য করছি', তিনি বল্লেন, 'দেখছি তোমরা কি সুন্দর। ওর দিকে তাকাও—ওর গাল দুটি কেমন গোলাপী!' তিনি ন্যাটাশার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করলেন। 'তাড়াতাড়ি করে হাত মুখ ধোও, আমরা চা খাবার ব্যবস্থা করছি। বুড়ো কিছুই ভোলে না! দেখ, চায়ের পাত্র তোমার জন্যই অপেক্ষা করছে......'

চার জনে মিলে চা খাওয়া গেল। আমাদের বিমর্ষ সঙ্গীটি এতক্ষণ ধ'রে ন্যাটাশার দিকে চেয়ে রইল যে সে ফেল্ল ধৈর্য হারিয়ে। অবশেষে সোলজারটি বলল: 'আপনার মত আমার স্ত্রীর নামও ন্যাটাশা। আমি গত দুবছর তাকে দেখিনি।'

তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেলে সে বর্ণনা করল সীমান্তে একা একা নৈশ পাহারা দেবার ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতা। বিনা শুল্কে আমদানী-রপ্তানীকারী একদল লোকের সঙ্গে খণ্ড যুদ্ধে তার পায়ে আঘাত লেগেছিল, সে কথাও আমাদের বল্ল। তার পায়ে কয়েকবার অস্ত্রোপচার করার প্রয়োজন হ'য়েছিল।

'আর এখন আমার স্ত্রী, আমাকে এই অবস্থায় দেখে নিশ্চয়ই আমাকে ত্যাগ করবে,' সে বিষণ্ণভাবে তার বক্তব্য শেষ করল।

'নিশ্চয়ই নয়, সে এ ধরণের কিছুই করবে না'। ন্যাটাশা এত সুন্দর ভাবে

এ কথাটা বল্‌ল যে আহত সোলজারটি এবং আমি না হেসে পারলাম না। ঠাকুর্দা স্টেপান্ লাফিয়ে উঠে সোৎসাহে প্রশংসা করতে লাগলেন।

'আমি তোমাকে এই কথাই ব'লেছিলাম, এই কথাই ব'লেছিলাম', তিনি সোলজারটিকে সম্বোধন ক'রে বল্‌লেন। 'ও প্রকৃতই মেয়ের মত কথা বলেছে। ন্যাটাশা তোমাকে ধন্যবাদ, ধন্যবাদ। তোমার একটি সচ্চরিত্র চালাক স্বামী জুটুক্ এই কামনাই করি', এই ব'লে তিনি বক্রভাবে আমার দিকে তাকালেন। চা পানের পর ঠাকুর্দা প্রায় গ'লে গেলেন। আনন্দে উছ্‌লে প'ড়ে তিনি সুরু করলেন গল্প করতে একেবারে না থেমে। প্রত্যেকবার গাড়ি থামতেই তিনি খাবার, দুধ এবং আরও কত কি যোগাড়ে হন ব্যস্ত। তারপর তাঁর ব্যাগ এবং পোঁটলার মধ্যে কি-যেন খোঁজেন। তার মধ্য থেকে কত কি তিনি বার করছিলেন : রুমাল, সস্তার কাপড়ের টুকরো, সাবান, সুগন্ধি দ্রব্য, একটা ছোট হাত আয়না, মিষ্টি, শুকনো সসেজ প্রভৃতি। এই সব সঞ্চিত রত্নের প্রশংসা ক'রে তিনি আবার সেই সব যথাস্থানে রেখে দিচ্ছিলেন। তারপর তিনি বালিশের নীচ থেকে ওয়েষ্ট কোটগুলো বের ক'রে সেগুলো পর্যবেক্ষণ করছিলেন। অবশ্য এগুলো মোটেই খুব ভাল কাপড়ের তৈরী ছিল না—প্রায় প্রত্যেকটাই রং-চটা আর ছেঁড়া কিন্তু ঐ ওয়েষ্ট কোটগুলোই ছিল তাঁর প্রিয়তম সম্পদ। মোটা মোটা আঙুল দিয়ে ঠাকুর্দা সেগুলাকে পালিশ আর সূর্যালোকে সযত্নে পরীক্ষা করছিলেন—জিভ্ দিয়ে শব্দ ক'রে মাথা নেড়ে প্রশান্ত উদার হাস্যে তাঁর মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠছিল এই কাজে। বার্থের কিনারায় ঝুঁকে পড়ে ন্যাটাশা এবং আমি তাঁর কাণ্ডকারখানা লক্ষ্য করছিলাম।

অবশেষে বৃদ্ধ আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন : "এ ওয়েষ্ট কোটটা ঠিক আছে, না? ঈশ্বরের দিব্যি, এটা খুব সূক্ষ্ম কাপড়ে তৈরী। জীবনে আমি কখনও ওয়েষ্ট কোট পরিনি—ওয়েষ্ট কোট প'রে লাভ কি? কিন্তু তবু আমি এই ওয়েষ্ট কোটগুলো পরব।' এই ব'লে আনন্দে তিনি হাসতে লাগলেন। 'এগুলো কি উপহার পেয়েছেন?' ন্যাটাশা জিজ্ঞাসা করল। 'হাঁ, বাছা এগুলো উপহার। এর চেয়ে ভাল উপহার আর আমি পাইনি। ঈশ্বরের দিব্যি, মরবার আগে আমি এগুলো সব পরব—আমি ম'রে গেলে আমাকে

কফিনে বন্ধ ক'রে আমার সমাধিতে ক্রস্ গেড়ে তার উপর লেখা হবে: "যিনি পরম সুরসিক ছিলেন সেই ঠাকুর্দা ষ্টেপান্ এখানে চিরনিদ্রায় নিদ্রিত......"

তারপর বৃদ্ধ তাঁর জীবনকাহিনী আমাদের কাছে বল্‌লেন:

'আমি প্রায় চল্লিশ বছর ধ'রে ক্রিভোয়া-রোগে বাস করছি। রাস্তার প্রথম কুকুরটিকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলে সে ঘেউ ঘেউ করতে করতে তোমাকে আমার বাড়ীতে নিয়ে যাবে: "সেই কোন বিস্মৃত যুগ থেকে রেলপথের বুড়ো পাহারাদার ষ্টেপান্ মিট্রিশ লিয়াপিস এখানে বাস করছে।" আমি বহুদিন ধ'রে ওই ডিপোতে কাজ করছি। আমার খুব বিরাট পরিবার ছিল—আমার স্ত্রী সন্তান প্রসবে খুব পারদর্শিনী। আর আমি শুধু হাসতাম—বলতাম, বাচ্চাগুলোকে বড় হ'তে দাও। মহাযুদ্ধে আমার চারটি ছেলে মারা গেছে; আর দুজনকে দস্যু গ্রিগোরিয়েভ গুলি ক'রে মেরেছে—তারা ছিল লালদের (কম্যুনিষ্টদের) দলে। বাকী রইল শুধু আমার একটি মেয়ে সাশা—তার এঞ্জিনিয়ারের সঙ্গে বিয়ে হ'য়েছে, আর একটি ছেলে ভ্যাসিলাই—যে রেল কারখানার ফোরম্যান। আর একটি ছেলে আছে ম্যাটভেই—তারই বাড়ীতে ছুটি কাটিয়ে আমি ফিরে যাচ্ছি। আমার মেয়ে সাশা প্রায়ই আমাকে দেখতে আসে—তার ছেলে মেয়ে—গোটা পরিবার সবশুদ্ধ। আর তার সঙ্গে তার স্বামীও আসে। ছেলেটি বড় বুদ্ধিমান। কি তার মাথা! সে এখন শিক্ষক—তাদের বাড়ীতে বই ছাড়া আর কিছুই নেই—সারা বাড়ী বইয়ে ভর্তি—ঈশ্বরের দিব্যি কুড়ি হাজার রুব্‌লের বই আছে। তোলযন্ত্র ছাড়া আমার যা' অবস্থা, বই ছাড়া তারও সেই অবস্থা। আর ম্যাটভেই তিন বছর সৈন্যদের দলে ছিল—সে এখন মেজর। দেখ, একমাস আগে আমি তার চিঠি পেলাম: "আমি সৈন্যদল থেকে বিদায় পেয়েছি। আমি বিয়ে করেছি এবং বর্তমানে আমি একটা জুতোর কারখানার ম্যানেজার। বাবা, তুমি আমার এখানে এস।" ষ্টেশন মাষ্টার আমাকে যাবার অনুমতি দিলেন: "যাও, যাও" তিনি আমাকে বললেন, "তুমি নড়াচড়া না ক'রে খুব বেশীদিন এখানে আছ।" কিন্তু আমার স্ত্রী সেকথা শুনবে না: "সারা জীবন তুমি এখান থেকে নড় নি' আর এখন তুমি মস্কো যেতে চাও? এই বৃদ্ধ বয়সে তুমি কোথায় যাবে?"

আমি তাকে বললাম : "বুড়ো আমি ? শোন, মস্কোতে আমি সব তরুণীর সঙ্গে প্রেম করব।"

বুড়ো হাসতে লাগলেন—আমরাও তাঁর সঙ্গে হেসে উঠলাম এবং হঠাৎ ন্যাটাশার কাঁধের সঙ্গে আমার গালের মৃদু সংযোগ হ'ল। 'অবশেষে বুড়ীকে বুঝিয়ে আমি যাত্রা করলাম....ম্যাটভেইর ফ্ল্যাট খুঁজে বের ক'রে দরজায় কড়া নাড়লাম। ময়লা রঙের একটি তরুণী এসে দরজা খুলে দিল। "বুড়ো, তুমি কি চাও ?" আমি তাকে বুঝিয়ে বললাম : "দেখ, আমি আমার ছেলে ম্যাটভেইকে দেখতে এসেছি।" সে আমাকে জড়িয়ে ধরে ব'লে উঠল : "ওঃ, ঠাকুর্দা এসেছেন।" তারপর সে আমার জিনিসপত্র নামিয়ে রেখে আমার জন্য চায়ের জল গরম করল। আমি ফ্ল্যাটটার চারদিকে তাকিয়ে দেখলাম—কেমন যেন ফাঁকা ফাঁকা। একটা টেবিল, কয়েকটা চেয়ার, একটা বিছানা...। একটা পোষাকের আলমারি—তাও যেন খালি—আর সেটা এত পাতলা যে মনে হয় ভেঙে পড়বে। এক ঘণ্টার মধ্যে ম্যাটভেই এসে পড়ল, রোদে পোড়া বলিষ্ঠ কালো চেহারা। সে যখন আমাকে আলিঙ্গন করল তখন আমার নিঃশ্বাস পড়ছিল না। সে বলল, "ত্যাখো, এই সবে মাত্র কাল আমি কাজ গ্রহণ করেছি—আমার কপাল খুব খারাপ।—এখানে আসার পথে কেমন ক'রে জানি না, আমার সব জিনিসপত্র হারিয়ে গেল। জন্মের সময় শিশু যেমন উলঙ্গ থাকে, লেনা আর আমি ঠিক তেমনি উলঙ্গ....," আর ন্যাটাশা তুমি যেমন ক'রে ফিরে তাকাচ্ছ, লেনাও ঠিক তেমনি তার দিকে ফিরে তাকাচ্ছিল', ঠাকুর্দা ষ্টেপান্ আমার দিকে দুষ্টুমিভরা চোখে তাকিয়ে বললেন।

ন্যাটাশা ফিরে গিয়ে তার বার্থের মধ্যে প্রায় ডুব দিল। আমি দেখতে পেলাম সে নীরবে হাসছিল।—বৃদ্ধ ষ্টেপান্ বললেন : 'ন্যাটাশা, রাগ কোরো না—আমি শুধু ঠাট্টা ক'রে একথা বললাম।' তারপর একটা সিগারেট ধরিয়ে তিনি আবার তাঁর গল্প ধরলেন—'ওদের দিকে তাকিয়ে আমার কত আনন্দ হ'ল—ওদের মধ্যে কত সরস বোঝাপড়ার সম্বন্ধ। কাজেই আমি ওদের সঙ্গেই থেকে গেলাম। মাঝে মাঝে মেয়ে সাশাকে দেখতে যেতাম। মেয়ে আমাকে গিয়ে তার বাসায় থাকতে বলে আর লেনা জোর ক'রে বলে যে

আমাকে তাদের সঙ্গেই থাকতে হবে। এ বিষয় নিয়ে প্রায় একটা ঝগড়াই হয়ে গেল। তাদের সব যুক্তি তর্ক শুনে আমার মন যেত মাখনের মত গলে। তার পর আমি একটা ব্যবস্থা করলাম—এক রাত কাটাব সাশার বাড়ীতে আর এক রাত লেনার ওখানে। থিয়েটার সিনেমা সর্বত্র ওরা আমাকে টেনে নিয়ে যেত। সাশা আবার বুড়ীর জন্য এক বোঝা জিনিষ কিনে দিল—তোমরা সে সব দেখেছ। এই সব উপহার দেখে লেনা হাসল—কিন্তু আমি তার চোখ জলে ভ'রে আসতে দেখলাম। আর ভাখো, সেই রাত্রে আমি শুনতে পেলাম লেনা ম্যাটভেইকে বলছে যে তার টাকা না থাকায় সে অত্যন্ত লজ্জিত, সে আমার বুড়ীকে কিছু দিতে পারল না—আমাকেও কিছু দিতে পারল না। অনেকক্ষণ ধ'রে এই সব বলতে বলতে সে কেঁদে ফেলল। ম্যাটভেই তাকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করল: "তুমি অপেক্ষা কর—দেখবে শীঘ্রই আমরা ধনী হব এবং তারপর ওঁকে সব দেব।"

'এদের কথাবার্তায় আমি প্রায় কেঁদে ফেললাম। ভাবলাম, "তোমাদের কথাই শ্রেষ্ঠ উপহার……।" এমনি ভাবে দিন কেটে গেল। আমি ফিরে আমার জন্য জিনিসপত্র গুছাতে লাগলাম, উপহারে সব বোঝাই হ'য়ে গিয়েছিল। ক্রমে আমার যাত্রার দিন ঘনিয়ে এল। কয়েকটা সসেজ নিয়ে ম্যাটভেই এল: "বাবা, এই নিয়ে গিয়ে মাকে দিও এবং আমাকে ক্ষমা কর যে মাকে দেবার মত আমার আর কিছু নেই। আমি গির্জার ইঁদুরের মত গরীব।" আমার মুখের দিকে তাকানোর সাহসও তার হ'ল না। আমি আনন্দে কেঁদে ফেললাম। লেনা তারপর পোষাকের আলমারিটা খুলে ওয়েষ্ট কোটগুলো বের ক'রে আমার হাতে দিল: "এই যে বাবা", সে বলল, "এগুলো আমারি বাবা আমার জন্য রেখে গিয়েছিলেন। এই উপহার দেবার জন্য রাগ করবেন না যেন।" আমি তাদের আলিঙ্গন করলাম—তারাও এক সঙ্গে হেসে এবং কেঁদে আমাকে আলিঙ্গন করল।'

গল্প বলতে বলতে ঠাকুর্দা একবার হাসছিলেন, একবার কাঁদছিলেন; তার গাল বেয়ে দাড়িতে চোখের জল গড়িয়ে পরতে লাগল। দেখলাম কাটাশাও চোখ মুছছে। সোলজারটি মুখ ফিরিয়ে নিল।

সূর্যাস্তের আগে আমরা নিপ্রোপেট্রোভস্ক পৌঁছলাম। এখানে সোল-

জারটির আমাদের ছেড়ে যাবার কথা। ভাবাবেগে অভিভূত হ'য়ে সে করুণ ভাবে আঙুল মটকাচ্ছিল—তার মুখের উপরকার ছায়াগুলো করছিল পরস্পরকে অনুসরণ। ধীরে তার ঠোঁট দুটি কাঁপছিল। আমরা দরজার পাশে বারান্দায় তার স্যুটকেশটা এগিয়ে দিলাম। তাকে দেখা মাত্র আমাদের গাড়ির দিকে প্ল্যাটফর্মের উপর দিয়ে একটি তরুণী দৌড়ে এল। স্ত্রীকে চিনতে পেরে সোলজারটি আর তার ভয় লুকিয়ে রাখতে পারছিল না। আগের চেয়ে বেশী খোঁড়াতে খোঁড়াতে সে গাড়ী থেকে নামার চেষ্টা করল এবং হোঁচট খেয়ে প্রায় পড়ার মত অবস্থা হ'ল। তার স্ত্রী তাকে উঠিয়ে চুমু খেয়ে তার মুখে হাত বুলাতে বুলাতে তার সঙ্গে মৃদু স্বরে কথা বলতে লাগল। ঠাকুর্দা ষ্টেপান চীৎকার ক'রে উঠলেন, 'আমি-ত তোমাকে আগেই এ কথা ব'লেছিলাম; দেখছ ত আমার কথাই ঠিক হ'ল। দেখলে ত', তোমার স্ত্রী তোমাকে ভাল-বাসে।' সোলজারটি তিনবার বৃদ্ধকে আলিঙ্গন করল। 'আমাকে দেখতে এস', ঠাকুর্দা ষ্টেপান্ বললেন, 'অবশ্য অবশ্য এস। ক্রিভোয়ারোগে প্রত্যেকটি কুকুর আমায় চেনে। যে কোন কুকুর তোমায় আমার বাড়িতে নিয়ে যাবে: এইখানে বৃদ্ধ ষ্টেপান বাস করে··· ··"

সোলজারও তার স্ত্রী পরস্পরের বাহু-বদ্ধ হ'য়ে ডিপো ত্যাগ ক'রে গেল—আমরাও আমাদের গাড়িতে ফিরে এলাম। তারা ইতিমধ্যেই গাড়িটা খুলে ক্রিভোয়ারোগ-গামী আরেকটা ট্রেনে জুড়ে দিচ্ছিল। ঠাকুর্দা ষ্টেপান্ যথারীতি তাঁর ওয়েষ্ট কোটগুলোকে আদর ক'রে শয্যায় আশ্রয় নেবার জন্য তৈরী হ'লেন······

ক্রিভোয়ারোগে পৌঁছানোর পূর্বে বুড়ো উঠে তাঁর সব ব্যাগ আর পোঁটলা তাড়াতাড়ি গুছিয়ে নিয়ে বার্থের কিনারায় ব'সে তাঁর বাড়িতে যাবার জন্য আমাদের অনুরোধ করতে লাগলেন। 'আমাদের ওখানে এখন কী চমৎকার জীবন—সবাই সুখী। কারখানা থেকে টাটকা মাখন পাবে আর বাজারে যা চাও তাই। এখন সাদা রুটি ছাড়া লোকে আর কিছু খায় না। আর কত সব গর্ভবতী মেয়ে। ন্যাটাশা, লজ্জা পেয়ো না, আমাদের এ পৃথিবীতে আনন্দ আর সুখ দেয় তো ওরাই—ঈশ্বরের দিব্যি আমি সত্যি কথাই বলছি।'

আমরা শিগ্‌গিরই তাঁর ওখানে যাবার প্রতিজ্ঞা ক'রে বৃদ্ধকে সাদর সম্ভাষণ

জানালাম। তারপর ক্রিতোয়ারোগে তাঁকে সঁপে দিলাম তাঁর বুড়ীর হাতে। মনে হ'ল বুড়ী যেন রোজই তাঁর প্রত্যাগমন প্রত্যাশা করছিলেন। প্রায় বারো মিনিটের জন্য গাড়ি দাঁড়াল। বৃদ্ধ এবং তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে আলাপ করার যথেষ্ট সময় আমরা পেলাম, কিন্তু কেন জানি না বৃদ্ধ যেন কেমন বিব্রত বোধ ক'রে তোৎলাতে সুরু করলেন আর তাঁর পোঁটলা পুঁটলি তুলে নিয়ে তাড়া-তাড়ি ষ্টেশন ত্যাগ ক'রে গেলেন। আমরা শেষবারের মত চীৎকার ক'রে বল্‌লাম, 'বিদায় ঠাকুর্দা, বিদায়। আপনার সুখ কামনা করি।'

গাড়ি আবার এগিয়ে চলল। বসন্ত-রাতের মতন ঈষদুষ্ণ রাত। গাড়ির খোলা জানালা দিয়ে আসছিল টাটকা ঘাসের গন্ধ। আমরা দুজন এত কাছাকাছি ব'সেছিলাম যে বাতাসে আমাদের পরস্পরের চুল যাচ্ছিল জড়িয়ে।

'চমৎকার বুড়োটি!' আমি বল্‌লাম।

'উনি নিশ্চয়ই খুব সুখী!' ন্যাটাশা বলল।

'ভেবে ভাখো, ন্যাটাশা, সুখী হ'তে মানুষের খুব কম জিনিসেরই দরকার হয়।'

ধীরে ন্যাটাশার গালে আমার গাল ঘসে' দিলাম। মৃদুস্বরে সে বলল, 'তুমি বরং শুতে যাও'।*

গোপাল ভৌমিক

* [তরুণ রুশ লেখক Nicolai Virtaর On a Journey গল্পের অনুবাদ]

কাগজের টাকা

আজকাল প্রায়ই আলোচনা শুনি inflationary অবস্থার আরম্ভ হয়েছে কি হয় নাই। সোজা বাংলায়, সরকার বাজারে বেশী নোট চালাবার জন্য জিনিষপত্রের দাম বেড়ে যাচ্ছে কি যাচ্ছে না এই হ'ল আলোচনার বিষয়। আলোচনা যাঁরা করেন তাঁদের মনের পেছনে একটা অর্থনৈতিক সূত্র বোধ হয় উঁকি ঝুঁকি মারে। সূত্রটা হচ্ছে, যদি বাজারে জিনিষপত্রের ও কেনাবেচার পরিমাণ একই রকম থাকে তবে যে পরিমাণ বেশী টাকা বাজারে চালান হবে ঠিক সেই পরিমাণে টাকার দাম বা ক্রয়শক্তি কমে যাবে। টাকার দাম কমা মানে সাধারণ ভাবে জিনিষের দাম বাড়া। সূত্রটী বহুবিদিত হলেও এর প্রয়োজনীয়তা বড় কম, কারণ, এ দিয়ে একটা অবস্থার বর্ণনা করা হয় মাত্র। কেমন করে এই অবস্থার উদ্ভব হয় এই সূত্রের সাহায্যে তা বার করা সম্ভব হয় না। সব জিনিষের দাম বাড়া আর বাজারে কি পরিমাণ টাকা চলছে এই দু'টোর ভেতর একটা সম্পর্ক আছে। কিন্তু থাকুক সম্পর্ক, কি বোঝায় তাতে? বেশী নোট চালাবার জন্যই যদি সব কিছুর দাম বেড়ে গিয়ে থাকে এবং নোট বেশী না চালালেই যদি দাম ঠিক থাকত তবে শুধু গণ্ডগোলের সৃষ্টির জন্য সরকার নোট বাড়াবে কেন? সত্যি সত্যি ব্যাপারটা হচ্ছে ঠিক উল্টো। জিনিষপত্রের দাম বেড়ে যাওয়ার জন্য সমাজে টাকার চাহিদা বেশী হয় এবং সরকারকে বেশী নোট চালাতে হয়।

জিনিষপত্রের দাম কেন বাড়ে? স্বানাভাবে সবগুলি কারণ নিয়ে আলোচনা করা সম্ভব নয় বলে দেশের বর্ত্তমান অবস্থার কয়েকটা কারণ নিয়েই আলোচনা করা যাক। এবারের দাম বাড়ার প্রধান কারণ যুদ্ধ। শান্তির সময় বিভিন্ন জিনিষের চাহিদা যে ধরণের থাকে যুদ্ধের সময় তা বদলে অন্য ধরণের হয়। কিন্তু দেশের উৎপাদন ব্যবস্থা অত তাড়াতাড়ি নতুন অবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে পারে না। এই সময়ে যুদ্ধোপকরণ ও সৈন্যদের রসদ ও পোষাক সম্পর্কিত মালের চাহিদা বিশেষ করে বাড়ে আর সেই সঙ্গে দামও বাড়ে। এই ধরণের শিল্প ও বাণিজ্যের সঙ্গে যারা সংশ্লিষ্ট তাদের উপার্জ্জন ও ক্রয়শক্তি

বাড়ে এবং আস্তে আস্তে দাম বাড়া সবদিকে ছড়িয়ে পড়ে। আমদানি রপ্তানির অসুবিধা, যানবাহনের অসুবিধা দাম চড়াতে আরও সাহায্য করে। সর্ব্বোপরি আসে speculation। কোনো জিনিষের দাম বাড়ছে দেখে ভবিষ্যতে আরও বাড়বে এই আশায় কতগুলি লোক সেই জিনিষ কিনে আটকে রাখে। আটকে রাখার জন্য তা' যখন দুর্মূল্য হয়ে ওঠে তখন ওরা মোটালাভে বিক্রি করে। যুদ্ধের সময় হঠাৎ একটা অদল বদল হয় বলে কিছুটা দাম বাড়ার কারণ থাকে কিন্তু যানবাহনের গণ্ডগোল আর speculation-এর চোটে অ-ন্যায্য কিছু হওয়া না হওয়া নির্ভর করে দেশের শাসনতন্ত্রের কর্ম্মনিপুণতার ওপর। সরকারী কর্ম্মনিপুণতার পরিচয় এবার এ পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নি। সুযোগে ব্যবসা ক'রে দু'পয়সা করে নেওয়ার তালে অনেকেই আছে। উপায়ও সর্বদা খুব সৎ নয়, বিবেক আর সামাজিক মঙ্গলের কথা ছেড়েই দিলাম। ভয় থাকে শুধু আইনের আর পুলিশের। আইন আর পুলিশ যদি সজাগ না থাকে তবে কেল্লামাৎ। এবার অজুহাতেরও অভাব নেই কারণ যানবাহনের বে-বন্দোবস্ত চরমে পৌঁছেচে। চারিদিকে আজ চড়া দাম আর সেই টানে ছড়িয়ে পড়ে সরকারও নোট বাড়াতে বাধ্য হচ্ছে।

দৈনন্দিন জীবনের সমস্যাই হোক, আর সামাজিক অথবা inflation-এর সমস্যাই হোক—সব কিছুর উত্তর নির্ভর করছে আর একটী প্রশ্নের উত্তরের উপর। প্রশ্নটি হচ্ছে এই যে, আজকের মুল্লুক ভারত সরকারের না মগের। প্রচলিত বাংলায় মগের মুল্লুক বা হরির লুট বল্লে একটা অবস্থা বুঝি যেখানে আইন কানুনের ধার কেউ ধারে না। আজকের বাজারে আইনের ধার কেউ ধারছে কি? দোকানে গিয়ে কর্তৃপক্ষের ধরা দামে জিনিষ চাইলে দোকানীরা হাসে। আইন আর পুলিশের ভয় দেখালে অবজ্ঞার কটাক্ষ হানে। বেশী দাম দিয়েই জিনিষ কিনতে হয়। ছাপার অক্ষর জীবন পেল না। এ ছাড়া নিত্যকার অনেক প্রয়োজনীয় জিনিষ ত সোজাসুজি পাওয়াই যায় না। চোরা বাজারে কিনতে হয়। ব্যবসায়ী বন্ধুরা চোখ টিপে বলে, আজব ব্যাপার, কিছুই নেই অথচ সবই আছে। বর্ত্তমানের আজব ব্যাপার জনসাধারণকে ঘায়েল করল। চাল, ডাল, আটা, তেল, কয়লা প্রভৃতি নিত্য ব্যবহার্য্য জিনিষের দাম সাধারণের কেনার শক্তির প্রায় বাইরে এসে দাঁড়িয়েছে।

কুইনিন আর অন্যান্য ওষুধ পাওয়া যদি যায় ত' কেনা কষ্ট। অবস্থা যে এরকম দাঁড়িয়েছে কর্তৃপক্ষ তা' অস্বীকার করেন না। সুবন্দোবস্তের চেষ্টাও সরকারীভাবে করা হয়েছে ও হচ্ছে কিন্তু সাফল্যের লক্ষণ এখনও দেখা যাচ্ছে না। বড়লাটের পরিষদের বাণিজ্যসদস্য সরকার মহাশয় আমাদের ভরসা দিয়েছেন যে খাদ্যাভাব দূর করার চেষ্টা গভর্ণমেন্ট প্রাণপণে করছেন। ব্যবসাদারদের অনুরোধ করা হয়েছে তারা যেন অনর্থক দাম বাড়িয়ে সাধারণের কষ্ট না বাড়ান। অনুরোধ আর ভরসা কর্তৃপক্ষের কেউ না কেউ অনেকদিন থেকেই দিয়ে আসছেন। কিছু করার চেষ্টাও যে হচ্ছে তার প্রমাণ এখানে ওখানে দেখা যায় এবং বিশ্বাসও করি; কিন্তু উদ্বেগ ও চেষ্টার তুলনায় সাফল্যের বহর দেখে বিশ্বাস করতে বাধ্য হতে হয় যে আসলে কর্ম্মকুশলতারই অভাব। সাধারণভাবে বেঁচে থাকার মত যে চাহিদা তার বিলিব্যবস্থাও যদি চালু রাখা না যায় তবে শাসনতন্ত্রের আসল কর্ত্তব্যেই ত ঘাটতি পড়ে।

উঠতি দামের রাশ সরকার টেনে রাখতে পারছেন না বরং সেই টানে পড়ে বাজারে কাগজের টাকা বাড়িয়েই চলেছেন। গত ৪ বছরের ডিসেম্বর মাসে Reserve Bank-এর বিবৃতি অনুসারে বাজারে কত নোট চলতি ছিল তার একটা তালিকা নীচে দেওয়া হ'ল।

	বাজারে চলতি নোটের মোট সংখ্যা (কোটী টাকা)	ব্যাঙ্কের তহবিলে সোনা ও সোনার মুদ্রার পরিমাণ (কোটী টাকা)
ডিসেম্বর ১৯৩৯ (বর্ম্মা নিয়ে)	২৩০	৪৪'৪
„ '৪০ („ „)	২৩৮	৪৪'৪
„ '৪১	৩০৪	৪৪'৪
২৫শে ডিঃ '৪২	৫৬০	৪৪'৪

১৯৩৯ সালে বর্ম্মা নিয়ে বাজারে নোট চলতি ছিল ২৩০ কোটী টাকার। দু'বছর পরে ১৯৪১ সালে শুধু ভারতবর্ষে নোট চলতি ছিল ৩০৪ কোটী টাকার আর একবছরের ভেতরই ১৯৪২ সালের ডিসেম্বরে সেই সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ৫৬০ কোটী টাকা। অথচ Issue Department-এর তহবিলে মোট সোনার

পরিমাণ সেই ৪৪ কোটী টাকারই আছে। নোট বাড়াবার সঙ্গে সঙ্গে অবশ্য sterling securities বাড়ান হয়েছে অর্থাৎ ইংলণ্ডের টাকার (পাউণ্ডের) বাজারে Reserve Bank-এর টাকার পাওনা বাড়ান হয়েছে। চলতি নোটের শতকরা সত্তর বা ততোধিক মূল্যের সোনা ও sterling securities Bank-এর Issue Department-এর তহবিলে সর্বদা থাকে। প্রকৃতপক্ষে সোনা ঠিক রেখে শুধু sterling securities-ই বাড়ান হয়। এটা অবশ্য বেআইনী কিছু নয়। Reserve Bank-এর আইনই করা হয়েছে এই ভাবে। তবে নোট চালাতে হলে একটা শতকরা অনুপাতে কিছু সোনা যে তহবিলে রাখতে হবে—যে উদ্দেশ্য নিয়ে এই নিয়ম সবদেশে প্রচলিত আছে—সেই উদ্দেশ্য বিফল হওয়ার সম্ভাবনা এখানে আছে।

সব টাকা যদি সোনারূপোর হ'ত তা'হলে টাকার অভাবে আজকালকার যুগে কেনা বেচাই চলত না, কারণ, সোনারূপোর পরিমাণ ব্যবসার তুলনায় কত আর একটা দেশে থাকে। সামন্ততন্ত্রের যুগে ব্যবসাবাণিজ্য যখন বাড়ছিল শাসনকর্তারা তখন সোনার খাঁটি টাকা চালাবার অসুবিধা বুঝছিল। অত সোনা কোথায় পাওয়া যাবে? তাই সোনা কম দিয়ে মুদ্রার ওপরে বেশী-দামের ছাপ দিয়ে দেওয়া হ'ত। মুদ্রার আসল দাম আর ধরে-দেওয়া দাম ভিন্ন হ'ল। ধরে দেওয়া দামের সমান সোনা যদি কেউ চায় তবে রাজকোষ থেকে তাই দেওয়া হবে। লোকের আস্থা হ'ল যে চাইলেই পাওয়া যাবে, তাই ভাঙাবার দিকে আর মন গেল না। কমদামের মুদ্রার বেশীদামের ছাপ-টাকা লোকে মেনে নিল। আসলে সবাই শাসনতন্ত্রের কথার ওপর বিশ্বাস রাখল। কাগজের টাকার গোড়ার ব্যাপারটাও তাই। নোট একটা প্রতিজ্ঞাপত্র মাত্র। টাকার ইতিহাস আরও একধাপ এগিয়ে গেছে। আজ আর নোটের বদলে সোনা পাওয়া যায় না। যতদিন একটা শাসনতন্ত্রকে লোকে মানবে ততদিন তার ছাপ দেওয়া কাগজের টাকাকেও মানতে হবে। সবদেশেই এই বন্দোবস্ত। কাগজ যোগাড় করে ছাপ দিতে যখন বেশী খরচের দরকার হয় না তখন একটা বিপদ রইল যে ব্যাণিজ্যের বিশৃঙ্খলায় জড়িয়ে পড়ে শাসন-তন্ত্র বেশী নোট চালিয়ে না দেয়। তাই একটা সীমারেখার বন্দোবস্ত হ'ল যে যত নোট বাজারে চালান হবে তার একটা নির্দ্দিষ্ট শতকরা মূল্যের সোনা

Bank-এর তহবিলে থাকবে। সীমায় এসে যখন পৌঁছুবে তখন যেন সরকার তাকিয়ে দেখে অর্থনৈতিক অস্বাস্থ্যের লক্ষণটা কোথায় ? যেন দেদার নোট চালিয়ে দিয়ে বিশৃঙ্খলার আসল কারণগুলিকে এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা না করে। নোটের মূল্যের শতকরা এতখানি সোনা রাখতে হবে—এই ব্যবস্থায় আর কিছু না হোক বিশৃঙ্খলার প্রারম্ভে সরকারকে একবার সাবধান করে দেওয়া হয়, আর এই ব্যবস্থা ভাঙলে জনসাধারণের চোখেও জিনিষটা পড়ে। আমাদের দেশে সোনার বদলে sterling securities বাড়ালেই হয়। সোনা অপেক্ষা sterling securities জোগাড় করা অনেক সহজ এবং অনেক নোট কাড়িয়ে সাধারণের চোখ এড়িয়ে যাওয়া আরও সহজ।

কাগজের টাকা অস্বাভাবিক ভাবে বেড়ে গেছে কিনা এবং তার জন্য আশু বিপদের সম্ভাবনা আছে কিনা—এই ধরণের আলোচনার মানে সামান্যই, কারণ রাজ্য যদি টেঁকে তবে কাগজের টাকাও টিকবে—সরকারী ব্যাঙ্কের তহবিলে সোনা থাকুক আর নাই থাকুক। জিনিষপত্রের দাম অসম্ভব বেড়ে যাওয়া আর বাজারে দেদার নোট চলা—এগুলি হচ্ছে সামাজিক অস্বাস্থ্যের লক্ষণ মাত্র। আসল কারণ সরকার আইন ও শৃঙ্খলা বজায় রাখতে পারছে কিনা সেইখানে। গত যুদ্ধের শেষের দিকে জার্মেনীতে জিনিষের দাম আর কাগজের টাকার পরিমাণ বাড়তে বাড়তে এমন অবস্থায় এসে পৌঁছেছিল যে নোটের দাম কাগজের দামের সমান হ'য়ে গিয়েছিল। এর কারণ ছিল রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা। বিলিব্যবস্থা সবই ভেঙে পড়েছিল। কাইজারের সাম্রাজ্যের পতন হ'ল।

রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক শৃঙ্খলার প্রশ্নই আজ আসল প্রশ্ন। চারিদিকের এত সুব্যবস্থা সত্ত্বেও, এত আবেদন করেও, সরকার কেন সাধারণের সাহায্য পাচ্ছে না ? পদে পদে সরকারী ব্যবস্থার এত খুঁত থাকে কেন ? যারা এতদিনেও ভাবেনি তাদের মনেও হয়ত আজ প্রশ্ন উঠে—এই রাজত্বের পেছনে উদ্দেশ্য কি ? জনসাধারণের মঙ্গলই যদি আসল উদ্দেশ্য হয় তবে সেই ছাঁচে সব ব্যবস্থার চালাই হয় না কেন ? বর্ত্তমান দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে সরকার যা' পারছে না, দৃষ্টিভঙ্গী বদলেও কি অক্ষমতা ততখানিই থাকবে ? যুদ্ধই হোক আর শান্তিই হোক সাধারণের মঙ্গলই সর্বপ্রধান উদ্দেশ্য কিনা এ প্রশ্ন করার অধিকার আমাদের সর্ব্বদাই থাকবে।

সত্যব্রত সেন

ভারতীয় সমাজ-পদ্ধতির উৎপত্তি ও বিবর্ত্তনের ইতিহাস

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

বেদের সূক্তকার ঋষিদের মধ্যে যখন কতিপয় বৈশ্যও ছিলেন তখন তাহারাও অন্যান্য বর্ণের ঋষিদের ন্যায় গোত্র প্রবর্ত্তক ছিলেন। কিন্তু পরে বৈশ্য শূদ্রত্বে অবনমিত হইল এবং ব্রাহ্মণ্য-বিধান এই মর্ম্মে জাহির হইল যে কলিযুগে ব্রাহ্মণ ও শূদ্র ব্যতীত বর্ণ নাই। কাজেই বৈশ্য যখন শূদ্র বলিয়া গৃহীত হইল তখন তাহার গোত্র আসিবে কি প্রকারে? কাজেই তাহার গোত্র তাহার পুরোহিত প্রদত্ত—এই মত জাহির করা হইল। পুনঃ বিজ্ঞানেশ্বর বলিলেন, ক্ষত্রিয়ের গোত্র নাই। ইহার অর্থ, হিন্দুর অধঃপতনের যুগে ব্রাহ্মণেরা বলিলেন—ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য নামক অপর দুইটি দ্বিজ জাতি নাই, শূদ্র ত শোক তাপ করিতেই জন্মিয়াছে। বৈদিক কৃষ্টির একমাত্র প্রতীক ব্রাহ্মণ, আর সেই ব্রাহ্মণ পুরোহিতের গোত্র সংজ্ঞাতিগুলি বহন করিবে। এই প্রকারে অন্যান্য বর্ণের পৃথক সত্ত্বা ব্রাহ্মণেরা উড়াইয়া দিলেন। এইরূপে পুরোহিততন্ত্র সমগ্র হিন্দু ভারতকে নিজেদের শোষণ নীতির কবলে আনয়ন করিলেন।

কিন্তু গোত্রের যদি যথার্থ জাতিতাত্ত্বিক অর্থ গ্রহণ করিতে হয় তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে হিন্দু পদ্ধতি অনুযায়ী একটি বংশ বা কুল (clan) প্রতিষ্ঠাতা হইতেছেন 'গোত্র প্রবর্ত্তক' এবং এই কুল হইতে অন্যান্য শাখা-প্রতিষ্ঠাতাদের বিভিন্ন গোত্র (কুল) সংস্থাপক বলা হয়, এবং হিন্দু পদ্ধতি অনুযায়ী তাহাদিগকে প্রবর বলা হয়। জাতিতত্ত্ব বলে, একই বংশ হইতে উদ্ভূত বিভিন্ন কুলগুলি সম্মিলিত হইয়া একটি জন বা কৌম (tribe) গঠন করে। এই কৌমটি এক বংশোদ্ভব বলিয়া নিজেদের মধ্যে বিবাহ না করিয়া অন্য কৌমের সহিত বিবাহাদি (exogamy) করে। পুরাণে এই সংবাদ প্রাপ্ত হওয়া যায় যে এক গোত্র ও প্রবরের লোক সমূহের মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ [মৎস্য-

ভৃগুদের বিভিন্ন গোত্রের মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ (১৯৫-৩৬) আঙ্গিরস গোত্রীয়দের পরস্পরের মধ্যে বিবাহ-বিধান নাই (১৬৯।১-২০) ইত্যাদি। ইহার অর্থ, সগোত্র বিবাহ (endogamy) নিষিদ্ধ। পুরাণোক্ত এই সংবাদটি অন্যদেশীয় এইপ্রকারের জাতিতাত্ত্বিক বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের ফলের সহিত মিলে। কিন্তু কথা ওঠে, বর্ণ-বিভাগ সম্পর্কে। উপরে আলোচনায় দেখা গিয়াছে যে অনেক ব্রাহ্মণ—ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য বংশ সমুদ্ভূত। তাঁহারা সকলেই গোত্র প্রবর্ত্তক। আবার পুরাণ বলিতেছে, পুরু বংশে (ক্ষত্রিয় গোষ্ঠী) ভরদ্বাজ, বিতথ নামে সেই কুলে উৎপন্ন হইলেন......সেই বিতথ...কৌশিক ও গৃহস্পতি নামে আরও দুই পুত্র উৎপাদন করেন, ব্রাহ্মণগণ, ক্ষত্রিয়গণ, বৈশ্যগণ...গৃৎসপতির তনয়গণ (অগ্নি, ২৭৮।৯-২২)। এই উক্তি দ্বারা উক্ত তিন বর্ণের লোকদের উৎপত্তি যে এক তাহা স্বীকৃত হইয়াছে। তাহা হইলে বৈশ্যবর্ণোদ্ভব বর্ত্তমানকালের ব্যবসায়ী, শিল্পী, কৃষিজীবি জাতি সমূহের গোত্র যে আর্ষেয় হইবে তাহাতে আশ্চর্য্যান্বিত হইবার কিছুই নাই। উপরে ইহাও দেখা গিয়াছে, লোকে পদ, বর্ণ বা জাতি পরিবর্ত্তন করিলেও স্বীয় 'গোত্র' পরিবর্ত্তন করে নাই। এমন কি, 'টটেম' গোত্রগুলি স্বীয়রূপে অথবা বিকৃতরূপে অনেক জাতির মধ্যে এখনও চলিতেছে। নগেনবাবুর উক্তি—'নাগর পুষ্পাঞ্জলী' এবং 'নাগরোৎপত্তি' পুস্তক দুইটি মতে যেসব নাগর ব্রাহ্মণ ব্যবসায়-বৃত্তি গ্রহণ করে তাহারা 'নাগর বেনিয়া' নামে অভিহিত হয় (এই বিষয়ে ডাঃ গুহের নরতাত্ত্বিক অনুসন্ধান দ্রষ্টব্য)। তাঁহার (নগেনবাবু) মতে, এই প্রকারে সপাদলক্ষ, অহিচ্ছত্র বা নাগর ব্রাহ্মণেরা বিভক্ত হইয়া ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বেনিয়া জাতিদের মধ্যে বৃত্তি অনুযায়ী প্রবেশ করিয়াছে (১)। তাঁহার মতে "এইজন্যই বাঙ্গলার কায়স্থ, বৈদ্য, গন্ধবণিক, সুবর্ণবণিক, শঙ্খবণিক, কাংসবণিক, জাতিদের মধ্যে নাগর ব্রাহ্মণোচিত পদবী ও গোত্র প্রাপ্ত হওয়ায় অনুমিত হয় যে গুজরাটের ন্যায় তাহাদের মধ্যেও কিঞ্চিৎ নাগর ব্রাহ্মণের রক্ত প্রবাহিত হইতেছে (২)।"

এই যুক্তি ঠিক হইলে পুনঃ দেখা যায় যে, বর্ণ বা জাতি পরিবর্ত্তন করিলে লোক গোত্র পরিবর্ত্তন করে না। তবে বৈদিক যুগ হইতে দেখা যাইতেছে যে

১-২। N. N. Vasu—Op. cit., Vol. III, P 137-138.

দত্তকপুত্র গ্রহণকালে (শুনঃশেপ ; গৃৎসমদের দৃষ্টান্ত) লোকের গোত্র পরিবর্ত্তিত হয়। কাজেই বর্ত্তমানের শূদ্র নামে অভিহিত জাতিসকল যে অর্ধেয় গোত্র বহন করিতেছেন তাহা প্রাচীনকালের দ্বিজবর্ণগণের ও তাহাদের এক উৎপত্তি বলিয়াই সম্ভবপর হইয়াছে এবং প্রাচীন বিভিন্নবর্ণের লোক বর্ত্তমানের নানা জাতির মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে বলিয়াই এই সৌসাদৃশ্য প্রাপ্ত হওয়া যায় বলিয়া ধরিতে হইবে।

ব্রাহ্মণ গোত্র শূদ্রের ভিতর কি প্রকারে আসিয়াছে তাহা নিম্নোক্ত দৃষ্টান্ত হইতে অনুমান করা যাইতে পারে। খৃষ্টীয় ৬৫০ শতাব্দীতে বাঙ্গলার ত্রিপুরা জেলায় লোকনাথ নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার প্রদত্ত একটি তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহাতে যে সমাজতাত্ত্বিক সংবাদ প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহা তৎকালীন সমাজের উপর আলোক সম্পাত করে।

লোকনাথের প্রপিতামহ ভরদ্বাজ ঋষির সন্তান বলিয়া দাবী করিয়াছেন। তাঁহার মাতার প্রপিতামহ ও পিতামহদের "দ্বিজবরা দ্বিজসত্তমা" বলা হইয়াছে (Verse 6)। কিন্তু লোকনাথের পিতা "পারশব," অর্থাৎ তিনি অনুলোম বিবাহ-জাত নিকৃষ্ট শূদ্রে অবনমিত হইলেন। আর ভরদ্বাজ ঋষির বংশধর লোকনাথ স্বয়ং 'করণ' (Verse 9). বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন। এখন প্রশ্ন উঠে, লোকনাথের মাতামহ "পারশব" শ্রেণীতে অবনমিত হইয়া কি পৈতৃক গোত্র পরিত্যাগ করিয়াছেন? লোকনাথ কায়স্থ শ্রেণীয় হইয়া কি পৈতৃক ঋষি গোত্র হইতে বঞ্চিত হইয়াছিলেন? *

বর্ত্তমানের একটা জাতি (caste) পাঁচ ফুলের সাজির ন্যায়; প্রাচীন বিভিন্ন বর্ণের লোক এক পেশা অবলম্বন করিয়া বিবর্ত্তনের ধারায় একটি 'গিল্ড' গঠন করে এবং কালে তাহা বর্ত্তমান যুগে caste-এ (জাতি) পরিণত হইয়াছে। এই-জন্য প্রাচীন বর্ণ সমূহ হইতে বিভিন্ন গোত্রীয় লোক সমূহের বংশধরদিগকে বর্ত্তমানের এই সকল জাতি মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। এক-একটা জাতি এক-একটা পৃথক মূলজাতীয় (racial element বা biotype) বা জাতিতাত্ত্বিক সমষ্টি (ethnic unit) নয়; কাজে কাজেই, আজ তথাকথিত উচ্চ জাতিদের

* Tipperah Copper-plate Grant of Lokenath in Epigraphica Indica, Vol. 15, Pp. 303—306.

মধ্যে (ব্রিটিশ শাসকবর্গ কর্ত্তৃক কথিত 'Caste Hindus') সমগোত্র পাওয়া অসম্ভবও নয় এবং আশ্চর্য্যও নয়।

শারীরিক নরতত্ত্ব বা জাতিতত্ত্বর চাবি দিয়া অনুসন্ধান করিলে এই তথ্য সুস্পষ্ট হইবে এবং সামাজিক ইতিহাসের দিক দিয়া অনুসন্ধান করিলে এই সত্যই প্রকাশ পাইবে, যে ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্য বর্ণ সমূহের অথবা শূদ্রদের গোত্র নাই—এই দাবী পুরোহিততন্ত্রের নিছক ধাপ্পাবাজী মাত্র। এই গোত্র সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধান প্রয়োজন। কারণ এতদ্বারা ভারতীয় জাতিতত্ত্বের উপর নূতন আলোক সম্পাত করিবে। অনেক তথাকথিত শূদ্রের এখনও গোত্র নাই বলিয়া কথিত হয় এবং অনেক 'নূতন-হিন্দু' জাতি যে আর্য্যের গোত্র গ্রহণ করিয়াছে সেই তথ্যও উপরে প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। কোন অনুসন্ধানকারী পরিব্রাজক লেখককে বলিয়াছেন যে পাঞ্জাবের অশিক্ষিত হিন্দু জাঠদের গোত্র নাই। তাহারা কৌমের নামেই পরিচিত হয়। গোঁড়া হিন্দুরা ইঁহাদের হাতে জল খায় না। শিক্ষিত জাঠেরা ব্রাহ্মণ্য প্রভাবে নিজেদের গোত্র তৈয়ারী করিতেছেন।

এই তথ্যের সঙ্গে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের একটা বড় অনুষ্ঠান বিজড়িত রহিয়াছে—তাহা হইতেছে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের conversion policy, অর্থাৎ অন্য জাতীয় বা ধর্ম্মের লোকদের স্বীয় সমাজ শরীরে গ্রহণ করিবার নীতি।

হিন্দুর পারিবারিক জীবনে গোত্রের সহিত অন্যান্য কতকগুলি অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠান (institutions) বিজড়িত আছে। এইগুলি হইতেছে, সপিণ্ড, সকুল্য, সমানোদক, সগোত্র এবং সমান-প্রবর। যাহাদের মধ্যে এইগুলি এক (common) তাহারা উক্ত সম্বন্ধে পরস্পরের সহিত আবদ্ধ। এই বিষয়ে পরলোকগত গোলাপচন্দ্র শাস্ত্রী (৩) মহাশয় বলিয়াছেন, 'গোত্র' শব্দটি 'গো' এবং 'ত্র' (রক্ষা করা) শব্দের যোগে সৃষ্ট। ইহার অর্থ, যাহা গরুকে রক্ষা করে, অর্থাৎ গোচর জমি (pasturage), 'উদক' অর্থে জল কিম্বা জলাশয়—যেমন, পুষ্করিণী বা কূপ বুঝায়। 'কুল্য' শব্দের মূল 'কুল' (ল্যাটিন্ Colo) হইতে উদ্ভূত

৩। Golap Chandra Sarkar Sastry—A Treatise on Hindu Law. 5th Edn., 1924. P. 107-108

হইতে পারে। ইহার অর্থ কর্ষণ বা চাষ করা; এতদ্বারা চাষের জমি বুঝায়; আর 'পিণ্ড' শব্দের অর্থ হইতেছে 'খাদ্য'।

মনু (৮।২৩৭—২৩৯) এবং যাজ্ঞবল্ক্য (২।১৬৬—১৬৭) গ্রাম পত্তন বিষয়ে যে নির্দ্দেশ করিয়াছেন তাহাতে উক্ত হইয়াছে যে গ্রামের যেস্থলে বসত বাটী-গুলি অবস্থিত তাহার পার্শ্বদেশে কৃষি জমি বাদ দিয়া একটুকরা জমি (৪০০ কিউবিট্ দীর্ঘ) গোচারণের জন্য আলাদা করা থাকিবে। এই বিষয়ে শাস্ত্রী মহাশয় বলিয়াছেন, যদি ধরিয়া নেওয়া যায় যে একটি গোষ্ঠি দ্বারা একটি নূতন গ্রাম স্থাপন করা হইত এবং ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে গ্রীষ্মপ্রধান দেশে গোচারণ ভূমি ও জলাশয় অবশ্য প্রয়োজনীয়; আর হিন্দু আইনে উহার ভাগ করা যাইত না, তাহা হইলে 'সগোত্র' ও 'সমানোদক' (৪) শব্দ দুইটির এই অর্থ করিতে পারা যায়—একটি গোষ্ঠীর সকল লোক-সমষ্টি যাহারা গোচর-ভূমি এবং জলাশয়গুলি সাংসারিক ও কৃষিকর্ম্মের জন্য সাধারণ-ভাবে অথবা যৌথভাবে (holding in common) ব্যবহার করিত। 'সকুল্য' অর্থে যাহারা যৌথভাবে জমি চাষ করে এবং 'সপিণ্ড' অর্থে যাহারা একত্রে সংসার (common mess) করে। যখন গোষ্ঠীর সংখ্যা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় তখন সর্ব্বপ্রথম পৃথক সংসার স্থাপিত হইবে; কিন্তু বিষয় বা কুল্য যাহা বেশীরভাগ জমিতে আবদ্ধ তাহা তখনও যৌথভাবে চাষ চলিবে এবং উৎপন্ন শস্য বখরা অনুযায়ী বন্টন হইবে। ইহাও অসুবিধাজনক বিবেচিত হইলে লোকে গোষ্ঠীর জমি বিভক্ত করিবে, যদিচ 'গোত্র', অর্থাৎ গোচারণের 'জমি' এবং 'উদক', অর্থাৎ জলাশয়গুলি এক বংশজাত দূরসম্পর্কীয় (distant agnate relations) জ্ঞাতিদের মধ্যেও যৌথ থাকিবে। শাস্ত্রী মহাশয় বলেন, বৌধায়ন (৫) এবং ব্রহ্মপুরাণের 'অবিভক্ত ধনাস্থেতে সপিণ্ডাঃ পরিকীর্ত্তিতা' (৬) শ্লোকগুলি দ্বারা এই অর্থই আন্দাজ করা যায়।

৪। "সপিণ্ডতা সমানোদক ভাবস্ত...ততপরং গোত্রমুচ্যতে" (the word 'Gotra' is declared to comprise these (i. e. Sapindas and Samanodakas)—Vrihat Manu cited in the Mitakshara 2, 5, 6 quoted by Shastri, P65.

৫। "অবিভক্ত দায়াদান্ সপিণ্ডান্...বিভক্ত দায়াদান্ সকুল্যান্ আচক্ষ্যতে"—দায়ভাগধৃত বৌধায়ন বচনম্ Quoted by Sastri, P65.

৬। Quoted by Sastri—Op. cit. P73.

উপরোক্ত এই ব্যাখ্যা দ্বারা শাস্ত্রোক্তি বলিতেছেন যে ইহা দ্বারা Village Community Systemর (গ্রাম্য সমাজ-পদ্ধতি) (৭) সহিত ইহাদের সম্ভবতঃ সম্পর্ক বাহির করা যাইতে পারে (৮)। কিন্তু ইতিপূর্ব্বে দেখা গিয়াছে যে বেডেন পাউএল এবং তৎপরবর্ত্তী অনুসন্ধানকারীগণ বলেন যে ভারতে প্রাচীন জমি-বিলি পদ্ধতি ছিল "রায়তারী প্রথা" অনুযায়ী। অশোকের সময় হইতে বিজয়নগর রাজত্বের শেষকাল পর্য্যন্ত শিলা ও তাম্রলিপি সমূহে জমিবিলি ব্যবস্থা বিষয়ে অন্য প্রকারের সংবাদ প্রাপ্ত হওয়া যায়। জমি রাজারই ছিল বলিয়া অনুমান হয়। ইহার অর্থ, একটি গোষ্ঠী প্রথমে একটি গ্রাম স্থাপন করিত এবং সেই গ্রামটি সেই বংশেরই সম্পত্তি হইত। পুনঃ উক্ত লেখক—হিন্দুর প্রথমাবস্থায় যৌথভাবে গ্রাম্য সমাজ-নিয়ন্ত্রণ-পদ্ধতি ছিল, মেইনের এই মত খণ্ডন করিয়া বলিয়াছেন যে জমিতে ব্যক্তিগত অধিকারই ছিল, tribal communism (কৌমগত কম্যুনিসম্) প্রতিষ্ঠানের চিহ্ন প্রাপ্ত হওয়া যায় না। বস্তুতঃ মরগান বর্ণিত উক্ত প্রতিষ্ঠানটির প্রমাণ বৈদিক সাহিত্যে পাওয়া যায় না। কিন্তু উপরোক্ত ব্যাখ্যা দ্বারা ইহা নির্দ্ধারণ করিতে পারা যায় যে, যদি এক গোষ্ঠী (গোত্র) বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে একটা বড় কুল (clan) হয়, তাহা হইলে 'সমানোদক' (একটি লোকের তের পুরুষ অধস্তন বংশধরগণের মধ্যে তের পুরুষ ব্যবধান রূপ সম্পর্ক) সম্পর্কে clan communism ছিল বলিয়া ধরিতে হইবে। ইহাকে tribal communism-এর চিহ্ন বলিয়া ধরিলে ধরা যাইতে পারে। কিন্তু 'সকুল' ও 'সপিণ্ড' ব্যাপারে family communismএর চিহ্ন প্রাপ্ত হওয়া যায় বলিয়াই অনুমিত হয়। পৈতৃক দায় সম্বন্ধে মিতাক্ষরা আইনও family commuuism-এর লক্ষণ প্রকাশ করে; আর যৌথ পরিবার (joint-family) সম্বন্ধে মিতাক্ষরা ও দায়ভাগ আইনে গোষ্ঠীগত কমুনিসমের লক্ষণ প্রকাশ পায়। এই অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠানগুলি হিন্দুর সুদূর অতীতের স্মৃতি বহন করিয়া তাহার স্কন্ধে চাপিয়া বসিয়া আছে। এইগুলির গুণগত কর্ম্ম (function) আর নাই, আছে শুধু কাঠামোটি (structure) ভগ্নাবশেষ। এই ব্যাপারে বিস্মৃত জাতিতাত্বিক অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠানগুলি অর্থশূন্য অবস্থায় ধর্ম্মের সঙ্গে বিজড়িত হইয়া হিন্দুকে আজ ভারাক্রান্ত করিয়া তুলিয়াছে। ক্রমশঃ

শ্রীভূপেন্দ্রনাথ দত্ত

৭। দক্ষিণ-ভারতে গ্রাম্য-কমিটি যাহাকে "সভা" বা "মহাসভা" বলা হইত তাহাই ছিল। এই সভা মাত্র স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসন পরিচালনা করিত। South-Indian Inscriptions Vol. III, Pt. I, p2.

৮। Shastri—Op. cit. P107.

এক রাজনৈতিক গোষ্ঠীপতি-কে

তোমার যে পরিচয়, সে নয় তোমার।
সে বিরাট জনতার আন্দোলনে ভাসে।
ব্যক্তি নয়, বক্তা তুমি; গুরু কর্মভার
তোমাকে চারিত্র্য দেয় বিপ্লবী প্রয়াসে।
তোমার গৌরব জেনো আজ অনেকের,
দায়িত্ব অশ্বত্থ যেন আকাশ প্রসারী,
দিনে রাতে অঙ্গে নিজে ওঠে তার ঘের॥
ভবিষ্যতে জলসত্র হবে সারি সারি।
আপাতত স্বাভাবিক কর্মিষ্ঠ আবেগে
গোঁড়ামি প্রশ্রয় দেয়, হয়তো অজ্ঞান।
গোষ্ঠীর গর্বের ধারে যদি মরি লেগে
উন্নাসিক তোমাদের সঙ্গ রাখি দূরে।
নূতন ব্রহ্মণ্যতেজ বিপ্লব মুকুরে
আত্মসাৎ করে শেষে দিও কাছে টান॥

বিষ্ণু দে

প্রস্তুত

কালো মৃত্যুরা ডেকেছে আজকে স্বয়ম্বরায়,
নানা দিকে নানা হাতছানি দেখি বিপুল ধরায়—
ভীত মন খোঁজে সহজ পন্থা, নিষ্ঠুর চোখ,
তাই বিষাক্ত আস্বাদময় এ মর্ত্য লোক ;
কেবলি এখানে মনের দ্বন্দ্ব আগুন ছড়ায়।

অবশেষে ভুল ভেঙেছে, জোয়ার মনের কোণে,
তীব্র ভ্রূকুটি হেনেছি কুটিল ফুলের বনে ;
অভিশাপময় যে সব আত্মা আজো অধীর
তাদের সকাশে রেখেছি প্রাণের দৃঢ় শিবির ;
নিজেকে মুক্ত ক'রেছি আত্মসমর্পণে।

চাঁদের স্বপ্নে ধুয়ে গেছে মন যে সব দিনে,
তাদের আজকে শত্রু ব'লেই নিয়েছি চিনে,
হীন স্পর্ধারা ধূর্তের মত, শক্তিশেলে—
ছিনিয়ে আমায় নিতে পারে আজো সুযোগ পেলে,
তাই সতর্ক হয়েছি মনকে রাখিনি খপে।

অসংখ্য দিন কেটেছে প্রাণের বৃথা রোদনে,
নরম শোফায় বিপ্লবী মন উদ্বোধনে ;
আজকে কিন্তু জনতা জোয়ারে দোলে প্লাবন—
নিরন্ন মনে রক্তিম পথ অনুধাবন
করছে পৃথিবী পূর্ব-পন্থা সংশোধনে।

অস্ত্র ধ'রেছি, এখন সমুখে শত্রু চাই,
মহা-মারণের নিষ্ঠুর ব্রত নিয়েছি তাই ;
পৃথিবী জটিল, জটিল মনের সম্ভাষণ,
তাদের প্রভাবে রাখিনি মনেতে কোনো আসন—
ভুল হবে জানি তাদের আজকে মনে করাই।

সুকান্ত ভট্টাচার্য

পুস্তক-পরিচয়

সাধারণী *

গত কয়েকমাস যাবৎ একটা প্রশ্ন কেবলই মনে উঠছে। তিন চার বছর আগে 'প্রগতি' সাহিত্যের ধুয়ো শুনি। সে সম্বন্ধে কাণাঘুষোও চলেছিল কিছু, কেউ বলেছিলেন সাহিত্য সাহিত্য, তার আবার প্রগতি কি? কেউ উত্তর দিলেন জীবনের সহযোগেই সাহিত্যের সার্থকতা, এবং সে-জীবন যখন বদলাচ্ছে তখন সাহিত্যের বিষয় ও রূপও বদলাবে নিশ্চয়। প্রগতিশীল সাহিত্যিকরা দলবদ্ধ হতে চেষ্টা করলেন, দু'একখানা পত্রিকাও বেরুল, তারপর যুদ্ধের হাঙ্গামা সুরু, ২২শে জুন হিটলার রাশিয়াকে আক্রমণ করলে, কম্যুনিষ্ট পার্টি আইনসঙ্গত হ'ল, (পার্টির কার্য অবশ্য বে-আইনী রইল) সঙ্গে সঙ্গে প্রগতি গতি পেলে, খানিকটা মতিও এসে পড়ল বৈকি। মতি যোগাড় দিলে মার্ক্সিজম। খানিকটা, কারণের মধ্যে সোভিয়েট-প্রীতিটাই বেশী। এগুলো ঘটনা, অতএব তর্কাতীত। এখন প্রশ্নটা হল, আমাদের আধুনিক প্রগতিশীল সাহিত্যে মার্কসিজম্-এর প্রভাব কতটুকু? আমি এমন উত্তর চাই না যার সাহায্যে কোন বিশেষ রচনাকে প্রগতি (বিপ্লব)-বিরোধী নাম দিয়ে অগ্রাহ্য করতে পারি। যাঁরা পার্টির সভ্য হয়ে কাজে নেবেছেন তাঁদের পক্ষে সূক্ষ্ম মতান্তরতার মূল্য অনেক। সাহিত্যে কিন্তু ততটা মূল্য যখন নেই

১। চঞ্চলকুমার চট্টোপাধ্যায়—বসুন্ধরা (কবিতাভবন, ৮৹)।

২। সমর সেন—নানাকথা (কবিতাভবন ১৸৹)।

৩। কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়—শিবির (কবিতাভবন, ১৷৹)।

৪। গোপাল হালদার—সংস্কৃতির রূপান্তর (পুঁথিঘর, ২২, কর্ণোয়ালিশ ষ্ট্রীট, ২৷৹)

৫। W. Friedman—World Revolution and the Future of the West (Thinkers Library, 3/6.)

৬। R. N. Anschen—Freedom, Its Meaning (George Allen & Unwin.)

৭। বসময় দাশ—অন্তঃশীলা।

৮। সুধীর কর—চিত্রভাস্থ।

তখন প্রাথমিক দৃষ্টিভঙ্গীটাই বিচার্য্য, অর্থাৎ তারই দ্বারা প্রমাণ হবে প্রভাবটি বেশী না কম।

কবিতাতেই যেন মার্কসিজম প্রচারিত হচ্ছে বেশী। অন্ততঃ সমর সেনের 'নানা কথা', চঞ্চলকুমারের 'বসুন্ধরা', বিষ্ণু দে'র 'পূর্ব্বলেখ' ও '২২শে জুন' প্রভৃতি আধুনিক কবিতার বই, 'কবিতা', 'নিরুক্তে'র ইদানীংকার সংখ্যা প্রভৃতি দেখে তাই মনে হওয়া স্বাভাবিক। কামাক্ষীপ্রসাদের 'শিবির'কেও এই দলে ফেলা যায়। অবশ্য রসময় দাসের 'অন্তঃশীলা' ও 'সুধীর বাবুর 'চিত্রভানু' সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরণের রচনা, যার মধ্যে মতবাদ নেই বলব না, তবে যা আছে তাতে আমরা এতই অভ্যস্ত যে তার অস্তিত্বটা আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে খোঁচায় না। অর্থাৎ সেজন্য হয়ত দোষটা যত আমাদের চোখের কৃতিত্ব, ততটা তাঁদের রচনারই নয়। তবে এটা নিশ্চিত যে 'অন্তঃশীলা' ও 'চিত্রভানু'তে মার্কসিজম্-এর নাম গন্ধ নেই। বই দু'খানি এই হিসেবে পবিত্র। 'পবিত্র' কবিতা ভাল কি মন্দ বলছি না। সাহিত্যিক গতির নির্দেশ হিসেবে যখন আলোচনা করছি তখন ভিন্ন মুখের চিহ্ন হবার জন্য পবিত্র কবিতা একটু অতিরিক্ত রকমের ভাল হলেই সুবিধে হয়। 'অন্তঃশীলা' ও 'চিত্রভানু'তে একাধিক উপভোগ্য কবিতা রয়েছে নিশ্চয়, কিন্তু তাদের কাব্য-গুণ এমনই অপূর্ব্ব নয় যে আমাদের মনকে এই যুগপ্রবাহ থেকে সহজে বিচ্ছিন্ন করতে পারে। প্রগতিশীল কবিতায় অনেক বাজে লেখা চলেছে, তবু যেন সমষ্টিগত ভাবে এই সব দ্বিতীয় শ্রেণীর রচনাও জীবন্ত। ওরা যেন ঘাটের মন্দির, পুরাতন বলেই সুন্দর, এরা যেন নদীর স্রোত, কাদাকুড়ো সত্বেও স্রোত।

Anti-Fascist সোভিয়েট বন্ধুদের একাধিক পুস্তিকাও পড়লাম। তাঁরা ত মার্কসিষ্ট হবেনই। মার্কসিষ্ট না হলে ফ্যাশিজম্-এর ধর্ম্ম বোঝা যায় না এবং তার বিপক্ষে লড়াও যায় না। মাত্র 'উদার' মতাবলম্বীর কাজ নয় ওটা। ঔদার্য্যের ইতিহাস ধনিকতন্ত্রেরই সঙ্গ, যে-ধনিকতন্ত্রের বিকৃত অথচ পূর্ণ রূপ ঐ ফ্যাশিজম। হাতের কাছে চমৎকার প্রমাণ পেলাম। "World Revolution and the Future of the West" এবং "Freedom—Its Meaning" নামে দু'খানা অত্যন্ত সুলিখিত বই পড়লাম। প্রথমটির লেখক W. Friedman, লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনের অধ্যাপক, এবং দ্বিতীয়টির সম্পাদিকা

Ruth Nanda Anschen, যাঁর জন্য পৃথিবীর উনিশ জন দিগ্‌গজ প্রবন্ধ লিখেছেন কিংবা পুরানো প্রবন্ধ দিয়েছেন, স্বাধীনতা বিচার করে। এঁদের মধ্যে কেউই ফ্যাশিজম-এর ভক্ত নয়, এবং হগ্‌বেন ও হল্‌ডেন ভিন্ন আর কেউই মার্ক্‌সিষ্ট নয়। ল্যাস্‌কীকে কোন দলে ধরব জানি না। কেবল তাই নয়, ঐ ক্রীডল্যাণ্ড, আইনষ্টাইন, টম্যাস মান্‌, সাল্‌ভেমিনি বার্ণষ্টাইন, প্রত্যেকেই ফ্যাসিজম-এর হাতে বিধ্বস্ত হয়েছেন। বার্ট্রাণ্ড রাসেলের স্বাধীনতা-প্রীতি কে না জানে। অথচ, এঁদের অমন পাণ্ডিত্যপূর্ণ লেখাও যেন ফাঁকা মনে হল। রাসেলের প্রবন্ধ ঝকমক করছে, কিন্তু তবু যেন কোথা থেকে গিল্‌টীর আওয়াজ কানে আসে। রাসেল লিখছেন :

"Karl Marx as a religious leader, is analogous to both Confucius and Bentham. His ethical doctrine, in a nutshell, is this : that every man pursues the economic interest of the class, and therefore, if there is only one class, every man will pursue the general interest. This doctrine has failed to work out in practice as its adherents expected, both because men do not in fact pursue the interest of their class, and because no civilized community is possible in which there is only one class, since government and executive officials are unavoidable."—অতএব রাসেলের সিদ্ধান্ত যে- এই হবে তাতে আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই : "But if government is not to be tyrannical, it must be democratic, and the democracy must feel that the common interests of mankind are more important than the conflicting interests of separate groups. To realize this state of affairs completely would be scarcely possible, but since the problem is quantitative a gradual approach may be hoped for." এই ধরণের লেখার চেয়ে হগবেন, হল্‌ডেন-এর লেখায় অনেক বক্তব্য আছে। এমন কি ম্যারিটাঁ-র মতন লেখকের মধ্য-যুগীয় মনোভাবও এর চেয়ে অনেক বেশী সারগর্ভ। যদিও তাঁর বিশ্লেষণ দেখলে ভট্টপল্লীর কথা মনে ওঠে···কলের ধোঁয়ার সঙ্গে যজ্ঞের ধূম্র, কলের বাঁশীর সঙ্গে বৈদিক মন্ত্র এবং গঙ্গার পবিত্র জলের ওপর কলের তেলের রঙ বাহার। ব্যাপারটা এই : মার্কসিষ্ট না হলে ফ্যাশিজম্‌-এর আসল প্রকৃতি বোঝা যায় না।

কাব্য-সমালোচনা ও তাত্ত্বিক আলোচনাতেও মার্কসিষ্ট দৃষ্টিকোন ধরা পড়েছে দেখলাম। প্রমাণ স্বরূপ পরিচয়, নিরুক্ত, কবিতা, চতুরঙ্গ, অরণি ও আনন্দ-বাজারের প্রবন্ধ দাখিল করছি। হুমায়ুন কবিরের 'বাঙলার কাব্যে' অন্যান্য বহু বক্তব্যের মধ্যে মার্কসিজমের দিকে ঝোঁক রয়েছে, যদিও সেটা অন্যান্য ঝোঁকের জোরে বেশী খুলতে পায়নি, বরঞ্চ এক এক জায়গায় কাটাকাটি হয়ে গেছে—যথা 'হিন্দু মানস', 'মুসলমান মানস'। মার্কসিষ্ট এই ধরণের group mind কিংবা ethos মানতে পারে না। তবু তাঁর বইটাকে ধরতে হবে। সর্ব্বোপরি মেয়েদের চালিত পত্রিকার রচনা। এই সবের মধ্যে কম লেখাই উচ্চাঙ্গের, কিন্তু সর্ব্বত্রই সোশিয়ালিষ্ট চিন্তার ছাপ স্পষ্ট। অবশ্য যাঁরা মনস্থ করেছেন যে বিশুদ্ধ সাহিত্য-চর্চ্চাতেই মগ্ন থাকবেন তাঁদের কথা স্বতন্ত্র। কিন্তু বিশুদ্ধ সাহিত্যিকদেরও স্খলন দেখেছি। যাঁরা ধর্ম্ম ও দর্শন নিয়ে প্রবন্ধ লেখেন তাঁদেরও প্রাণপণ প্রচেষ্টা মার্কসিষ্ট জড়বাদকে কিভাবে খণ্ডন করা যায়। ছোট গল্প ও নভেলে কিন্তু ধারাটা খুব জোরাল নয়, যদিও সোমেন চন্দের 'ইঁদুর', সঞ্জয় ভট্টাচার্য্যের 'ফসল' নামে গল্পগুচ্ছ, সুবোধ ঘোষের 'কর্ণফুলীর ডাক' গল্প, সবই গণবোধের চেতনায় জীবন্ত। তা ছাড়া একটা মোটামুটি অর্থনৈতিক ব্যাখ্যার চেষ্টা সর্ব্বত্রই রয়েছে মনে হয়।

গোপাল হালদারের 'সংস্কৃতির-রূপান্তর'-এ সমাজ-বিবর্ত্তন সম্বন্ধে জ্ঞান সুস্পষ্ট। তিনি পুরোপুরি মার্ক্‌সিষ্ট। মার্ক্‌স-এর মূলতত্ত্বের ব্যাখ্যা এবং ভারতীয় সংস্কৃতির বিবৃতি ও তার রূপান্তর তাঁর বিষয়। মোটামুটি যতটা জ্ঞানের প্রয়োজন মার্ক্‌স-এর মতামত সম্বন্ধে তার প্রায় সবই কিছু না কিছু বইখানিতে পাওয়া যাবে। কিন্তু বাঙলা ভাষায় একে Intelligent Women's Guide to Socialism কিংবা Culture বলব না। যাঁরা ইংরেজী বইএর কৃপায় মার্ক্‌সিজম সম্বন্ধে খানিকটা জ্ঞান অর্জ্জন করেছেন, তাঁরাই এই রচনাটি উপভোগ করবেন, অবশ্য রচনাভঙ্গীর দোষ ভুলে গিয়ে। অন্ততঃ তাই ভাবাই সঙ্গত। কিন্তু খানিকটা পড়বার পর উপভোগের এক বাধা ওঠবার ভয় আছে। যাঁরা ইংরেজীতে মার্কসবাদ পড়েন তাঁরা সাধারণত ভারতবর্ষের সংস্কৃতি সম্বন্ধে অজ্ঞ, অথচ তাঁরা জানবার জন্য একটু উদ্‌গ্রীব হচ্ছেন, আজ-কাল। তাঁরা যখন দেখবেন যে গোপাল বাবু মার্ক্‌সিজম সম্বন্ধে এমন কোনো

নতুন কথা বল্লেন না যা ইংরেজী বই-এ নেই, কিংবা আরো মনোজ্ঞ ভাবে নেই, তখন বইখানির কাছ থেকে ভারতীয় সংস্কৃতি সম্বন্ধে অজ্ঞতা পূরণ করতে চান ও চাইবেন। সেখানে কিন্তু দেখা গেল যে গোপালবাবুর বর্ণনা খাপ-ছাড়া ও নিতান্তই সুনীতিবাবুর একটিমাত্র প্রবন্ধের ওপর আশ্রিত। খাপ-ছাড়া না হয় আমাদের মালমশলার অভাবে, কিন্তু মাত্র সুনীতিবাবুর ব্যাখ্যা কেন? সুনীতিবাবুর বক্তব্যের বিচার করছি না, কিন্তু এটুকু বলব যে সে-ব্যাখ্যার ওপর অত বড় সিদ্ধান্ত দাঁড় করান যায় না, এবং যায় নি। গোপাল বাবুর নিজের cultural interpretation চাইলাম তাঁর মার্কসবাদের ব্যাখ্যার অপূর্ণতার পরিবর্তে, পেলাম অন্যের এমন একটি ব্যাখ্যা যেটা তার সয় না মার্কসবাদের। ভারতীয় সংস্কৃতির ধারাবাহিক ও নিজস্ব ব্যাখ্যা বরঞ্চ ভূপেন দত্ত মশাই দিচ্ছেন পরিচয়ের পৃষ্ঠায়। পূর্ব্বে যা লিখলাম সে-সব মাত্র আমার একার মনোভাব নয়। গোপালবাবুর বইখানি আমি একাধিক সুশিক্ষিত ভদ্র-লোককে দিয়েছি, তাঁদেরও বিপত্তি আমারই মতন। গোপালবাবুর অবস্থা আমি বেশ বুঝি। আমাদের কৃত্রিম সমাজে লেখকরা বুঝতে পারেন না কাদের জন্য তাঁরা লিখবেন। একধারে মাতৃভাষার ওপর প্রীতি ও জন-শিক্ষার প্রতি কর্ত্তব্য-বোধ, অন্যধারে মালমশলা অন্য ভাষায়, প্রত্যয়গুলিও তাই। যাঁরা প্রথম শ্রেণীর চিন্তাশীল লেখক তাঁরা বিরোধের সমন্বয় সাধতে পারেন বটে, কিন্তু বাকী লেখকরা? তাঁদের লিখতে হবে না, তাঁদের ভাষা-প্রীতি ও জন-প্রীতি থাকবে না এমন কোনো নিয়ম নেই। অতএব এঁদের রচনায় পূর্ব্বোক্ত দোষ থাকবেই থাকবে। গোপালবাবু একত্রে পণ্ডিত ও লেখক। সংবাদপত্রের সঙ্গেও তিনি যুক্ত, অতএব তাঁর কলম খুঁড়িয়ে চলে না আমি জানি। তাই বোধ হয় একটু বেশী মাত্রায় প্রত্যাশা করেছিলাম। অন্যত্র ভাষার কৃতিত্ব যা দেখেছি সেটা এখানে একটু বিসদৃশ ঠেকল—যেমন বইখানির প্রারম্ভে ও সুনীতিবাবুর সঙ্গে কথোপকথন বর্ণনায়। এক এক সময় মনে হয় যদি আমাদের দেশের লোকেরা এমিল লাডভিগ্-এর ভক্ত না হতেন তবে ভালই হত। পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য আরো অনেক উপায় আছে। আরেকটি কথা: কলকাতার তথা বাঙলার সংস্কৃতির পরিচয় তিনি যা দিয়েছেন সেটা আমার কাছে যেন চেনা-চেনা মনে হল। এটি ছোট্ট

ব্যাপার, ব্যক্তিগত সন্দেহ মাত্র। সে যাই হোক—বইখানি সত্যই মূল্যবান। এখানকার অনেককে পড়িয়েছি, এবং প্রত্যেকের হাতে হাতে যেন ঘোরে কামনা করি। কোথায় মার্কসিজম-এর ব্যাখ্যায় আমার মতান্তর আছে তা বলবার মুখ মেরে দিয়েছেন গোপালবাবু। যেটা সব চেয়ে বড় কথা এই বইখানি সম্বন্ধে সেটা হল এই : আমাদের দেশের চিন্তাশীল ব্যক্তিরা একত্রে ভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃতি ও মার্কসিজম সম্বন্ধে মাথা ঘামাচ্ছেন। ঐ 'একত্রে'-টাই দরকারী ছিল, নচেৎ কেবল মার্কসিজম পড়া বুদ্ধির, ও কেবল ভারতবর্ষের ইতিহাস পড়া দেশভক্তির, বিলাস মাত্র। কোথায় কর্ণেল উপেন মুখুজ্যে আর কোথায় গোপাল হালদার! আমি বলি এটা উন্নতি, কেবল দৃষ্টিকোনের পরিবর্ত্তন নয়।

সংখ্যা হিসেবে কবিতাতেই কিন্তু মার্কসিজমের ছাপ বেশী পড়েছে। গুণ হিসেবে নয়, কারণ, বিজন রায় ও গোপাল হালদারের সমাজচেতনা কবিদের মধ্যে পাচ্ছি না। প্রত্যাশা করব না কেন? নিশ্চয় করব। রাগ-রূপের জন্য যেমন ঠাট, কাব্য-রূপেরও তেমনই দর্শন। তারপর আনন্দ, জানি, কিন্তু তার অভাবে ফক্কিকারীতাও জানি। আনন্দের জন্য চেতনার সীমা নেই, ঠিক এই মাত্রার পর চেতনা আনন্দের বাধা হবে এমন কোনো পরিমাণও নেই। ইকনমিক্স-এ আজকাল optimum এবং law of proportion প্রত্যয় চলছে। তাও যদি সাহিত্যে খাটাই তবু আমার চাহিদা নিরর্থক নয়, কারণ, optimum হল একটা চলন্ত সীরিজ, একটা গতিশীল অনুপাত, চেতনা, ছন্দ, ভাবধারার অনুপাত। সেটা আবার একটা স্তর থেকে অন্য স্তরে ওঠে নাবে। তাতে ডায়েলেকটিক্‌স্‌ও দেখা যায়। অতএব আমি কবিদের কাছেও চেতনার বৃদ্ধি চাইবই চাইব। 'প্রেরণা' অজ্ঞানতারও নামান্তর হতে পারে। আমি অন্ততঃ মার্কসিজম-এর প্রভাব বিচারে ঐ চেতনারই দোষগুণ খুঁজব।

প্রায় বছর দশেক আগে আমাদের কবিতায় হতাশা ফুটে ওঠে। রবীন্দ্রনাথের কবিতার সুর ছিল অস্তি ও আনন্দের, যার সঙ্গে বিদেশী optimum-এর কোনো ঐক্য নেই। নতুন সুর নাস্তিকতার, বা nihilism-এর নয়, মায়াবাদের দুঃসাহসিকতারও নয়, মাত্র সন্দেহের, অসন্তোষের, প্রশ্নের খুঁতখুঁতুনি। আনন্দের পরিবর্ত্তে যে নিরানন্দ এল তার পিছনে এমন

কোনো জীবন-দর্শন ছিল না যার জন্যে অসন্তোষকে সদর্থক ভাবা যায়। হার্ডির কবিতায় যা পাই তা যতীন সেনগুপ্তের কবিতায় নেই। অসন্তোষের দুটি অঙ্গ ছিল, জৈব ও আর্থিক। কোনো কোনো কবির হাতে দুটি মিশে গিয়ে একটা বিপ্লবী চণ্ড যে আসে নি তা নয়। সাধারণত কিন্তু মিশল না, কেবল যৌন-ব্যাপারে সমাজের বিপক্ষে ব্যক্তি পরিপূর্ণতার নামে মাথা তুলে দাঁড়াল। তার প্রয়োজন ছিল অবশ্য, এবং কাম জিনিষটাই বিপ্লবী। কিন্তু সে-বিপ্লবের সূত্রপাতটা নিতান্তই ব্যক্তিকেন্দ্রিক। আমাদের সংস্কৃতিও ইংরেজ আমল থেকে ঐ মুখো। অতএব এই ধরণের কবিতায় একটা anarchic element ছিল, যার অস্তিত্ব সন্দেহ ক'রে, না বুঝে, অনেকে তীব্র প্রতিবাদ সুরু করলেন। কিন্তু বিশেষ কিছু ফল হয় নি, কারণ, অসন্তোষের অন্য অঙ্গটি জৈব-অঙ্গকে সাহায্য করতে সদা তৎপর। ঠিক ঐ সময় আমাদের দেশের সামনে এল বেকার-সমস্যা তার দৈন্যের রূপ নিয়ে। 'দৈন্য'-কথাটির অর্থ আশা-শূন্যতা নয়, কারণ আমাদের দেশের বে-কার-সমস্যা একটু অন্য জাতির, সেটা প্রাণ-রক্ষা নয়, ভদ্রতা-রক্ষা, এবং যে-ভদ্রতার মধ্যে ইংরেজী বুর্জোয়ার নিঃশঙ্ক নিশ্চয়তা নেই, ঐতিহ্যের যোগ কোথাও নেই, এবং যে-রক্ষার কবচ অফিসের বড়বাবুর আশীর্ব্বাদ ও মুরুব্বীর জোর এবং যার মূল্য মাসিক চল্লিশ টাকা ও কিছু উপরী। এর সঙ্গে জুটল ইংরেজী-সাহিত্যের পূর্ব্ববর্তন দশকের হতাশবাদ। 'প্রভাব' কথাটি ব্যবহার করতে চাই না, কারণ, সেটা একটু একপেশে, তাতে আমাদের দিকটা বাদ পড়ে। আমাদের ওপর নানা দিক থেকেই প্রভাব এসেছে, কিন্তু তার থেকে বেছে নেওয়াটাই কৃতিত্ব। এক হিসেবে টি. এস. এলিয়ট-এর Waste Land যে বাঙলা আধুনিক কবিতার জন্ম-স্থান তার বহু প্রমাণ পেলে। ১৯৪২ সালের সাম্যবাদী পদ্য ও গদ্য-কবিতায় 'ফণি মনসা' প্রতীকটির, রঙের মধ্যে 'হলদে' এবং স্থানের মধ্যে 'বালুচরের' ছড়াছড়ি। সুধীন্দ্র দত্তের এলিয়ট সম্বন্ধে প্রবন্ধ প্রায় দশ বছর আগেকার, মধ্যে রবীন্দ্রনাথের Journey of the Magi-র বিখ্যাত অনুবাদ, এবং এখনও পূর্ব্বলেখ-এ বিষ্ণু দের 'ফাঁপা মানুষ'। এলিয়ট-এর ব্যর্থতাবোধকে পরিমিত মনে হওয়া স্বাভাবিক, তাঁর 'সুইনী' ও 'প্রুফ্রক' আমাদেরই মত ব্যবহার করে। তাদেরও ভবিষ্যৎ নেই, আমাদেরও নেই, কেন নেই তার কারণ তারাও স্নব,

আমরাও তাই, তাদের প্রেম ও প্রাণ চড়ুই পাখীর, আমাদেরও তাই। কিন্তু এলিয়ট-এর আরেকটি অন্তরের দুঃখ ছিল, যার খোঁজ আমরা করি নি, সেটি হল খৃষ্টান সভ্যতার সর্ব্বনাশে বিক্ষোভ। সেটা আবার সক্রিয় বিক্ষোভ, জাতে ভদ্রলোক আমেরিক্যান, তাই নিষ্ক্রিয় থাকতে পারেন না। কতটা সক্রিয় তার অনন্ত প্রমাণ তাঁর আজকালকার নাটক ও কবিতায়, এবং সর্ব্বোপরি তাঁর একটা Christian Sociology দাঁড় করাবার প্রাণপণ চেষ্টায়। সুধীন্দ্রনাথ তাঁর প্রবন্ধে এলিয়টের সক্রিয়তা ধরিয়ে দেন, কিন্তু তাঁর নির্দ্দেশ তাঁর অন্যান্য নির্দ্দেশের মতনই আমরা অবহেলা করি। সে যাই হোক, এলিয়টের ব্যর্থতার (frustration) সঙ্গে আমাদের বড় চাকরী ও মাঝামাঝি রকমেরও চাকরী না পাওয়ার আফ্‌শোষটা জুড়ে দিলাম। প্রথম থেকেই সমাজের চাপে যৌন-নিষ্ফলতা ছিল। এখন মিলে জুলে একটা ছক্ হয়ে গেল। তাই আধুনিক কবিতার মনোভাবে একটা জোড়াতাড়া, একটি ফাঁকি রয়ে গেছে। আমার বিশ্বাস যে আধুনিক কবিতার দোষ দক্ষতার অভাবে নয়, প্রধানত তার ভাবগুচ্ছের অসংলগ্নতায়। শেষে দাঁড়ায় ঐ সামাজিক-বিপ্লবের অপূর্ণতা। কিন্তু কার্য্যকারণভাবে নয়। তাই যদি হত তবে কম্যুনিষ্ট সমাজেই সব কবিতা সর্ব্বাঙ্গীন হত। যদি কারণ খুঁজতেই হয় তবে বলব, ঐ জোড়া-তাড়ার জন্য দায়ী আমাদেরই অজ্ঞতা, নিজেদের পরিস্থিতি ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে, সামাজিক অভিব্যক্তির নিয়ম-ব্যাপারে। আমি চাই না যে আমার বক্তব্য ভুল বোঝা হয়। অসংলগ্নতা, অজ্ঞতা রয়েছে নিশ্চয়ই। তবু আধুনিক কবিতার খাপছাড়া নক্সাটাও নতুন, তার অন্তরে নতুনত্বের চাহিদা আছে। আমাদের আধুনিক কবিতা কেবল সৌখীন ফ্যাসান নয়। দু একজনের পক্ষে এখানে ওখানে ভাববিলাস, কিন্তু একত্রে ধরলে তার মধ্যে বিপ্লবের বীজ আছে। অবশ্য খানিকটা অজানা বলে তার বিপদও আছে, কিন্তু সম্ভাবনাও কম নয়। শক্তি উন্মুক্ত হবার পর এই রকম দ্বিধা বিভক্ত হবার সম্ভবনা থাকবেই। মার্কসিষ্ট কবিদের উদ্দেশ্যই হল যাতে শক্তিটা বাঞ্ছনীয় প্রণালীতে চলে। আমি তাই মার্কসিষ্ট কবিতার বহুল প্রচার কামনা করি। পূর্ব্বেকার হতাশা আজ আশায় পরিণত হতে চাইছে, এই হল মোট কথা। তারপর সাহিত্যিক বিচার।

পরিণতি চাইছে, কিন্তু পরিণত হয় নি। গোটাকয়েক চিহ্ন দেখেছি দুর্ব্বলতার। বিষ্ণু দে, সমর সেন ও চঞ্চলকুমারের অধিকাংশ কবিতাতে অন্যান্য কবিদের, বিশেষত, রবীন্দ্রনাথের পদের উদ্ধৃতি আছে, এবং সেগুলো সম্পূর্ণ নতুন ধরণের পদের সঙ্গে গলাগলি করে দাঁড়িয়ে থাকে। উদ্দেশ্য অবশ্য নতুন পুরাতনের বৈপরীত্য-বোধ জাগান। উদ্ধারটা স্মৃতির, এবং বোধ জাগান চেতনার কাজ। দুটি কাজের সমন্বয়-সাধন, দুই রাজ্যে অবাধ বিচরণ আজ-কালকার স্বাভাবিক চিত্তবৃত্তি, অতএব কাব্যপ্রয়াসের অধীন। আধুনিক কবিতাকে সমসাময়িক হতেই হবে। কিন্তু সমন্বয়ে এমন একটা কিছু থাকে যেটা নিছক দ্বন্দ্বের (contrariety), অতিরিক্ত। আধুনিক কবিতায় বেশীর ভাগ পাচ্ছি, একধারে স্মৃতি, অভ্যাস, অতীতের টান, অন্যধারে একটা বোধ, বুদ্ধি নয়, বোধ, যেটা বাষ্পীয় ব'লে আধারের আকার নেয়, (যে-জন্য রুষিয়ান সাহিত্যিক পরীক্ষার অনুকরণ সম্ভব) অথচ নিজের তাগিদে সুনির্দ্দিষ্ট নয়। বিষ্ণু দে'র 'জন্মাষ্টমী'তে সমন্বয়ের জমজমাট ভাব নেই, অথচ পদধ্বনিতে আছে। '২২শে জুনে'র রচনায় কাঠিন্য থাকার দরুণ অনেকস্থলে উপভোগ্য, কিন্তু কোথাও এমন ভাবে জমেনি যে প্রতি পাঠে নতুন সৌন্দর্য্য আবিষ্কারে চিত্ত ভরে ওঠে। কামাক্ষীপ্রসাদের 'শিবিরে' পূর্ব্বোক্ত সমন্বয়ের কোনো চিহ্নই পাইনি। চঞ্চলের 'বসুন্ধরা'র একাধিক কবিতায় কিন্তু আছে। কেবল তাই নয়, সমগ্র বইখানি বিচার করলে একটা ধারারও প্রমাণ পাই। 'পলাতক' একধারে ও 'বসুন্ধরা' অন্যধারে, মধ্যে 'অডিসিউস' ও 'ক্যাসাণ্ড্রা' এই ভাবে কবিতাগুলি সাজালে লক্ষ্য করি কবির সমাজচেতনার অভিব্যক্তিকে। পলাতকের শোচনীয় অবস্থা পার হয়ে ওডিসিউসের 'একনিষ্ঠ স্বধর্ম্মে প্রত্যয়ে' আসা উন্নতির একটি ধাপ। 'মিডিয়া' ও 'ক্যাসাণ্ড্রা' নিষ্ক্রিয় ও সক্রিয় প্রতিক্রিয়ারই নিদর্শন। সর্ব্বশেষে, 'বসুন্ধরা', যেখানে বর্ত্তমান সমস্যার একটা পূর্ণ রূপ দিতে চেয়েছেন আমাদের কবি। সে-রূপ হয়ত বিকশিত হয়নি, কিংবা বিকাশে তেমন উজ্জ্বলতা নেই। তবু ধারাবাহিকতা রয়েছে অস্বীকার করা যায় না। চঞ্চলের কবিতা অন্য কবির তুলনায় হয়ত কম চমকদার, কিন্তু সেখানে ফাঁকি থাকে না।

সমর সেনের 'নানা কথা' নিয়ে লক্ষ্ণৌএর জন কয়েক সাহিত্যানুরাগী

ভদ্রলোক দু' তিন বার আলোচনা করেছিলেন। আলোচনার সময় দেখা গেল যে সমরের ছোট কবিতাই সকলের প্রিয়। 'নানা কথা' কবিতাটি বার বার পড়বার পর মন্তব্য হয়েছিল 'খাপছাড়া, অন্য ছোট কবিতার মতন ঘন নয়।' এই মন্তব্য থেকে একটি প্রশ্ন উঠতে পারে। সমর সেন কি miniature poet হিসেবেই সফল ? তাঁর কবিতা অবশ্য চিত্রানুগম। অন্যান্য দেশে যে সামাজিক অবস্থায় miniature painting-এর প্রচার হয়, আমাদের দেশের অবস্থা তা নয়। অবশ্য সমর সেন খুব sensitive, কিন্তু sensitiveness থেকে sensibility তে আসার অন্তরায় কি তার পক্ষে ? 'যার ধর্ম্ম তারই সাজে অন্যের লাঠি বাজে' ভাবলে একজন কবিকে খোপের মধ্যে পুরে রাখাই ভাল, সেখানে সে বক্ বকম্ করুক গে। কবিরও কি পরিণতি নেই, তাব কাব্যবোধ যদি প্রসারিত হয়ে সমাজ বোধের দিকে অগ্রসর হয় তবে কোন পাঠকের, কোনো সমালোচকেরই অধিকার নেই, ক্ষমতা নেই, বাধা দেবার। সমর সেন এগিয়ে চলেছে ঐ দিকে এটা আমাদের গ্রহণ করতেই হবে—তার পর অন্য কথা। কিন্তু এই অন্য কথার মধ্যে একট দরকারী কথা এই, অগ্রস্থিতিটা জোর পায়ে, না খুঁড়িয়ে, তার পিছন-টান আছে কি নেই। যদি জোর কদমে হয়, যদি পিছন-টান না থাকে, তবেই সমন্বয় পাওয়া যাবে। কিন্তু খুব মন দিয়ে পড়েও তা পাইনি। আমি রসোত্তীর্ণতার উল্লেখ করছি না। এটা Smiles-এর Self-Help-এর success-এরই কাব্য সংস্করণ। আধুনিক কবিদের মতন আধুনিক পাঠকও status-এর চেয়ে process-এর ওপর জোর দিতে চান। তবু বলি ঐ process-এর জন্যও integration-এর প্রয়োজন। তবে সেটা চৈতন্যের। আমার বিশ্বাস যে সমর সেন এবং অন্য আধুনিক কবিরাও নিজেরাই বুঝেছেন নিজেদের অভাব—প্রমাণ, সকলে এপিগ্রাম, সনেট, অন্যান্য ছোট কবিতা লিখছেন। ভারী মজার এই ডায়েলিক্‌টিক্—চৈতন্য যত প্রসারিত হচ্ছে কবিতা আকারে ততই ছোট হচ্ছে। কেবল তাই নয়, সমাজবোধ যতই উদার, বিদ্রূপ ততই সঙ্কীর্ণ। আধুনিক কবিদের বিদ্রূপ, যেমন বিষ্ণু দের বিস্তর কবিতায়, সমরের 'ব্রতচারী', চঞ্চলের 'পলাতকে' পাৰ্চ্ছি, সেটা নিতান্তই নিষ্ফলতা-প্রসূত। এ-বিদ্রূপ মেয়েদের মাথার কাঁটার মতন বাঁকা, গোপন-প্রেমিকের মতন ভীরু, যার

চাহিনী হল চোরা, যার কোটান হল খোঁচান, আর চলন হল হেনাঙ্গি মাখান। এর সঙ্গে উইণ্ডহাম লিউস-কল্পিত 'স্যাটায়ার'-এর কোনো সম্বন্ধ নেই, গ্রীক এপিগ্রামেরও সঙ্গে নেই। মার্কসিষ্ট কবিতায় হাতুড়ির মার ও কাস্তের কাটাই থাকাই স্বাভাবিক। তা নেই যখন, অথচ একাধিক কবিতা যখন ভাল লাগছে তখন সন্দেহ ওঠে যে হয়ত বা মার্কসিজম কবিদের মজ্জায় পৌঁছয় নি। ভাল কবিতা লিখতে গেলে মার্কসিজম ছাড়তে হবে এমন কোনো কথা নেই। প্লেটনিজম-এর আশ্রয়ে ত বহু ভাল কবিতা লেখা হয়েছে ...ওয়ার্ডসওয়ার্থের Intimations of Immortality বাদ দেব?, ব্লেক, রবীন্দ্রনাথের মতবাদ ছিল না? মার্কসিষ্ট কবি কি অন্য দেশে জন্মায় নি? অথচ আমাদের কোনো কবি কাঁচা নন।

দুর্ব্বলতার আর দুটি চিহ্ন না দেখিয়ে থাকতে পারছি না। এত গ্রীক পৌরাণিক গল্পের ছড়াছড়ি কেন? আমি স্বীকার করি যে গ্রীক পুরাণের মধ্যে একটা সার্ব্বজনীনতা আছে। এও জানি যে ঐ সব গল্প সর্ব্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে, তাদের কেন্দ্র কোথায় জানা না থাকলেও গ্রীসে তাদের পরিণতি হয়েছিল স্বীকার্য্য। আমরাও নিজেদের পুরাণ সম্বন্ধে একেবারে মূর্খ হয়ে পড়েছি। ব্যাপারটা অনুকরণও নয়। গ্রীস কেন, নরওয়ে যেতেও আমার আপত্তি নেই। কিন্তু legends, myths and symbols তিনটি পৃথক প্রত্যয়। যদি কেউ ওডিসিয়ুস সম্বন্ধে ছন্দে গল্প লেখেন, আমার কোনো আপত্তি নেই, যদি কারুর solar myth ব্যবহার করতে হয় তিনি Apollo, Phoebus-এর নাম গ্রহণ করুন। কিন্তু আপনার আমার ব্যক্তিগত কিংবা সামাজিক সমস্যাকে সার্ব্বজনীন করবার জন্য কেবল myth আর legend-এর ব্যবহার যথেষ্ট নয়। তাদের symbol-এ দাঁড় করাতে হবে। সেই চেষ্টাই কবিরা করেছেন। কিন্তু এইখানেই বিপদ। myth আর symbol-এর পার্থক্য collective emotions-এ, যাদের শেকড় সমগ্র জাতির অবচেতনায়। এখনো আমাদের অবচেতনায় প্রোসারপাইন বাসা বাঁধেন নি, আমাদের মস্তিষ্কের কোনো নিভৃত কোণে ডিয়োটিমা একটি ক্ষণের জন্যও বসেন নি, ক্যাসাণ্ড্রা নয়, ইলেক্ট্রাও নয়। এখন যদি কবির এমন শক্তি থাকে যেটা ঐ collective emotions-এর শক্তির অভাবের পূরণ করতে পারে, তবে অবশ্য অন্য কথা।

সে-ক্ষমতা এঁদের কি আছে ? তাই মনে হয় symbol-এর সন্ধানটা একটা নিদর্শন মাত্র, কবিতার 'পরোয়ানা' নয়। অন্য দুর্ব্বলতা আরো মারাত্মক—সেটা বিদেশী সঙ্গীতের allusion। বিদেশী সঙ্গীতের বিপক্ষে আমার কোনো আপত্তি নেই, থাকতে পারে না, কারণ, বহু চেষ্টার পর মনে হয় যেন আজকাল ভাল লাগছে। কিন্তু যখন বিষ্ণু দে 'জন্মাষ্টমী' কবিতার মাথায় বিদেশী সঙ্গীতের জার্ম্মাণ ভাষায় উল্লেখ করেন, ও কেবল তাই নয়, যখন অন্যত্র, অন্য কবির লেখায় আমাদের নিজেদের সঙ্গীতের উল্লেখ ভুল দেখি, এবং আরো যখন দেখি যে কবিতাতেও বিষ্ণু দের মতন হুঁসিয়ার কবির musical sense-এর স্খলন হচ্ছে, তখন তাঁর ও তাঁর সহধর্ম্মীর এই অভ্যাসকে snobbishness ছাড়া কি বলব। মোদ্দা কথা এই যে এঁদের, বিশেষত, বিষ্ণুর প্রতিভা সাঙ্গীতিকই নয়, কোনো সঙ্গীতের সঙ্গেই এঁদের প্রতিভার যোগ নেই। আমি গান বাজনা জানা কি ভালবাসার কথা বলছি না, না জেনে খুব না ভালবেসেও কাব্য-প্রতিভা সুর-প্রধান হয় দেখেছি। আমি কেবল মূলগত ঐক্যের নির্দ্দেশ করছি। তা ছাড়া, পাঠক-পাঠিকার মধ্যে ক'জন বেটহোফেন-এর ইঙ্গিত ধরতে পারে। যদি প্রশ্ন করি বিষ্ণু কেন এই কাজ করলেন তখন কি তাঁর সার্ব্বভৌমিকতায় আমার প্রশ্নের উত্তর মিলবে, না মিলবে মানুষের সেই প্রবৃত্তিতে যেটা ভূমিকা থেকে ভ্রষ্ট হবার পর এমন একটা কোনো আশ্রয় খোঁজে যার কৃপায় আত্মসম্মানকে আত্মসম্মান, সামাজিক প্রতিষ্ঠা দুইই পাওয়া যায়।

এ মনোভাব ব্যক্তিগতভাবে খুবই স্বাভাবিক, কিন্তু মার্কসিষ্ট নয়, নিশ্চয় নয়। মার্কসিষ্ট মনোভাবের দায়িত্ব ভীষণ। অন্ততঃ সেখানে একটা intellectual honesty-র চাহিদা সর্ব্বদাই থাকে। কিন্তু কবি যখন নিজের নৈরাশ্যকে বড় ভাবেন তখন তিনি মাত্র আত্মকেন্দ্রিক, কেবল একটিমাত্র fact নিয়ে ব্যস্ত। মার্কসিষ্ট-এর মনোভাব বিপরীত, তার কাছে factsগুলো data। মার্কসিষ্ট কবিদের কেন্দ্র ব্যক্তি নয়, পুরুষ, সমষ্টি-বোধে জাগ্রত পুরুষ। আমাদের কবিতায় সমষ্টিবোধ আসে নি, পুরুষ আর ব্যক্তির পার্থক্য এখনও ধরা পড়ে নি। তাই যে-বাস্তবতার চর্চ্চা চলছে সেটা জোর populist realism, social realism নয়। জনগণের উল্লেখ আর গণবোধের মধ্যে

পার্থক্য আছে। পার্থক্য ঘুচতে পারে, আপাততঃ, চেতনার উন্নতিতে। যতটা সংখ্যাবৃদ্ধির ওপর উন্নতি নির্ভর করে ততটার প্রসার আমি মার্কসিষ্ট কবিতার জন্য চাই। আমার বক্তব্য এই : দুর্ব্বলতা সত্ত্বেও ১৯৪২ সালের 'আধুনিক' কবিতা পূর্ব্বেকার 'আধুনিক' কবিতার চেয়ে উন্নত। এ গুলো মধ্যবিত্তের চাকরী না পাওয়ার দুঃখ থেকে জন্মায় নি, অমুকাদেবীর মুখ চেয়েও লেখা নয়। যে-লেখক ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তা করেন, আমাদের ভবিষ্যৎ নেই কেন ভাবেন, যে-কবি প্রেমে পাগল নয়, বন্ধুত্বের সন্ধানী, যে ব্যক্তি সমাজ অভি-ব্যক্তির নিয়ম খুঁজতে ব্যস্ত, তিনিই ১৯৪২ সালের আধুনিক, অতএব আমাদের সকলেরই শ্রদ্ধার্হ। অবশ্য লেখক হওয়া চাই, বলাই বাহুল্য। এবং রবীন্দ্র-নাথের অভ্যুদয়ের পর আমাদের কবিরা লিখতে জানেন না কে বলে ?

ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

রবীন্দ্র-গ্রন্থপঞ্জী

রবীন্দ্র-গ্রন্থ পরিচয়। শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। সাহিত্য-পরিষদ্ গ্রন্থাবলী—৮৯। প্রাপ্তিস্থান—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ। ২৪৩।১ লোয়ার সার্কুলার রোড, কলিকাতা।

যাঁহারা বঙ্গ সাহিত্যের ইতিহাস চর্চ্চা করিতে চাহেন, যাঁহারা রবীন্দ্র-প্রতিভার ক্রমবিকাশ সর্ব্ব প্রথম অরুণ আভা হইতে অশীতি বর্ষে অস্তাচল গমন পর্য্যন্ত দেখিতে চান, তাঁহাদের পক্ষে এই গ্রন্থখানি অমূল্য। রবীন্দ্রনাথের একখানি উপযুক্ত জীবনচরিত নিশ্চয়ই একদিন না একদিন বঙ্গ সাহিত্যের গৌরব বৃদ্ধি করিবে ; সেই মহৎ কার্য্যের একটি প্রধান উপকরণ হইয়া থাকিল এই পুস্তিকাখানি। ইংলণ্ড ও আমেরিকায় মহা পণ্ডিতেরা বহু বর্ষ অক্লান্ত পরিশ্রম, একনিষ্ঠ চেষ্টা এবং নানা নগরের পুস্তকাগারে, বিখ্যাত বংশের পারিবারিক দলীল ও চিঠিপত্র সংগ্রহের মধ্যে অন্বেষণ করিয়া তাহার

পর, এক একজন বড় ইংরাজ কবি বা উপন্যাস-লেখকের গ্রন্থপঞ্জী প্রস্তুত করেন। পূর্ণতা, অভ্রান্ততা এবং বিস্তৃতির গুণে এই সব বিব্লিওগ্রাফি-নামক গ্রন্থ সাহিত্য-ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকে। আমাদের পরম সৌভাগ্যের বিষয় যে ব্রজেন্দ্রবাবুর মত বিচক্ষণ, দক্ষ ও অক্লান্তকর্মী রবীন্দ্র-গ্রন্থপঞ্জী সংগ্রহে নিজশক্তি লাগাইয়াছিলেন, এবং রবীন্দ্রনাথ এ জগতে থাকিবার সময়েই তাঁহার অতি পুরাতন এবং বিলুপ্ত-স্মৃতি প্রথমকার রচনাগুলি আবিষ্কার করিয়া মহাকবিকে দেখাইয়া তাঁহার দ্বারা সেগুলি স্বীকৃত করাইয়া লন। সুতরাং এরূপ নির্ভুল গ্রন্থপঞ্জী ইহার পর রচিত হওয়া সম্ভব নহে। আশা করি মহাকবির ভক্তগণ প্রত্যেকে এই গ্রন্থের একখানা তাঁহাদের গ্রন্থাগারে রাখিবেন, এবং ইহা রবীন্দ্র-গ্রন্থাবলীর চির সঙ্গী হইয়া থাকিবে।

শ্রীযদুনাথ সরকার

বাংলা সাহিত্যে বিদেশ

হাতের কাজ।—হিরণ্ময় ঘোষাল। দি ন্যাশন্যাল লিটারেচার কোম্পানী। ১০৫, কটন ষ্ট্রীট কলিকাতা। দাম এক টাকা।

শাকাম্ন।—হিরণ্ময় ঘোষাল। অগ্রগতি পাব্লিশিং ওয়ার্কস্। পি-৯১, সর্দার শঙ্কর রোড, কলিকাতা। দাম আঠারো আনা।

'হাতের কাজ' ও 'শাকাম্ন' দুটি বই-ই বর্তমান বাংলা কথা-সাহিত্যের ভাণ্ডার সমৃদ্ধ করেছে—বিশেষ ক'রে প্রথম বইটি। 'হাতের কাজ' ছটি গল্প নিয়ে গ্রথিত। এই ছটি গল্পেরই পটভূমি পোলাণ্ড—পোল্যাণ্ডের শহর, গ্রাম, মাঠ, বন। যতদূর জানি বাংলা সাহিত্যে পোল্যাণ্ডের ছবি এই প্রথম। এই ছবি যিনি এঁকেছেন শুধু তাঁর 'হাতের কাজ' নিপুণ নয়, তাঁর মন সংবেদনশীল ও কল্পনায় ঐশ্বর্যবান্। পোলিশ নরনারী এমন কি জীবজন্তু ও পোলিশ নৈসর্গিক দৃশ্যের যে বর্ণনা এই বইটির প্রাণ তাতে যেমন আছে বর্ণসমারোহ তেমনি আছে সহৃদয় মনের পরিচয়। কিন্তু মনে হয় লেখকের মমতা জীবজন্তু

বা মানুষের চাইতে গাছপালার পরই বেশী। এই মমতার শ্রেষ্ঠ পরিচয় পাওয়া যায় 'তুরলাক' গল্পে। নায়ক দুর্ধর্ষ দস্যু, কিন্তু তার দস্যুবৃত্তির কারণ তার প্রাণপ্রিয় বনভূমির গাছপালার ওপর মানুষের নির্মম হস্তক্ষেপ। লেখক এই গল্পটিতে যে-রোমান্টিক আবহ সৃষ্টি করেছেন তা এই জাতীয় শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক রচনার সঙ্গে তুলনীয়। এই আবহ সৃষ্টিতে সাহায্য করেছে লেখকের ভাষার বিশিষ্ট ভঙ্গী ও বিদেশী নামের নিপুণ ব্যবহার।

লেখকের ভাষার দুই একটি নমুনা না দিলে তাঁর হাতের কাজের পরিচয় অসম্পূর্ণ থাকবে। "রাত্রি একটু গভীর হইয়া আসে, বুড়াবুড়ী শুইতে যায়, জানালার আলোটা ক্রমে মুমূর্ষুর চোখের মত নিস্তেজ হইয়া আস্তে আস্তে নিবিয়া যায়। তখন এই ক্ষুদ্র মানবগোষ্ঠীর শেষ চিহ্নরূপে গ্রামের পথটা ভদকা-খোরের মত ধূলায় লুটাইয়া যেন নেশায় ভোর হইয়া অসারভাবে পড়িয়া থাকে। সেদিন আকাশে একটিও তারা নাই, গভীর রাতে হঠাৎ মেঘ করিয়া ঝড় উঠিল। স্নিনারচ্যিকের বাড়ীর চারিপাশের তপলাগাছগুলা পরস্পরের গায়ে পড়িয়া সির্-সির্ শব্দে কী একটা বিষয় লইয়া কানাকানি করিতে বসিল। ঐ ঝাউবনটার দিক হইতে একটা চাপা গোঙানির শব্দ বাতাসে ভাসিয়া আসে......মানুষের স্নায়ুগুলোতে ভয় বলিয়া যে পদার্থটা রক্তের সঙ্গে মিশিয়া থাকে তাহা যেন এই দুর্যোগের রাতে ছাড়া পাইয়া প্রেতের মত হা-হা করিয়া বেড়াইতেছে।"

এই উদ্ধৃতিটি নেওয়া হয়েছে 'হাতের কাজ'-এর প্রথম গল্প 'হস্তীগান' থেকে। নামটি রসনা-পীড়ক, কিন্তু গল্পটি অভিনব বিষয়বস্তু ও দক্ষ রচনার সমাবেশে অত্যন্ত উপভোগ্য হয়েছে। হিরন্ময় বাবুর ভাষার আর একটি নমুনা নিচে দেওয়া গেল 'তুরলাক' গল্প থেকে, এতে শুধু ওঁর দক্ষ হাতের নয়, তীক্ষ্ণ চোখের ও নিবিড় নিসর্গ-প্রীতিরও পরিচয় পাওয়া যায়।

"মাথার উপর যতদূর দৃষ্টি চলে, সবুজ পটভূমির কোলে হেমন্তের পত্র পুষ্পের হেম আলিম্পন, মাঝে মাঝে আকাশের অবকাশ এবং শতাব্দী-বৃদ্ধ সসনা, তপলা, বুক্, গ্রাব্ ও নবোন্মেষিত য়াঝোস্বীনা, চেরেমুহার অপ্রতিহত পরিবেষ্টন কী এক বিচিত্র আলহামব্রা রচনা করিয়াছে। সেই অপূর্ব বনসৌধের চন্দ্রাতপতলে কে যেন অতি সন্তর্পণে একটি একটি করিয়া তারার প্রদীপ জ্বালিয়া

দিল। ক্ষীণপ্রভ নক্ষত্রের আলোকে কোনো মতে পথ চিনিয়া, পরিচিত সম্‌না, দহ বা তপলাকে দক্ষিণে, বামে রাখিয়া মেয়ে কয়টি নিঃশব্দে অগ্রসর হইতে লাগিল। একটু দূর হইতে অন্ধকারের বুকে তাহাদের অধোবদন, অস্পষ্ট রেখা-মূর্ত্তি দেখিয়া মনে হয়, তাহারা যেন মুহ্যমান পদক্ষেপে শবের অনুগমন করিতেছে।"

'শাকান্ন' বইটি সম্বন্ধে গুরুতর আপত্তি এই যে এর গল্পগুলির বিষয়বস্তু শুধু একঘেয়ে নয়, সাহিত্যসৃষ্টির পক্ষে অচল। অর্থাৎ উচ্চ সাহিত্যসৃষ্টি। সুলভ চমকপ্রদ সাহিত্যসৃষ্টির উপাদান হিসেবে তা' একেবারে আদর্শ। কিন্তু সুলভ সাহিত্যসৃষ্টি যে লেখকের ধাতস্থ নয় তার পরিচয় পাওয়া যায় প্রায় প্রত্যেকটি গল্পেই—তাঁর শিল্পের ও তাঁর বক্তব্যের স্পষ্ট বিরোধে। যদিও 'কান্না-গাছ' ও 'পুতুল-নাচ', এই দুটি গল্পে লেখক এই বিরোধের কথঞ্চিৎ সমন্বয় করতে পেরেছেন,—তবু এই বিরোধের ছাপ এই গল্প দুটির সার্থকতা অনেক পরিমাণে ক্ষুণ্ণ করেছে। 'পুতুল-নাচ' গল্পটির নায়ক এক আসঙ্গ-উন্মুখ তরুণীকে উপেক্ষা ক'রে মন প্রাণ নিয়োগ করল একটি চেষ্টনাট্ গাছের চিত্রাঙ্কনে। এই ভাবে তার স্রষ্টার বৃক্ষপ্রীতির প্রতিফলনে তার 'পলায়ন' সুগম হ'ল সন্দেহ নাই, কিন্তু কথাসাহিত্যের নায়ক হিসাবে সে যে খুব বড় স্থান অর্জন করল তা বলা যায় না। অন্য গল্পগুলির নায়ক কিশোর-সুলভ যৌন সমস্যা নিয়ে এমনই জর্জ্জিত যে পলায়নের শক্তি পর্যন্ত তারা হারিয়েছে। যেটুকু নায়কত্ব তারা লাভ করেছে তা শুধু লেখকের বর্ণচাতুর্যের ফলে। কিন্তু চাতুর্য দিয়ে সার্থক সাহিত্য সৃষ্টি হয় না। বিশেষত, বিষয়বস্তু সম্বন্ধে লেখকের নিজের দরদ না থাকলে। মনে হয় এই দরদের অভাবই 'শাকান্ন' বইটির প্রধান ত্রুটি। প্রচলিত কথাসাহিত্যের মাপকাঠিতে এই বইটির স্থান খুব নিচু নয়। কিন্তু এর চাইতে অনেক বেশী উঁচু জায়গা দাবি করে 'হাতের কাজ'-এর লঘু বা গুরু প্রত্যেকটি গল্প। এই বিচিত্র গল্পগুলিতে আধুনিক জীবনের কোনো গুরুতর সমস্যাই প্রতিফলিত হয় নাই, এই হিসাবে এই গল্পগুলি সম্পূর্ণরূপে 'পলায়নী' মনোবৃত্তির পরিচায়ক, কিন্তু তা সত্ত্বেও আন্তরিকতা ও দক্ষ আঙ্গিকের সংযোগে 'হাতের কাজ' মহৎ সাহিত্য না হ'লেও যে সার্থক সাহিত্যে উত্তীর্ণ হয়েছে তা' নিঃসন্দেহ।

হিরণকুমার সান্যাল

পাঠক-গোষ্ঠী

সবিনয় নিবেদন,

মাঘ মাসের "পরিচয়ে" শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন পুরকায়স্থ মহাশয় অধুনা প্রকাশিত "Bengali Literature" পুস্তিকাখানির পরিচয় দিয়ে লেখক ও লেখিকাকে আশাতীত সম্মান দেখিয়েছেন। কিন্তু এমনি আমাদের কপাল যে তিনি গোড়াতেই আমাদের ভুল বুঝেছেন। বইটির মুখবন্ধে আছে—

"This little book has been written for the common reader by two of them. It does not lay any claim to scholarship. All it hopes to do is to arouse interest in its subject."

এর কোনখানেই "মুখ্যতঃ" বা সেই জাতীয় কোনো শব্দ নেই। অথচ পুরকায়স্থ মহাশয় জানাচ্ছেন, "মুখবন্ধে শ্রীযুক্ত রায় লিখিয়াছেন যে পুস্তিকাখানি মুখ্যতঃ সাধারণ পাঠকপাঠিকার (বোধহয় বাংলা অনভিজ্ঞ) জন্য রচিত।"

রেলগাড়ীর গায়ে যদি লেখা থাকে "SERVANTS" তা হলে কি বুঝতে হবে কামরাটি মুখ্যতঃ খিদমদগারদের জন্যে ও গৌণতঃ মনিবদের জন্যে? মনিবরা যদি সেখানে বসে আরাম না পান তবে কি সেটা কোম্পানীর দোষ?

তারপর বইখানি যাঁরা লিখেছেন তাঁরা common reader বলে নিজেদের অভিহিত করেছেন। বাংলা সাহিত্য পাঠ করে পাঠক হিসাবে তাঁরা আরো দশজন স্বদেশী ও বিদেশীকে পাঠকার্যে আগ্রহী করতে চান। অথচ পুরকায়স্থ মহাশয়ের মতে, "ইংরাজী ভাষায় বাংলা সাহিত্যের ঐতিহাসিক হিসাবে গ্রন্থকারের একটি বিশিষ্ট দায়িত্ব আছে।"

এত বড় একটা গুরুতর দায়িত্ব আমার উপর আরোপ করলে তো হবে না, প্রমাণ করতে হবে যে আমি এরূপ দায়িত্ব স্বীকার করেছি। কিম্বা নিখিল ভারত পি. ই. এন. মণ্ডলী স্বীকার করেছেন *। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের জনকয়েক লেখকলেখিকা মিলে শ্রীমতী সোফিয়া ওয়াডিয়ার সম্পাদনায় এই যে গ্রন্থমাল্য বিরচন করছেন এর উদ্দেশ্য সজ্জন তোষণ নয়। তা যদি হতো তবে এর আকার প্রকার গুরুতর হতো, আর এর প্রণয়নভার পড়ত গুরুদের উপরে। কিন্তু আমাদের এই সিরিজটি যাঁদের জন্যে তাঁরা "কমন রীডার" বা "ইতরে জনাঃ।" তাঁদের জন্যে মিষ্টান্ন পাক করতে গিয়ে সফল হয়েছি কি না তারই বিচার হোক। ইতি। বিনীত—

অন্নদাশঙ্কর রায়

* "No systematic attempt has been made to popularise the story of the Indian literatures or to present gems from their masterpieces to the general public in English translation. This is now being attempted by the centre for India of the International P. E. N." (Editor's Foreword, page ii, "Bengali Literature").

সম্পাদকীয়

এই সংখ্যায় 'কবি ষ্টিফেন স্পেণ্ডার' নামক যে প্রবন্ধটি ছাপা হয়েছে একাধিক কারণে তা উল্লেখযোগ্য। স্পেণ্ডার ইংল্যাণ্ডের খ্যাতনামা কবি—এই হিসেবে সাহিত্যানুরাগী পাঠকদের মধ্যে তাঁর এই পরিচয় আগ্রহের সঞ্চার করবে। কিন্তু স্পেণ্ডার সম্বন্ধে আমাদের আগ্রহের ও ঔৎসুক্যের অন্য কারণও আছে। বর্তমান জীবনের সমস্যা স্পেণ্ডারের মনকে গভীরভাবে আলোড়িত করেছে ও সাহিত্যিক ও অ-সাহিত্যিক বহু ব্যক্তির মত তিনি এই সমস্যার সমাধানের আশায় মার্কস্‌বাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছেন। স্পেণ্ডারের রচনায় মার্কস্‌বাদের প্রতিভাস সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত শিবনারায়ণ রায় তাঁর প্রবন্ধে আলোচনা করেছেন। সাহিত্য ও মার্কস্‌বাদ বিষয়টি ব্যাপক ও জটিল, বাংলাভাষায় এই বিষয়ে এতাবৎ যতটুকু আলোচনা হয়েছে তাতে এর জটিলতা দূর না হ'য়ে বরঞ্চ ঘোরতর হয়েছে।

সম্পাদকীয় মন্তব্যের সঙ্কীর্ণ পরিসরে এই জটিলতা সরাসরি মোচন করবার মতন দুঃসাহসিক চেষ্টা না ক'রেও দু' একটি ভুল সংশোধন করা যেতে পারে। পরিচয়ের গত সংখ্যায় শ্রীযুক্ত হুমায়ুন কবির-প্রণীত 'বাংলার কাব্য' সমালোচনা প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন পুরকায়স্থ এই অভিযোগ করেছেন যে 'বামপন্থী' অর্থাৎ (লেখকের রচনার ভাব থেকে মনে হয়) মার্কস্‌বাদী লেখকেরা রবীন্দ্রনাথকে 'নিজেদের দলে টানিবার চেষ্টা করেন'। প্রমাণস্বরূপ তিনি উল্লেখ করেন যে শ্রীযুক্ত হুমায়ুন কবিরের মতে রবীন্দ্রনাথ নাকি তাঁর জীবনের শেষ দশ বারো বৎসর দেশের গণমানসকে আবিষ্কার করার সাধনা করেছিলেন। কিন্তু এই নজির অগ্রাহ্য, কেননা শ্রীযুক্ত হুমায়ুন কবির 'বামপন্থী' (মার্কস্‌বাদী অর্থে) লেখক নন্। তাছাড়া, ক্ষেত্রবাবুর অভিযোগের বিরুদ্ধে একাধিক নজির এই পত্রিকা থেকেই উপস্থিত করা যেতে পারে। ১৩৪৮ সালে রবীন্দ্রনাথের শেষ জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে ও তাঁর মৃত্যুর পরে 'পরিচয়'-পত্রিকার যে দুইটি বিশেষ রবীন্দ্র-সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিল তার প্রথমটিতে শ্রীযুক্ত বসুধা চক্রবর্তীর 'মার্কসবাদীর দৃষ্টিতে রবীন্দ্রনাথ' ও দ্বিতীয়টিতে শ্রীযুক্ত অমিত সেন লিখিত "রবীন্দ্রনাথ ও অগ্রগতি"—ঐ দুটি প্রবন্ধই বিশেষভাবে মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচায়ক। রবীন্দ্রনাথের সমগ্র জীবন ও সাহিত্য যে প্রগতিশীল এই দুটি প্রবন্ধেই এই কথা বিশেষ-ভাবে আলোচিত হয়। কিন্তু এই মার্কস্‌বাদী লেখকদ্বয়ের একজনও দাবী করেন নি যে রবীন্দ্রনাথ মার্কস্‌পন্থী ছিলেন, বরঞ্চ দুই জনেই অত্যন্ত পরিষ্কার ভাষায় তার উলটো কথা বলেন। এমন কি, এই প্রসঙ্গে লেখা

শ্রীযুক্ত বসুধা চক্রবর্তীর একটি উক্তিকে প্রসঙ্গচ্যুত অবস্থায় ও ফলে বিকৃত অর্থে উদ্ধার ক'রে অনেক 'দক্ষিণপন্থী' লেখক মার্কস্‌বাদী লেখকদের বিরুদ্ধে অস্ত্রস্বরূপ ব্যবহার করেন। তাঁর অভিযোগ ছিল যে মার্কস্‌বাদী লেখকেরা নাকি রবীন্দ্রনাথকে স্বীকারই করেন না। আজ দেখি অপর এক দক্ষিণপন্থী লেখক, শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন পুরকায়স্থ, অভিযোগ করছেন যে বামপন্থী লেখকেরা রবীন্দ্রনাথকে 'প্রগতিশীল' আখ্যা দিয়ে নিজেদের দলে টানবার চেষ্টা করছেন। এই দুই অভিযোগই অতথ্য। মার্কস্‌বাদীর বিচারে রবীন্দ্রনাথ শুধু প্রগতিশীল লেখক নন, আমাদের বর্তমান জাতীয় সংস্কৃতির নির্মাতা, কিন্তু তার অর্থ এ নয় যে তিনি মার্কস্‌বাদী ছিলেন।

এই বিষয়ে ও ব্যাপকভাবে সাহিত্য ও মার্কস্‌বাদ-সম্বন্ধে মতভেদের ও বহু আলোচনার অবকাশ আছে। আশা করি যাঁরা মার্কস্‌বাদী ও যাঁরা মার্কস্‌বাদী নয় এই দুই জাতীয় লেখকই এই বিষয়টিকে ক্রমশ পরিষ্কার ক'রে তুলতে সাহায্য করবেন। যেমন ধূর্জটিবাবু এই সংখ্যাতেই পুস্তক-পরিচয় প্রসঙ্গে করেছেন। যে-প্রবন্ধটি উল্লেখ করে এই সম্পাদকীয় মন্তব্যের অবতারণা তারই একটি চ্যুতির উল্লেখ ক'রে এটি শেষ করতে চাই। লেখকের মতে—

"যুদ্ধ বাধার পর স্পেণ্ডার যখন 'কোলিওজ অব্ নিউ রাইটিং'-এ লিখলেন যে ব্রিটিশ সাম্যবাদী দলের অস্থির পদক্ষেপের সাথে তাল রাখা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়, তখন তাঁর ভেতরে বুর্জোয়া ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য লক্ষ্য করে ক্ষুব্ধ হবার কারণ দেখিনে। আদর্শের প্রতি সততা উইনট্রিংহামের মত গণযুদ্ধে সক্রিয় অংশ গ্রহণেই প্রমাণিত হয়েছে। পার্টির ভ্রান্তপথ অনুসরণ না করা যে ঠিকই হয়েছিল পার্টির পরবর্তী মত পরিবর্তন-ই তার প্রমাণ।"

এখানে একটু তথ্যের অপলাপ ঘটেছে। ব্রিটিশ কমিউনিষ্ট পার্টি পথ বদলেছিল কিন্তু মত নয়। এই পথ বদলানোর কারণ পূর্ববর্তী পথ ভ্রান্ত ছিল বলে নয়—অবস্থার সম্পূর্ণ পরিবর্তনে ভিন্ন পথ অবলম্বন প্রয়োজন হয় বলে। দুই ক্ষেত্রেই পার্টি একই মূল নীতির অনুসরণ করে। এই মূলনীতির প্রয়োগ সম্বন্ধে অজ্ঞতাই ব্রিটিশ বা ভারতীয় কমিউনিষ্ট পার্টির মত ও পথ সম্বন্ধে অনেকের মনে বিভ্রমের সৃষ্টি করেছে।

হিরণকুমার সান্যাল

শ্রীকুন্দভূষণ ভাদুড়ী কর্তৃক পরিচয় প্রেস, ৮ বি, দীনবন্ধু লেন,
কলিকাতা হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

১২শ বর্ষ, ২য় খণ্ড, ৩য় সংখ্যা
চৈত্র, ১৩৪৯

পরিচয়

উপনিষদে জড়তত্ত্ব

একাদশ অধ্যায়

লোক-সৃষ্টি

আমরা দেখিয়াছি নির্গুণ পরব্রহ্ম মায়া-উপাধি অঙ্গীকার করিয়া সগুণ মহেশ্বর হইলে তাঁহাতে সিসৃক্ষার (সৃষ্টির ইচ্ছার) উদয় হয়। তখন তাঁহা হইতে যথাক্রমে আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল ও ক্ষিতি—এই পঞ্চ তত্ত্বের আবির্ভাব হয়। এই তত্ত্বসৃষ্টির কথা আমরা পূর্ববর্তী অধ্যায়ে যথাসম্ভব আলোচনা করিয়াছি। অতঃপর লোক-সৃষ্টি সম্বন্ধে আলোচনা করিব। এ প্রসঙ্গে ঐতরেয় উপনিষদ্ বলিতেছেন :—

আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীৎ। নান্যৎ কিঞ্চন মিষৎ। স ঐক্ষত লোকান্নু সৃজা ইতি। স ইমান্ লোকানসৃজত—ঐত, ১।১।১-২।

"অগ্রে অর্থাৎ সৃষ্টির পূর্বে এক পরমাত্মা ভিন্ন অন্য কিছুই ছিল না। তিনি ঈক্ষা (সঙ্কল্প) করিলেন, 'আমি লোক সৃষ্টি করিব'। তিনি এই সমস্ত লোক সৃষ্টি করিলেন।" কি কি লোক সৃষ্টি কবিলেন ?—অম্ভো মরীচীর্মরমাপ।

অদোঽম্ভঃ পরেণ দিবং, দ্যৌঃ প্রতিষ্ঠাঽন্তরিক্ষং মরীচয়ঃ। পৃথিবী মরো যা অধস্তাৎ তা আপঃ—ঐত, ১।১।২

অম্ভঃ শব্দ বাচ্যো লোকঃ পরেণ দিবং দ্যুলোকাৎ পরেণ পরস্তাৎ * * দ্যৌঃ প্রতিষ্ঠা আশ্রয়স্তস্য অম্ভসো লোকস্য। দ্যুলোকাদ্ অধস্তাৎ অন্তরিক্ষং যৎ তৎ মরীচয়ঃ। * * পৃথিবী মরঃ ম্রিয়ন্তেঽস্মিন্ ভূতানি ইতি। যা অধস্তাৎ পৃথিব্যাঃ তা আপঃ উচ্যন্তে—শঙ্করভাষ্য।

"অম্ভঃ, মরীচি, মর ও অপ্।"

অপ্ আমাদিগের সুপরিচিত কারণার্ণব—জড় জগতের নির্বিশেষ উপাদান—সাংখ্যদিগের প্রধান বা মূল-প্রকৃতি। অপ্ কোন লোক-বিশেষ নহে—উহা সমস্ত লোকের উপাদানভূত মূল ভূত।

ঐতরেয় উপনিষদের উপদেশে আমরা জানিলাম যে, নিম্নে মরলোক (পৃথিবী), মধ্যে মরীচি—অন্তরিক্ষ লোক, ঊর্ধ্বে দিব্ বা দ্যুলোক (স্বর্গ), এবং তাহার পারে অম্ভঃ। পৃথিবী, অন্তরিক্ষ ও দ্যৌঃ—ইহা আমাদিগের সুপরিচিত ত্রিলোক—যাহাদিগের প্রচলিত সংজ্ঞা—ভূঃ, ভুবঃ ও স্বঃ।

পৃথিবী অন্তরিক্ষং দ্যৌঃ—তৈত্তি, ১।৬

উপনিষদের বহুস্থানে এই তিন লোকের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ কয়েকটি স্থল উদ্ধৃত করিলাম—

ভূমিঃ অন্তরিক্ষং দ্যৌঃ—বৃহ, ৫।১৪।১

অথ ত্রয়ো বাব লোকাঃ মনুষ্যলোকঃ পিতৃলোকো দেবলোক ইতি—বৃহ, ১।৫।১৬

পুনশ্চ—যা হুতা উজ্জ্বলন্তি দেবলোকম্ এব তাভির্জয়তি। যা হুতা অতনেদান্তে পিতৃলোকম্ এব তাভির্জয়তি, যা হুতা অধিশেরতে মনুষ্যলোকম্ এব তাভির্জয়তি।

প্রজাপতিঃ তাম্ (ত্রয়ী-বিদ্যাম্) অভ্যতপৎ। তস্যা অভিতপ্তায়া এতানি অক্ষরাণি সম্প্রাস্রবন্তঃ। ভূর্ভুবঃ স্বঃ ইতি—ছান্দোগ্য, ২।২৩।২

'প্রজাপতি ত্রয়ীবিদ্যাকে অভিতপ্ত করিলেন। অভিতপ্ত ত্রয়ীবিদ্যা হইতে এই তিন অক্ষর প্রাদুর্ভূত হইল—ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ'।

প্রজাপতিঃ লোকান্ অভ্যতপৎ। তেষাং তপ্যমানানাং রসান্ প্রাবৃহৎ। অগ্নিং পৃথিব্যা বায়ুমন্তরিক্ষাৎ আদিত্যং দিবঃ—ছান্দোগ্য ৪।১৭।১

(প্রাবৃহৎ=উদ্ধৃতবান্ আগ্রহ ইত্যর্থঃ—শঙ্কর)

'প্রজাপতি লোকসমূহকে অভিতপ্ত করিলেন। অভিতপ্ত লোক হইতে তিনি রস উদ্ধার করিলেন—পৃথিবী হইতে অগ্নি, অন্তরিক্ষ হইতে বায়ু এবং দ্যৌ হইতে আদিত্য।'

যদ্ ঊর্ধ্বং গার্গি। দিবো যদ্ অর্বাক্ পৃথিব্যা যদ্ অন্তরা দ্যাবা পৃথিবী ইমে—বৃহ, ৩।৮।৪

'হে গার্গি! যাহা দ্যুলোকের ঊর্ধ্বে, যাহা পৃথিবী (ভূলোকের) অধে, যাহা দ্যাবা-পৃথিবী (অন্তরিক্ষ) লোকের মধ্যে।'

ঋগ্ভিরেতং যজুর্ভিরন্তরিক্ষং স সামভির্যৎ তৎকবয়ো বেদয়ন্তে—প্রশ্ন, ৫।৭

'ঋকের দ্বারা এই (পৃথিবী) লোক, যজুর দ্বারা অন্তরিক্ষ লোক এবং সামের দ্বারা কবিগণ-বেদ্য (ঊর্ধ্ব) লোক প্রাপ্ত হওয়া যায়।'

এই ভূঃ ভুবঃ স্বঃ—পৃথিবী, অন্তরিক্ষ, দ্যুলোক—ইহাদিগের পারে ঐতরেয় উপনিষদ্ অন্তঃ লোকের উল্লেখ করিলেন। কোথা সে অন্তঃলোক? "পরেণ দিবম্"—"দ্যুলোকের পরপারে"। অর্থাৎ ভূ ভুবঃ স্বঃ এই ত্রিলোকীর ঊর্ধ্বতন যে লোক, তাহার সাধারণ নাম অন্তঃ। সম্ভবতঃ তৈত্তিরিয় উপনিষদ্ "মহঃ" শব্দ দ্বারা এই ঊর্ধ্বতন অন্তঃ লোককেই লক্ষ্য করিয়াছেন :—

ভূঃ ইত্যগ্নৌ প্রতিতিষ্ঠতি। ভুবঃ ইতি বায়ৌ। স্বরিত্যাদিত্যে। মহঃ ইতি ব্রহ্মণি।

এখানে আমরা ভূ ভুবঃ স্বঃ—এই তিন লোকের ঊর্ধ্বে—মহঃ এই নামধেয় 'ব্রহ্ম'লোকের উল্লেখ পাইলাম। অন্তঃ শব্দের ন্যায় সম্ভবতঃ এই মহঃ শব্দও ঊর্ধ্বতন লোকের সাধারণ নামরূপে এখানে ব্যবহৃত হইয়াছে। কিন্তু উপনিষদের অন্যত্র আমরা সপ্তলোকের স্পষ্ট উল্লেখ পাই :—

সপ্ত ইমে লোকা যেষু চরন্তি প্রাণাঃ—মুণ্ডক, ২।১।৮

'এই সপ্তলোক যাহাতে প্রাণ সঞ্চারিত হয়।'

যস্যাগ্নিহোত্রম্ অদর্শম্ অপৌর্ণমাসম্ * *
আসপ্তমান্ তস্য লোকান্ হিনস্তি—মুণ্ডক, ১।২।৩

'যাহার অগ্নিহোত্র দর্শ ও পৌর্ণমাস রহিত, তাহার সপ্তম অবধি লোক বিনষ্ট হয়।'

এই সপ্তলোক কি কি? প্রথমতঃ আমাদিগের পরিচিত ভূঃ ভুবঃ স্বঃ এই ত্রিলোক এবং তাহার ঊর্ধ্বে মহঃ, জনঃ, তপঃ ও সত্যলোক। এই সপ্তলোকের নামনির্দেশ আমরা উপনিষদ্ ও আরণ্যকের স্থানে স্থানে শুনিতে পাই।

ভূর্লোকঃ পাদয়োস্তস্য ভুবোলোকস্তু জানুনোঃ।
স্বর্লোকঃ কটীদেশে তু নাভিদেশে মহর্জগৎ।
জনলোকস্তু হৃদয়ে কণ্ঠদেশে তপস্ততঃ।
ভ্রুবোর্ললাটমধ্যে তু সত্যলোকো ব্যবস্থিতঃ।—নাদবিন্দু, ৩-৭
ওঁ গায়ত্রীং আবাহয়ামি ইতি

ওঁ ভূঃ। ওঁ ভুবঃ। ওঁ স্বঃ। ওঁ মহঃ। ওঁ জনঃ। ওঁ তপঃ। ওঁ সত্যম্। ওঁ তৎসবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি। ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ। ওঁ আপো জ্যোতী রসোঽমৃতং ব্রহ্ম ভূর্ভুবঃ স্বরোম্, ইতি॥

ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বর্মহর্জনস্তপঃ সত্যং তদ্ব্রহ্ম—তৈত্তি-আরণ্যক, ১০,২৭-২৮

য এতং মন্ত্ররাজং নারসিংহমানুষ্টুভং নিত্যমধীতে স ভূর্লোকং জয়তি স ভুবর্লোকং জয়তি স স্বর্লোকং জয়তি স মহর্লোকং জয়তি স জনোলোকং জয়তি স তপোলোকং জয়তি স সত্যলোকং জয়তি স সর্বান্ লোকান্ জয়তি স সর্বান্ লোকান্ জয়তি। *—নৃসিংহপূর্ব তাপনী, ২।৪

'তাঁহার পাদদেশে ভূর্লোক, জানুতে ভুবর্লোক, কটিদেশে স্বর্লোক, নাভিতে মহর্লোক, হৃদয়ে জনলোক, কণ্ঠদেশে তপলোক এবং ললাটমধ্যে সত্যলোক অবস্থিত'।—নাদবিন্দু।

'গায়ত্রীকে আবাহন করি, ওঁ ভূঃ, ওঁ ভুবঃ, ওঁ স্বঃ, ওঁ মহঃ, ওঁ জনঃ, ওঁ তপঃ, ওঁ সত্য। সেই সবিতাদেবের বরণীয় তেজকে আমরা ধ্যান করি। তিনি আমাদিগের ধীকে প্রেরণা করেন। অপ্, জ্যোতিঃ, রস, অমৃত ব্রহ্ম। ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ, মহঃ, জনঃ, তপঃ, সত্য।—সেই ব্রহ্ম।' —তৈত্তি, আরণ্যক।

'যিনি এই নারসিংহ আনুষ্টুভ মন্ত্ররাজ অধ্যয়ন করেন, তিনি ভূলোক জয় করেন, ভুবর্লোক জয় করেন, স্বর্লোক জয় করেন, মহর্লোক জয় করেন, জনঃ লোক জয় করেন, তপঃ লোক জয় করেন, সত্যলোক জয় করেন, তিনি সমস্ত লোক জয় করেন।' —নৃসিংহ পূতাঃ।

এইরূপে আমরা ভূ ভুবঃ স্বঃ মহঃ জনঃ তপঃ সত্য—এই সপ্তলোকের উল্লেখ পাইলাম। কোথাও কোথাও (যেমন বৃহদারণ্যকের গার্গী যাজ্ঞবল্ক্য সংবাদে) এই সপ্তলোকের বিভিন্ন ভাবে উল্লেখ আছে। কিন্তু তাহা থাকিলেও লোকসমূহের সপ্ত সংখ্যাই যে উপনিষদের অভিপ্রেত, তদ্বিষয়ে সন্দেহ করা যায় না। বৃহদারণ্যকের নির্দেশ এইরূপ :—

ইদং সর্বং অপ্সু ওতঞ্চ প্রোতঞ্চ। কস্মিন্ খল্বাপ ওতাশ্চ প্রোতাশ্চেতি বায়ৌ গার্গীতি কস্মিন্ খলু বায়ুরোতশ্চ প্রোতশ্চেত্যন্তরিক্ষলোকেষু গার্গীতি কস্মিন্ খল্বন্তরিক্ষলোকা ওতাশ্চ প্রোতাশ্চেতি গন্ধর্বলোকেষু গার্গীতি কস্মিন্ খলু গন্ধর্বলোকা ওতাশ্চ প্রোতাশ্চেত্যাদিত্যলোকেষু গার্গীতি কস্মিন্ খল্বাদিত্যলোকা ওতাশ্চ প্রোতাশ্চেতি চন্দ্রলোকেষু গার্গীতি কস্মিন্ খলু চন্দ্রলোকা ওতাশ্চ প্রোতাশ্চেতি নক্ষত্রলোকেষু গার্গীতি কস্মিন্ খলু নক্ষত্রলোকা ওতাশ্চ প্রোতাশ্চেতি দেবলোকেষু গার্গীতি কস্মিন্ খলু দেবলোকা ওতাশ্চ প্রোতাশ্চেতীন্দ্রলোকেষু গার্গীতি কস্মিন্ খল্বিন্দ্রলোকা ওতাশ্চ প্রোতাশ্চেতিপ্রজাপতিলোকেষু গার্গীতি কস্মিন্ খলু

---

* আরুণেয় উপনিষদে সপ্ত পাতালের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। প্রজাপতি আরুণিকে উপদেশ দিতেছেন :—

ভূর্লোকভুবর্লোকস্বর্লোকমহর্লোকজনোলোকতপোলোকসত্যলোকং চাতলপাতালবিতলসুতলরসাতলমহাতললাতলং ব্রহ্মাণ্ডং চ বিসৃজেৎ।

এই অতল, পাতাল, বিতল, সুতল, রসাতল, মহাতল ও তলাতল সম্ভবতঃ ভূর্ভুবঃ প্রভৃতি সপ্তলোকেরই প্রতিবিম্ব। কোন কোন মতে ইহারা পৃথিবী লোকের সপ্ত স্তর।

প্রজাপতিলোকা ওতাশ্চ প্রোতাশ্চেতি ব্রহ্মলোকেষু গার্গীতি কস্মিন্ খলু ব্রহ্মলোকা ওতাশ্চ প্রোতাশ্চেতি।—বৃহ, ৩।৬

'এই সমস্ত অপে ওতপ্রোত রহিয়াছে। অপ্ বায়ুতে, বায়ু অন্তরিক্ষলোকে, অন্তরিক্ষলোক গন্ধর্বলোকে, গন্ধর্বলোক আদিত্যলোকে, আদিত্যলোক চন্দ্রলোকে, চন্দ্রলোক নক্ষত্রলোকে, নক্ষত্রলোক দেবলোকে, দেবলোক ইন্দ্রলোকে, ইন্দ্রলোক প্রজাপতিলোকে এবং প্রজাপতিলোক ব্রহ্মলোকে ওতপ্রোত রহিয়াছে।' *

সপ্তলোক বলিলে আমরা কি বুঝিব? লোক বলিতে ভুবন—জীবের লীলাক্ষেত্র। যেমন এই ভূলোক (পৃথিবী) স্থূল ক্ষিতি-উপাদানে গঠিত জীবের আবাস-ভূমি, তাহার লীলা ভুবন; সেইরূপ ভুবঃ প্রভৃতি অন্যান্য লোক; প্রত্যেকেই জীবের ক্ষেত্র, প্রত্যেকেই বড় উপাদানে গঠিত। উপাদানের সূক্ষ্মতার তারতম্য অনুসারে লোকের সূক্ষ্মতার তারতম্য। ভূলোক সর্বাপেক্ষা স্থূল; ভুবর্লোক তদপেক্ষা সূক্ষ্ম; ভুবর্লোকের অপেক্ষা স্বর্লোক সূক্ষ্ম; তাহার তুলনায় মহর্লোক সূক্ষ্মতর; আবার মহর্লোক অপেক্ষা যথাক্রমে জন, তপ ও সত্যলোক সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম। সর্বোচ্চ লোক সত্য লোক সূক্ষ্মতম উপাদানে গঠিত। কিন্তু তাহা হইলেও তাহা জড়, প্রাকৃতিক, প্রকৃতির বিকারে গঠিত।

আমরা তত্ত্বসৃষ্টির প্রসঙ্গে দেখিয়াছি যে, সূক্ষ্মতম আকাশ হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমে ক্রমে স্থূলতর বায়ু, অগ্নি, জল ও ক্ষিতি এই পঞ্চ মহাভূতের আবির্ভাব হয়। সপ্তলোক যখন ভৌতিক উপাদানে গঠিত, তখন আমাদিগের জানা আবশ্যক, কোন্ ভূত কোন্ ভুবনের উপাদান। আমাদের পৃথিবী (ভূলোক) সর্ব্বাপেক্ষা স্থূল; সেইজন্য ক্ষিতিতত্ত্ব ইহার উপাদান। ক্ষিতিতত্ত্বের বিকার দ্বারা এই ভূলোক গঠিত। এইরূপ অপ্ তত্ত্বের উপাদান দ্বারা ভুবর্লোক বা অন্তরিক্ষ নির্মিত। অগ্নি বা তেজস্তত্ত্বের উপাদানে স্বঃ বা দ্যুলোক নির্মিত এবং বায়ুতত্ত্বের বিকাশ দ্বারা মহর্লোক গঠিত। এই মহর্লোকের অপর

---

* শঙ্করাচার্য বলেন, "ব্রহ্মলোকা নাম অণ্ডারম্ভকানি ভূতানি"। অর্থাৎ "এস্থলে ব্রহ্মলোক শব্দের অর্থ ব্রহ্মাণ্ডের উপাদানভূত পঞ্চভূত।" তাহা যদি হইল, তবে সম্ভবতঃ উদ্ধৃত বৃহদারণ্যক বাক্যোক্ত অন্য অন্য লোকশব্দও 'সপ্তলোক' বলিলে আমরা যে লোক বুঝি, সে লোকের সূচক নহে।

নাম প্রজাপতিলোক—প্রাজাপত্যঃ ততো মহান্। এই মহর্লোক নিম্নতর ত্রিলোকী ভূঃ ভুবঃ স্বঃ এবং ঊর্ধ্বতর ত্রিলোকী জনঃ, তপঃ, সত্য, এই উভয়ের মধ্যবর্তী। জনঃ তপঃ সত্য, এই ঊর্ধ্বতর ত্রিলোকীর সাধারণ নাম ব্রহ্মলোক।

ব্রাহ্মস্ত্রিভূমিকো লোকঃ প্রাজাপত্য স্ততো মহান্

ব্যাসভাষ্যধৃত এই প্রাচীন শ্লোক হইতে আমরা জানিতে পারি যে, মহর্লোকের উপরিতন যে ত্রিভূমিক (three-levelled) লোক, তাহার নাম ব্রহ্মলোক। এই ভূমিত্রয় আমাদিগের পরিচিত জনঃ, তপঃ ও সত্যলোক। ইহাদিগের সাধারণ উপাদান পঞ্চভূতের সূক্ষ্মতম ভূত আকাশ। সেজন্য এই লোক সূক্ষ্মতম লোক। কারণ, আকাশিক বিকারের তারতম্যে এই ব্রহ্মলোক-রূপ ত্রিলোকী গঠিত হইয়াছে। স্বর্লোকের উপর ঐ প্রজাপতি লোক ও ব্রহ্মলোকের উল্লেখ আমরা কৌষীতকী ও বৃহদারণ্যক উপনিষদেও প্রাপ্ত হই। কৌষীতকী বলেন—

স এতং দেবযানং পন্থানম্ আসাদ্য স ইন্দ্রলোকম্ (আগচ্ছতি), স প্রজাপতিলোকং স ব্রহ্মলোকম্—১।৩

বৃহদারণ্যকের উপদেশ এই :—

কস্মিন্ নু খলু দেবলোকা ওতাশ্চ প্রোতাশ্চ ? ইন্দ্রলোকেষু। কস্মিন্ নু খলু ইন্দ্রলোকা ওতাশ্চ প্রোতাশ্চ ? প্রজাপতিলোকেষু। কস্মিন্ নু খলু প্রজাপতিলোকা ওতাশ্চ প্রোতাশ্চ ? ব্রহ্মলোকেষু—বৃহ, ৩।৬।১

অর্থাৎ, দেবলোক ইন্দ্রলোকে ওতপ্রোত, ইন্দ্রলোক প্রজাপতিলোকে ওতপ্রোত এবং প্রজাপতিলোক ব্রহ্মলোকে ওতপ্রোত। বৃহদারণ্যকের অন্যত্র ঊর্ধ্বতম ব্রহ্মলোকের ভূমানন্দ বর্ণন করিতে গিয়া ঋষি নিম্নতর আনন্দের পরিমাণ উপলক্ষে পর পর মনুষ্যলোক, পিতৃলোক, গন্ধর্বলোক (যাহা পিতৃ-লোকেরই ভূমিকাভেদ), দেবলোক, এবং ঐ প্রজাপতিলোক ও ব্রহ্মলোকের উল্লেখ করিয়াছেন। (বৃহ, ৪।৩।৩৩ দ্রষ্টব্য)

অতএব আমরা বুঝিলাম যে, ঐ ভূঃ ভুব স্বঃ মহঃ জনঃ সত্য বস্তুতঃ উপনিষদের ঐ পঞ্চ লোক—অর্থাৎ মনুষ্য লোক, পিতৃলোক, [illegible]লোক, প্রজাপতিলোক ও ব্রহ্মলোক। ইহারাই খিয়-

সকির Five Planes—Physical Plane, Astral Plane Devachanio Plane, Budhic Plane and Nirvanic Plane. ব্রহ্মলোকের যেমন তিনটি স্তর—জনঃ তপঃ ও সত্য—দেবলোকেরও সেইরূপ দুইটি স্তর—রূপস্তর ও অরূপস্তর। অবশ্য রূপস্তর অপেক্ষা অরূপস্তর সূক্ষ্মতর উপাদানে গঠিত।

পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক অনেক দিন এই Physical Plane বা মনুষ্যলোকের ঊর্ধ্বে উঠিতে পারেন নাই। সুখের বিষয় সম্প্রতি তিনটি লোকের কথা বলিতেছেন।

Man lives in three environments—the physical, tbe etherial, and the the met-etherial which is called the heaven world.

—Frederio Myers.

পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের এই তিনটি environments (এদেশে environment-এর প্রাচীন নাম 'আবসথ'—তস্য ত্রয়ঃ আবসথাঃ—উপনিষদ্)—প্রাচ্য প্রজ্ঞানের সুপরিচিত ভূঃ ভুবঃ ও স্ব, অর্থাৎ, মনুষ্যলোক, পিতৃলোক ও দেবলোক। আশা করা যায়, কালে পাশ্চাত্যেরা তদুপরিতন প্রজাপতিলোক ও ব্রহ্মলোকেরও সন্ধান পাইবেন।

লক্ষ্য করিতে হইবে প্রত্যেক লোকই প্রাকৃত, অর্থাৎ জড় উপাদানে গঠিত। These (five) planes are definite regions in nature, each having its own kind of matter.—Annie Besant.

হীরেন্দ্রনাথ দত্ত

জীবনের পটভূমি

দ্বিতীয় অঙ্ক

তৃতীয় দৃশ্য

[ক'দিন পর সন্ধ্যাবেলায়। সুমিত্রা দেবীদের বসবার ঘরে প্রিয়ব্রত ও সুমিত্রা দেবী দুখানি চেয়ারে সামনাসামনি ব'সে আছেন। মুখের ভাবে দু'জনকেই কিছুটা চিন্তান্বিত ব'লে মনে হয়, যদিও দুজনের চিন্তার ধারা দুই বিভিন্ন ধারায় প্রবাহিত। সুমিত্রা দেবী ইতিমধ্যে অনিরুদ্ধের প্রভাব বোধ হয় অনেকটা কাটিয়ে উঠেছেন, কিন্তু প্রিয়ব্রত তাঁকে কতটা গ্রহণ করেছে বুঝতে না পেরে এখনো সংশয়ের ভাব দূর করতে পারেন নি। তাঁর ক্লান্ত চোখের ঈষৎ উজ্জ্বল দৃষ্টিতে এই আশা-নিরাশার টানাপড়েনের চিত্রটা স্পষ্ট হ'য়ে উঠেছে। এদিকে প্রিয়ব্রতের স্বাভাবিক হাস্যময় মুখচ্ছবিতেও কী এক সমস্যা যেন চিন্তার কালো ছায়া ফেলেছে,—চোখের দৃষ্টিতে দূরান্তের বনানীরেখার কুয়াশানীল অস্পষ্টতার ছাপ,—পথশ্রমের গ্লানিকে স্বীকার ক'রে মধ্যবর্ত্তী সমস্যার এই বিরাট প্রান্তর অতিক্রম ক'রে দূরের ঐ বনানীস্নিগ্ধ সমাধানে সে পৌঁছাতে পারবে কিনা, সেইটেই বোধ হয় তার চিন্তার বিষয়-বস্তু। কিন্তু সমস্যাটা যে ঠিক কী নিয়ে তা এখনো স্পষ্ট নয়। তবে সুমিত্রা দেবীর প্রেম ইত্যাদি যে নয় তা নিশ্চিত। সেদিকে তার তত খেয়াল নেই।

এই দু'জন ছাড়াও ঘরে তৃতীয় ব্যক্তি ছিল। সে অনিরুদ্ধ। টেবিল চেয়ারের পরিবেশ ছেড়ে সে অদূরে সোফার ওপরে অর্দ্ধশায়িতভাবে কী একটা অমনোরম চেহারার বই নিয়ে ব্যস্ত ছিল। তার ভঙ্গীটা অনেক পরিমাণে আহত-আত্মাভিমানের পরিচায়ক; যেন অভিমান করেই সে নিজেকে এদের পরিবেশ থেকে সরিয়ে রেখেছে এই রকম মনে হয়।

সুমিত্রা দেবী পরেছিলেন আলতা-পেড়ে ধূপছায়া রঙের শাড়ী। অন্য দু'জনের বেশভূষা স্বাভাবিক, উল্লেখযোগ্য নয়।

প্রিয়ব্রত টেবিলের ওপর থেকে কনুই তুলে চেয়ারে হেলান দিয়ে বসল। তারপর সুমিত্রা দেবীর দিকে একবার চেয়ে টেবিলের ওপরকার ইতস্তত বিক্ষিপ্ত কয়খানি সাময়িক পত্রিকা থেকে একখানি তুলে নিয়ে—]

প্রিয়ব্রত (অনিরুদ্ধের দিকে) আজকাল পত্রিকা বেরিয়েছে কত দেখেছ, অনিরুদ্ধ! নাম মনে রাখাই কঠিন।

অনিরুদ্ধ (বই থেকে মুখ ফিরিয়ে গম্ভীর ভাবে) কী পত্রিকা?

প্রিয়ব্রত (একটু হেসে হাতের পত্রিকা দেখিয়ে) এ পত্রিকার কথাই যে আমি বলছিলাম তা নয়, এমনি সাধারণ ভাবে বলছিলাম যে পত্রিকার সংখ্যা খুব বেড়ে গেছে।

অনিরুদ্ধ ও। (ব'লে বইয়ে চোখ ফেরাল।)

প্রিয়ব্রত কি পড়ছ কি? এদিকে এস না, আড্ডা দেওয়া যাক।

অনিরুদ্ধ (বই থেকে চোখ না ফিরিয়ে) তোমরা আড্ডা দাও। আমি এখানেই বেশ আরামে আছি।

(প্রিয়ব্রত বোধ হয় কিছুটা দুঃখিত হ'ল, বোধ হয় কিছুটা আহতও হ'ল। কিন্তু কিছু না ব'লে চুপ করে রইল। কিছুক্ষণ পর—)

সুমিত্রা (মৃদু গলায়) সকালে একটা পত্রিকায় তোমার কবিতা পড়ছিলাম। বেশ লাগল। দুটো লাইন মনে আছে,—

নিষ্প্রাণ কথায় জানি, অলে শুধু নিরর্থক কল্পনার চিতা;
এবার মানুষ দিয়ে তাই প্রিয় লিখে দেব জীবন্ত কবিতা।

সকালে স্কুলের সেক্রেটারী বাবু এসেছিলেন, বুড়ো ভদ্রলোক, তোমার কবিতার এ দুটো লাইনের যা মানে করলেন, চমৎকার।

প্রিয়ব্রত (একটু হাসি ফুটিয়ে) কী রকম?

সুমিত্রা (হেসে, পূর্ব্ববৎ মৃদু গলায়) তোমার মানুষ দিয়ে কবিতা লেখবার সংকল্পের ভেতর ঘর বাঁধবার ইচ্ছার ছায়া দেখেছেন তিনি। (কথাটা ব'লে ফেলে চোখের দৃষ্টিকে যেন একটু তীক্ষ্ণ করলেন তিনি,—যেন এ কথায় তাঁর নিজের ব্যক্তিত্বের খাদও মিশেছে, এই রকম ভাব।)

প্রিয়ব্রত (জানালায় দৃষ্টি ফেলে) ভদ্রলোকের মাথা আছে।

(কিছুক্ষণ চুপ চাপ। গেরুয়া রঙের কালপেড়ে শাড়ী প'রে জয়ন্তী এল ঘরের ভেতর,—তার কাপড়ের রঙের মতই মুখের ভাব নিঃস্পৃহ। এসে একটা চেয়ারে বসে—)

জয়ন্তী (স্বাভাবিক ভদ্রতার সুরে) অনিরুদ্ধ বাবু একা কেন ? এদিকে এগিয়ে আসুন না।

অনিরুদ্ধ (বই থেকে মুখ না ফিরিয়ে।) আপনারা বসুন। আমি এইখান থেকেই তাল দিচ্ছি।

জয়ন্তী (প্রিয়ব্রতের দিকে অনুচ্চ কণ্ঠে) ওঁর শরীর খারাপ নাকি ?

প্রিয়ব্রত (সহৃদয়ভাবে হেসে অনুরূপ অনুচ্চ কণ্ঠে) না বোধ হয়।

সুমিত্রা (অনুরূপ অনুচ্চকণ্ঠে) ওকে দেখলে মনে হয় ও যেন আমাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে পড়েছে,নয় কি ?

প্রিয়ব্রত (বিষণ্ণ হাসি হেসে অনিরুদ্ধের কান বাঁচিয়ে) হ্যাঁ, ওর বোধ হয় ধারণা যে আমাদের কাছে ও ঠিক আগেকার মত সম্বর্দ্ধনা আর পাচ্ছে না।

জয়ন্তী (ঈষৎ অন্যমনস্কভাবে কণ্ঠস্বরে অনুরূপ গোপনতা রক্ষা করে) কথাটা মিথ্যেও নয়। (বলে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে সুমিত্রা দেবীর দিকে চাইল।)

(সুমিত্রা দেবী কিছু বলবার আগেই অনিরুদ্ধ বই বন্ধ ক'রে সোফা থেকে উঠল। তারপর আস্তে আস্তে জানালার কাছে গিয়ে কয়েক মুহূর্ত অপেক্ষা ক'রে এদিকে ফিরে চাইল।—)

অনিরুদ্ধ (গম্ভীর স্বরে) সুমিত্রা, একটু শুনে যাবে ?

(সুমিত্রা দেবী ধীরে ধীরে উঠে তার কাছে এগিয়ে গেলেন। তিনি অনিরুদ্ধের কাছে গিয়ে দাঁড়ালে প্রিয়ব্রত আর জয়ন্তী সে দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে দু'জনে দুখানা পত্রিকা তুলে নিল টেবিল থেকে।

অনিরুদ্ধ বোধ হয় একটু হাসবার চেষ্টা করল, কিন্তু হাসি না ফুটে তাতে কেবল মুখের পেশীগুলোই দৃঢ় হ'ল। জানালায় ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে সুমিত্রা দেবীর দিকে গভীর দৃষ্টি ফেলে—)

অনিরুদ্ধ আচ্ছা, একটা কথা।······তুমি কি এখনো আমাকে আগেকার মতই···শ্রদ্ধা কর ?

সুমিত্রা (কোমলভাবে) দেখ, শ্রদ্ধা করি এমন কথা ব'লে (একটু কঠিন হয়ে) ভুল বোঝাতে পারব না তোমাকে। কেননা যে সময়ে

তোমাকে পুরোপুরি শ্রদ্ধা করতাম তার চেয়ে (অধিকতর কঠিন হ'য়ে) অনেকটা নেমে গেছ তুমি। তবে (খানিকটা কোমল-ভাবে) তুমি আমার পুরানো বন্ধু, তোমাকে সর্ব্বদাই আন্তরিকতার সঙ্গে স্মরণ করি।···কেন, শ্রদ্ধার কথা জিজ্ঞাসা করছ যে?

অনিরুদ্ধ (জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে) এমনি।···আমি তোমার চোখে নেমে গিয়েছি। বুঝতে পারি। তুমি আর আমাকে শ্রদ্ধা কর না। (সহসা সুমিত্রা দেবীর চোখের ওপর দৃষ্টি ফেলে, চাপা তিক্ততার সঙ্গে) কিন্তু একথা তুমি নিশ্চয় জেনো আমাদের দেশে সত্যিকার শ্রমিক জাগরণ আসা কখনোই সম্ভব নয়।

সুমিত্রা কেন? তাদের ভেতর কি অসন্তোষ নেই ব'লে তোমার ধারণা?

অনিরুদ্ধ অসন্তোষ হয়ত আছে। কিন্তু রূপহীন। তা ছাড়া শ্রমিক আন্দোলন জিনিষটার ওপরই আমার শ্রদ্ধা নেই। ওপথে আমাদের মিছিমিছি শক্তির অপব্যয় ছাড়া আর কিছু লাভ হবে ব'লে আমার বিশ্বাস হয় না।

সুমিত্রা তার মানে, তুমি তোমার বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকে পর্য্যন্ত হারিয়েছ। (ঈষৎ শ্লেষের সুরে) এর পরে হয়ত দেশ যে কোনদিন স্বাধীন হবে এ বিষয়েও তোমার যথেষ্ট সংশয় ঘটেছে?

অনিরুদ্ধ (সমান শ্লেষের সুরে) অন্তত, মজুর বিলাসের দ্বারা যে হবে না, এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ। আমাদের চেষ্টা করতে হবে অন্য পথে।

সুমিত্রা (ধৈর্য্যকে কিছু পরিমাণে ফিরিয়ে এনে) তোমার মতের এত বেশী প্রতিবাদ করা যায় যে কোনো প্রতিবাদই আমি করব না। কিন্তু অন্য কোন্ পথে চেষ্টা করা যেতে পারে বল তো?—অহিংসা, না পণ্ডিচেরী আশ্রম?

অনিরুদ্ধ (তিক্ত হাসির সঙ্গে ঈষৎ আহত সুরে) অর্থাৎ, আধ্যাত্মিক শক্তিতে বিশ্বাস করো না, এই তো?

সুমিত্রা (সংযত হ'য়ে দৃঢ়তার সঙ্গে) না। সে সম্বন্ধে আমার কোনো কৌতূহল নেই, এই পর্য্যন্ত।···ওতে আমার কোনো আগ্রহ নেই।

অনিরুদ্ধ (অনমনীয়ভাবে) তার মানেই বিশ্বাস নেই। কিন্তু (বিষণ্ণভাবে হেসে হেসে) হে হোরাসিও, সংসারে এমন অনেক জিনিষ ঘটে যা তোমাদের মীমাংসা শাস্ত্রের স্বপ্নেরও অগোচর।—যাক। আজ আমি দেশে চলছি। কবে ফিরব বলতে পারি নে। (চোখের ভুরু টান ক'রে, কেমন এক অদ্ভুত সুরে) যাও, ওরা ব'সে রয়েছে। তোমার ছুটি। (ব'লে সে জানালা থেকে বাহিরের দরজার দিকে অগ্রসর হল।)

(সুমিত্রা দেবীর চোখের ওপর একবার যেন ছায়া ঘোর হ'য়ে এল। কিন্তু সে কেবল ক্ষণেকের জন্যে, পরক্ষণেই সামলে নিলেন নিজেকে। বোঝা গেল এই শেষ বেদনার মোচড়ের সঙ্গে সঙ্গে বেদনার কারণকেও মন থেকে উৎপাটিত করে দিলেন তিনি। অনিরুদ্ধের গমন পথের দিকে চেয়ে ধীরে ধীরে তাঁর বিষণ্ণ বিধুর চোখে পুনরায় স্বাভাবিক দৃষ্টি ফিরিয়ে আনলেন,—সঙ্গে সঙ্গে আনলেন একটা মুক্তির আনন্দ আর নতুনের জন্যে ব্যগ্রবাহু আকর্ষণ।···নতুন একটা কিছু প্রায় হাতের মধ্যে এসে গেছে এ আশ্বাস মনে না থাকলে অনিরুদ্ধকে বিদায় দিয়ে সেইখানেই তাঁর মাটিতে লুটিয়ে পড়া উচিত ছিল।

অনিরুদ্ধ কয়েক পা বেশ দৃঢ়তার সঙ্গে এগিয়ে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ফিরে চাইল। তার মুখে এবং চোয়ালে একটা আয়াস-কৃত দৃঢ়তার ছাপ ; অপরাহ্নের মেঘবিচ্ছুরিত সূর্য্যরশ্মির মত তার চোখের দৃষ্টিতে করুণ প্রখরতা বিরাজমান। প্রিয়ব্রত, জয়ন্তী এবং সুমিত্রা দেবী তিনজনেই তার দিকে চাইল, সে হাত তুলে,—

অনিরুদ্ধ (চাপা গাঢ় সুরে:) চললাম। (এবং সঙ্গে সঙ্গেই ঘর থেকে বেরিয়ে বারান্দার মোড়ে অদৃশ্য হ'ল।)

জয়ন্তী (সুমিত্রা দেবীর দিকে চেয়ে ঈষৎ উদ্বিগ্ন কণ্ঠে) কোথায় চললেন?

সুমিত্রা (জানালায় দাঁড়িয়ে থেকেই) দেশে,—পাবনায়।

জয়ন্তী (খানিকটা আশ্বস্ত হ'য়ে) কিন্তু তার জন্য এত ঘটা করা কেন? ভাব দেখে মনে হল যেন চিরবিদায় নিচ্ছেন।

(সুমিত্রা দেবী উত্তর না দিয়ে ফিকে ভাবে একটু হাসলেন। —মনের অন্তস্তলে নিজেকে কি অনিরুদ্ধের জন্ম কিছুটা অপরাধী মনে-করছিলেন না ?)

প্রিয়ব্রত (এতক্ষণ চুপ ক'রে থেকে, অত্যন্ত ধীর মৃদু গলায় সুপ্ত মমতার সঙ্গে) এক অর্থে কথাটা সত্য। রাজনীতি থেকেও বোধ হয় চিরবিদায়ই নিল।

জয়ন্তী (স্বাভাবিক গলায়) কিন্তু, করবেনই বা কী ? যে রকম স্বভাবের মানুষ, ভাল ছেলে সেজে সংসার করাও তো সম্ভব নয়।

(এ কথার কোনো উত্তর না দিয়ে প্রিয়ব্রত সুমিত্রা দেবীর মুখের দিকে চাইল। সুমিত্রা দেবী মুখ সরিয়ে জানালার বাইরে তাকালেন। প্রিয়ব্রত মুখ ফিরিয়ে একটা সিগারেট ধরাল। কিছুক্ষণ চুপ চাপ। তারপর জানালা ছেড়ে সুমিত্রা দেবী নীরবে বাড়ীর ভেতরে চ'লে গেলেন। আরও কিছুক্ষণ পর।—)

জয়ন্তী (মৃদু গলায়) ভাবছেন কী ?

(প্রিয়ব্রত যেন চিন্তায় আকর্ণ ডুবে আছে। তার কথা শুনতে পেল কিনা বোঝা গেল না। একটু অপেক্ষা ক'রে পুনরায়—)

জয়ন্তী (মৃদু গলায়) ভাবছেন কী ? (গলার স্বরের মধ্যে বেশ একটা আন্তরিকতার রেশ পাওয়া গেল ; নাটকের প্রথম দিকে প্রিয়ব্রতের প্রতি বিরক্তি ও কাঠিন্যের সঙ্গে এই আন্তরিকতা তুলনা ক'রে দেখলে স্পষ্টই বোঝা যায় যে মোটের ওপর প্রিয়ব্রত সম্বন্ধে তার যথেষ্ট মত পরিবর্ত্তন ঘটেছে।)

প্রিয়ব্রত (সিগারেটটা পায়ে চেপে, একটা নিশ্বাস ফেলে) আমার কী কর্ত্তব্য তাই।

জয়ন্তী অর্থাৎ ?

প্রিয়ব্রত (মৃদু, গম্ভীর কণ্ঠে) অর্থাৎ যতদিন অনিরুদ্ধ ছিল ততদিন নিশ্চিন্তে সাহিত্য করতে আমার বাধে নি। কাজের দিকটাকে তখন এত স্পষ্ট করে ভাববার সুযোগও আসে নি। কিন্তু আজ

যখন ও ফুরিয়ে গেল তখন বোধ হয় আর চুপ ক'রে থাকা আমার উচিত হয় না। কাজ সম্বন্ধে আগে ছিল একটা সংশয়, একটা ভয়। কিন্তু আজ যেন মনে হ'চ্ছে একেবারে কাজের মুখোমুখী এসে দাঁড়িয়েছি আমি। (শান্ত ভাবে হেসে) বিপদের মুখোমুখী দাঁড়ালে নিতান্ত কাপুরুষেরও সাহসে ভর করা ছাড়া উপায় থাকে না, আমারো যেন সেই রকমই হ'য়েছে।

(কথাগুলো শুনতে শুনতে যেন এক অপরূপ আভায় জয়ন্তীর মুখমণ্ডল উদ্দীপ্ত হ'য়ে উঠল। নত মুখে কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে প্রিয়ব্রতের মুখের দিকে চোখ তুলে ঈষৎ আচ্ছন্ন সুরে,—)

জয়ন্তী আজ যেন আপনাকে নতুন ক'রে চিনলাম।

প্রিয়ব্রত (সহজ ভাবে হেসে, সরল রহস্যের সুরে) অমন ক'রে প্রথম থেকেই প্রশ্রয় দেবেন না।…নতুন ক'রে চিনে থাকেন তো তার জন্যে দায়ী আপনারই পরিবর্ত্তিত দৃষ্টিভঙ্গী, আমি নই। আমি যদি কিছু হ'য়ে থাকি তা আমার পূর্ব্বেকার ব্যক্তিস্বরূপেরই যুক্তি-সম্মত স্বাভাবিক ক্রমবিকাশ মাত্র।

জয়ন্তী যেমন আপনার ইদানীন্তের কবিতা আগেকার কবিতার যুক্তিসম্মত স্বাভাবিক ক্রমবিকাশ, সেই রকম, না ?…যাক গে, সে কথা নয়। (ঈষৎ গাম্ভীর্য্যের সঙ্গে) যদি ভরসা দেন তো একটা কথা আজ বলি।

প্রিয়ব্রত (ছদ্ম গাম্ভীর্য্যের সঙ্গে) দেখুন, আমি কোনো সময়েই কাউকে ভয় দেখিয়েছি ব'লে আমার মনে পড়ে না। সুতরাং বাড়তি অভয় চাওয়া নিরর্থক। (সারল্যের সঙ্গে, জয়ন্তীর মনের কাছা-কাছি নেমে এসে) বলতে পারেন।

জয়ন্তী (একটু দ্বিধা ক'রে, পরিপূর্ণ বিশ্বাসের সুরে, দৃঢ়তার সঙ্গে) আপনার কাজের পথে যদি কখনো দরকার পড়ে আমাকে ডাকবেন।

(প্রিয়ব্রত তার মুখের দিকে কিছুক্ষণ তীক্ষ্ণভাবে চেয়ে কী সন্ধান করল। তারপর মৃদু হাসির সঙ্গে—)

প্রিয়ব্রত　(সুদূরপ্রসারী টানা সুরে) আচ্ছা।

(কিছুক্ষণ চুপ চাপ কী যেন চিন্তা ক'রে ঘড়িতে সময় দেখে সে উঠে দাঁড়াল।—)

প্রিয়ব্রত　নটা বাজে। আজকের মত চলি।—(ব'লে সে ধীরে ধীরে চলে গেল।)

(জয়ন্তী আত্মনিবিষ্টভাবে বসে রইল। কিছুক্ষণ পরে সুমিত্রা দেবী তার পেছন দিয়ে ধীরে ধীরে ঘরে ঢুকলেন।)

সুমিত্রা　(জয়ন্তীর দিকে এগিয়ে আসতে আসতে) চলে গেছে ?

জয়ন্তী　(চমকে দাঁড়িয়ে উঠে) হ্যাঁ। (সুমিত্রা দেবীকে জড়িয়ে ধ'রে) চমকে গিয়েছিলাম, বাবাঃ। (বলে সে তীক্ষ্ণভাবে হাসতে লাগল।)

(সুমিত্রা দেবী বিস্মিতভাবে তার দিকে চেয়ে রইলেন।)

(ক্রমশঃ)

মনীন্দ্র রায়

আমাদের-সাহিত্য

রাজনৈতিক ঘূর্ণিতে প'ড়ে বিভ্রান্তচিত্তে যখন জাতীয় সাহিত্যের-সন্ধানে বাংলা সাহিত্য হাতড়ে বেড়াতাম তখন এ কথাটা প্রায়ই কানে আসত যে, একদল প্রগতিবাদীর আবির্ভাব হ'য়েছে। শুনতাম তাঁরা নাকি 'আধুনিক সাহিত্য' সৃষ্টি ক'রছেন। ভারী ঔৎসুক্য হ'ত। খট্‌কাও লাগত।

বংকিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ' থেকে—ভায়া নির্ব্বাসিতের একগুচ্ছ আত্ম-কাহিনী—নজরুল পর্যন্ত পৌঁছোতে বেশী সময় লাগ্‌বার কথা নয়—মায় 'টডের রাজস্থান', ম্যাট্‌সিনি-গ্যারিবল্ডির অনুবাদ, তিন আনা সংস্করণের জীবনী—আর সখারাম গণেশ দেউস্করের বাজেয়াপ্ত 'দেশের-কথা'। তাই ঔৎসুক্য হ'ত। 'মা যা হবেন'-এর সাধনায় যে উপন্যাস-গল্পের পথ মাড়ানো ছিল নিষেধ, ভাব্‌তাম এই নবাগতেরা প্রগতিবাদী হ'ল কিসের জোরে? পড়া অক্ষুণ্ণ রাখতে গেলে এর পর মেরী করেলীর 'টেম্পোরাল পাওয়ার' অথবা হল কেইনের 'ইটার্নাল সিটি'তে যেতে হয়। তাই প্রগতি সাহিত্যের প্রতি একটা হেতুক মোহ জাগল।

খট্‌কা লাগত 'আধুনিক' কথাটা নিয়ে, এই অস্থায়ী অর্থহীন বিশেষণটা শত্রুপক্ষ না মিত্রপক্ষ জুড়ে দিয়েছে ভেবে। অথবা এ শব্দ অহঙ্কার প্রতিষ্ঠা বা অপমান করবার জন্য যদি ব্যবহৃত না হয় তবে এ আরও অর্থহীন। কেন না, আধুনিক শব্দটা কালবাচক; কোন্ তারিখ থেকে কোন্ তারিখ পর্যন্ত আধুনিক তার হদিস পাওয়া ছিল কঠিন। কিন্তু অতি-ব্যবহারের ফলে ঐ শব্দটারও কিছু কিছু কনোটেশন জমে' উঠ্‌ল।

আজ একথা বলতে পারি যে, ঠিক সমালোচনা নয়, নিন্দাবাদ থেকেই এ সাহিত্যের সঙ্গে আমার পরিচয় সুরু হ'ল। বুঝতাম যে বৃদ্ধের পক্ষে আজ-কালকার ছেলেদের নিন্দাবাদের সহজ ও আদিম প্রবৃত্তিটা এখানেও সক্রিয়। শিশুর সুস্থ স্যালাইভা বা যৌবনের সম্ভোগশক্তি দেউলে বৃদ্ধের নির্জীব ইন্দ্রিয়ের হিংসা উদ্রেক করতেই পারে এবং মগজে নিজের ফেলে-আসা সুস্থ বা অসুস্থ ক্রিয়াকলাপ মনোরম হ'য়ে ওঠে; আর সঙ্গে সঙ্গে আজকের মুমূর্ষু অস্থির বিস্ফারিত ক্ষীণ দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করে ফেলে ল্যাক্রিমাল গ্ল্যাণ্ডের দুর্বল অরোধ্য

রসপ্রবাহ। বাংলার 'অনির্দিষ্ট' আধুনিক সাহিত্য এভাবেই সম্বর্দ্ধিত হ'য়েছে. অর্থাৎ ব্ল্যাকপ্ল্যাগ-ডিমনস্ট্রেশন পেয়েছে।

আধুনিক সাহিত্যের প্রথম অহংকার বা নিন্দে হচ্ছে যে, এ বংকিম-রবীন্দ্র প্রভাবমুক্ত। শরৎচন্দ্র কারও প্রভাবমুক্ত এ অহঙ্কারও যেমন করেন নি, তাঁর এ ধরণের নিন্দেও-কেউ করে নি। কিন্তু যাদেরকে নিয়ে বিশেষ হৈ-চৈ সৃষ্টি হ'য়ে ছিল, সেই অচিন্ত্য-বুদ্ধদেবের মধ্যে এ প্রভাবমুক্তি আবিষ্কারে ব্যর্থকাম হ'তেই হবে। প্রত্যেকের মধ্যেই, অর্থাৎ, পাঠকের যদি লেখক হবার ক্ষমতা থাকে তবে তার ষ্টাইলটা হবে একটা সিনথিসিস মাত্র—কিন্তু ষ্টাইলটাকে প্রভাবমুক্তি বলা চলে না। ষ্টাইলটা হচ্ছে ব'লবার ধারা ও ভাষা। এককথায় ভঙ্গি। কিন্তু দৃষ্টিভঙ্গি নয়; সে আলাদা জিনিষ।

ব্যক্তিকে দিয়ে যদি যুগভাগ করতে হয় তবে কার্লাইলের হিরো-ওয়ার-শিপকে মান্‌তে হয় এবং সেদিক থেকে রবীন্দ্রনাথ যদি সমুদ্র হন তবে বুদ্ধদেব বসু নূনের পুতুল; নূনের পুতুল সমুদ্র মাপ্‌তে গেলে কি হয় এ কথা রামকৃষ্ণ পরমহংস ব'লেছেন। কিন্তু ব্যক্তির মধ্য দিয়ে যুগপ্রভাব যতই স্ফূর্ত বা মূর্ত হোক্ ব্যক্তি দিয়ে যুগ বোঝা যাবে না, যুগ দিয়েই ব্যক্তিকে (ব্যক্তিত্ব নয়) বুঝ্‌তে হবে; কেননা, যুগ বোঝ্‌বার মানদণ্ডটার সঙ্গে ব্যক্তি ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। ব্যক্তিকে নিয়েই যুগ—ব্যক্তি যুগ নয়।

বংকিমচন্দ্রকে দুর্গেশনন্দিনী দিয়ে বোঝা যাবে না, বোঝা যাবে কৃষ্ণকান্তের উইল দিয়ে। সেই উইল পর্যায়ক্রমে শরৎচন্দ্রের বিপ্রদাসে পরিণতি পেয়েছে। রবীন্দ্রনাথসহ এই অক্ষুণ্ণ পর্যায়ক্রমটি হ'চ্ছে পার্মানেন্ট সেটেলমেণ্ট। বংকিমচন্দ্রের ভগ্ন দেউল আর প্রাচীন গৃহের চিত্রে রবীন্দ্রনাথের যে আস্তরণ দিয়েছিলেন, শরৎচন্দ্রের কালে তা-ই খসে ঝরে পড়ছে। এই পার্মানেণ্ট-সেটেলমেণ্টকে কেন্দ্র ক'রেই অনাধুনিক ও আধুনিক বঙ্গ-সাহিত্য। পার্মানেন্ট সেটেলমেণ্ট বৃটিশ বুর্জোয়ার সৃষ্টি হলেও সামন্ততন্ত্রের পৈত্রিক পরিবারই জমিদার সমাজের প্রাণ। সেই কৃষ্ণকান্তের উইল, বংশগরিমা প্রতিষ্ঠার সেই পারিবারিক দ্বন্দ্ব। শরৎ-চন্দ্রের স্তুতিবাদ সব্বাইকেই ছাপিয়েছে; কেননা, নবসভ্যতার আঘাতে আঘাতে আজ এই প্রাচীন সমাজ অতি-জর্জর। বিপ্রদাস বংশরক্ষার জন্য দ্বিজদাস আর বন্দনার হাত মিলিয়েছেন। কেননা, একজন আধুনিক কিষাণ মজুর আন্দোলন

ও অপরে বিদেশী সভ্যতার মোহে কক্ষচ্যুত হ'তে যাচ্ছিল। ব্রাহ্মণ্য সমাজের সেবক দ্বিজদাসকে বন্দনা করেছে লক্ষ্যভ্রষ্ট মোহ।

ভয়ানক হাসি পায় যখন শুনি, পার্মানেণ্ট সেটেলমেণ্টের যারা ভ্রূণ সংস্করণমাত্র, যাদের পরিপক্কতার কোন সম্ভাবনাই নেই, তারা নাকি রবীন্দ্র-প্রভাবমুক্ত। ব্যক্তির মাপে রবীন্দ্রনাথের যুগ দীর্ঘস্থায়ী; রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি-ভঙ্গি বুর্জোয়া-চুমকি বসানো সামন্ততান্ত্রিক। কেননা, রবীন্দ্রনাথকে বুর্জোয়া পরিবেশের সংস্পর্শে আসতে হ'য়েছে। তিনি আশ্রম-তপোবনের মধ্যে আধুনিক অট্টালিকা তুলেছেন; পড়ুয়াদের জন্য গাছের নীচে সিমেণ্টের আসন দিয়েছেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ আমাদের কৃষ্ণকান্তের উইলটাই দিয়ে গেছেন। কোনদিনও একে ছেঁড়াপাতা ব'লে উপেক্ষা ক'র্‌বার ভরসা দেননি। নমস্ত আধুনিকেরা এই প্রভাব থেকে মুক্ত হ'তে পেরেছেন, এ অহঙ্কার নিষ্ফল।

জমি ও জমিদার-আশ্রিত ও পুষ্ট আধুনিকেরা সহরের দিকে তাকিয়ে তাদের ঘরোয়া দুঃখের ইতিহাসই লিখতে পারে, এর বেশী সহজ প্রবৃত্তি তাদের সম্ভব নয়। এদিক থেকে তারাশংকর ও বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায় ঐ উইলের ধারাটা অক্ষুণ্ণ রেখেছেন।

বুদ্ধদেব-প্রমুখ প্রগতিপন্থীদের সম্পর্কে এই কথাই বলা চলে যে, বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথের পিউরিটান শুচিবাইয়ের ফানুসকে মাটীতে নামিয়েও শরৎচন্দ্র রাবণের ভয়ে গণ্ডী পার হন নি। বঙ্কিমচন্দ্র কুন্দকে বিষ খাইয়েছেন, শৈবলিনীকে পাগল ক'রেছেন, রোহিনীকে গুলি ক'রে মেরেছেন; পক্ষান্তরে সূর্যমুখী-ভ্রমরকে প্রশংসার ট্রোফি দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ 'ঘরে-বাইরে' আর 'চোখের বালি'তে এই রক্ষাকবচটিকে আরও শক্ত গ্রন্থিতে বাঁধতে চেষ্টা ক'রেছেন; স্বচ্ছ বিমলার সীমাবদ্ধ সন্দীপ ও বিশ্বনিখিলের প্রতি দোটানা দ্বৈবদ্ধ আকর্ষণ, মহেন্দ্র-বিহারী দুই পাহাড়ের মধ্যে বিনোদিনীর উষর গিরিবর্ত্ম রচনা ক'রেছে। শরৎচন্দ্রের মহিম নিখিলের, সুরেশ সন্দীপের এবং বিমলা অচলার সন্তান। এখানেও 'গৃহ পুড়ে' গেছে—এর মধ্যে উপেন্দ্রের সুরবালা বিপ্রদাসের সতী জেগে আছে; আর পাগলের মত ঘুমোচ্ছে কিরণময়ী—সে জানত? সমাজকে আঘাত করা আর সমাজের দম্ভকে আঘাত করা এক জিনিষ নয়।

তারপর আসুন বুদ্ধদেবের 'বাসর ঘরে'। বুদ্ধদেবের রবীন্দ্র-বিদ্রোহ যে কত বড় ভান তা তাঁর এই রচনাতেই পরিস্ফুট। এই অক্ষম রচনাকে রবীন্দ্রনাথ পরমোল্লাসে প্রশংসা করেছেন; কিন্তু তাঁর উল্লাস রচনায় নয়, বুদ্ধদেবের মিথ্যা দুর্নাম স্খালন হ'ল ব'লে—অথবা শক্ররূপে ভজনা শেষ হ'ল ব'লে।

বুদ্ধদেব-প্রমুখ প্রগতিপন্থীরা ঐ রাবণের গণ্ডী মিটিয়ে সৃষ্টিকে যৌনাচ্ছন্ন ক'র্‌তে চেয়েছিলেন মাত্র। একটানা পিউরিট্যানিজ্‌ম্‌-এর এই প্রতিক্রিয়াকে তৎকালীন সমালোচক ও পাঠক প্রগতি ব'লে ভুল ক'রেছিলেন। প্রতিক্রিয়া বা প্রগতি এক জিনিস হয়। বল্‌বার ভঙ্গি নয়, দৃষ্টিভঙ্গি দিয়েই প্রগতি বা প্রতিক্রিয়া বোঝা যাবে। রবীন্দ্র-শরৎচন্দ্রের সকুণ্ঠ চুম্বনকে ছাড়িয়ে মোপাশাঁ, আপটন সিনক্লেয়ার বা হ্যুট হামসুন থেকে ধার-করা অতি-গোপন যৌনক্রিয়ার চিত্রপট আঁক্‌তে গেলে পর্ণোগ্রাফি যদিও বা হয়, প্রগতি হয় না। আর সেই পর্ণোগ্রাফিকে সঙ্কলন ক'রে সমালোচনার ছলে যারা ব্ল্যাকমেইল করে তারাও প্রগতিকে সমান বাধা দেয়। তা' ছাড়া, সমাজের, রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার মত কই তাঁদের সেই আত্মবিশ্বাস—রাজদ্বারে গেলেই যাঁরা কুর্নিশ ক'রে বসেন, সমাজের সর্বগঠনে যাদের অবিচল নিষ্ঠা? বর্তমান সমাজকে অক্ষুণ্ণ রেখে যৌন-স্বাধীনতার আন্দোলন কতখানি হাস্যকর ও মিথ্যা এই শ্রেণীর সাহিত্য তার প্রমাণ।

সুতরাং, বাংলা সাহিত্যে 'আধুনিক সাহিত্য' সম্পর্কে একটা বিকৃত ধারণা সমালোচক মহলে প্রচলিত আছে। সাহিত্যকে তাঁরা কি দৃষ্টিতে দেখেন জানি না। এ জিনিসটি ঐ জিনিস থেকে পৃথক—এই বিচার তাঁরা কোন্‌ গজকাঠিতে করেন জানি না। সাহিত্য যদি কেবলমাত্র রুচির জিনিষ হয়, তবে কোনটাকে টোম্যাটো কোনটাকে পায়েস বল্‌তে হয়। টোম্যাটো কেউ অমৃতবোধে খায়, কারও পায়েস দেখলেও গা বমি করে। সাহিত্য এমন ব্যক্তিগত রুচির জিনিস নিশ্চয়ই নয়। সাহিত্য দৈনিক সংবাদপত্রও না; 'বলধা জমিদার হত্যার মামলা' হুবহু তুলে দিলেই তা সাহিত্য হয় না। সাহিত্য কেবলমাত্র ফোটোগ্রাফ নয় যে, সমাজের চিত্রমাত্রই সাহিত্য হবে। সাহিত্য এদেরই, অথচ এদের নয়, এদের উত্তীর্ণ হ'য়ে যায়; সাহিত্য

'বিধাতার' সৃষ্টি-নিরপেক্ষ পৃথক্ সৃষ্টি। কিন্তু এই সৃষ্টি মানুষের মৌলিক-বোধকে এড়িয়ে হয় না। মানুষের মৌলিকবোধ তার পরিবেষ্টনীর ফল।

কিন্তু এই মৌলিকবোধ ও সাহিত্যবিচারকালে 'আর্ট ফর্ আর্টস সেক' ব'লে যাঁরা ধোঁয়া সৃষ্টি করতে চান তাঁদের সাহিত্য বিচার একটা দলগত গাজুরি মাত্র। আসলে, 'আর্ট ফর্ আর্টস সেক' ধর্মাচ্ছন্ন রাষ্ট্রের একটা প্রতিধ্বনি মাত্র। আধুনিক রাষ্ট্র যেমন ইতিহাসকে ভুলতে পারলে বাঁচে, তেমনি এই বিচারকেরাও দুর্জ্ঞেয় রহস্যবাদের অব্যক্ত 'আহা' ক'রেই ঐতিহাসিক পটভূমিকা অস্বীকার ক'রতে চান। এদিক থেকে শনিচক্রের দিক্পাল বা পূর্বকথিত প্রগতিপন্থীরা একই ভূমিতে দাঁড়িয়ে আছেন। তাই তাঁদের বিচারবোধটা গৃহযুদ্ধ মাত্র। তফাৎ এই যে, একদল মাটী খুঁড়ে আর্টের দুষ্প্রাপ্য সোনা উঠিয়ে লোকচক্ষু বিস্ফারিত ক'রে তুলছেন, অপর দল সংগুপ্ত ও অপরিতৃপ্ত যৌন সম্ভোগেচ্ছাকে আর্টের প্রবাহে ছেড়ে দিচ্ছেন। এই দুই দলের মধ্যে আর্টের সংজ্ঞা নিয়ে মৌলিক কোন বিরোধ নেই—সুনীতি সঙ্ঘের একটা 'মার্জিনাল' পার্থক্য আছে মাত্র। মানুষ অব্যাখ্যাত অতীন্দ্রিয় ব্যাপার নিয়ে রহস্যবাদের সৃষ্টি ক'রেছে বটে কিন্তু সাহিত্য রহস্য নয়। আজ প্রজনন ক্রিয়ার সমস্ত কিছু অ্যানাটমি-ফিজিওলজি দিয়ে ব্যাখ্যা করা যদি না যায় তবে ঐ অবশিষ্ট রহস্যের ট্রাম্প কার্ড দিয়ে সাহিত্যের রসসৃষ্টিও লুফে নিতে হবে এমন সদিচ্ছা কেবল তাদেরই হ'তে পারে যাঁরা সাধারণের শীর্ষে উঠে প্রতিভাবত্তার ব'সে আত্মতুষ্টি কামনা করেন এবং মানুষের সৃষ্টিকে যাঁরা বারবার নানাছলে ক্ষুণ্ণ ও অপমান করেন। মানুষ বিধাতার সৃষ্টি আজ এ প্রশ্ন অবান্তর; এরোপ্লেন ও ইনসেনডায়ারি বোমায় তা ঘুলিয়ে গেছে। কিন্তু মানুষ যে ঐতিহাসিক আর সামাজিক জীব—সেদিনকার ভার্সাই আর আজকের প্রলয়ংকর যুদ্ধই তার প্রমাণ। হিট্লার ব্যাক টু প্রি-ভার্সাইর সৃষ্টি; অথচ বিশ্বব্যাপী পুঁজিবাদের সঙ্গে এর কোন বিরোধ নেই। বিরোধ নেই ব'লে যে-'অল কোয়ায়েট অন দ্য ওয়েষ্টার্ণ ফ্রন্ট' পুস্তকসহ গ্রন্থকার জার্মানী থেকে বিতাড়িত হন, সেই চিত্রই আপদকালে ভারতে নিষিদ্ধ হয়। সাম্যবাদীরা কি গণতান্ত্রিক কি একনায়কতান্ত্রিক রাষ্ট্রে বন্দী হন। তাই বলছিলাম, হিট্লার বা

আইনষ্টাইন কেউই অসামাজিক নন, সামাজিক। হিট্‌লার আইনষ্টাইনের মাথা চেয়েছেন, কারণ, সেখানে হিট্‌লারী রাজত্ব। আইনষ্টাইনের থিওরি অব রেলেটিভিটির দাম আছে, আইনষ্টাইনের দাম নেই। যে-সমাজে আইনষ্টাইনকে সহ্য করা চলত, সে-সমাজ পাল্টেছে। কিন্তু হিট্‌লারী রাজত্বে যে ধ্বংসকর মনোবৃত্তির সৃষ্টি হ'য়েছে, তাকে কেবলমাত্র ধ্বংসকর ব'লেই অনাসৃষ্টি ব'লতে পারিনে। হিট্‌লারের সৃষ্টিকে তাই ভার্সাই দিয়ে বুঝ্‌তে হয়, বুঝ্‌তে হয় আন্তর্জাতিকে পুঁজিবাদ দিয়ে। ঠিক তেমনি কোন স্রষ্টাকে তার পরিবেষ্টনী উপেক্ষা ক'রে বোঝা যায় না—বিধাতাকেও না। রবীন্দ্রনাথ 'শেষের কবিতা' লিখতে পারেন, মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মানদীর মাঝি' লিখ্‌তে পারেন না। স্রষ্টা যত বড়ই হোন, তিনি সীমাবদ্ধ। গর্কির মা, দাস্তেভ্‌স্কির মা বা অনুরূপার মা তাই পৃথক্‌।

কিন্তু এ কেবলমাত্র ভৌগোলিক বা কালীয় বিচার। কথা হ'চ্ছিল দৃষ্টিভঙ্গির। এই দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন সমাজের পরিবর্তন না হ'লে হয় না। এদের আবার একটা পরিবর্তনকালীন অবসর আছে। এই অবসরেও দৃষ্টি বদ্‌লাতে থাকে। একেবারে টাক পড়ে না গেলে (উপমাটা প্লিকানভের) টাক ব'লে বোঝা দায়। অথচ টাক-পড়া প্রক্রিয়াটা চ'ল্‌তে থাকে। সমাজেও এম্‌নি একটা পরিমাণিক পরিবর্তন ঘট্‌তে থাকে। কিন্তু পরিমাণ যেদিন ধর্ম পরিবর্তন ক'রে দেয়, সেদিনই কেবল আমরা তাকে পৃথক্‌ ব'লে চিন্‌তে পারি। পিউবার্টির পর কিশোরকে যেমন যুবক ব'লে চিন্‌তে দেরী হয় না। বালকোচিত স্বভাব যৌবনোচিত স্বভাবে পরিণত হয়। এই দৈহিক পরিবর্তনের উপমাকে আমরা সমাজদেহে গ্রথিত করতে চাইনে। কেননা, সমাজদেহের বালকত্ব বা যৌবনত্ব খোঁজার প্রয়োজন কম। সমাজ পরিবর্তনশীল—এই হ'চ্ছে আমাদের মুখ্য বক্তব্য। এ কথা মেনে নিলে আমাদের একথা না জেনে উপায় নেই, সমাজ-পরিবর্তনের চিরন্তন পরিণতিতে কোন্‌ কোন্‌ শক্তি দায়ী। সচেতন পাতি-বুর্জোয়ারা এবার লাফিয়ে উঠে ব'লবেন, মার্ক্সিজ্‌ম্‌! সাহিত্যের অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা মানে অপব্যাখ্যা। এই কাঞ্চন-নির্লিপ্ত সাহিত্যিকদের এই আতংকে যথেষ্ট হাসির খোরাক আছে সত্য, কিন্তু তা আতংকই, যুক্তি নয়।

সমাজের পরিবর্তন অর্থ সমাজের নবতর সমাবেশ ছাড়া আর কিছু নয়। ঠিক যেমন যুদ্ধক্ষেত্রে দক্ষ পরিচালনায় সব্বার আগে সৈন্য সমাবেশের সুনিপুণ দৃষ্টি থাকা দরকার। কিন্তু এই যে সৈন্য সমাবেশের রকম তা আবার সৈন্যেরা কি রকম হাতিয়ার ব্যবহার করছে তার ওপর নির্ভর করবে। ধনুর্বিদ্যা ও ট্যাংক্-চালান এক জিনিস নয়, এক ব্যাপারও নয়। সমাজে যে এত কাজ কর্ম চলছে, মেথর মুদ্দাফরাস থেকে রাজা উজীর দেখছি, তাও একরকম সমাবেশ এবং সে-সমাবেশও সমাজের প্রয়োজনে যে দ্রব্যোৎপাদন তার সঙ্গে সুসঙ্গত, সুবিন্যস্ত ও সুসংলগ্ন। তাঁতির সমাজ আর বিরলার সমাজ এক নয়। তাঁতির সমাজে তাঁত ও বোনা-কাপড় তাঁতির নিজস্ব; বিরলার সমাজে বিরলা নিজে তাঁতি নয়, কিন্তু তাঁত ও বোনা কাপড়টি তাঁর। অথচ কেবলমাত্র এই তাঁতের মালিকানা পার্থক্যেই বিরলা ও তাঁতির সমাবেশ স্বতন্ত্র হ'য়ে গেছে। বিরলার তাঁত—কারখানা; তাঁতির শোবার ঘরের একটা অংশ নয়। বিরলার তাঁতের কারিগরি, কারিগর ও ব্যাপকতা সমাজের পরিবেশকেও বদ্‌লে দেয়। ঘরে ঘরে তাঁতির বিলুপ্তি ঘটে, বিরলার কারখানায় অবিরাম তাঁতি ও কাপড় জন্মায়। এখানকার তাঁতি ও বিরলার সম্পর্কটা আলাদা। বিরলা স্বভাবতই চাইবেন—তাঁতিরা তাঁর কথায় উঠুক বসুক। বিরলা চাইবেন—এই গতিনিয়ন্ত্রণের চাবিটা তাঁর হাতে থাক্। কারখানায় আছে, বাইরেও থাক্। কারখানার মালিক, মজুরের মালিক, সমগ্র সমাজের এবং সমাজের স্থির রাষ্ট্রের মালিক হ'তে চান; শক্তি ও সামর্থ্য নিয়ে তাঁর অনুকূলে 'আইন' রচনা করেন। এ হেন সমাজের কথা কি হবে, কাহিনী কি হবে, সাহিত্য কি হবে? হবে পিনালকোডের প্রতিচ্ছায়া, অধোগতির পিচঢালা সড়ক—নতুবা বাঁচ্‌বার উপায় নেই। তবুও যে বাঁচে বা বাঁচতে চায়, তা বুঝতে হলে ঐ টাকের কথা মনে করতে হবে। অবিশ্রান্ত কল-কারখানা ও মালিকানা স্বত্বের পরিবর্তনশীল ব্যবস্থা সমাবেশে এই সংঘর্ষ চলতে থাকে; চুলের আড়ালে টাক পড়তে থাকে।

আসুন এবার বাংলা সাহিত্যে। সামান্য একখানা 'পথের দাবী' নিয়ে সরকার কি করবেন ভেবে পান না। একবার বাজেয়াপ্ত করেন, একবার নিষেধাজ্ঞা তোলেন; আবার উপন্যাস রাখেন তো নাটক দেখাতে দেন না। এ-দেশে দারিদ্র্যের ষ্টাটিস্‌টিক্স বেআইনী ও রাজদ্রোহাত্মক। অথচ ঐ 'পথের

দাবী'তে আছে কি ? সমস্ত বইখানা নিঙড়ে বড়জোর একটা অসম্ভব ও অবাস্তব আদর্শ পাওয়া যেতে পারে—শাসনের ভিৎ তাতে এতটুকু নড়ে না। শরৎচন্দ্র স্বয়ং বিপ্লব-ভীরু ; চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আঁচড় যেখানে পড়েছে সেখানে তিনি প্রলেপ দিয়েছেন এবং প্রথম 'বিপ্রদাস' লেখার সময় 'বেণু' পত্রিকায় তিনি বিপ্লবের কথায় আঁৎকে উঠে একখানা চিঠি লিখেছিলেন। 'বিপ্রদাস' তারই পরিণতি। শরৎচন্দ্রের 'পল্লীসমাজ' আর 'পথের দাবী'তে মূলতঃ কোন ভেদ নেই। রবীন্দ্রনাথ সংস্কৃতির টানাটানি 'ঘরে বাইরে'তে প্রতিফলিত করেছেন এবং রাজনৈতিক দ্বন্দ্বকে রূপ দিতে চেষ্টা করেছেন 'চার অধ্যায়ে'। এতে পথের নিন্দে আছে, নির্দেশ নেই। 'কালের-রথ' বা 'রক্তকরবী'তে ধোঁয়া আছে, শিখা নেই। শরৎচন্দ্র রামমোহনের বিপ্লবী মনকে আদৌ স্বীকার করতে ভয় পেয়েছেন ; কিন্তু ব্রাহ্ম সমাজের ক্লেদ আর বিলেত ফেরৎদের বিজাতীয়তা পাইকারী হিসেবে ছিটিয়ে গেছেন। পুতুলের জড়তা থেকে অপৌত্তলিকতায় যিনি আনলেন উদার স্ফূর্তি তিনি রইলেন পড়ে, খৃষ্টান মিশনরীদের সঙ্ঘবদ্ধ আক্রমণকে যে ফ্লেক্সিব্‌ল্ লাইন প্রতিহত করল সেই-ব্রাহ্মদের নামে কেবল নাক কুচকেই গেলেন ; আর যাঁরা কালাপানি পার হয়ে সংকীর্ণ প্রাচীরকে দিলেন ধূলিসাৎ ক'রে তাদেরকে কেবলই এড়িয়ে গেলেন ঘৃণায়, নীলকণ্ঠের বিষের প্রতি এতটুকু কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলেন না ; তিনি কোন্ নির্দেশ দেবেন জাতীয় কল্যাণের ? সমাজের কাছে বার বার নিবেদন ক'রে ক'রে এই দ্বিধা দ্বন্দ্বই একদিন জাগল ; জন্ম দিলেন 'শেষ প্রশ্নের' এবং তার অবসান ঘটালেন 'বিপ্রদাসে'।

এঁরা দুজনেই চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে (পার্মানেন্ট-সেটেলমেন্টে) বাঁধা। তাই রবীন্দ্রনাথ যদিও বা সোভিয়েট ইউনিয়ান সম্পর্কে 'রাশিয়ার চিঠি' লিখতে পারেন এবং তাতে রুশিয়ার শিক্ষা প্রচেষ্টার অজস্র প্রশংসা করতে পারেন, পারেন না রুশিয়াকে সোভিয়েট ইউনিয়ান বলতে, বলশেভিক বিপ্লবের সুস্থির আলোচনা বা সমর্থন করতে। এতে তাঁদের নিন্দে করবার কিছু নেই বা একথা বললে তাঁদের অপমানও হয় না। আমরা বলেছি, স্রষ্টা যতবড়ই হোন তিনি সীমাবদ্ধ। অমুকে এতবড় হয়েও এটা কেন করলেন বা করলেন না—এ রকম অভিযোগ হাস্যকর ছেলেমানুষি ; কেন করলেন বা করলেন

না—সেই বিশ্লেষণটাই বড় কথা।

রবীন্দ্রনাথ ছিলেন সাহিত্যে রামমোহন; চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত আর বুর্জোয়া দৃষ্টির এক অপূর্ব মিশ্রণ। শরৎচন্দ্র ছিলেন সাহিত্যে বিদ্যাসাগর, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত (ইংরেজ বুর্জোয়ার সৃষ্টি) আর চাদর চটির সরল সমাবেশ। রবীন্দ্রনাথ বুর্জোয়া প্রভাববশতঃ সমাজ-সংস্কারে কিছুদূর পর্যন্ত যেতে রাজী আছেন; কেননা, তিনি ছিলেন যুক্তিপন্থী। শরৎ বাবু পল্লীসমাজের সংস্কার চান নেতৃস্থানীয়দের সংস্কার করে। কিন্তু কান টানলে যদি মাথা আসে তবে তিনি ভয় পেয়ে পিছিয়ে যান। বলেন, কানও থাক মাথাও থাক্—ওকে টানাটানি করে দরকার নেই।

এই অবস্থার মধ্যে শৈলজানন্দ যেদিন এলেন সেদিন তাঁর ভাষা ও উপজীব্যে সবাই বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকলেন। বাংলা কত বলিষ্ঠ তা রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন, কত কোমল তা শরৎচন্দ্র দেখিয়েছেন, কিন্তু এ কতখানি সবাক্ ও সহজগ্রাহ্য হ'তে পারে শৈলজানন্দের ভাষার পূর্বে তা যেন অনাবিষ্কৃত ছিল। আরও মজার কথা এই, ভারতের আধুনিক শিল্পের অগ্রদূত হ'চ্ছে রেলওয়ে এবং তার আনুষঙ্গিক কয়লা। রেলপথ আর কয়লার সুড়ঙ্গ আমাদের নূতনতর জায়গায় এনে ফেলেছে, শৈলজানন্দের সাহিত্যে তারই প্রতিচ্ছবি। শৈলজানন্দ যেন চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ম্যাজিনো লাইন ডিঙোতে চাইছেন। কিন্তু সেই শৈলজানন্দ আজ কোথায়? বাংলার সাহিত্য সৃষ্টিক্ষেত্রে আজ তিনি মৃত। কাঞ্চন-নির্লিপ্ত অবতারবাদী সাহিত্যিকেরা নোট ক'রে রাখতে পারেন যে, কাঞ্চনের জন্যই তাঁকে সাহিত্যক্ষেত্র ছাড়তে হ'য়েছে—যে সাহিত্যক্ষেত্রে দেড় হাজার বই বিকোয় তো দেড় হাজার পয়সা পাওয়া যায় না, কিন্তু সিনেমাক্ষেত্রে একখানা বই বিকোয় তো দেড় হাজার টাকা পাওয়া যায়।

বুদ্ধদেবের সাহিত্য রবীন্দ্রনাথের ক্ষীণ ও দুর্বল রিকেটি অনুকরণ মাত্র। বার্ণার্ড শ'র আপাত-বিরোধী কথনভঙ্গী, সুতীক্ষ্ণ শ্লেষ আর আকস্মিকতা যেখানে সেখানে গুঁজে দিলে লোকে "বলে কি" ব'লে থমকে যেতে পারে—কিন্তু ঐ পর্যন্তই।

প্রেমেন মিত্র প্রমুখ অন্যান্য লেখকেরা শরৎচন্দ্রের ধারাকে অনুসরণ করেননি। বিদেশী শাসনের প্রয়োজনে যে একদল মসীজীবীর সৃষ্টি হ'য়েছে

এবং ঐ বিদেশী শাসনানীত যে কারখানা-সভ্যতা বাংলার স্বয়ং-সন্তুষ্ট গ্রাম আর একান্নবর্তী পরিবারকে ভেঙে দিচ্ছে কিন্তু গড়্বার কোন সুযোগ বা অবসর দিচ্ছে না—তাঁদের কলমের আঁচড়ে সে সব ছবিই ফুটে উঠেছে। দুঃখের বিষয় এ সাহিত্যেও কোন নির্দেশ নেই; এদের মধ্যে ঢুক্‌লে কেমন একটা নিউরটিক আত্মহত্যার ভাবোদ্রেকে গা ছম্ ছম্ করে। ভয়াবহ দারিদ্র্যের মধ্যে বড় জোর এঁরা কিছু হঠাৎ বাবু বা upstart-এর সৃষ্টি ক'রেছেন এবং একদিন অকস্মাৎ কেমন ক'রে বর্তমান সভ্যতার মূলসূত্রটি হারিয়ে ফেলে বাইরেকার রাজনীতিতে নেতৃত্ব হারিয়ে ফেলেছেন। এ কথার চমৎকার সমর্থন এতেই পাওয়া যায় যে সর্বাধিক সম্ভাবনাপূর্ণ তৎকালীন প্রেমেন মিত্রও সাহিত্যক্ষেত্র ছেড়ে ফলিত সাহিত্যে গেছেন। মাড়োয়ারী মহাজনেরা বাংলা সাহিত্যের ঘাঁটি দখল ক'রল প্রায়।

কিন্তু বাংলা সাহিত্যে যাঁদের নিয়ে হৈ চৈ হ'তে পারত অথচ হয়নি তাঁরা হ'চ্ছেন মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় ও তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়। বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পথের পাঁচালী' বাংলা সাহিত্যের মস্ত বড় সম্পদ কিন্তু একান্ত পৃথক ক'রে দেখার মত বিস্ময়কর কিছু নয়। কেননা, বাংলা সাহিত্যকে আমরা কিছুতেই আজ আর ইউরোপীয় ও মার্কিন সাহিত্যকে ভুলে বিচার ক'রতে পারি না। কিন্তু বাংলায় যদি নোবেল প্রাইজের রেওয়াজ থাকৃত, আর প্রাচীনপন্থীরা লগুড় আর চাবি নিয়ে সকল ঘাঁটি আগ্‌লে না থাকৃতেন, তবে মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় শুধু 'পদ্মানদীর মাঝি'র জন্যই বিপুল সম্বর্দ্ধনা পেতেন। বাংলায় সত্যিকারের উপন্যাস নেই; প্রায়ই ফাঁপানো 'বড় গল্প'। কিন্তু 'পদ্মানদীর মাঝি' একখানা খাঁটী উপন্যাস। পড়্‌তে পড়্‌তে যদি সোলোকভের 'অ্যাণ্ড কোয়ায়েট ফ্লোজ দ্য ডন' মনে পড়ে তবে তাতে মাণিকবাবুর অকৃতিত্ব কিছু নেই; কেননা বই দুই খানার উপজীব্য নিতান্তই ভিন্ন গোত্রীয়; এক্ষেত্রে উভয়ের সৃজনী প্রতিভাই মনে পড়ে। মাণিকবাবুর 'সহরতলী' (২য় পর্ব) প্রকাশের পর মনে করা গেছল, তিনি 'পুতুলনাচের ইতিকথা'র সংযমকেই মেনে নিয়েছেন, বহুস্থ কথা ভুল্‌তে পেরেছেন; কেননা, 'সহরতলী' (২য় পর্ব) সব দিক থেকেই আধুনিকতা দাবী কর্‌তে পারে। কিন্তু তিনি নিরাশ ক'রেছেন 'সহরবাসীর ইতিকথা'য়। কোন

কোন বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের অস্পষ্টতার ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হ'য়ে মাণিকবাবু হারিয়ে গেছেন। পদ্মানদীর মাঝিতে কোন দৃষ্টিভঙ্গি নেই, দক্ষ কারিগরি ছাড়া আর কিছুই ওতে পাওয়া যায় না, সে কারিগরি বিস্ময়কর এবং অতুলনীয়। এই ভঙ্গির অভাব 'সহরতলী' (২য় পর্ব) খুঁজে পেয়েছিলাম। কিন্তু পরবর্তীকালে সেই ভঙ্গির অস্থিরতাতে মনে হ'ল রচয়িতার চিত্ত অসংবদ্ধ। দুটো একটা গল্প বাদ দিলে মাণিকবাবু গল্প লেখক হিসাবে ব্যর্থ। খাঁটী ঔপন্যাসিক হ'য়েও উপন্যাসে তাঁর এই ব্যর্থতার কারণ খুঁজে পাওয়া যাবে তাঁর ঐ অসংবদ্ধ দৃষ্টিভঙ্গিতে। অচেতন প্রতিভা কোকিলের মত গাইতে পারে, গানের বিজ্ঞান জানে না।

এই বিজ্ঞান যেন ধরা পড়েছে তারাশংকরের মগজে। জমিদার সমাজের ধ্বংস প্রথমটা তাঁকে বড্ড উদ্বেলিত ক'রে তুলেছিল; তাঁর ছোঁয়া পাই তাঁর প্রাথমিক সাহিত্যপ্রতিভায়। বিজ্ঞানের ছোঁয়ায় সে বেদনা যেদিন সইলেন, সেদিন এল 'কালিন্দী' এবং আরও পরিণতিতে 'ধাত্রীদেবতা'। তারাশঙ্কর প্রচারক-লেখক নন; সোভিয়েট বিপ্লবেও সে পর্যায় ছিল : তাই Cement উপন্যাসের ধার ঘেঁষেও সম্পূর্ণ কলাধর্মী নয়। কিন্তু Cement যেখানে শেষ Solokov-এর সেখানে আরম্ভ। সেখানে ডন নদী ধীরে ব'য়ে গেছে (And Quiet Flows the Don) এবং অকর্ষিত জমিতে হল চালনা হ'য়েছে (Virgin Soil Upturned); গর্কির পর্যায়ে পৌঁছাতে আর বাকী নেই। তারাশংকরের মধ্যে সে সম্ভাবনা নয়, তারাশংকরে তার পুষ্টিও ঘটেছে। আগামী, গণ বা আধুনিক সাহিত্য এক তারাশংকরকে দিয়েই সুরু করা যায় এবং যৌবনের অহংকারের বস্তুও তাতে আছে! মনোরঞ্জন হাজরার 'নোঙর ছেঁড়া নৌকা'য় সেই সম্ভাবনা আছে, পুষ্টি নেই। তারাশংকর ও মনোরঞ্জন উপন্যাসধর্মী এইটেই সুখের কথা; কেননা ভাববন্যাপ্রবাহের শ্রেষ্ঠ বাহন উপন্যাস। সেদিক থেকে তারাশংকরের হিসেব আজও হয়নি এবং ঠিক সেই দিক থেকে আজও বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছ থেকে আশা করবার কিছু নেই।

এদিকে বুদ্ধদেবের ধারা নিয়েছেন প্রবোধ সান্যাল। কিন্তু বুদ্ধদেব যেখানে কথকতা ক'রে সেরেছেন, প্রবোধকুমার সেখানে গল্প ফেঁদেছেন।

অর্থাৎ, বুদ্ধদেবের হাতে প্রবন্ধসাহিত্য সুষ্ঠু হ'য়ে উঠ্‌তে পারত এবং প্রবোধ-কুমারের হাতে গল্প জমে উঠ্‌তে পারত। কিন্তু দৃষ্টিভঙ্গির অভাবে দু'জনেই কেবলমাত্র ষ্টান্ট হ'য়ে রইলেন। সাহিত্য পণ্যের দরে বিকিয়ে গেল, কিন্তু তাঁরা দাগ কাটতে পার্‌লেন না কোথাও। এই গল্প জমিয়ে তুল্‌তে পারেন ব'লেই প্রবোধকুমারের ভ্রমণকাহিনী উপন্যাসের পর্যায়ে দাঁড়িয়ে গেল। প্রবোধকুমার ভ্রমণসাহিত্যে বিস্ময় সঞ্চার ক'রেছেন। অচিন্ত্যকুমারের সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি 'বেদে'ও যেন এর কাছে ম্লান হ'য়ে গেছে।

এই আধুনিক লেখকদের কেউ কেউ প্রাচীন রোমাণ্টিক ধারাটাই বজায় রাখলেন বটে কিন্তু আধুনিক সাহিত্য যে জন্য বঙ্কিম-রবীন্দ্র সাহিত্য থেকে পৃথক্ মনে হ'ল তা হচ্ছে এর ভেতর ঐ প্রাচীন ধারাটার অপ্রাধান্য। তাই এর ভাষাও সংস্কৃতাভিমান থেকে মুক্ত হ'ল। বাংলা ভাষা হ'ল আশ্চর্য রকমে ঝরঝরে, স্বচ্ছ, স্পষ্ট।

কিন্তু পরম দুঃখের বিষয় বাংলা সাহিত্যে যেন ভ্যাকুইটি দেখা দিয়েছে। আধুনিক সাহিত্যের কল্লোল-কলরোল যেন অকস্মাৎ থেমে গেছে। তার মস্ত বড় কারণ আমরা উল্লেখ ক'রেছি—এদের আত্মবিশ্বাসের অভাব, কেন না এদের কোন আত্মপোলব্ধি নেই। এই অভাবের দরুণ আধুনিক সাহিত্যকরা কোনদিনই সুদৃঢ় সঙ্ঘবদ্ধ প্রাচীনপন্থীদের মুখোমুখি দাঁড়াতে পারেন নি। প্রাচীনপন্থীদের ইউনাইটেড ফ্রন্ট যদিও বা হ'ল; আধুনিকদের হ'ল না; কারণ প্রাচীনপন্থীদের প্রাচীন সমাজ ব্যবস্থার প্রতি, প্রাচীন রীতিনীতির ওপর প্রচণ্ড আস্থা ছিল; আধুনিকদের না ছিল প্রাচীন সমাজের প্রতি শ্রদ্ধা না বর্তমানের প্রতি মায়া, না ভবিষ্যৎ সংগঠনের জন্য অনাগত আদর্শের প্রতি কোন নিষ্ঠা। এককালের আধুনিক সাহিত্যিকেরা ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হ'য়ে গেছেন; সমগ্র বাংলা-সাহিত্য দু'টো পথ গ্রহণ ক'রেছে। একটি পথ সিনেমা, অপরটি শিশু-সাহিত্য।

সিনেমা-সংস্পর্শে চলে গেছেন প্রেমেন শৈলজানন্দ-প্রমুখ আধুনিক সাহিত্যের দিকপালেরা এবং বুদ্ধদেব-অচিন্ত্য প্রমুখ সকলেই শিশুসাহিত্যে তলিয়ে গেছেন।

বর্তমান প্রবন্ধ অসহ্য রকমে দীর্ঘ হ'য়ে পড়ছে। তাই সিনেমা-সাহিত্য-সম্বন্ধে এই বললেই যথেষ্ট হবে যে, বাংলা সাহিত্যের ক্রমিক ধারা বঙ্কিম থেকে প্রেমেন পর্যন্ত পর্যবসিত হ'য়েছে—বাংলা সাহিত্যের পর্যায়ক্রমের পুনরা-

বৃত্তি; অথবা নাট্যমঞ্চের রূপান্তর; আর যেখানেই সৃষ্টি প্রচেষ্টা হ'য়েছে সেখানেই ডিরেক্টার-লেখকদের কল্যাণে ষ্টুডিওর ক্লেদ গেঁজে উঠেছে।

আর শিশুসাহিত্য সম্বন্ধেও সংক্ষেপে, যথেষ্ট না হ'লেও, বলব যে, শিশু-সাহিত্য নামে বাংলাদেশে যা চলছে তার অধিকাংশ বড়দের ছেলেমানুষি ইচ্ছার আরোপমাত্র। এ সাহিত্য অবৈজ্ঞানিক; পরিকল্পনাহীন বিশৃঙ্খল বঙ্গ-সাহিত্যের এ একটা লক্ষণ। যেমন তেমন করে কিছু ন্যাকামোপনা সচিত্র ক'রে দিতে পারলেই তা শিশুসাহিত্য বলে বিকিয়ে যায়। এঁরা শিশুশিক্ষক কিন্তু শিশু-মনস্তত্ত্ব সম্পর্কে বিশেষভাবে অজ্ঞ।

প্রাচীনপন্থীদের আঘাতে আধুনিক সাহিত্যিকেরা ছত্রভঙ্গ অবস্থায় এই যে দুদিকে ডুব মারলেন, তাতে বাংলা সাহিত্যের নিদারুণ ক্ষতি হ'ল। বুদ্ধদেব কবিতায় ডুবেছেন, প্রবন্ধ এক রকম ছেড়েছেন। কিন্তু অধুনা শিশুসাহিত্য লেখক শিবরাম চক্রবর্তী বাংলা প্রবন্ধ-সাহিত্যের দিক থেকে একটা মস্ত লোকসান। কেন না, বাংলায় প্রবন্ধ-সাহিত্যিক এক রকম নেই, আঙুল গুণে বলা চলে। অজিত চক্রবর্তীর সামান্য বিদ্যুৎ স্ফুরণের পর নলিনী গুপ্ত ও অতুল গুপ্ত বাংলা প্রবন্ধকে বাঁচিয়ে রাখলেন। নলিনী গুপ্ত, অতুল গুপ্ত ও শিবরামকে আমরা তিনটে স্তর বলতে পারি। নলিনী গুপ্ত গোঁড়া ও তাঁর আলোচনা যেন শাস্ত্রসঙ্গত; অতুল গুপ্ত শাস্ত্র ও অশাস্ত্রের সংমিশ্রণ; অতুল গুপ্তের ক্যাথলিসিটি বিস্তার লাভ ক'রেছে ও মুক্তি পেয়েছে শিবরামে। প্রসঙ্গতঃ আমাদের "সবুজ কথা"র (পত্রিকা নয়, বই) সুরেশ চক্রবর্তীকে মনে পড়ে। এঁদের পূর্বগামী-দেরও এমনি তিনটে স্তরে ভাগ করা চলে। বংকিম, রবীন্দ্র ও রামেন্দ্রসুন্দর। রামেন্দ্রসুন্দরই সুকঠিন প্রবন্ধের উপজীব্যকে জনগণবোধ্য ও সরল ক'রে তোলে। বলেন ঠাকুর প্রবন্ধে কাব্যের স্বাদ এনেছিলেন। (আজকালকার তথাকথিত গদ্য কবিতা সেখানে ম্লান।)

রস সাহিত্যে রাজশেখর বসু ছাড়া আর একজনের নাম করতে ইচ্ছা যায়। তিনি দিবাকর শর্মা বা রবীন্দ্র মৈত্রেয়। কেদার বন্দ্যোপাধ্যায়ের রস কড়াপাকে তেতো লাগে—পীড়া দেয়। অজানা বিষয়ে বা ক্ষেত্রে হাত-পা বাড়িয়ে বীরবল ব্যর্থ হয়েছেন। আজ তাঁর কথ্য ভাষার ওকালতিই সত্য হ'য়ে আছে। তবু বলতে হয়, প্রবন্ধকে তিনি আঁটিতে তুলে দিয়েছেন।

প্রগতির নামে আর এক প্রকার সাহিত্য দেখা দিয়েছে। ভোদ্‌কার বদলে দেয়িয়াস্তা, ডাষ্টবিন আর বস্তির বিক্ষিপ্ত কম্পিত চিত্র। এর চাইতে অনুবাদ ভাল। কিন্তু অনুবাদ সাহিত্যের সম্বন্ধে আমাদেব কেমন একটা বিসদৃশ লজ্জা ও বিতৃষ্ণা আছে। সে লজ্জা বিতৃষ্ণা চুরিতে নেই। অথচ অনুবাদ যে কঠিন এবং অনুবাদ যে জাতীয় সাহিত্য সমৃদ্ধির একটি অনুপেক্ষণীয় বাহন তার প্রমাণ ইংরেজী সাহিত্য। প্রসঙ্গত, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাম করতে ইচ্ছা যায়। বিনয় সরকারের নামও করতাম ; কিন্তু তাঁর অনুবাদ ভাল নয়। এজন্য প্রধানতঃ দায়ী আমাদের প্রকাশকদের দৈনন্দিন মুদিবৃত্তি ও প্রবৃত্তি। পোস্তা থেকে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষ বেচে আধ পয়সা লাভ ক'রতে পারলেই তারা খুসী।

তবু যুগেব পদধ্বনি যেন শোনা যায় ; বনে জঙ্গলে দাবানল আর চকমকি থেকে আগুন আবিষ্কারের মত চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের বাঁধটা একদিন ভেঙে যাবে। ভিসাস সার্কেল থেকে নিশ্চয়ই বাংলা সাহিত্য মুক্তি পাবে—নৈরাশ্যের বাতায়নে এই আশাতেই ব'সে আছি।

শ্রীপুলকেশ দে সরকার

হৃদয়ের রঙ

সকালবেলা। উঠতে আমার দেরি হয়েছে। মেয়েটি নাকি আজও অনেকক্ষণ বসেছিল, তারপর চলে গেছে। বলে গিয়েছে, পরদিন আবার আসব।

পরের দিন ও সত্যিই এলো। মনে মনে বিরক্ত হলাম, চেনা নেই শোনা নেই, এ রকম ধর্ষা দেওয়া কিসের জন্য?

বিরক্ত হয়েই দেখা করলাম। দেখলাম শ্যামল সপ্রতিভ মুখে ক্ষমাভিখারী দুটি চোখ। লজ্জিত হয়ে বললাম, "বসুন।"

বসল না, নীরবে দাঁড়িয়ে রইল।

শুধালাম, "কি দরকার আপনার? কাকে চান?"

"আপনাকেই।"

মধুর কণ্ঠ, শুনে মনটা আরও নরম হল? একটু চুপ করে থেকে বললাম, "আপনি কি আমাকে চেনেন?"

"চিনি বই কি।" একবার ইতস্তত করল, তারপর হঠাৎ সরে এসে সামনে নতজানু হয়ে বললে, "কী সুন্দর আপনি! ভালো করে দেখব, অনুমতি দিন।" তুলে ধরল ওর চোখ—আশ্চর্য চোখ।

আমি সুন্দর? মেয়েটি পাগল নাকি। বিচলিত হলাম, "ওকি করছেন? উঠুন, উঠে বসুন।"

"অপরিচিতা আমি··"

"বলুন না কী বলতে চান।"

"সব কথাই বলতে পারি তো?"

হাসলাম, "অনুমতির দরকার আছে?"

বলল, "আছে। বিনা অনুমতিতে দেখা করতে আসা এক, কথা বলা অন্য ব্যাপার। আমার যে অনেক আছে বলবার।"

ভেবে দেখলাম শোনা উচিত। লেখকের কল্পনার প্রতিষ্ঠা সত্যের উপর, অতএব মননের আগে শ্রবণকে প্রশ্রয় দিতে দোষ কি।

মেয়েটি যেন বুঝতে পারল, বললে, "দেখুন, আপনার সঙ্গে নিঃসংকোচ হওয়া ভালো। গোড়া থেকেই সুরু করি। ধরুন নামটি আমার অণিমা।

কেন এসেছি ? আমি কি জানি না লেখকের কাছে কথা বলতে আসা কী বিপদ। বলব এক, মনে মনে গড়ে তুলবেন অন্য বস্তু। 'সব জেনেই এসেছি। আমি যে শোনাতে চাই।"

উৎসুক হলাম, এমন কী কথা। না, আগে বরং ওঘরেই যাওয়া যাক, এখানে এসে পড়বে কেউ।

অন্য ঘরে এলাম অণিমাকে নিয়ে। এদিকে দৃশ্য সুন্দরতর, আকাশের অনেকখানি আমার।

অণিমা বলল, "ঘরটা দেখছি রাস্তার উপর। আপনি জনতা ভালোবাসেন ?"

"বাসিনে ? জনতা নিয়েই তো আমার কাজ।"

"কিন্তু আকাশকে নিয়ে আপনার কল্পনা। সেজন্যেই আসতে সাহস পেয়েছি।" বলে অণিমা নতমুখে কী ভাবল, চোখের সামনে খুলে ধরল হাত দুখানি। এতক্ষণ লক্ষ্য করিনি, এবার দেখলাম হাতে একটা আঙটি, বাম হাতের অনামিকায়। রক্তরাঙা পাথরখানি, সোনার বুকে যেন হৃদয়ের একফোঁটা রক্ত।

সেদিকে চোখ রেখে অণিমা ধীরে ধীরে বলল, "বয়স আমার খুব বেশি নয়। কত আন্দাজ করেছেন ? এই আপনারই বয়সী তো ? হবে। কিন্তু এরই মধ্যে কত দেশ ঘুরেছি। বিদেশী আকাশের আর বিদেশের জনতার, খানিকটা হাওয়া আর ঢেউ, এখনো লেগে রয়েছে গায়ে। অনেক গল্পই শোনাতে পারতাম। হয়ত আর একদিন। আজকে শুনুন আমার নিজেরই গল্প। বলেছি না, প্রকাশের তাগিদে আপনার কাছে আসা ? যাক্, শুনুন। সংক্ষেপেই সারব।

বছর কয়েক আগে। সমুদ্রে ভাসছিল আমাদের জাহাজ। ছিলাম ভেনিসে, জাহাজ ছাড়বার অপেক্ষায়। দিন কয়েক পরেই নিরুদ্বেগে পাড়ি দেব অকূলে। কিন্তু অদৃষ্ট! সঙ্গে পরিচিত যারা ছিল, প্রতাপ তাদের একজন। দেখতে কেমন ?···বলব না। কল্পনা করে নিন।

একদিন অসময়ে অকারণে, বিনা ভূমিকায়, ওই প্রতাপই আমাকে বললে, "শুধু এটুকু পথের নয়, অণিমা, আমার জীবনের অনন্ত পথেরও সঙ্গিনী তুমিই।'

বিশ্বাস করবেন কিনা জানি না, শুনে আমি সেদিন খুসি হতে পারিনি। প্রতাপকে অনেক দেখেছি, এভাবে তো কখনো দেখিনি। অকস্মাৎ প্রিয়তম হয়ে বসবে, একি সম্ভব ? প্রেম এ রকম হঠাৎ পাওয়ার বস্তু নয়। আমি তো জানি, রসরচনার মতো ভালোবাসাকে আগে আপন অন্তরের রসে রচনা করতে হবে, পরে আসবে তার দান।

এই ব্যক্তি আমাকে এত সহজলভ্যা মনে করল কেন ? ভাবছি।···প্রতাপ বললে, 'কী ভাবছ ? ভাবো। হয়ত এখনো তেমন ভালোবাস না আমায়, কিন্তু নিশ্চয় জেনো বাসতেই হবে।'

প্রেম সম্বন্ধে যত কল্পনা ছিল, কোনোটাই মিলল না এই পুরুষের উক্তির সঙ্গে। বড় রাগ হল। বললাম, 'বেআদবের কাছে ভালোবাসার পাঠ নেবো না। জীবনসঙ্গিনী হওয়া দূরে থাক, পথের সঙ্গিনীও হতে আপত্তি আছে।'

কিন্তু বার্থ যে রিজার্ভ করা। প্রতিজ্ঞা রাখতে বিপদে পড়লাম। প্রতাপ দয়া করে বলল সে নিজেই এক ষ্টিমার পরে আসবে।

বললাম, 'তা হবে না, কেবল অকারণ নাটকটাই বাদ দিতে হবে।'

তারপর থেকে দেখলাম প্রতাপ এক নতুন মানুষ। কিংবা হয়ত আমার দৃষ্টিই গিয়েছে বদলে। পরিবর্তনের শক্তি মানুষের ভিতরে যে অসীম। কখন, কাব কী কথায়, কোন পরশে, অন্তরের জানা লোকটির অজানা বিবর্তন হবে, বলা কঠিন। আমার চোখে এবার প্রতাপের নতুন রূপ প্রকাশ পেলো। নিতান্ত সাধারণ বলেই জানতাম ওকে। কিন্তু আজ, ওযে আমায় ভালোবাসে ! সংসারে এর চেয়ে অসাধারণ আর কী আছে ? মমত্বের চেতনায় এক নতুন দরদ নিয়ে প্রতাপকে আমি এখন বিশেষভাবে লক্ষ্য কবতে লাগলাম।

আমাদের চুক্তি অনুসারে প্রতাপ ষ্টীমারে দূরে থাকল। পরে বুঝলাম এখানেই হতে দিয়েছি ভুল। কাছে থাকলে লোকটি হয়ত মনের সামান্য কিছু স্থান জুড়ে থাকত। দূরে দূরে রইল বলে ওর চিন্তা, ও যে ভালোবাসে এই চিন্তা আমায় পেয়ে বসল। দেখলাম রাতে তারার ঝিলিক বুকে বেঁধে সাগর যেন আকাশের সঙ্গে কথা বলে, উদয় ও অস্তে সূর্যের রঙ কী আশ্চর্য ! এ রকম আর কেউ কখনো দেখেনি, আমিই প্রথম দেখলাম ! নানাভাবে আবিষ্কার করলাম ধরণীর অসীম সৌন্দর্য, আমার অন্তহীন অভিলাষ। আবিষ্কার

করলাম আমি কবি—হলামই বা অবিকশিত, পৃথিবীর বুকের সব ফুলই কি ফোটে ?

নিজেকে নেড়েচেড়ে আমি ছিলাম সুখে, ধাক্কা লাগল প্রতাপের পরিবর্তনে। আর একদিকের ডেক-এ বসে ওযে ঢেউ গণনা করে, হাতে বই ধরে থাকে বৃথাই, ডাকলে বিরক্ত হয়। রোগাও হয়েছে।

আমার ভিতরের নারী বুঝতে পারল সবই। প্রতাপের ও আমার, দুজনের জীবনে এখন দুই রঙ। নিজের চোখে আমি সার্থক, কেননা বিধাতার সৃষ্টি-শিল্প আমার দ্বারা ব্যর্থ হয়নি—ওই পুরুষটিই তার প্রমাণ। কিন্তু সে কেন শক্তিহীন ? কারণ ঈপ্সিতা নারী ওকে প্রত্যাখ্যান করেছে। নিয়েছে প্রাণ—দেয়নি ফিরিয়ে। আমার ব্যাঙ্কের খাতায় জমা, প্রতাপের হয়েছে খরচ।

বিবেকে বোঝাল এটা ভাল হচ্ছে না। অনুভব করলাম, রঙ ফিরিয়ে না দিলে রঙীন হওয়া অন্যায়। কিন্তু কি করি, কী দেবো ওকে ? কী যে চায়, জানি ; ওই বর্বরতার কাছে কি হার মানব ?

ভেবেছিলাম, ভালোবাসব আমি পুরুষের স্থিরশিখা বুদ্ধিকে। ওদের দুর্বার প্রতাপ কেন আমার আবেগের উপর বলপ্রয়োগ করল ?

নিজের দুর্বলতায় ভীত হলাম। ওরা নিষ্ঠুরভাবে আমাদের আকর্ষণ করে, ওদের বাহাদুরি এইখানে। প্রিয়া নারীর কাছে ওদের দাবি তো শিশুর উৎপাতের মতন অবুঝ—এই উপদ্রব ভালোও লাগে, রাগও হয়। প্রতাপ নিজের চারদিকে যতই দুঃখের আবর্ত রচনা করতে লাগল, বুঝলাম এমনি করেই ও জোর করে কেড়ে নেবে, সৃষ্টি করবে আমার ভালোবাসাকে। দিন কয়েক এমনি বলপরীক্ষা চলল।

তারপর, একদিন—না, দিনে নয়, রাতে···হাজার নক্ষত্রদীপের নীচে, সমুদ্রের হৃদয়ে সরোজের মতন জাহাজখানি যখন জ্যোতির্ময় ও ভাসমান, কী যে আমি বলেছিলাম ওকে, মনে নেই, মনে পড়ে না ; মনে রয়েছে ওরই কথা, 'মিছে তোমার এত অনুযোগ। অণিমা, ধরো এই আঙটি নাও। যখনই দেখবে, মনে পড়বে আমার আত্মদান, পুরুষের দাবি নয়—সমর্পণ।'

পরিয়ে দিল, এক ফোঁটা রক্তের এই মণিটি। সিঁদুরের সেই চিরন্তনী লেখা নয়, এঁকে রেখে গেল না প্রিয়তমের চিরন্তন অধিকার। তবু, রক্তের এই ফুলটি, যাকে জড়িয়ে ধরেছে সোনার বেড়ি, যার অঙ্গীকার···!"

অণিমা হঠাৎ নিস্তব্ধ হল। মনে হল সাবধানে সযত্নে একটা নিশ্বাস গোপন করে ফেলল।

তারপর অনেকক্ষণ চুপ। বিস্মিত হলাম।

আরো একটু পরে বললাম, "কথা কি শেষ হয়েছে?"

"শেষ? কি করে বলব। আগে জানতে হবে মনের জগতে এর কী অর্থ। সিঁদুর নয়, তবু কেন আমার ললাটে রইল এই দাগ? প্রতাপ আজ কোথায়, কতদূরে। আমি ওর কে। কেউ না।···তবু ওর দান নিজেই এসে ফিরিয়ে না নিলে, আমি তো তার অমর্যাদা করতে পারছি না—আমার মুক্তি কোথায়?···একথা বলবেন ওকে, তাই আপনার কাছে এসেছি···"

তড়িতাহতের মতন ধাক্কা খেয়ে উঠলাম, তীব্র সুরে বললাম, "কে—কে আপনি? একি অন্যায়। না, আর হেঁয়ালি নয়, দিন পরিচয়!"

"পরিচয়? একই বস্তুর এপিঠ আর ওপিঠ—আমি বুদ্ধি, আপনি হৃদয়। আমি চেয়েছি ওর আত্মদান, আপনি দিয়েছেন তৃষ্ণার জল। আর কত পরিচয় চাই?···হ্যাঁ, আরো একটু আছে, শুনুন। বোম্বাইতে প্রতাপকে শপথ করতে হয়েছিল আমার স্বাধীনতা সে হরণ করবে না, এই সর্তে আঙটি আমি রাখব। ওর মুখের দিকে সে সময় চেয়ে দেখেছিলাম, কী বিবর্ণ দেখালো মুখখানি। কিন্তু আমি যে তখন উচ্চ জীবনের সন্ধানী—পুরুষের বন্ধনে নীড়ে বন্দিনী হতে নারাজ।···তারপর কত দিন গেল, কত পথে ঘুরলাম, প্রতাপ এসে ফিরে গেল বার বার—ফিরিয়ে দিলাম ওকে। আঘাত দিয়েছি, দিতে পারিনি এই মণিটুকু—ওর এই আঙটি। বলুন তো, কেন তবু বুঝলাম না? ফিরে এলাম আবার কলকাতায়। কাজে মন লাগে না, ভেসে যায় ভেনিসে, সাগরে, সেই চোখে সেই মুখে। মনে হল ডাকি: সামান্য সাধারণ মানুষ প্রতাপ, সঙ্গে তার সামান্যা সাধারণ মানবীই হই। কেন ইতস্তত করতে সময় গেল? কেন বুঝলাম না? এ দিকে জগত যে গেল বদলে, সে দোষ কার?"

অবাক হয়েছি, উত্তর দেবো কী।

একটু পরে মধুর কণ্ঠ আবার বললে, "বলবেন ওকে···আপনার স্বামীকে বলবেন, পরিবর্তনে বারবার আবর্তিত হবে পৃথিবীর সকল ছন্দ, বদলে যাবে সব রঙ, শুধু শোণিতের ছন্দ হৃদয়ের রঙই বদলাবে না কখনো। বলবেন, একথা আমি বাস্তবিক কোনোদিনই ভুলিনি। ভুল হয়েছিল শুধু ওকে 'না' বলা।"

কি জানি কতক্ষণ ছিলাম অন্যমনস্ক, ঈষৎ শব্দে যখন সজাগ হলাম, দেখলাম ধীরে চলে যাচ্ছে অণিমা। ডাকব কি?

ছুটে গিয়েও কিন্তু ডাকলাম না আর, মনে পড়ল আমার কথা শুনতে সে আসেনি—এটুকু গোড়াতেই বলে রেখেছিল।

শ্রীজ্যোতির্মালা দেবী

পোল কবি আদাম আস্‌ন্ত্রিকের
একখানি অপ্রকাশিত পত্র

উনবিংশ শতাব্দীর পোল সাহিত্য বহুল পরিমাণে ভারতীয় ভাবে অনুপ্রাণিত। ও-দেশের তিনটি খ্যাতনামা কবি ভারতীয় দর্শন ও সংস্কৃতিকে আপন সাহিত্যে অমর করেছেন। তাঁদের নামঃ য়ুলিয়ুশ্‌ স্লোভাৎস্কি, য়ান্‌ কাস্প্রোভিচ্‌ ও আদাম আস্‌ন্ত্রিক্‌। শেষোক্ত দুই কবিকে ভারতীয় কবি বললেও অত্যুক্তি হবে না। এঁদের মধ্যে একমাত্র আস্‌ন্ত্রিকেরই ভারতবর্ষের সঙ্গে চাক্ষুষ পরিচয় ঘটেছিল। ইনি শেষ দশায় ১৮৯৪ সালে ভারত ভ্রমণ করে যান।

নিম্নলিখিত পত্রখানি আস্‌ন্ত্রিকের সাহিত্যিক বন্ধু ইগ্‌নাৎসী সেন্তের মাৎস্যেরভ্‌স্কি-কে সম্বোধন করা। পোল দেশের খ্যাতনাম্নী নটী Lucyna Kotarbińska-র কাছে পত্রখানি পাওয়া গেছে। বলা বাহুল্য তা পোলদেশেও অদ্যাবধি অপ্রকাশিত। ভারতবর্ষ ও সিংহলের বিবরণ থাকাতে পত্রের অধিকারিণীর কাছে তার বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করবার অনুমতি নিয়ে এসেছি।

—অনুবাদক।

সিংহল, কলোম্বো
Galle Face Hotel,
২৬-২-১৮৯৪

প্রিয় সেন্তের,

এইবার গন্তব্যস্থানে পৌঁছনো গেল। আমার শেষ চিঠি বোম্বাই প্রবেশ করবার আগে। তা ভ্লজিও-র ঠিকানায় পাঠিয়েছি, তোমাদের পড়িয়ে শুনিয়েছে নিশ্চয়। আমাদের জাহাজ যখন বোম্বাইয়ের কাছেই উপসাগরে নোঙর ফেললে তখনও সূর্যোদয় হয়নি। জাহাজের পাটাতন থেকেই দিনের প্রথম আলোয় ছোট বড় দ্বীপের জটিল সমাবেশ আর আমাদের চোখের সুমুখে মেলা ঐ প্রকাণ্ড শহরকে অভিবাদন জানালাম। প্রাচ্যের রূপ-বাহুল্য আর ইউরোপের সভ্যতা, এই দুইয়ের সংমিশ্রণ। চোখে পড়ে ঘুমন্ত শহর আর তাল গাছের সারির ওপর কারখানার চিম্‌নীর ধোঁয়ার নিশান। সে ছবি আশ মিটিয়ে দেখা হয়ে উঠলো না, ন-টার পরই আমাদের জাহাজ অতি

সন্তর্পণে ভিক্টোরিয়া ডকের দিকে চললো, এবং ডক পার হয়ে পাঁচিল-ঘেরা জেটীর ভেতর প্রবেশ করলো। জেটীর ওদিকে Maria Valeria অপেক্ষা করছে আমাদের কলোম্বো নিয়ে যাবার জন্যে। মালপত্রের হাঙ্গামা এড়াবার জন্যে Maria Valeria-য় না ওঠা পর্যন্ত সেগুলো Imperatrix-এই রেখে যাওয়া গেল। নিজে কয়েকজন পরিচিতের সঙ্গে গিয়ে উঠলাম Watson Hotel-এ অর্থাৎ আমার Head Quarters-এ। বোম্বাইয়ে দু-দিন কেটে গেল হু-হু করে। দিনে ও সন্ধ্যায় শহরের নানা পল্লী ঘুরে ঘুরে দেখা গেল। অট্টালিকা, ভবন, প্রাসাদ, যেমন বিশাল তেমনি সুদর্শন। রেলের ষ্টেশনের তুলনা জগতে মেলে না। জাটা নামে একটি পার্শী ক্রোড়পতির প্রাসাদ দেখলাম। শহর থেকে একটু দূরে Malabar Hill। তার ওপর মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে শান্তি-স্তম্ভ, পার্শীরা যেখানে আপন মৃতের সংকারের জন্যে তাদের শকুনির আহার্যরূপে রেখে আসে। চারি দিকে ঝাঁকে ঝাঁকে শকুনি।

সব জিনিষের বিবরণ দেওয়া সম্ভব নয়, কারণ তা সময়-সাপেক্ষ। পশ্চিম থেকে যারা আসে তাদের মাথা ঘুরে যায়। রূপ-বীক্ষণের ভেতরকার ছবির মত অসংখ্য পরস্পর-বিরোধী রেখার সংগম ও সংমিশ্রণ। অনুভূতির ঐশ্বর্য ও পরিমাণের ভারে নিষ্পিষ্ট, পরিশ্রান্ত হয়ে পড়তে হয়। হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম ২১শে তারিখে। সকাল ৯-টায় Maria Valeria-য় এসে উঠলাম। এগারো-টার সময়ে দক্ষিণ দিকে যাত্রা করা গেল, ভারতবর্ষের উপকূল ধরে। কুমারিকা পর্যন্ত জাহাজ থেকে বরাবর তটভূমি চোখে পড়ে। সমুদ্রযাত্রার সুরু থেকে এই কটা দিনই সব চেয়ে উপভোগ্য। সূর্যাস্তের সে কী অপরূপ সৌন্দর্য! তার রঙের বাহার আমরা ইউরোপে কল্পনাই করতে পারি না। জ্যোৎস্না-ভরা রাত্রি দিনের আলোর মত পরিষ্কার, অথচ অসংখ্য জানা, না-জানা মণ্ডলীর উজ্জ্বল নক্ষত্রের আলো তাতে একটুও ম্লান হয় নি। সমুদ্র, বিশেষতঃ সিংহলের কাছে নীলকান্ত মণির মত নীল, স্বচ্ছ, জ্বলন্ত ফেণার ঝালর দেওয়া। কুমারিকা ছাড়ার পর দিন ও রাত্রি যেন মূর্তিময়ী বেটোফেনের সোনাতা। কোন্ দিকে তাকাবো, কোন্ জিনিষটার তারিফ করবো তা ভেবেই পাওয়া যায় না। দলে দলে শুশুক জলের ওপর ডিগবাজী খাচ্ছে, ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ো মাছ ঢেউয়ের ওপর দিয়ে ক্ষণেকের তরে তাদের সোণার আভরণ ঝলমলিয়ে সমুদ্রের অতলে

হারিয়ে যাচ্ছে, জাহাজের পাশে পাশে চলেছে কচ্ছপের দল, গম্ভীর বদন, নানা জাতের সমুদ্রের পাখী মাছ ধরতে ব্যস্ত, ঢেউয়ের নীলিমায় ফেণার মুক্তোর অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ। আলোর ঝরণা-ঝরা আকাশের তলায় দেখছি এই সব। জাহাজের মৃদু দোলানির তালে তালে আমার মনে কত বিচিত্র স্বপ্ন যে দোলা দেয়। সওয়া একটার সময়ে দূরে চক্রবালরেখায় এক টুকরো মেঘের মত কিসের আভাস পাওয়া গেল। সিংহলের তটভূমি। দু-টোর সময়ে তা বেশ স্পষ্ট হয়ে এল। আধ ঘন্টার মধ্যেই বন্দর আর শহর পরিষ্কার হয়ে ফুটে উঠলো, সবুজে ঢাকা নারকেল বাগানের একটানা পাড় সমুদ্রতীর ধরে চলে গেছে বরাবর Mount Lawinia (?) পর্যন্ত। তিনটের পর আমরা বন্দরে ঢুকলাম। এইবার মালপত্র নিয়ে নৌকায় নামতে হলো। জিম্‌নাস্টিক্-এর কসরৎ করতে করতে নামতে হয়, কুলী-মজুরদের পাশ কাটিয়ে। তাদের সে কী হৈ হৈ হল্লা! এক-এক জনে এক-একটা মোট নিয়ে তার জন্তে আলাদা আলাদা মজুরী দাবী করছে। ডাঙ্গায় এসে পড়লাম। জিনিষপত্র শুল্ক-ঘরে নিয়ে যেতে হলো, এবং পুনরায় যাবতীয় বিধি-বিধান পালন পূর্বক সেগুলো গাড়ীতে তোলা গেল। তারপর সুস্থ শরীরে এসে হাজির হলাম এই Galle Face Hotel-এ। হোটেলে যখন পৌঁছলাম তার অনেক আগেই পাঁচটা বেজে গেছে। যে-ঘরে থাকবার ব্যবস্থা হলো তার দুটো দোর, একটা দালানের দিকে, আর একটা খড়খড়ি-দেওয়া, বারান্দার দিকে; সূর্যাস্তের আলো একেবারে বারান্দার সামনে এসে পড়ে, দোর খুললেই পড়ন্ত রোদ। লম্বা, ছিপ্‌ছিপে সত্তরটা নারকেল গাছ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মাথা নাড়ছে। তাদের ঠিক পেছনেই আসমানী রঙের সাগর আর ফেণায়মান তরঙ্গের মর্মরানি। ভারত মহাসাগরের অসীমতা ও দূরবিস্তৃততট-রেখা বন্দর, কেল্লা আর সহরের মাঝ খান থেকে আরম্ভ করে Mount Lawinia (?) পর্যন্ত চোখে পড়ে। তার ধারে ধারে অসংখ্য নারকেল এবং নানা অন্য গাছের যেন একটি পাড় বসানো। কলাগাছ, Zalipot (?), Ficus Elasticus—আমাদের গৃহ-পালিত জাতের নয়, সে এক-একটি মহীরুহ—মাগ্‌নোলিয়া, নানা জাতের মিমোজা, আকাসিয়া, আম, পানদান (?), রুটি-সীম, সালাদ-গাছ (?), তেঁতুল, বাঁশঝাড় ইত্যাদি। শহরের যে-অংশে আমার হোটেল তার নাম কালুপিথ্যা, ইংরেজীতে Colpetty,

যেন একটা প্রকাণ্ড প্রাকৃতিক পার্ক। তার ভেতর ইউরোপীয়দের ভীলা আর বাংলো, মাঝে মাঝে সিংহলীদের কুটীর। পৌঁছবার ঠিক পরেই গা-ঢাকা হয়ে এসেছে। সেই সন্ধ্যার সময়েই এই একক শহরে খানিকটা টহল দিয়ে আসা গেল। সাগর ছাড়াও শহরের ভেতর দিকে কতকগুলো হ্রদ আছে, শাদা ফুলে ঢাকা······মাটীর রং লাল, যেন দারুচিনির গুঁড়ো। মনের ওপর প্রথম যে ছবি পড়ে বিবরণ দিয়ে তাকে প্রকাশ করা যায় না। এ-সব দৃশ্য দেখতে দেখতে চোখ ক্রমে অভ্যস্ত হয়ে আসে। এখনও কেবলই মনে হয়, যেন আমার চোখের সুমুখে একটি রূপ-কথার রাজ্য মেলা রয়েছে, আরব্য রজনীর গল্পের ছবির মত। কাল পোষ্ট আফিসে গিয়েছিলাম। কিন্তু চিঠি একখানিও পেলাম না। জানি না ক্রাকুফ. থেকে খবর পাবো কবে। এত-দিন জগৎ থেকে এমন বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিলাম যে, জানিও না কোথায় কী ঘটেছে, তুমি ভাই, চিঠিখানা ভুজিওকে পাঠিয়ে দিও। কাল-পরশু নাগাদ তাকে লিখবো। সেও সে-চিঠি তোমায় দিয়ে আসবে। ভারি অদ্ভুত লাগে যখন ভাবি যে যা লিখছি তা তোমরা চার সপ্তাহ পরে পাবে, আর তোমরা যা লিখবে তাও পুরোনো খবর। এখানে দস্তুর মত গরম। বোম্বাই থেকে কলোম্বোর পথে থার্মোমিটারে দেখা গেল ৩৯ ডিগ্রী (Cel)। দুপুরবেলা ছায়ায় এখানে ঐ রকমই গরম হবে, হয়তো ওর চেয়েও বেশী। সমুদ্রের হাওয়া কিঞ্চিৎ উত্তাপের উপশম করে এবং শরীরটাকেও সামান্য স্নিগ্ধ করে, এই যা বাঁচোয়া। তুমি আমার স্নেহালিঙ্গন নিও। তোমার "বাভর্যা"* বা "গেরূক্রদা"র * বান্ধবীদের হস্তচুম্বন করি। এমিলা ও লুৎসিয়ানা ভ্রয়াৎস্কি, কোতার্বীন্‌স্কিদের, শ্রীমতী ইদালিয়া, দুন্‌চ্যিক্, মাল্‌চেভ্‌স্কি, মস্তভ্‌স্কি, সার-নেৎস্কি, এস্ত্রাইহের, কুমারী পাশ্‌কভ্‌স্কা এবং যাবতীয় পরিচিতদের আমার নমস্কার জানিও। ভুজিওকে আমার স্নেহালিঙ্গন জানিও। চিঠি লিখো হে, চিঠি লিখো। +

তোমার আদাম।

অনুবাদক—ডক্টর হিরণ্ময় ঘোষাল

---

*সম্ভবতঃ কাফি-খানা।—অনু।

+(?) - চিহ্নিত শব্দগুলির অর্থ অস্পষ্ট।—অনু।

মত

কুক্ষণে সেদিন বউবাজারের মোড়ে নামিয়া পড়িয়াছিলাম এবং কুক্ষণে এক সের দত্তপুকুরের ছানা কিনিয়া রুমালে বাঁধিয়া পুনরায় বাসে উঠিয়া টপ্ টপ্ করিয়া জল ফেলিতে ফেলিতে কোন মতে বাসায় পৌঁছিয়াছিলাম। আপনারা ভাবিতেছেন, মাত্র এক সের ছানা, তার আবার সুক্ষণ কুক্ষণ কি? সেই কথাই তো বলিতেছি।

বাসায় ফিরিয়া গৃহিণীকে বলিলাম, এই নাও, একটু ছানা এনেছি। যা হাঙ্গাম, সারা পথ বাসের মধ্যে ফোঁটা ফোঁটা জল ফেল্‌তে ফেল্‌তে—

কি দরকার ছিল এ হাঙ্গামার?

একদিন একটু আনলুম। এ পাড়ায় তো ওসব চোখে দেখবার জো নেই।

তা বেশ করেছ। এখন এ দিয়ে কি করি বল ত। কাঁচাই খাবে চিনি দিয়ে? না, রাত্রে ছানার ডালনা করব?

আচ্ছা, এক কাজ করলে হয় না? একটু চিনি মিশিয়ে চট্‌কে, উনুনে একটু আল দিয়ে—

মানে সন্দেশ?

হ্যাঁ, তাই। তবে, অত হাঙ্গাম—থাক্ গে।

হাঙ্গাম আর কি? তাই হোক। সন্দেশের পাক কিন্তু খুব কঠিন—অভ্যেস না থাকলে মুস্কিল।

তাতে আর কি? ছানা চিনি মিশিয়ে একটু আল দেওয়া—খাওয়া গেলেই হ'ল।

বেশ তাই করব খন।

সখের সন্দেশ প্রস্তুত হইয়াছে। গৃহিণী একটু গরম সন্দেশ আনিয়া আমার হাতে দিয়া বলিলেন, দেখ তো কেমন হয়েছে? ধরে টরে যায় নি তো?

খাইয়া দেখিলাম, মন্দ হয় নাই। মিষ্টির পরিমাণ, ছানার দানা, গন্ধ, স্বাদ—মোটের উপর ভালই হইয়াছে। বলিলাম, বেশ হয়েছে। তুমি তো বড় একটা সন্দেশ তৈরি করবার সুযোগ পাও না। তবু বেশ হয়েছে। গৃহিণী খুসি হইয়া আর একটু সন্দেশ আনিয়া আমার হাতে দিলেন।

খাওয়া শেষ হইলে জল খাইতে খাইতে বলিলাম, দেখ একটু সন্দেশ পাঠিয়ে দাও ও বাড়ীর নির্মলকে। ওরা নূতন কিছু পেলে আমাদের না দিয়ে খায় না।

বেশ তো। এখুনিই দিচ্ছি পাঠিয়ে।

সন্দেশের সঙ্গে গৃহিণী ছোট একটু চিঠিতে লিখিয়া দিলেন, ঠাকুরপো, অ্যামেচারের হাতের একটু খাবার পাঠাইলাম। কেমন হইয়াছে, চাখিয়া দেখিও এবং মত জানাইও।

একটু বেড়াইতে বাহির হইয়াছিলাম। ফিরিয়া আসিয়া গৃহিণীর মূর্তি দেখিয়া চক্ষু স্থির হইয়া গেল। বারান্দার এক পাশে দেওয়ালে ঠেস দিয়া চুপ করিয়া বসিয়া আছেন। আঁচল এলোমেলোভাবে মাটিতে লুটাইতেছে। চুলগুলিও তথৈব পিঠের উপর লুটাইতেছে। গা-ধোওয়া, কাপড় ছাড়া, চুল বাঁধা, প্রভৃতি কিছুই হয় নাই। মুখখানি মলিন, ততোধিক গম্ভীর। দৃষ্টি অর্থহীন। দেখিয়া হঠাৎ একেবারে চমকাইয়া উঠিলাম। সশঙ্কচিত্তে অগ্রসর হইয়া নিকটে গিয়া দেখি, ডান হাতে একখানি কাগজ। নানাপ্রকার দুশ্চিন্তা মনে উদয় হইতে লাগিল। শ্বশুর বাড়ি হইতে কোন খারাপ খবর আসে নাই তো? আমার শাশুড়ী ঠাকুরাণী অনেকদিন হইতে বাতে ভুগিতেছেন, কিন্তু হঠাৎ তেমন একটা কিছু হইবার মত সম্ভাবনা তো নাই। ব্যাপারটা কি! আস্তে আস্তে গৃহিণীর পাশে গিয়া বসিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, কি হয়েছে, বল না। গৃহিণী বলিলেন, হয়েছে আমার মাথা। কেন তুমি আমাকে বললে নির্মল ঠাকুরপোকে সন্দেশ পাঠাতে? আমি কি সন্দেশ তৈরি করতে জানি? তুমি নেহাৎ বললে, তাই—

তাতে হয়েছে কি? আর সন্দেশ তো বেশ ভালই হয়েছে।

ছাই হয়েছে। দেখ তো ঠাকুরপো কি লিখেছে? কত কথা—সব আমি বুঝতেও পারলুম না। আমি তো ভয়ে ভয়ে সন্দেশের নামও করি নি। লিখেছিলাম, খাবার পাঠাচ্ছি। কি ঝকমারি—

কেন তুমি এত অস্থির হচ্ছ? দেখি কি লিখেছে?

গৃহিণীর হাত হইতে কাগজখানা লইয়া পড়িলাম। তাহাতে লেখা আছে—

বউদি, আপনার প্রেরিত খাবার পাইলাম। বিনয় করিয়া খাবার বলিয়াছেন। কিন্তু জিনিষটি সন্দেশ বলিয়াই মনে হইল। আপনি কিছু মনে

করিবেন না, আমি বলিতে বাধ্য হইতেছি যে জিনিষটা সন্দেশ হয় নাই। সব খাবার তৈরি করিবার একটা প্রণালী আছে, একটা প্রসেস আছে, একটা রীতি আছে, একটা টেকনিক আছে। হাতা খুন্তি হাতে লইয়া উনানের উপর কড়াই চাপাইলেই রান্না হয় না। আপনার ওই সন্দেশ—ওর ছানা হইতে খুব ভাল করিয়া জল সরান হয় নাই। তারপর ছানা যতটা বাটা দরকার তাহা বাটা হয় নাই। অথচ দানাও তেমন বড় বড় নাই। ফলে, না হইয়াছে বাটা সন্দেশ, না হইয়াছে কাঁচাগোল্লা। পাকটিও না হইয়াছে কড়া, না হইয়াছে নরম। সন্দেশের পাকের যে কয়টি রেকগ্‌নাইজ্‌ড্‌ ষ্টেজ আছে, তার একটার মধ্যেও পড়ে নাই আপনার পাক। অর্জুন নাগের তিন টাকা সেরের সন্দেশ আপনার সন্দেশের চেয়ে বেশি মিষ্টি, বেশি শক্ত এবং বেশি বাটা। দ্বারিক মিত্রের এগার সিকে দরের সন্দেশের চেয়ে আপনার সন্দেশ কম মিষ্টি, কম শক্ত এবং কম বাটা। সিন্ধুভূষণের সন্দেশের গন্ধটা আপনার সন্দেশের চেয়ে বেশি উগ্র, কম স্নিগ্ধ এবং কম ভুরভুরে। আমাদের এই মোড়ের কার্ত্তিক ময়রার সন্দেশে যেটুকু কর্পূর এবং এলাচদানার গন্ধ পাওয়া যায়, তাহা আপনার সন্দেশে নাই। সন্দেশের পাক শেষ করিয়া তাল পাকাইয়া ডেলা করিয়া রাখিলেই তো হয় না। প্রস্তুত সন্দেশের কতকগুলি ষ্ট্যাণ্ডার্ড সাইজ এবং গড়ন আছে। যেমন, আম-সন্দেশ, তাল শাঁস, আতা প্যাটার্ণ, ইত্যাদি। আপনার সন্দেশের কোন আকার বা গড়ন নাই। অগত্যা যদি বরফির মত চৌকো বা ডায়মণ্ড প্যাটার্ণ হইত, তাহা হইলেও চলিতে পারিত। সন্দেশের উপরে উপরে একটু পেস্তার কুচি ছড়াইয়া দিতে হয়, তাও কি আপনার জানা নাই? তাও যদি না করিয়াছেন, তবক দিয়া মুড়িয়া তো দিতে পারিতেন। আজকাল সন্দেশ কি কেউ গরম খায়? বাড়ীতে তো রেফ্রিজারেটর রহিয়াছে—তাহাতে ঠাণ্ডা করিয়া পাঠাইলেন না কেন? মোট কথা, আপনার সন্দেশ সন্দেশই হয় নাই। ইতি, আপনাদের নির্মল।

পত্র পড়া হইলে গৃহিণী বলিলেন, এ সব কি? অর্জুন নাগ, দ্বারিক মিত্তির, টেকনিক—ব্যাপার কি? কেন তুমি বললে আমায় সন্দেশ তৈরি করতে? বললেই যদি, নিজেরা খেলেই হ'ত। ঘটা করে পাড়ায় বিলোতে

গেলে কেন? টেকনিক না মাথা! আমি কি সন্দেশে অনার্স নিতে যাচ্ছি না এম. এ. দিতে যাচ্ছি? যত সব—

তাই তো, নির্মলটা শেষে তোমাকে এমনি করে—

আমি কিন্তু এ জন্মে আর ঠাকুরপোর সঙ্গে—

আচ্ছা রোস—বলিয়া চাকরকে ডাকিয়া একখানি স্লিপে লিখিলাম, ভাই নির্মল, তোমার বৌদি তোমাকে যে সন্দেশ পাঠাইয়াছিলেন, তাহা খাইতে কেমন লাগিল জানাইও।

একটু পরে চাকর উত্তর লইয়া আসিল, খাইতে খাসা হইয়াছে। চমৎকার!

স্লিপখানা গৃহিণীর হাতে দিয়া বলিলাম, এই দেখ। এবার হয়েছে তো?

এ কথাটা আগে লিখ্‌লেই হ'ত। অত সব টেকনিক ফেকনিকের আমি কি বুঝি।

নির্মল যে সন্দেশ তৈরি কর্‌তে ওস্তাদ, সেটা জানানো চাই তো। নাও, যাও এবার চুল টুল বাঁধ গিয়ে।

গৃহিণী আঁচল ঘুরাইয়া চুল দুলাইয়া ড্রেসিং রুমে ঢুকিলেন।

"ভাস্কর"

ভারতীয় সমাজ-পদ্ধতির উৎপত্তি ও বিবর্ত্তনের ইতিহাস

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের আক্রমণশীলতা

পূর্ব্বে লোকের বিশ্বাস ছিল যে বেদ-প্রসূত ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্ম অন্য মূলজাতীয় (race) লোককে স্বীয় পদ্ধতি মধ্যে গ্রহণ করে নাই। ইহা জাবতুষ্টীয়, ইহুদী ধর্ম্মের ন্যায় খাঁটি জাতীয়ধর্ম্ম, অর্থাৎ একটা মূলজাতির কৌমগত ধর্ম্ম। এক্ষণে উপরোক্ত দুই ধর্ম্মের ন্যায় অনুসন্ধানের দ্বারা নির্ণীত হইয়াছে যে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম আক্রমণশীল (aggressive) ধর্ম্ম, অপরকে স্বীয় ধর্ম্ম ও সমাজশরীর মধ্যে আশ্রয় প্রদান করে। সত্য বটে যে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম বৈদিক আর্য্য-ভাষীদের কৌম-গত ধর্ম্ম। কিন্তু বেদ, পুরাণ ও অন্যান্য ধর্ম্মশাস্ত্রের ধর্ম্মের আবরণের মধ্য হইতে এই তথ্য বাহির করা যায় যে পুরাকাল হইতেই ব্রাহ্মণেরা বিজাতীয়দের স্বীয় ধর্ম্মও সমাজশরীর মধ্যে গ্রহণ করিতেছিল। তাহা না হইলে দ্রাবাড় ও ইণ্ডো-টিবেটানভাষী লোকেরা কি প্রকারে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মান্তর্গত হয় ?

অজ্ঞান-তিমির যত দূরীভূত হইতেছে ততই দেখা যাইতেছে যে, ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম চিরকালই ভিন্নজাতীয় লোককে হজম করিয়া আসিতেছে। ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের সংঘ (organisation) নাই, প্রচারপদ্ধতি নাই তথাপি দিনের পর দিন অহিন্দু "হিন্দু" হইতেছে। প্রাচীনকালে যাঁহারা দক্ষিণে গিয়া তথাকার লোকদের হিন্দু করিয়াছিলেন তাঁহাদিগকে 'ব্রহ্ম-রাক্ষস' বলা হইত। পুলস্ত, পুলোহ, পুলোমার এবং বিশ্বামিত্রের ৪৯ বংশধরগণ এই প্রকারে ব্রহ্ম-রাক্ষস হন। আর যাঁহারা ধর্ম্মপ্রচারকের কাজ করিতেছেন তাঁহাদের কি বলা হয়—তাঁহাদের কি পতিত বা 'বর্ণ ব্রাহ্মণ' বলা হয় ?

যাঁহারা বাঙ্গলার পশ্চিমপ্রান্তে, পূর্ব্বপ্রান্তে এবং মধ্য ভারতের উপত্যকায়, দক্ষিণে, হিমালয় অঞ্চলে হিন্দু মিশনারীদের নীরব কর্ম্ম অবলোকন করিয়াছেন তাঁহারাই বুঝিবেন যে তথাকথিত আদিম অধিবাসীগণ কি প্রকারে হিন্দু হইয়া

উঠিতেছেন। ইহা দেখিয়া বিগত মহাযুদ্ধের সময় Rev. Archer তাঁহার পুস্তকে তারস্বরে চেঁচাইয়া বলিয়াছেন, যে সব ধর্ম্ম ভারতের লোকদের ধর্ম্মান্তরিত (convert) করিতেছে তাহাদের পারস্পরিক সংখ্যার অনুপাতে (ratio) হিন্দুর সংখ্যাই অধিক হইয়া পড়িতেছে—অন্যান্য ধর্ম্ম অপেক্ষা হিন্দু ধর্ম্মই ধর্ম্মান্তরিতের সংখ্যা অধিক পাইতেছে। যতদূর জানা যায় তাহাতে দেখা যায় যে বিভিন্ন বৈষ্ণব সম্প্রদায়ই এই ধর্ম্মপ্রচারের কার্য্যে ব্যাপৃত আছেন।

এই কার্য্যের পিছনে কোন সংঘবদ্ধ দল নাই, আছে শুধু একদলের অর্থনৈতিক তাড়না আর একদলের "নাম প্রচার দ্বারা জীবকে মুক্তি প্রদান করা" রূপ প্রচেষ্টা। ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম স্মৃতি ও ব্যবস্থা পুস্তকে যে সব কৌমদের অন্ত্যজ ও অস্পৃশ্য বলিয়া অভিহিত করিয়াছে অজ্ঞাত ব্রাহ্মণ সন্তানেরা তাহাদেরই মধ্যে গিয়া সেই সকল লোকদের পৌরহিত্য করিতেছে। কালক্রমে তাঁহাদের অহিন্দু আচার ত্যাগ করাইতেছেন, তাহাদিগের হিন্দু নাম প্রদান করিতেছেন; তাঁহারাও হিন্দু অনুষ্ঠান সমূহ গ্রহণ করিতেছেন। আর যে-কৌম বা জন যত অধিক ব্রাহ্মণ্যবাদীয় সংস্কার আঁকড়াইয়া ধরিতেছেন, তাঁহারা ততই উচ্চজাতীয় হিন্দু বলিয়া গণ্য হইতেছেন। সুন্দরবন অঞ্চলে একদল সাঁওতাল অথবা ছোটনাগপুরের পার্ব্বত্যজাতীয় কৃষক বাস করিয়া 'বুনো' জাতিতে পরিণত হইয়াছেন। এখন তাঁহারা নিজেদের 'বাঙ্গালী' বলেন এবং লেখককে খুবই হৃষ্টচিত্তে বলিয়াছেন যে তাঁহারা একজন ব্রাহ্মণও প্রাপ্ত হইয়াছেন। যশোহরের অঞ্চলেও একদল এক প্রকারের 'বুনো' জাতি আছেন, তাঁহারা ব্রাহ্মণ পাইয়াছেন। ইহারা নিজদিগকে 'কুর্ম্মী' জাতীয় বলিয়া পরিচয় দেয় যদি গৌড়ীয় অথবা অন্য সম্প্রদায়ের বৈষ্ণব এই প্রকার জাতির মধ্যে যান তাহা হইলে তাঁহারা ইহাঁদের গলায় মালা পরাইয়া দেন, মাথায় শিখা রাখিয়া দেওয়ান, এবং বরাহ প্রভৃতি জন্তুর মাংস ভক্ষণে নিষেধ করেন। এই প্রকারে পশ্চিম বঙ্গের সাঁওতালেরা "মাঝি" জাতিতে অভিব্যক্ত হইতেছেন। হুগলী ও হাওড়া জেলায় এই প্রকারে 'বুনো' 'বাগদী' জাতি উদ্ভূত হইতেছে। পুনঃ ছোটনাগপুরের শিক্ষিত ও ধনী বংশীয় হো (কোল) জাতীয় লোকেরা নিজদিগকে হিন্দু নামে অভিহিত না করিয়া ব্রাহ্মণ্য আচারাদি শনৈঃ শনৈঃ গ্রহণ করিতেছেন। সিংভূমের এই প্রকারের একজন শিক্ষিত ও জমিদারের (মানকী)

পুত্র লেখককে বলিয়াছেন যে তাঁহার শ্রেণীর মধ্যে সকলেই শ্রাদ্ধ ও বিবাহাদি ব্যাপারে ব্রাহ্মণ আনাইয়া ক্রিয়া নিষ্পন্ন করেন। তবে তাঁহারা আদম সুমারীতে কেন হিন্দু বলিয়া নিজদিগকে লেখান না—এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন যে ইহাতে রাজনীতিক প্রতিবন্ধকতা রহিয়াছে *। আবার ইহাদের মধ্যে কালী পূজা প্রভৃতিও প্রচলিত হইয়াছে। বাঁকুড়ার কোনও এক সাঁওতাল লেখককে সগর্ব্বে বলিয়াছেন, তাঁহার পিতৃশ্রাদ্ধে মানভূমের কোন ব্রাহ্মণ নারায়ণ শিলা লইয়া তাঁহার ক্রিয়া সম্পন্ন করাইয়াছেন। এই প্রকারে ক্রমশঃ বৈদিক ঋষিগণের ঘৃণার পাত্র বঙ্গ বগদচের জনপদের লোকদের শেষাংশও বেদ-প্রসূত একটা-না-একটা আর্য্যধর্ম্মের কুক্ষিগত হইতেছেন।

এইরূপে দেখা যায় যে, আদিম অধিবাসী জাত মুণ্ডা বাঁকুড়া জেলায় 'মুদী' জাতি, খেড়িয়া কোড়া বা খয়রা—বৈদিক 'বগদ' এখন 'বগ্র ক্ষত্রিয়'; কুশমেটে অধুনা 'কুশক্ষত্রিয়', বৈদিক পুণ্ড্র (?) ও মধ্যযুগের পুঁড়ো অথবা পোদ এক্ষণে 'পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়', কাম্বোজ নামে আখ্যাত বা পাহাড়ী কোচ এখন 'ক্ষত্রিয়', তদনুরূপ খ্যান এখন 'সেন' ও কায়স্থ, আদিম জাতীয় ওঁরাও এখন 'ওরাং ক্ষত্রিয়,' তদ্রূপ লায়েক এখন হয় কায়স্থ না হয় 'ক্ষত্রিয়'; স্থানভেদে ভূমীজ বা ভূঁইয়া বামুসাহার নামধারী লোকেরা এখন স্থানে স্থানে ক্ষত্রিয় অথবা রাজপুত, ভূঁইয়া এখন সূর্য্যবংশীয় ক্ষত্রিয়, তাহাকে কুশহস্তে মন্ত্রপাঠ করিবার সময় কান্যকুব্জের ব্রাহ্মণের একান্ত প্রয়োজন। এই প্রকারেই টটেম গোত্রীয় 'গো-বংশীয়' ও 'নাগ-বংশীয়' লোকেরা ক্ষত্রিয় হইয়াছেন এবং শেষোক্তেরা বিষ্ণুপুরাণোক্ত 'নব-নাগ' রাজবংশের সহিত রক্তের সম্বন্ধ স্থাপন করেন। আবার পালামৌ-এর 'চেরো' জাতি এখন উপবীত গ্রহণকারী রাজপুত হইয়াছেন (১)। এই প্রকারেই নেপালের গুরুং, নায়ার প্রভৃতি জাতিগুলি এবং হিমালয় পর্ব্বতস্থিত অপরাপর পার্ব্বত্য জাতিসমূহ ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মী হইয়াছেন।

কথিত আছে, নূতন কোন জাতিকে স্বীয় ধর্ম্মে আনয়ন করিলে ইসলাম তাহার পূর্ব্ব সংস্কার ও প্রতিষ্ঠানসমূহ সমূলে উৎপাটিত করে। খৃষ্টধর্ম্ম

* সাঁওতাল পরগণার কোন এক যায়গায় এই প্রকার এক ঘাটওয়ালের (জমিদার) স্থাপিত কালী মন্দিরের বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ পুরোহিত লেখককে এই কথাই বলিয়াছেন।

১। Risley—Tribes and Castes of Bengal.

ঐগুলির সহিত একটা রক্ষা করে এবং হিন্দুধর্ম্ম সেই গুলিকে সশরীরে স্বীয় দেহে স্থান দেয়। কিন্তু অনুসন্ধানকারীদের মত এই যে কোন ধর্ম্মই প্রাচীন সংস্কারাদিকে একবারে বিনষ্ট করিতে পারে নাই, সেইগুলি স্বীয় আবরণের বৈশিষ্ট্য দ্বারা ঢাকিয়া রাখে মাত্র।

বৌদ্ধ পুস্তক সমূহ হইতে জ্ঞাত হওয়া যায়—বিভিন্ন কৌমকে স্বীয় দলভুক্ত করিবার জন্য মহাযান বৌদ্ধধর্ম্ম বৌদ্ধবিধান গ্রহণকারী জাতির কৌমগত ধর্ম্মকে (tribal religion) 'লৌকিক-ধর্ম্ম' রূপে গ্রহণ করিয়া স্বীয় কুক্ষিগত করে। এই প্রকারে আদিম জাতীয় চড়কপূজা (২), গ্রাম্য দেবদেবী পূজা মহাযান ধর্ম্মের অন্তর্গত হইয়াছে। ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম বৌদ্ধ ধর্ম্মকে বিতাড়িত করিয়া অথবা যেখানে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রভাব বিস্তার করে নাই সেখানে গিয়া কৌমগত ধর্ম্মের অনুষ্ঠানগুলিকে ক্রমশঃ হটাইয়া দিয়া ব্রাহ্মণ্য অনুষ্ঠান সমূহ কায়েম করে। এই জন্য তথাকথিত অন্ত্যজ জাতিদের টটেম গোত্র পাওয়া যায় না, সেইগুলি ব্রাহ্মণ্য নামের আবরণে ঢাকা রাখা হইয়াছে (হংস ঋষি, শাণ্ডিল্য পক্ষী)। টটেমগুলির উদ্দেশ্য এই সকল লোক ভুলিয়াছেন যদ্যপি তৎপ্রসূত 'তাবু' এখনও বলবৎ আছে। অবশ্য বিভিন্ন জাতি সমূহের মধ্যে দুই চারিটা টটেমগত নাম এখনও প্রচলিত আছে যদিও লোকে উহার তাৎপর্য্যার্থ ভুলিয়া গিয়াছে [শুকপক্ষী, তেতুল নন্দন (তেঁতুলে বাগদীর গোত্র), হরিদ্রা গোত্র, গোবংশীয়, নাগবংশীয় প্রভৃতি], অতঃপর ব্রাহ্মণ্য আচার শিক্ষা দিয়া তাহাদিগকে ধীরে ধীরে অসৎ-শূদ্রে উন্নীত করা হয়।

২। চড়কপূজা সম্পর্কে শ্রীযুক্ত হরিদাস পালিতের "অন্তার গম্ভীরা" দ্রষ্টব্য। তিনি উক্ত পূজাকে একটি প্রাচীন উৎসব বলেন। শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী—The Cult of Katar-karudra (Cadakpuja) in Journal of the Asiatic Society of Bengal, Vol. 1, 1935, No. 3 দ্রষ্টব্য। তিনি বলেন, বাংলার গোবিন্দানন্দ ও রঘুনন্দন স্মৃতিকারদ্বয় এই পূজার কোন উল্লেখ করেন নাই, হয়ত ব্রাহ্মণ্য ও ব্রাহ্মণ্য-পূর্ব্ব পূজা পদ্ধতি ও আচার চড়ক পূজার মধ্যে থাকার সম্ভাবনা আছে। ব্রাহ্মণ্য প্রভাব হালেই ইহার মধ্যে আসিয়াছে। শ্যাম (থাই) দেশের Swinging Festivalএর সহিত চড়ক পূজার সাদৃশ্য আছে। শ্রীযুক্ত ক্ষিতি প্রসাদ চট্টোপাধ্যায় (J. A. S. B., Vol. 1, 1935, No 3) বলেন, চড়ক পূজার সাদৃশ্য আছে এবং উহার উৎপত্তিও এক।

তখন তাহারা ব্রাহ্মণ পুরোহিত ও তাহাদের গোত্র-প্রবর (কোন কোন স্থলে ইহার ব্যতিক্রমও দৃষ্ট হয়) প্রাপ্ত হয়, পরে তাহাদের ক্ষমতানুযায়ী আরও উন্নত হইয়া একটা উচ্চবর্ণে প্রবেশ করে।

হিন্দুর রাজশক্তির অভাবে এবং দেশে Pax Britanica থাকার দরুণ পূর্ব্বেকার ন্যায় এত দ্রুত পরিবর্তন আর হইতেছে না। ছোটনাগপুরের ও অন্যান্য স্থানের নূতন হিন্দুগণ আর অস্ত্র হস্তে রাজ্যস্থাপন করিয়া ক্ষত্রিয়-রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠাতা হইতেছেন না; তাহাদের হিন্দুত্ব বা ক্ষত্রিয়ত্বের দাবী সাংসারিক আচারে আবদ্ধ থাকিতেছে এবং বর্ত্তমানের রাজনৈতিক কারণবশতঃ অনেক কৌম তাহাদের কৌমপদ্ধতি ভাঙ্গিয়া হিন্দু সমাজের অন্তর্গত হইতে পারিতেছে না।

ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মও অন্যান্য ধর্ম্মের ন্যায় স্বীয় নূতন অনুগামীদের (converts) ব্রাহ্মণ্য জনশ্রুতি ও ইতিহাস ঘাড়ে চাপাইয়া দেয়। এই জন্যই নূতন হিন্দুরা পুরাণ সমূহ হইতে নিজেদের বংশ পরিচয় বাহির করেন এবং প্রাচীন আর্য্যদের জনশ্রুতি সমূহ নিজেদের বলিয়া বিশ্বাস করেন *। কিন্তু ইহার ফল কি হইতেছে? দেখা যায়, হিন্দুর অচলায়তন সমাজ-পদ্ধতি তাহাদের উপর চাপিয়া তাহাদিগকে স্থাণুবৎ নিশ্চেষ্ট করে। নূতন হিন্দু জানে, যে জাতিতে সে জন্মিয়াছে, যে সমাজ-ব্যবস্থা তাহার আছে তাহা হইতে বাহির হওয়া অধর্ম্ম। সে নিজের অবস্থাকে সনাতন ও শাশ্বত বলিয়া মানিয়া নিয়াছে। এইজন্যই কথাকথিত পতিত, অস্পৃশ্য বা অন্ত্যজ জাতিগুলি নির্ব্বাক হইয়া নিজদিগের ব্যবহারিক দুঃখ সহ্য করে। সে জানে যে হিন্দু হইলেই এই সব সহ্য করিতে হইবে। এই অবস্থার বিরুদ্ধে তাহার মনে কোন দ্বন্দ্বভাব (anti-thesis) উদয় হয় না। ব্রাহ্মণ তাহার নিকট ক্রমাগত প্রাক্তন, কর্ম্মফল, পুনর্জ্জন্ম, দেবদ্বিজে ভক্তি প্রভৃতির মাহাত্ম্য অতীব দুর্ব্বোধ্য ভাষায় তাহাকে বলিতেছেন। অবশ্য যেখানে হালের ইংরেজী শিক্ষা প্রবেশ করিতেছে সেখানে বিদ্রোহ ধূমায়মান হইয়া উঠিতেছে।

---

* পোরজাতীয় অনৈক ভদ্রলোক ক্ষত্রিয়ত্বের দাবী করিয়া লেখককে বলেন—"তাহা হইলে আমরা King of Porus-এর relatives।"

নব হিন্দুর মর্য্যাদা

এক্ষণে দেখা যায় যে সর্ব্ব প্রকারের হিন্দুদের এখনও বর্ণাশ্রম মধ্যে আনা হয় নাই। যাহারা বর্ণাশ্রম মধ্যে নাই তাহাদেরই বোধ হয় অন্ত্যজ বলা হয়। কিন্তু যাঁহারা ইহার মধ্যে আসিয়াছেন তাঁহারা কি পতিত বলিয়া গণ্য হইয়া থাকেন? নরতাত্ত্বিক অনুসন্ধান দ্বারা তথাকথিত অন্ত্যজদের সহিত আদিম অধিবাসীদের সম্পর্ক বাহির করা প্রয়োজন। কতকগুলি অন্ত্যজ জাতি—যথা, বাউরী, ভূমিজ, ভূঁইয়া, খন্দ, রামোশী এবং স্থান বিশেষের কুর্ম্মী ও দক্ষিণের অনেক নীচ জাতীয় লোকদের সহিত আদিম অধিবাসীদের সম্পর্ক ধাপে ধাপে ধরা যায়। কিন্তু পতিত বা অন্ত্যজ বলিলেই আদিবাসী বুঝায় না; অথচ কতকগুলি স্মৃতিতে (যম সংহিতা, ৫২ ; সম্বর্ত্ত সংহিতা, ১০-১২) ভীল, কোল-দেরও পতিতের মধ্যে গণ্য করা হইয়াছে। পতিত নানাপ্রকারের আছে—উচ্চবর্ণোদ্ভব এবং তথাকথিত অর্য্যোচিত আকৃতির লোকও আজ হিন্দু সমাজে পতিত এবং আদিবাসী সম্ভূত লোক যাহাদের আকৃতিতে দ্রাবিড়-পূর্ব্ব (Pre-Dravidian) মূল জাতীয় লক্ষণ আছে তাহারাও পতিত বলিয়া গণ্য। আজ-কালকার উচ্চবর্ণের লোকদের মধ্যেও আদিবাসীর শারীরিক লক্ষণ সমূহের প্রকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। এই জন্য শারীরিক নরতত্ত্ব (Physical Anthropology) দ্বারা আজ একটা জাতির সামাজিক মর্য্যাদা স্থিরীকৃত হইতে পারে না। পুনঃ অন্ত্যজ ও আদিবাসীর আকৃতিগত পার্থক্য সর্ব্বত্র সমান বলিয়াও বোঝা যায় না।

কিন্তু বর্ণাশ্রম সমাজ দ্বিজ জাতিদের মধ্যে যেমন বিভেদ সৃষ্টি করে, শূদ্রের মধ্যেও তদ্রূপ করিয়া থাকে। তাহাদিগকে সৎ ও অসৎ শূদ্র নামে বিভক্ত করা হয়। অসৎ শূদ্রের নীচে অন্ত্যজের স্থান। কিন্তু এই সকল শ্রেণীর সীমা নিরূপণ করিবার কোন উপায় নাই। শ্রেণী ও জাতি সমূহ শনৈঃ শনৈঃ স্বীয় পদমর্য্যাদা পরিবর্ত্তিত করিতেছে। একই জাতি বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন প্রকারের সামাজিক পদমর্য্যাদা প্রাপ্ত হইতেছে। এই বাঙ্গলায়ই দেখা গিয়াছে, একই জাতি এক জেলায় জলচল, আবার অন্য জেলায় জল-অচল। সমাজ গতিশীল, উহার মধ্যে শ্রেণী-সংগ্রাম প্রতিনিয়তই স্বীয় শক্তি প্রকাশ করিতেছে। বর্ণাশ্রম হিন্দু ধর্ম্ম বিভিন্ন জাতির মর্য্যাদাসূচক নামকরণ

(nomenclature) মধ্যে বাঁধা ধরা (stereo-typed) গণ্ডী টানিয়া দেয় নাই। ফলে নিম্নশ্রেণীর জাতিগুলি স্বীয় গণ্ডী ডিঙ্গাইয়া উচ্চস্তরে প্রবেশ করিতেছে। উপরোক্ত কারণ সমূহের জন্য অনেক জাতি আজ হিন্দু অথচ হিন্দু সমাজের সকল প্রকার অধিকার হইতে বঞ্চিত রহিয়াছে। ইহাই হইতেছে হিন্দু সমাজের সমস্যা।

(ক্রমশঃ)

শ্রীভূপেন্দ্রনাথ দত্ত

এক টিকেটহীন সহযাত্রী

হৃদয়ের অনাবৃষ্টি, বুদ্ধির অকালে
অসমঞ্জ বৃদ্ধি, রুগ্ন অস্থির যৌবন।
শৈশবের কোন্ কীট কূটগ্রন্থিজালে
ঘোরে, উচ্চঅভিলাষে ক্ষিপ্ত দেহমন।
মামুলি সংসার তাই হল নাকো পাতা,
দাম্পত্যে দোহার বুঝি দেশে মেলা ভার।
সংস্কৃতির উচ্চমঞ্চে তাই ধরো ছাতা
আজ একে, কাল ওকে। তোমার অসার
বহুধাভঙ্গুর মনে স্পষ্ট দেখি ঘুন্।

তোমার বিহার যবে আজ দেখি চলে
সম্মানিত সাম্যবাদে, চল্তি উকুন
দেখি বেছে যাও তুমি, ঊর্ধ্বশ্বাস ছলে
জানি এ কুহক কার। হে বিকল-মতি,
চৈতন্যের মৃত্যু আত্মবঞ্চনার গতি॥

বিষ্ণু দে

শুক্লপক্ষ

(১)

বৎসরের শেষ প্রান্তে প্রস্ফুটিত চাঁদ
প্রতি রাত্রে পাতে বুঝি মরণেরই ফাঁদ।
কলায় কলায় ভরি অনল গরল
ছড়ায় বিষাক্ত দৃষ্টি রূপালী তরল।
পথপ্রান্তে, নগরের উদ্ধত চূড়ায়,
মনে, মুখে, জমে উঠে বোমাত্রস্ত বাত।
উর্ধ্ব হতে বারে বারে অশনি ঘুরায়
পুষ্পকবাহন পশু ; নিচে ভূমিসাৎ
জীবনের অট্টালিকা। তাই ত সুধাই
কার পাপে সুস্থ প্রাণ ব্যস্ত করি সবে!
নিরীহ এ গড্ডলিকা কার কষাঘাতে
ছিন্ন ভিন্ন নিরুদ্দেশ। এই বসুধাই
বিধৃত করেছে আমাদেরই প্রাণপণে,
দ্বিধা দ্বন্দ্বে, প্রেমে সখ্যে, জীবনে মরণে॥

(২)

ছন্দ ভাঙ্গি প্রতি পদে। নিটোল সুডৌল মূর্ত্তি ক্রুদ্ধ জনতায়
বিক্ষুব্ধ চিত্তের মাঝে, আকাশের গা'য়,
বিদগ্ধ মজলিসে আর সামরিক মনন সভায়
কোথা ত দেখি না। বুঝি অন্তর্হিত মর অলকায়
লালিত্যের গ্রীবা ভঙ্গী, বর্ত্তুল বিলাস লঘু অলস রেখায়।
শঙ্কাহত অবকাশ, বিস্ফোরণ ব্যগ্র, নীল শিরায় শিরায়
এই আকাশের। তাই মন চলে যায়,
ডুবে যায় কোন রূঢ় স্থাপত্যের পরুষ লীলায়।

বজ্রনাদী গানে। বৃথা তাই আজ সহজ সাধন,
তাই ঠুংরি নরুপায়
ধ্রুপদী আসরে। মৃদু শীর্ণ লঘিমায়
ভীরুতার পাপ লাগে। মেদুর শিখায়
প্রাণের কুটিরে বসি পাঠ করা তনু লিপিকায়
প্রমায়ুর জয়গাথা, আজ ত অচল। আজ আরক্ত সন্ধ্যায়
যুগান্তের সূর্য মুগ্ধ ভাবী প্রভাতের স্বর্ণ সূর্যের আভায়॥

(৩)

তর্ক বৃথা। দূর দিগন্তের পানে চাহি
পরিত্রাণ খুঁজি কোন স্মরণের শ্যামল সীমায়।
কূলত্যাগী মননের স্বপ্নে অবগাহি
স্নিগ্ধ হই। বৃথা জানি খোঁজা কোনও জীবন বীমায়
নিরাপত্তার বাণী, বিশুদ্ধ আরাম।
বৃত্তিভোগ যদি ঘটে লোলচর্ম্ম বৃদ্ধ অবকাশে,
নিষ্পিষ্ট কঙ্কালসার প্রমায়ুর কি বা আছে দাম!
ক্লান্ত, ম্লান যবে চন্দ্র, শ্রান্ত যবে প্রাচীন আকাশে
ছিন্ন পক্ষ স্বর্ণ-চিল প্রবল প্রাণের,
কি হবে অতীত ভাগ্যে। দক্ষ যত সঞ্চিত স্মরণ
যক্ষ যৌবনের,—যত বিহ্বল গানের
অন্তরার চূড়ে কাঁপে দুর্নিবার গম্ভীর মরণ।
সান্ত্বনার ছায়াচ্ছন্ন পাদপেরা কতই বা দূর,
আজ যবে রণোন্মাদ, জীবনের করুণ মাধুর॥

জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র

পুস্তক-পরিচয়

সাম্যবাদের প্রকৃতি ও প্রকাশ

A PEOPLE'S HISTORY OF GERMANY by A. Ramos Oliveira (Translated by Eileen Brooke). Gollancz. 1942. 7s 6d. Pp. 228.

ESSAYS IN POLITICAL PHILOSOPHY by Vidya Dhar Mahajan. Doaba House, Lahore. 1943. Pp. 106.

ইংরেজ ইতিহাসবেত্তা গ্রীন এককালে History of the English People ব'লে কয়েক খণ্ড বই লিখেছিলেন এবং বইয়ের ভিতরে না হ'লেও মলাটে 'পিপ্‌ল্' কথাটার জন্য অনেকে নাকি ইতিহাসের নূতন পদ্ধতির সন্ধানলাভ করেছিলেন। এ কালে গণদেবতার চোখে ইতিহাসকে নূতন ক'রে দেখবার রেওয়াজ হয়েছে; কিন্তু সে কাজ সহজসাধ্য নয় এবং তার মালমশলা অনেকক্ষেত্রে কল্পনার সাহায্যে যোগাড় ক'রতে হয়। অলিভীরা ব'লে স্প্যানিস্ সাংবাদিক জার্ম্মানীর যে গণ-ইতিহাস রচনার প্রয়াস পেয়েছেন তা একাধিক কারণে সার্থক হ'য়েছে। অলিভীরা মার্কামারা মার্ক্স-পন্থী নন: তবে তাঁর দৃষ্টি সজাগ: বয়সে তিনি তরুণ এবং হিটলারের অভ্যুত্থানের প্রাক্কালে তিনি বার্লিনে স্প্যানীস্ সমাজ-তন্ত্রীদের কাগজের প্রতিনিধি ছিলেন—সেই সময়টা যেমন জার্ম্মাণীর যুগসন্ধির সময়, পৃথিবীর ইতিহাসে ও মতবাদের পটভূমিকারও বিপ্লবী পরিবর্ত্তনের সময়-নির্দ্দেশক। আলোচ্য গ্রন্থখানি সেজন্য শুধু রচনানৈপুণ্যে ও ঘটনা-বিন্যাসের কারণে নয়, স্বাধীনতাকামী ও সাম্যরাজ-স্বপ্নবিলাসীকে সতর্কবানীর সন্ধান দিতে পারে ব'লেও পঠনীয়। যুদ্ধকালীন কাগজ ও ক্ষুদে অক্ষরের বিপর্য্যয় সত্ত্বেও এ ধরণের বই হাতে পেলে মন তাজা হয়।

প্রথম কয়েকটি অধ্যায়ে গ্রন্থকার ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভের 'ফিউড্যাল' জার্ম্মানীর চেহারা ও নেপোলীয়ানী ও তৎপরবর্ত্তী বিপ্লবের ঘাত-প্রতিঘাতের বিবরণ দিয়েছেন। এই বিবরণের মধ্যে একদিকে মার্কসের আবির্ভাব, এবং অন্যদিকে মধ্যবিত্ত সমাজের জনগণের সাহায্য নিয়ে ক্রমে রাষ্ট্র ক্ষমতার অংশী-দার হবার চিত্র ভবিষ্যতের ইঙ্গিত দেয়। ভারতীয় পাঠক এখানে আমাদের

দেশের প্রথম জাতীয় আন্দোলনের উদ্দেশ্য ও পরিণতির তুলনা স্মরণ করতে পারেন।

তারপরের যুগ বিসমার্কের এবং সেই সঙ্গে ফ্যার্ডিনান্ড লাসালের উৎকেন্দ্রিক্ সাম্যবাদের প্রকাশ নিয়ে আরম্ভ। ১৮৬০-এর পর জার্মানীর শ্রমিক-আন্দোলনের আবির্ভাব মধ্যবিত্ত রাজনীতিবিদ্‌দের ফাঁদমুক্ত হ'য়ে। সোশ্যাল ডেমক্র্যাটিক্ দলের পরিণতির বিবরণ গ্রন্থকার শুধু বর্ণনা করেন নি, সে সম্বন্ধে যে বিশ্লেষণ বইখানিতে ক'রেছেন তা গভীর অন্তর্দৃষ্টির পরিচায়ক। দ্রুত শিল্প-প্রসারের ফলে বিসমার্ক-নেতৃত্বে জার্মানীর সাম্রাজ্যবাদ বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের চেয়ে বেশী আশঙ্কার সম্ভাবনা নিয়ে কেন আবির্ভূত হয়েছিল তার এবং ব্রিটেন জার্মানী, রুশিয়া, অষ্ট্রিয়া ও ফরাসীদেশের সম্বন্ধের অদলবদলের অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা গ্রন্থকার সরসভাবে ক'রেছেন।

হিটলারের অভ্যুত্থান যে প্রকৃতপক্ষে ভার্সাই সন্ধির ও ইহুদি-তাড়নার "জিগীর" মাত্র লোককে ভোলাবার জন্ম নিয়েছিল এবং হিটলারের আন্দোলনের প্রথম ধাপ ও দ্বিতীয় ধাপের তফাৎ; মুসোলিনীর সমর্থক ও হিটলারের সমর্থকদের আর্থিক ভিত্তি ও রাজনৈতিক মতের প্রভেদ ও পার্থক্য—গ্রন্থে সুনিপুণভাবে আলোচিত হয়েছে। গত দশ বৎসরের ইতিহাস ও তার উপলক্ষ্য ব্যক্তি ও গণ-শক্তি পাঠকের চোখের সামনে জীবন্ত হ'য়ে ওঠে এবং অনেকবারই এদেশী পাঠক এদেশী আন্দোলনের গতি ও ভবিষ্যৎ ভাবতে সুযোগ পান। জাতীয়তার বুলি ও ধনিকের স্বার্থ কি ভাবে একে অন্তকে সাহায্য করতে পারে, জনসাধারণও কি ভাবে তাদের নিকটতর শোষকদের ধাপ্পায় ভুলতে পারে বহিঃশত্রুর প্রতি আক্রোশে, তা জার্মানী আমাদের শিখিয়েছে। তবে ইতিহাসে পুনরাবৃত্তি হ'লেও ইতিহাসের "শিক্ষা" যে সবাই গ্রহণ করে তা নয়: কারণ "শিক্ষিত" লোক ইতিহাসের ধারা নিয়ন্ত্রণ খুব কম সময়েই করে।

তথ্য, সমালোচনা ও পরিবেশন-নৈপুণ্যে অলিভীরার বইটি আদৃত হবে আমার বিশ্বাস। আশ্বাসের কথা এই যে যুদ্ধের বিষবাষ্পের মধ্যেও অযথা কটূক্তি বা ব্যক্তিগত গালিগালাজ এতে কম, যদিও সাম্যবাদী দলসমূহের ভুল-ভ্রান্তি সম্বন্ধে গ্রন্থকারের মন্তব্যগুলি অনেকস্থলে একদেশদর্শী ও আপত্তিকর, বিশেষত কম্যুনিষ্ট পার্টি সম্পর্কে শ্লেষ।

লাহোরের একটি তরুণ অধ্যাপকের কাঁচা হাতের বইটিও সমাজতন্ত্রবাদের কুলজি হিসাবে শিক্ষার্থীর হাতে দেওয়া চলে। বইটির বারটি অধ্যায়ের নয়টি সমাজতন্ত্রবাদের আলোচনা। বিভিন্ন মতবাদের আলোচনা ভিন্ন, ঐ সব মতের উদ্‌গাতাদের জীবনী ও মূল বক্তব্যের সার-সংগ্রহ আছে। গ্রন্থকার এ সব সংকলন ক'রতে খেটেছেন এবং পাঠক-সাধারণের খাটুনি কমিয়েছেন। নোট পুস্তক না লিখে রাজনৈতিক বিষয়ে মতবাদ আলোচনার চেষ্টাও প্রশংসনীয়।

শ্রীবিনয়েন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

বিশ্বভারতী ও লোক শিক্ষা

বাংলা সাহিত্যের কথা—শ্রীনিত্যানন্দবিনোদ গোস্বামী (বিশ্বভারতী লোকশিক্ষা গ্রন্থমালা, ৬নং)। মূল্য—।৵০

সাহিত্যের ক্ষেত্রে শ্রীযুক্ত নিত্যানন্দবিনোদ গোস্বামী তেমন পরিচিত নহেন ; কারণ, পাণ্ডিত্যমাত্র তাঁহার সম্বল। পাণ্ডিত্যের বাহ্যাড়ম্বর এমন কি কোনো আড়ম্বরই তাঁহার নাই। এমন লোক "বাংলা সাহিত্যের কথা" বলিতে বসিলে স্বভাবতই লোকে অধিকারের প্রশ্ন তুলিতে পারে। কিন্তু গোঁসাইজীকে যাঁহারা জানেন তাঁহারা খুশীই হইবেন এই জন্য যে তাঁহার নিকটে অনেকেই অনেক আশা করিয়াছিলেন এবং এই ক্ষুদ্র পুস্তকটিকে সেই আশা পূর্তির সূচনা বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে।

গ্রন্থকার 'লেখকের নিবেদন'-এ নিজেই বলিয়াছেন যে বাংলা সাহিত্যের কালানুক্রমিক পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনা তাঁহার উদ্দেশ্য নহে। "তরুণ শিক্ষার্থীদের জন্য সরলভাবে প্রাচীন ও আধুনিক সাহিত্য ও সাহিত্যিকের সংক্ষিপ্ত পরিচয়" দেওয়ার জন্যই এই বইখানি লেখা হইয়াছে। কাল অনুসরণ না করিয়া লেখক বিষয় অনুসারে পুস্তকের পরিচ্ছেদগুলিকে বিভক্ত করিয়াছেন। এইরূপ বিষয় সন্নিবেশের একটি গুরুতর অসুবিধা এই যে, সাহিত্য ও সাহিত্যিকের জন্মকাল এবং পৌর্বাপর্য সম্বন্ধে ধারণাটা নিতান্ত অস্পষ্ট থাকিয়া যায়। কিন্তু সুবিধা

অনেক বেশি। বিষয় হিসাবে পরিচ্ছেদ সাজাইবার ফলে প্রত্যেকটি পরিচ্ছেদই স্বল্প পরিসরেও কতকটা স্বতঃসম্পূর্ণ হইতে পারিয়াছে। মনসামঙ্গল অধ্যায়ে মনসামঙ্গলের বৃত্তান্তই পাই। হরিদত্ত আগে কি বিজয় গুপ্ত আগে এ প্রশ্নের উত্তর নাই মিলুক কিন্তু মনসামঙ্গল বলিতে কি বুঝায়, মনসামঙ্গলের উপাখ্যানটি কি, মনসামঙ্গলের প্রধান প্রধান লেখক কে—এ তথ্যগুলি একটি অধ্যায়ের মধ্যেই পাওয়া যায়। এমন কি এই প্রসঙ্গে পদ্মাপুরাণ এবং ভাসান-গানের কথাও উল্লিখিত হইয়াছে।

মঙ্গলকাব্যের প্রসঙ্গে চণ্ডীমঙ্গল, ধর্মমঙ্গল এবং মনসামঙ্গলের কাহিনীগুলি সরস ও সুললিত ভাষায় বিবৃত হইয়াছে। দীর্ঘকালব্যাপী শিক্ষকতার ফলে লেখক তরুণ মনের এই তত্ত্বটি বেশ বুঝিয়াছেন যে, পাঠ্যপুস্তকের তত্ত্বকথা ও নীতি উপদেশ অপেক্ষা রূপকথার মনোহারিতা অনেক বেশি। সাহিত্যের ইতিহাসে সাল তারিখের জটিলতার পথ পরিত্যাগ করিয়া তিনি যে সাহিত্যের কথা মাত্র বলিয়া গিয়াছেন তাহার ফলে ইতিহাস সাহিত্যের মতই সরস ও সুপাঠ্য হইয়াছে। 'নাথ সাহিত্য' প্রসঙ্গেও গোরক্ষবিজয় এবং ময়নামতীর কাহিনী দেওয়া হইয়াছে। লেখক কথার ভাষায় বই লিখিয়াছেন, তাহাতে গল্পগুলির সচলতা ব্যাহত হয় নাই। অবশ্য চলতি ভাষাই যে এই স্বাচ্ছন্দ্যের একমাত্র কারণ তাহা নয়, গোঁসাইজী গল্প বলিতে জানেন। একটি দৃষ্টান্ত দিই : "বাপ মা চলে গেলে কালকেতু আর ফুল্লরা ঘর সংসার করতে লাগল। কিন্তু তারা বড়োই গরীব। রোজ আনে রোজ খায়। তার ওপর আবার কালকেতু ছিল খাইয়ে লোক। সে খেতে ব'সে :

মুচড়িয়া দুই গোঁফ বাঁধি লয় ঘাড়ে,
এক শ্বাসে দশ হাঁড়ি আমানি উজাড়ে।
চার হাঁড়ি মহাবীর খায় খুদ জাউ,
ছয় হাঁড়ি মসুর সুপ মিশাইয়া লাউ।

"এই রকম তার খাওয়া। এক একদিন সে ফুল্লরার খাবার পর্যন্ত খেয়ে ফেলত। ফুল্লরা উপোসী থাকত।"

চোয়াড় ব্যাধের বর্ণনায় লেখক নিজের ভাষায় কবিকে যথাযথ অনুসরণ করিয়াছেন, কিন্তু কোথাও তাঁহাকে ছাড়াইয়া যাইবার চেষ্টা করেন নাই। মূল

গ্রন্থ হইতে স্থানে স্থানে কাব্যাংশ উদ্ধৃত করায় গল্পগুলি আরও জমিয়াছে। ইহাতে পুস্তকের উদ্দেশ্যও অনেকটা সিদ্ধ হইয়াছে।

প্রাচীন যুগের সাহিত্যের জন্য সবশুদ্ধ ৭২ পৃষ্ঠা দেওয়া হইয়াছে। ইহার মধ্যে ৪৭ পৃষ্ঠায় শুধু মঙ্গলকাব্য এবং নাথসাহিত্যের আলোচনা। বাকি ২৫ পৃষ্ঠায় 'লোক সাহিত্য' 'গীতিকাব্য' 'চরিতকাব্য' 'নাটক ও যাত্রাভিনয়' এবং 'বাস্ত'—এই প্রসঙ্গগুলির আলোচনা সম্পূর্ণ করিতে হইয়াছে। তাহার ফলে শেষোক্ত বিষয়গুলি, বিশেষতঃ 'অনুবাদ সাহিত্যে', 'চরিতকাব্য' এবং 'গদ্য' প্রসঙ্গ অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত আকার ধারণ করিয়াছে। 'চরিতকাব্য' অধ্যায়টি অর্ধ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। কয়েকটি গ্রন্থের নাম ভিন্ন এ অধ্যায়ে আর কোনো কথাই বলা হয় নাই। অথচ বলিবার কথা এখানে অনেক আছে—এমন কি এই ক্ষুদ্রায়তন পুস্তকের পক্ষেও আছে। যেমন মনসামঙ্গল বিভিন্ন কবির রচিত হইলেও তাহার আখ্যান ভাগে একটা ঐক্য আছে এবং লেখক মনসামঙ্গলের বিভিন্ন রচয়িতার নাম উল্লেখ করিয়া মূল গল্পটি বলিয়া গিয়াছেন, তেমনি শ্রীচৈতন্যের জীবনাবলম্বনে যে সকল গ্রন্থ রচিত হইয়াছে সেগুলির মধ্য হইতে মহাপ্রভুর জীবনেতিহাসটিও যদি তিনি সংক্ষেপে সংকলিত করিয়া দিতেন তাহা হইলে পুস্তকটির মর্যাদা বাড়িত। তাহা হইলে বৃন্দাবন দাস, কবিরাজ কৃষ্ণদাস, জয়ানন্দ প্রমুখ বিশিষ্ট জীবনীকারগণের গ্রন্থ হইতে দুই চারি পংক্তি উদ্ধৃত করিয়া দিবারও অবসর থাকিত এবং তাহাতে তরুণ পাঠকগণের পক্ষে বৈষ্ণব কবিগণের রচনার কিছুটা স্বাদ লাভ করিবার সুযোগ মিলিত।

'অনুবাদ সাহিত্য' বিভাগটিও অতিশয় ক্ষুদ্র হইয়াছে। এই অধ্যায়টি মাত্র ১২টি ছত্রে সম্পূর্ণ। কয়েকটি বই এবং কাশীরাম ও কৃত্তিবাস এই দুইজন কবির নাম ভিন্ন আর কোনো তথ্য এই প্রসঙ্গে নাই। লেখক যদি নিজের বাল্যকাল স্মরণ করিয়া এই ধারণা করিয়া থাকেন যে এ যুগের ছেলেরা এমন কি তাহাদের জনকজননীরাও কাশীরাম ও কৃত্তিবাসের গ্রন্থের সহিত বিশেষ পরিচিত তাহা হইলে সে ধারণা তাঁহাকে বর্জন করিতে হইবে।

'লোকসাহিত্য' বিভাগটিতে ছয়টি উপবিভাগ আছে: ১. খেলার ছড়া, ২. ছেলে ভুলানো ছড়া, ৩. বিবিধ, ৪. ডাক ও খনার বচন, ৫. প্রবাদবচন,

৬. ব্রতকথা। উপবিভাগগুলি দীর্ঘ না হইলেও তথ্যবহুল। উদাহরণস্বরূপ ব্রতকথার প্রসঙ্গ ধরা যাক। 'ব্রতকথা' অধ্যায়ে লেখক কয়েকটি ছত্রের মধ্যেই ব্রত কেন করা হয়, অধিকাংশ ব্রত শুধু মেয়েদের মধ্যেই প্রচলিত কেন, দেশের ইতিহাসের সহিত এই সকল ব্রত অনুষ্ঠানের সম্বন্ধ কি—এই তত্ত্বগুলি এমন স্বাচ্ছন্দ্যের সহিত বর্ণনা করিয়াছেন যে, জানিবার বিষয় সব জানা গেলেও লেখা পড়িয়া পণ্ডিতের রচনা বলিয়া সন্দেহই হয় না। 'ব্রতকথা' হইতে কয়েক ছত্র উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি।

"পুরুষদের চেয়ে মেয়েদের ভবিষ্যৎ ভাগ্য অনিশ্চিত। বড়ো হয়ে তাদের পরের ঘরে যেতেই হয়। কেউ বা মনোমত ভালো ঘরে পড়ে সারা জীবন সুখে কাটায়, কেউ বা মন্দ ঘরে পড়ে সারাজীবন দুঃখ পায়। তার ওপর সেকালে অনেককে সতিন নিয়ে ঘর করতে হত। অদৃষ্ট মন্দ হলেই দুঃখ হয়। এই দুঃখভোগ যাতে না করতে হয়, সেই রকম কামনা ক'রে মন্দ অদৃষ্টকে ভালো করবার জন্যেই বোধ হয় মেয়েদের মধ্যে এত রকম ব্রত করার রীতি। এই ব্রতগুলির ছড়া (বা বাংলা মন্ত্র) আছে। সেগুলিতে তখনকার কালের মনোভাব বেশ বোঝা যায়।"

'লোকসাহিত্য'-এর সব কয়টি উপবিভাগেই যেমন জ্ঞাতব্য তথ্য বিস্তর আছে, তেমনি দৃষ্টান্তও কম নাই। এই বিভাগটি আমাদের সব চেয়ে ভালো লাগিল, ছেলে মেয়েদেরও লাগিবে।

অতঃপর আধুনিক যুগ। ৩৪ পৃষ্ঠার মধ্যে আধুনিক যুগের আলোচনা সম্পূর্ণ করিতে গিয়া লেখক কয়েকটি খণ্ডিত তথ্য ভিন্ন আর কিছু দিবার অবকাশ পান নাই। ভিন্ন ভিন্ন অধ্যায়ে বিশিষ্ট লেখকগণের সংক্ষিপ্ত নাম তালিকা দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু সে স্থলেও সম্ভবত লেখকের অনবধানক্রমেই কয়েকটি উল্লেখযোগ্য নাম বাদ পড়িয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপে বলি, দক্ষিণারঞ্জন মিত্রমজুমদার মহাশয়ের নাম 'শিশু সাহিত্য' প্রসঙ্গে উল্লিখিত হয় নাই। তাঁহার নাম যে 'ইত্যাদি'র মধ্যে পড়ে না লেখক একথা অবশ্যই স্বীকার করিবেন। আধুনিক যুগের প্রসঙ্গে আর একটি অভাব নজরে পড়ে। এ যুগের বিখ্যাত সাহিত্যিকদের নাম আছে কিন্তু সাহিত্যের নাম এমন নির্মম-ভাবে বর্জন করিলেন কেন? গীতাঞ্জলি ভিন্ন রবীন্দ্রনাথের কোনো বইয়ের

নাম নাই। শরৎচন্দ্র এবং বঙ্কিমচন্দ্রেরও কোনো পুস্তকের নাম উল্লিখিত হয় নাই।

সাহিত্যিকের পরিচয় প্রসঙ্গে জাতি ধর্মের উল্লেখ শুধু অবান্তর নয়, ক্ষেত্র-বিশেষে বর্জনীয় বলিয়া মনে করি। যাঁহার প্রতিভা আছে তিনি স্বীয় শক্তি-বলেই সমাদর লাভ করিবেন। সুতরাং সাহিত্যিকের কথা বলিতে গিয়া হিন্দু মুসলমানের মধ্যে পংক্তিভেদ করার প্রয়োজন দেখি না। বঙ্গীয় কবির তালিকায়, জসীম উদ্দীনের নাম দেওয়া হউক, আপত্তি করিব না ; কিন্তু তাঁহার বা তাঁহার স্বজাতির অন্য লেখকদের জন্য স্বতন্ত্র তালিকা রচিত হইলে শুধু সাহিত্যের নয়, সাহিত্যিকের প্রতিও সুবিচার করা হয় না।

পুস্তকটির পরিসরের অনুপাতে প্রসঙ্গের বাহুল্য অনেক বেশি হইয়াছে। সাহিত্যের আসল কথা আরম্ভ করিবার পূর্বে লেখক ভাষা এবং সাহিত্যের তত্ত্ব সম্বন্ধে সুদীর্ঘ আলোচনা করিয়াছেন। তরুণ পাঠক পাঠিকারা অবশ্য এই তত্ত্বালোচনা অপেক্ষা মূল সাহিত্য কথায় আনন্দ পাইবে অধিক। এমন কি তত্ত্বকথার তেইশটি পৃষ্ঠা সাহিত্যকথায় নিয়োজিত করিলে খণ্ডিত এবং অতি সংক্ষিপ্ত অধ্যায়গুলি সম্পূর্ণতর হইতে পারিত। তবু এই তত্ত্বালোচনার প্রয়োজন আছে একথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। শুধু তরুণ নয় প্রবীণ পাঠকও এই অংশে শিক্ষণীয় সামগ্রী অনেক পাইবেন।

গ্রন্থকার নিজেই লিখিয়াছেন :—

"বয়স্থ লোকের মনের খোরাক জোগানোর লোকের অভাব নেই। কিন্তু ছোটো ছোটো ছেলেদের মনের খোরাক জোগানোর লোক কম। কাজটাও সোজা নয়।"

গ্রন্থকার সেই কঠিন কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করিয়াছেন। তাঁহার ভাষা সচল অথচ বলিষ্ঠ। যে সব তরুণ শিক্ষার্থী চলিত ভাষার অনুরাগী, গোঁসাইজীর রচনাভঙ্গীকে তাহারা আদর্শস্বরূপে গ্রহণ করিতে পারিবে।

শ্রীবিজনবিহারী ভট্টাচার্য্য

আধুনিক কবিতা

ত্রিশঙ্কু।—কৃষ্ণদাস গুপ্ত। (একা প্রেস্, ২১০, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য—২৷৷৹)

আলোচ্য বইটী একটু নতুন ধরণের। এটা বাস্তবতঃ একটি কবিতার বই। কিন্তু সেটা এর আসল কথা নয়। আসল কথা হচ্ছে এটা একটা গল্প যার উদ্দেশ্য হচ্ছে মনস্তত্ত্বের বিশ্লেষণ। গল্পের মর্ম হল এই: কাঁচা ফল অনেক কষ্টে পাকল, পেকে শুকিয়ে গেল বা যাচ্ছে।

নায়ক এক কিশোর, যিনি পরে যুবক হলেন, এই যৌবন পাওয়া ও পেয়ে তাঁর কি অবস্থা হল, এটাই হল গল্প। কিশোর আরম্ভ করল তার দুঃখ জানিয়ে (কৈশোর)। দুঃখটা কিশোর-সুলভ অত্যন্ত অস্পষ্ট, যেটা কিশোর নিজেই বুঝতে পারছে না, সে চায় এই না-বোঝার জন্য সমবেদনা। দুঃখটা কিসের? কিশোর নিজেকে দেখতে লাগল। প্রথমে বলে উঠল, চারদিকে বাধা, গোলযোগ, নিজের মধ্যে ও অন্য সবাইয়ের মধ্যে (বাধা)। কিসের বিষয়ে বাধা? ফোটার বিষয়ে (বেদনা)। ফোটা টা কি? কিশোর জানে না সেটা কি, সে শুধু জানে ফুটতে হবে, সে চায় সাহায্য, পায় গালাগাল, সঙ্গীহীন সমবেদনাহীন অবস্থা (যেন চোর)। পুরানো রীতি বা morality ভেঙ্গে যাচ্ছে, নতুন রীতি বা morality গড়ে উঠতে পারছে না, এটাই হল কিশোরের নিঃসঙ্গতার মূল কারন। সে যাই হোক, কিশোরকে কেউ বুঝল না। সে সাংসারিক উন্নতি ছাড়া আর কিছু চায় কেন? কেঁদে উঠল (কোথায় সাগর মোর),—মৃত্যুর ইচ্ছা জেগে উঠল। পরক্ষণেই দুঃস্বপ্ন এল, symbolic dream of awakening, কিন্তু mightmare-এর রূপে (দুঃস্বপ্ন)। তার অনিদ্রা অকারণ, ক্লান্তিবশতঃ ও মাথার গোলমালের জন্য auto eroticism-এর সাহায্যে ভোরে ঘুম এল (প্রত্যুষে)। হঠাৎ দেখে সাগর ক্ষেপে উঠেছে, কিশোর জাগতে চায়, দেখল মরে আছে, (সাগরের অশান্তি)। 'কোথায় সাগর মোরে'র শেষ কথা মৃত্যুর ইচ্ছা, 'সাগরের অশান্তি'র শেষ কথা অভিযোগ। কিশোর এতাবৎকাল 'একোঽহং' ছিল, হঠাৎ দ্বিতীয়ের দরকার বুঝল, কিন্তু তার মানসী সে নিজেই এখনও, অতএব তাকে পায় না (মানসী)। সমবেদনা চাইতে লাগল নারীর কাছে,

যে সমবেদনা আধুনিক যুগে কিশোরের কাছে ভুলেই (through accident) আসতে পারে (আবাহন)। কিশোর ডাকতে লাগলে, সে ডাকার রূপ হল যাকে 'নিবর্ত্তন' নামক শেষ কবিতায় 'মম' বা Oedipus অবস্থা বলা হয়েছে (আমন্ত্রণ)। ডাকার আবেগ আরও গভীর হল (অনুরাগ)। কিশোর হঠাৎ বুদ্ধি দিয়ে নিজের দোষ দেখল (মোহ)। নিজের দোষের জন্য ও কিশোরীর দোষের জন্য কিশোর কিশোরীকে পেয়েও পায় না (নৈরাশ্য)। কিশোর জ্বলতে লাগল (অনল)। বুদ্ধি দিয়ে ভাবতে লাগল, সবাই কি এই অবস্থাপ্রাপ্ত (বেসুরা) ? দেখল তরণীর গোলমাল নেই, কারণ সে আপনাকে যথার্থ ভালোবাসে, আপনাকে কখনও ভোলে না (তরণী)।

এই বোঝার পর কিশোরের জীবনে এক নতুন অধ্যায় আরম্ভ হল। কিশোরী এল (নিমন্ত্রণ)। তারপর ধীরে ধীরে 'অহম্' অবস্থা ছেড়ে (প্রথম আলো) প্রণয়াবস্থা (প্রেম) পেল। প্রেম জিনিষটা একটা অস্পষ্ট ভাব, আধেক অ-জানা, আধেক অ-শোনা। আসল পাওয়াটা পরের অবস্থা (পাওয়া), যখন হাসি-কান্না নিয়ে চাওয়া যায়। তারপর এল প্রিয়াপ্রাপ্তি (প্রিয়া), যখন নতুন অনেক জিনিস খুলল। শেষে সবটা বুদ্ধি দিয়ে বিচার করা হল (ভুল ভাষা)।

কিশোর এখন যুবক হল। আগে প্রাণই ছিল চেতনায় মুখ্যভাবে, এখন শরীর আসতে লাগল ধীরে ধীরে (আবেগ)। নিবিড় দেহ-সংযোগ হল (সংঘাত), আগে (পরশ) প্রাণের সংযোগই ছিল প্রধান।

এর পরই যুবকের মনে নতুন করে গোলমাল আরম্ভ হল, কারণ নরনারীর অসম দৃষ্টি ও intellect-বৈষম্য। আধুনিক জীবনে (বিচ্ছেদ)। দুঃখটা হল এই যে, যুবক চায় যুবতী তার সমকক্ষ হয় বুদ্ধিতে। দুঃখের পরিণাম, হল পলায়ন (বিদায়)। যুবক পালিয়ে গেল প্রকৃতিতে। নতুন জীবন খুঁজল (শ্রাবণে)। নারী-স্মৃতি পলায়নে জড়িয়ে রইল (ফাল্গুনী পূর্ণিমায়)। হঠাৎ যুবক প্রকৃতিকে প্রকৃতি বলে উপভোগ করল (বৈশাখের ভোরে)। এই উপভোগের প্রধান লক্ষণ হচ্ছে, শেষ কবিতায় যাকে 'অদ্বিতীয়ম্', 'অহম্', ও 'মম' অবস্থা বলা হয়েছে সেগুলো থাকবে অত্যন্ত প্রচ্ছন্নভাবে। তার পরেই যুবক শুনল চাঁদের কথা (চন্দ্রবাণী), শুনল আধুনিক জীবনে সমাজপ্রীতির

প্রতিদান না থাকলেও প্রীতি ছাড়া উপায় নেই জীবনে। মেঘ শোনাল বিশ্ব প্রেম চাই, কিন্তু তার উপায় হচ্ছে আধুনিক জীবনে বিপ্লব, সকল বাধার দূরীকরণ (মেঘের ভাষা)। শেষে মরে যেতে হবে, যেই দেবার আর কিছু থাকবে না। আবার দুঃখ (শ্রাবণের চাঁদ)। কিন্তু এবার যুবকের দুঃখ, সচেতন দুঃখ, যুবক দেখল তার প্রাণে শুধু মেঘ, একটুও মুক্তি নেই। রজনী উৎসাহ দিল (রজনীর প্রতি)। প্রকৃতি নারীকে স্মৃতিতে আনল, মন বা বুদ্ধির পিছন দুয়ারে দিয়ে (ভোরের হাওয়ায়)। যুবক নারীবর্জ্জিত অবস্থা বুঝল (বিরহ), আর ভুল করবে না, ঠিক করল। দেহের, প্রাণের ও মনের সংযোগ হল, সমবেদনা হল, compromise হল, যদিও নারী সমকক্ষ নয়। ফলে স্নেহ, প্রীতি এল (ভালোবাসা), দেহের ও প্রাণের তীব্র ক্ষুধা চলে গেল, balance এল (পরিচয়)। যুবক জাগল, বিশ্বকে তার দরকার বুঝল অভিযোগের সুরে (জাগরণ)। জেগে দেখল সে হতভাগ্য, কারণও বুঝল (ত্রিশঙ্কু)। নিজের শ্রেণীকে গালাগাল দিল, সবাইকে বদলাতে বলল, নিজেকে বদলাতে বলল (মধ্যবিত্ত রমণী ও পুরুষ)। শেষে জন্ম থেকে নিজের বিবর্তন দেখল। যৌবনের গোড়ার অবস্থা 'বহুস্যাম্', সেখানে গোলমাল, যৌবনের পরিণত অবস্থা 'প্রজায়েয়', সেখানেও গোলমাল।

এই গল্পটী অনেকগুলি কবিতার আকারে বার করা হয়েছে। লেখক ভূমিকায় জানিয়েছেন, কবিতাগুলো তিনি লিখে গেছেন অনেকটা খেয়ালবশতঃ, শেষে বোধ হয় বুঝতে পারেন যে সেগুলো সাজালে একটা গল্পের আকার ধারণ করে। প্রত্যেক কবিতা সেজন্য এক একটি প্রবন্ধ ও প্রবন্ধগুলো পর পর পড়তে হবে, মানে বুঝতে হলে।

শ্রীদিলীপ সেনগুপ্ত

বাংলা কথাসাহিত্যে নূতন ধারা

সংকেত ও অন্যান্য গল্প—সোমেন চন্দ। প্রতিরোধ পাব্‌লিশার্স ঢাকা। দাম দেড় টাকা।

সোমেন চন্দের এই বইখানা বার হওয়া নিতান্ত দরকার ছিল। যাঁরা তার অপরিণত বয়সে শোচনীয় প্রাণনাশের কথা জানেন তাঁরা তার সাহিত্যিক

পরিচয় পেয়ে খুসী হবেন। আর যাঁরা প্রগতি সাহিত্যে বিশ্বাসী এবং ফ্যাসিষ্ট-বিরোধী সম্প্রদায়ের লেখক, তাঁরা দুঃখিত হবেন এমন অকালে বাঙলার লেখক-গোষ্ঠী একজন নতুন কর্ম্মিষ্ঠ, দৃষ্টিবান্ এবং পরিণতি-কামী সাহিত্যিক হারালো।

'সংকেত' কয়েকটি গল্পের সঙ্কলন, যে গল্পগুলি বন্ধুরা বাছাই করে একত্র প্রকাশ করেছেন। সোমেন চন্দের আরো কিছু লেখা আছে যা প্রকাশ করার যোগ্য। আশা করি পরের বইয়ে 'ক্রান্তি'তে 'বনস্পতি' নামে যে গল্পটি বেরিয়েছিল সেটি নির্ব্বাচিত হবে। সোমেনের বইখানি পড়ে বার.বার এই কথা মনে হয়েছে যে তার লেখার পিছনে ছিল সদাজাগ্রত মন এবং বলিষ্ঠ ও ঋজু দৃষ্টিভঙ্গী। কথাগুলি মামুলি অর্থে ব্যবহার করছি না। কারণ সোমেন আর পাঁচ জন তরুণ সাহিত্যিকের মত স্বপ্ন দেখেছে সত্যি কিন্তু সে স্বপ্নকামনা অতৃপ্ত আত্মরতি নয়, যৌবনসুলভ বিষাদ-বুভুক্ষাও নয়। সে চেয়েছিল সাহিত্যে গণশক্তির স্ফুরণ সঞ্চারিত করতে।

প্রোলিটেরিয়ান্ সাহিত্যরচনায় অবশ্য তার পূর্ব্বেও কেউ কেউ হাত দিয়েছেন। কিন্তু কোনো কোনো ক্ষেত্রে সে সব লেখায় দৃষ্টিভঙ্গীর চেয়ে প্রকাশের কারুকার্য্যটাই প্রাধান্য পেয়েছে। ফলে সমবেদনা থাকলেও এবং স্থানীয় পরিবেশ চমৎকার ফুটলেও, পটভূমির প্রসারে সমষ্টির মূলসূত্রটি হারিয়েছে। কোনো জায়গায় বা চরিত্র জীবন্ত হয়েছে, কোথাও বা সাহিত্যিক বেশি নজর দিয়েছেন তুলির আঁচড়ে, রঙের সমন্বয়ে। সবগুলোরই মূল্য আছে কিন্তু কেবলমাত্র নির্য্যাতিতের বেদনা ও ব্যর্থতাবোধে যে সাহিত্যের জন্ম, তার রস সাহিত্য-ভিয়ানের অতিরিক্ত মিষ্টতায় সংক্রামিত হবার আশঙ্কা রাখে।

এই বইখানিতে সোমেন চন্দের শিল্প-প্রতিভার পরিচয় খুব বেশী না থাকলেও একটা জিনিষ পরিষ্কার বোঝা যায়—তার সমাজ-চৈতন্য এবং ঐতিহাসিক মূল্যবোধ তাকে কোন্ পথে চালিত করেছিল। এবং যে পথে সে অগ্রসর হচ্ছিল, সেটা তার স্বনির্ব্বাচিত—সাম্যবাদের আদর্শ-প্রতিষ্ঠার পথ। সে পথের সাহিত্যিক বিপত্তি সে জান্ত; গল্পগুলির অসম্পূর্ণ উজ্জ্বলতাই তার প্রমাণ। আমার মনে হয় এই অল্প পালিশের কাজটুকু খুলতো কিছু সময় থাকলে।

গল্পগুলির মধ্যে তার মনন-শক্তির ও রচনাভঙ্গীর একটা যেন ক্রমিক ইতিহাস পাচ্ছি। 'রাত্রিশেষ' ও 'স্বপ্ন' সুন্দর লেখা কিন্তু এখানে গতানুগতিকতার আভাস রয়েছে। এদের মধ্যে যে লঘু কোমলতার স্পর্শ রয়েছে সেটা মাটির সঙ্গে আলগা সংযোগের ফল। যোগসূত্র গভীর হলে, লেখা আরো দৃঢ় কঠিন হ'ত। 'একটি রাত' গল্পে সোমেন তার বক্তব্য খুঁজে পেয়েছে, পেয়েছে বিপ্লবী মনের দ্বন্দ্ব ও চিন্তা-সূত্র। আর একটি জিনিষ লক্ষ্য করবার—সেটা হল গল্পের শেষ মোচড়। বাস্তবতার চিত্র সংক্ষিপ্ত ও নিখুঁত হয়েছে। 'সংকেত' গল্পটিতে এসেছে তোর নিজস্ব অভিসঙ্কেত, পুঁজিবাদে অনাস্থা, শোষণনীতির বিরুদ্ধে মাত্র তীব্র প্রতিবাদ নয়, সংঘবদ্ধ প্রয়াসের কামনা। গল্পের শেষটা কিন্তু ছায়াচ্ছন্ন, তাই ইঙ্গিত জোরালো হয়েও আবার ম্লান। 'দাঙ্গা'য় পেলাম বিরোধী শক্তির প্রতিক্রিয়া, সাম্প্রদায়িকতার সস্তা মোহ, অজ্ঞতার ভয়াবহ চোরাবালি যার ওপরে শ্রেণিভেদহীন গণশক্তির ইমারৎ খাড়া করা প্রায় দুঃসাধ্য ব্যাপার। এই গল্পটিতে সোমেনের সন্ধানী দৃষ্টির পরিচয় পাই। 'ইঁদুর' অবশ্য তার সার্থকতম রচনা। শেষ গল্পে সে প্রমাণ করেছে যে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর স্বার্থবোপিত বনস্পতির কোটরে ও ফাটলে যে সব অস্বস্তিকর ইঁদুরের উৎপাত, তার গভীর কারণ রয়েছে মাটির নীচে, মূল শিকড়ে—সযত্নে চাপা-দেওয়া। সোমেন চন্দের এই লেখাটি থেকে অনেক আশাপ্রদ কথা মনে হয়েছিল। কারণ এই সঙ্গে সে এমন জায়গায় এসে পৌঁছেছিল যেখানে বক্তব্য শিল্পে রূপান্তরিত হয়ে যায়। ইতিহাসের ব্যাখ্যায়, বিশ্লেষণ-বৃত্তির সাহায্যে, বিদ্রূপের উত্তাপে ও আন্তরিকতায় সে নিজের রচনাকে সমৃদ্ধ করতে পেরেছিল। এবং তার চেয়ে বড় কথা—আমাদের দিনানুদৈনিক কুশ্রীতা, দৈন্যবোধকে জয় করে সে সুশ্রী ও সবল ভবিষ্যতের অনিবার্য্য ইঙ্গিত পেয়েছিল।

বই শেষ করলে বোঝা যায় যে সোমেন চন্দ শুধু এখানেই থামত না। এই মন নিয়ে সে আরো ভাব্‌ত, শিখ্‌ত, এবং মেশাতে পারত প্রকাশের তাগিদকে কর্ম্মের প্রেরণায়। তার ভাষার সজীবতা, ভাবের সংযম ও উপমার নতুনত্ব আপনিই দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং মনে হয় নতুন যুগের গণসাহিত্য রচনায় সে একটি মৌলিক অধ্যায় যোগ করতে পারত।

তার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ও সৃষ্টির নমুনা 'ইঁদুর' গল্পটি তর্জ্জমা করা উচিত অথবা 'সংকেত'। এদের চেয়ে নীচু দরের গল্প 'নিউ রাইটিং'-এও স্থান পেয়েছে।

বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

কালো হাওয়া—বুদ্ধদেব বসু ডি. এম. লাইব্রেরী, ৪২ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রিট, কলিকাতা। ৩৮৩ পৃষ্ঠা, মূল্য তিন টাকা।

শ্রীবুদ্ধদেব বসু মহাশয়ের পাঠকমাত্রেরই জানা আছে যে তিনি গল্প ও উপন্যাস-বর্ণিত চরিত্রগুলির মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণে বিশেষ মনোযোগী। গল্প ও উপন্যাসের প্রতিটি ঘটনাও তিনি বিভিন্ন চরিত্রের ব্যক্তিগত দিক হইতে বিশ্লেষণ করিয়া থাকেন। আলোচ্য উপন্যাসখানি এইদিক হইতে গ্রন্থকারের অপর কোনও উপন্যাস হইতে স্বতন্ত্র না হইলেও তাঁহার পূর্ব্বাচরিত টেকনিক এই গ্রন্থে অনেক পূর্ণতা লাভ করিয়াছে। দৈনন্দিন পারিবারিক জীবনে কোন ঘটনা অথবা কথোপকথন নাটকের মত নিরবিচ্ছিন্ন গতিতে চলে না। মাঝে মাঝেই উহাতে ছেদ পড়ে। কথাবার্ত্তায় অথবা ঘটনার অন্তর্বর্ত্তী বিরতির সময়ে মানুষের মন একেবারে নিশ্চল থাকে না। কখনও সুসম্বদ্ধ কখনও বা টুকরা টুকরা চিন্তা মনে যাওয়া আসা করে। এই চিন্তারাশি ব্যক্তির মানসিক রূপের পরিচায়ক। অবচেতন মনের যে সকল চিন্তা চেতন স্তরে অস্পষ্ট ভাবে দেখা দিয়াই আবার মিলাইয়া যায়, তাহা অনুসরণ করা কতদূর সম্ভব সে কথা বিশেষজ্ঞরাই বলিতে পারেন ; এবং এই অনুসরণের ফল সাহিত্যের উপজীব্য হইবে কি না, তাহা এখন বিদেশের সাহিত্যকেরা পরীক্ষা করিতেছেন। কিন্তু যে চিন্তা স্পষ্ট তাহা ঔপন্যাসিকের কাজে আসে। বুদ্ধদেব বাবুর উপন্যাসে ইহার ব্যাপক প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। এই উপন্যাসখানিতে কোনও ঘটনা অথবা কথার ব্যক্তিগত প্রতিক্রিয়া এই উপায়ে দেখান হইয়াছে, উপরন্তু কাহিনীটির অতীত অংশও এই কৌশলে বর্ণিত হইয়াছে।

টেকনিকের আরও একটি নূতনত্ব উল্লেখযোগ্য। একটি ঘটনার বহু শাখা-বাহী উপাদানগুলির একত্র সমাবেশেই ঘটনাটি সৃষ্ট হয়। কোনও ঘটনার এই বিভিন্ন অংশের fusion সাধন করা নিতান্ত সহজসাধ্য নহে। নাটকে এবং

উপন্যাসে ঘটনাগুলি সাধারণত স্বতন্ত্রই থাকিয়া যায়। সিনেমাতে এই fusion সাফল্যের সহিত দেখান সম্ভব। আলোচ্য উপন্যাসখানিতে এই fusion দেখাইবার চেষ্টা কতকাংশে সফল হইয়াছে।

আধুনিক বাংলা সাহিত্যের গোড়াপত্তনের কাল হইতে চলিতভাষা এবং সাধুভাষার দ্বন্দ্ব চলিয়া আসিতেছে; আজিও তাহা মিটিয়া যায় নাই। সাধু-ভাষার সমর্থকেরা যাহাই বলুন না কেন, তাঁহাদের সকল যুক্তি ও রুচি উপেক্ষা করিয়া চলিত ভাষা জয়ী হইবেই যদি সে ভাষা কথিত ভাষার রূপ পরিগ্রহ করে। বুদ্ধদেব বাবু চলিত ভাষাতেই লিখিয়া থাকেন, তাঁহার ভাষা উত্তরোত্তর কথিত ভাষার rhythm অবলম্বন করিতেছে। বুদ্ধদেব বাবুর ভাষার ইংরাজী গঠনরীতি অনেকে অপছন্দ করেন। এক সময়ে হয়ত এই বাক্যগঠনরীতি কানে পীড়া দিত। কিন্তু নিরপেক্ষ পাঠকেরা তাঁহার আধুনিক রচনা দেখিয়া নিশ্চয়ই স্বীকার করিবেন যে বুদ্ধদেব বাবুর বাক্যগঠনরীতির বৈদেশিক প্রভাব এখন তাঁহার ভাষার সহিত সম্পূর্ণ মিশিয়া গিয়াছে, উহাকে আর বিদেশী বলিয়া চিনিবার উপায় নাই। বাংলা ভাষায় ইংরাজী বাক্যগঠনরীতি প্রয়োগ-পরীক্ষা করিয়া বুদ্ধদেব বাবু ভাষার পুষ্টিসাধনই করিয়াছেন।

কিন্তু উপন্যাসখানিতে বহু ত্রুটি আছে। প্রথমত, গল্পাংশ নিতান্ত অকিঞ্চিৎ-কর। স্বচ্ছল মধ্যবিত্তের ধর্ম্মমূঢ়তা এবং তজ্জনিত ট্র্যাজেডি আধুনিক কালে কাহারও মন স্পর্শ করে না। পাগল গলায় দড়ি দিয়া মরিলে তাহাকে ট্র্যাজেডি বলিবে কে? দ্বিতীয়ত, কাহিনীর পরিণতিও অবশ্যম্ভাবী বলিয়া মনে হয় না। প্রথম দৃশ্যের বুলি মো-টুও হইতে রিচর্ডসনি চিঠির লিপিকার বুলিতে মাত্র একমাস সময়ে রূপান্তরিত হইয়াছে, ইহা বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না। এক সময়ে মিনি নিজেকে মিসেস নিরঞ্জন বোস বলিয়া কল্পনা করিয়াছিল; নিরঞ্জন সম্বন্ধে একটি কুৎসাই তাহার সকল কল্পনা ধূলিসাৎ করিয়াছে। হৈমন্তীর ধর্ম্মমূঢ়তার ছোঁয়াচ এই ব্যাপারে সহায়ক হইয়াছে ইহা ধরিয়া লইলেও মনে হয় পরিত্যাগ ব্যাপারটি অনিবার্য্য নহে। সর্ব্বোপরি নিরঞ্জনের কলিকাতায় আসা এবং অরিন্দমের মৃত্যুকেও অবশ্যম্ভাবী বলা যায় না।

উপন্যাসখানিতে একটি চরিত্রও নাই যাহা মনে গভীর রেখাপাত করে। বুলিকে ভাল লাগে; কিন্তু পাছে পাঠকের মনে হয় তাহার কথাবার্ত্তার ধরণ

বয়সাতিরিক্ত সেই জন্য একাধিকবার বুলির মুখ দিয়াই স্মরণ করাইয়া দেওয়া হইয়াছে যে তাহার বয়স সত্তেরো। চারিত্রিক ত্রুটি বিচ্যুতি থাকা সত্ত্বেও অরিন্দমকে fine animal বলা যাইতে পারে। কিন্তু অরিন্দম হৈমন্তীর গুলির আঘাতে মারা গেল।

অরিন্দমের মৃত্যুর অব্যবহতি পরে হৈমন্তীর মানসিক অবস্থার বিশ্লেষণ কুশলী হস্তের পরিচায়ক। বুলি নিরঞ্জনের সহিত ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠিবার কালে মিনির মনের ক্ষোভ ও ঈর্ষ্যার সামান্য দু একটি কথায় সার্থক পরিচয় পাই। কিন্তু বিশ্লেষণ ব্যাপারেও সংযমের প্রয়োজন আছে। হৈমন্তীর সাত্বিক আহারের বর্ণনা তাহার কৃচ্ছ্র সাধনকে বিদ্রূপ করিবার অস্ত্র হিসাবেও প্রয়োজনাতীত দীর্ঘ। তেমনি খাবার টেবিলে অরিন্দমের animal vitalityর পরিচয় মিলিলেও তাহা প্রীতিপ্রদ নহে।

উপন্যাসখানি বিশদ আলোচনা করিবার প্রয়োজন নাই। কিছুকাল পূর্ব্বে এই কাহিনী অবলম্বনে কোনও উপন্যাস রচিত হইলে তাহাকে ভাল বলা যাইত। আধুনিক পাঠক প্রশ্ন করিবে বইখানির সার্থকতা কি? সত্যই কোনও সার্থকতা উপন্যাসখানিতে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। কোনও বৃহত্তর সামাজিক চেতনার আভাস ইহাতে নাই, সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত মূল্য নিরূপণের চেষ্টাও নাই। স্বচ্ছল মধ্যবিত্ত সমাজের পারিবারিক জীবনে বিশৃঙ্খলা ও ভাঙ্গনের চিত্র হিসাবেও উপন্যাসখানির সার্থকতা নাই।

বুদ্ধদেব বাবু ক্ষমতাবান লেখক। এই সুদীর্ঘ উপন্যাসখানি যে আদ্যো-পান্ত পাঠ করা চলে ইহাই তাঁহার ক্ষমতার পরিচায়ক। তাঁহার ক্ষমতা বহু-মুখী, কিন্তু তাঁহার প্রতিভার বিকাশ সাহিত্যের দুইটি ক্ষেত্রে মাত্র দেখা দিয়াছে। গল্প ও উপন্যাস রচনায় বোধ হয় তাঁহার প্রতিভার সম্যক বিকাশ সম্ভব নহে। অথচ পাঠক সমাজে গল্পলেখক ও ঔপন্যাসিক হিসাবে তাঁহার পরিচয় আছে। এই পরিচয় তাঁহার পক্ষে গৌরবের নহে। আধুনিক কালে তাঁহার সমালোচনা ও কবিতা নিঃসংশয়ে তাঁহার প্রতিভার সাক্ষ্য দিবে। তাঁহার গল্প ও উপন্যাস এই প্রতিভার খ্যাতি বৃদ্ধি না করিয়া বরং বহুলাংশে ম্লান করিয়া দেয়।

শ্রীকরালীকান্ত বিশ্বাস।

বৃত্ত—সঞ্জয় ভট্টাচার্য্য। পূর্ব্বাশা প্রেস, কলিকাতা।

'বৃত্ত' হচ্ছে সঞ্জয় ভট্টাচার্য্যের প্রথম উপন্যাস। একজন বাঙালী অধ্যাপকের জীবনকে কেন্দ্র করে গল্পটি গ'ড়ে উঠেছে। বাংলার হাওয়া এখন কোন্ দিকে বইছে, সত্যবানের মানস-বিশ্লেষণ থেকে তা বেশ টের পাওয়া যায়। কোনো অসাধারণ চরিত্র বা ঘটনার অবতারণা না ক'রে একজন সাধারণ মননশীল যুবককে নিয়ে উপন্যাস লেখা সহজ নয়। সত্যবানের পরিচয় লেখকের কথাতেই দিচ্ছি: "সত্যের চেহারা নিশ্চল নয়, এখন তা ভালো করেই সত্যবান বুঝতে পারে। মনের অক্ষবৃত্ত সত্যবানের যেন পরিবর্ত্তন হ'য়ে যাচ্ছে। ইলেক্ট্রন যেন ক্রমেই স্থিরতর চক্রপথ আশ্রয় করে আলো বিকীরণ করছে। তবু ইলেক্ট্রনের মতো হঠাৎ আবেগের স্রোতে এ পরিবর্ত্তন আসে না সত্যবানের। এক মাস, দু' মাস, এক বছর, পাঁচ বছর এমন কি দশ বছর চ'লে যায় তার এক একটা নূতন চক্রপথ ধরে নিতে। তাহ'লেও আলো সে বিকীরণ করেই। দিনের পর দিন যে সে উজ্জ্বল হয়ে উঠছে তাতে আর ভুল নেই। নিজের মনেই সে নিজের উজ্জ্বলতা অনুভব করে।"

সত্যবানের সঙ্গে সতীর প্রেম ও বিবাহ, বন্ধু রজতের মধ্যস্থতায় সুরমাদি ও তাঁর মেয়ে বনানীর সঙ্গে পরিচয়, সুরমাদির আকস্মিক গৃহত্যাগ, সতীর সঙ্গে সত্যবানের বিরোধ প্রভৃতি ঘটনা গল্পের গতি বৃদ্ধি করেও টেনে এনেছে প্রেম, হিন্দু-বিবাহ, স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধ, গান্ধীবাদ, সাম্যবাদ প্রমুখ বড়ো বড়ো সমস্যাগুলিকে। দক্ষ চিকিৎসকের মতো লেখক নিপুণভাবে বর্ত্তমান বাঙালী জীবনের বিস্ফোটকের ওপর ছুরি চালিয়েছেন। তাঁর কৃতিত্ব শুধু এইখানেই নয়, আলোচ্য উপন্যাসের আঙ্গিকও সূক্ষ্ম শিল্পবোধের পরিচায়ক। তা যেমন অভিনব, তেমনি উপযোগী। চরিত্রাঙ্কনের দিক্ থেকে বিচার করলে সত্যবান ছাড়া তার স্ত্রী সতী আর সুরমাদি (যিনি স্বামীকে পরিত্যাগ করেছিলেন) সুন্দর ফুটেছে। সতী সাধারণ বাঙালী মেয়েরই প্রতিভূ। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় সে মায়ের জাতে পড়ে। কিন্তু সুরমাদির কথা বিশেষ ভাবে মনকে নাড়া দিয়ে যায়। তাঁর নিরুদ্দেশ হওয়া আকস্মিক ঠেকলেও তাঁর চরিত্রের এই পরিণতি মোটেই অসঙ্গত বলে মনে হয় না।

এই ঘটনাগুলো সত্যবানের মনে পড়ছে এক সন্ধ্যায় তার পুরানো চিঠি

পড়তে পড়তে। আসলে সমস্ত বইখানি হলো তার চিন্তার কাহিনী। লেখকের সংযম ও লিপিকুশলতার গুণে সত্যবানের এই চিন্তার ভেতর দিয়েই প্রতিফলিত হয়েছে বর্তমান বাঙালীর মানসলোক।

মিনতি দেবী।

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা

অনন্ত অবধি—বিমলেশ দে প্রণীত। ভারতী ভবন। ১||০

ইহা গদ্যে লিখিত হইলেও ইহাকে উপন্যাস না বলিয়া গদ্য কাব্য বলা উচিত, কারণ কাব্যের ধর্ম্মই ছত্রে ছত্রে পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। গল্পে, প্রবন্ধে, ডায়ারিতে, কাব্যে মিলাইয়া ইহা এমন এক জাতীয় রচনা যাহা কোন শ্রেণী বিশেষের মধ্যে পড়ে না। একটা কাহিনীর ক্ষীণসূত্র ইহার মধ্যে অন্তর্নিহিত ভাবে আছে বটে, কিন্তু ঘটনার চেয়ে ভাবনার গ্রন্থির উপরেই লেখকের ঝোঁক। বাহিরে যাহা ঘটিতেছে লেখক তাহার বর্ণনা করেন নাই; সেই ঘটনা অন্তরে যে ভাব-তরঙ্গ তুলিয়া দিতেছে তাহারই বর্ণনা লেখকের প্রধান উদ্দেশ্য। এই ভাবনার প্রচ্ছন্ন সূত্রটিকে না ধরিতে পারিলে রচনাটি বুঝিতে অসুবিধা হইবে। যে বয়সে সাধারণতঃ বাহিরের দিকেই দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকে, তখন যে লেখকের মন ভিতরের দিকে আকৃষ্ট হইয়াছে ইহা ভরসার কথা। প্রকৃত মনস্তত্ত্বমূলক উপন্যাসের ভবিষ্যৎ লেখকের সম্মুখে আছে বলিয়া মনে হয়।

ভাষা মধুর এবং বস্তুর উপযোগী। বর্ণনায় কিছু অত্যুক্তি ও উচ্ছ্বাস আছে। কিন্তু তাহাতে আশঙ্কার কারণ নাই, লেখকের বয়স বেশি নয়। কাল-ক্রমে, জীবনের অভিজ্ঞতার ফলে এই সব দোষ কাটিয়া যাইবে, তখন অত্যুক্তির ভিতর হইতে আসল উক্তিটা স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হইয়া পড়িবে।

শ্রীপ্রমথনাথ বিশী

AN INTRODUCTION TO THE PHILOSOPAY OF SRI AUROBINDO —S. K. Maitra. The Culture Publishers, Calcutta.

শিক্ষিত ভারতবর্ষের চোখে পণ্ডিচেরি এখনো একটি রহস্য-নিকেতন। সাধারণ ভারতীয় ভদ্রলোকের মনে শ্রীঅরবিন্দ এখনো নতুন আগন্তুক মাত্র।

অথচ ইংরাজি ভাষায় লেখা অনেকগুলি বই-এর তিনি প্রণেতা, তাঁর মতামত সম্বন্ধে এখানে ওখানে মাঝে মাঝে সভাসমিতির অধিবেশনও হ'য়ে থাকে; তাঁর ভক্ত এবং অনুচরের সংখ্যাও বিরল নয়। তবু তাঁর সম্বন্ধে বিশেষ স্পষ্ট কোনো ধারণা এখনো সাধারণ্যে প্রচার লাভ করেনি।

শ্রীঅরবিন্দকে এক রকম দ্বৈতবাদী বলা চলে। আত্মাকে তিনি স্বীকার করেন, আবার দেহ-ও তাঁর কাছে নিষিদ্ধ নয়। জড়বস্তুর মধ্যমে প্রাণবস্তুর বিবর্তন লক্ষ্য করে তিনি জড় এবং প্রাণ এই দুই বিভিন্ন পদার্থকেই সমান মর্য্যাদা দিয়ে থাকেন। Evolution এবং Involution—এই দুই ব্যাপারেই তিনি আস্থাবান। তাঁর ঈশ্বর বেদান্তের ঈশ্বর নন আবার প্লেটোর Demiurge-এর ধারণাতেও তাঁর সম্মতি নেই। বিশ্লেষণধর্মী লৌকিক চিত্ত এবং সংশ্লেষণ-ধর্মী ভূমা-র মধ্যবর্তী এক অতিমানস বা super mind-এর অস্তিত্ব সম্বন্ধে তিনি বিশ্বাসপরায়ণ। পাশ্চাত্ত্য দার্শনিকের মধ্যে প্লেটো এবং হেগেলের সঙ্গে আংশিক ভাবে তাঁর মতের ঐক্য সূচিত হয়, বার্গস্‌-র স্বজ্ঞা-বিচারেও তাঁর আংশিক সম্মতি আছে কিন্তু এঁদের নির্দিষ্ট পথ অতিক্রম করে তিনি আরও অগ্রসর হ'য়েছেন। প্রাচ্য দার্শনিক শঙ্করাচার্যকেও তিনি সম্পূর্ণ স্বীকার করেন না। ব্যক্তি-র মুক্তিলাভে তিনি ততো আগ্রহশীল নন, যতো আগ্রহপরায়ণ মানবজাতির দৈহিক-মানসিক উন্নতি বিধানে।

হিন্দু-বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন শাস্ত্রের প্রধান আচার্য মৈত্র মহাশয় সাধারণ পাঠকের জন্য একজন জীবিত ভারতীয় দার্শনিকের পরিচয় লিপিবদ্ধ ক'রে আমাদের ধন্যবাদ ভাজন হ'য়েছেন। অরবিন্দদর্শনের সঙ্গে প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্ত্য দর্শনের সংক্ষিপ্ত তুলনামূলক আলোচনার সন্ধানও এ বই-এ পাওয়া যাবে। বইখানির বহিরঙ্গ সৌন্দর্য ও সুরুচির পরিচায়ক।

হরপ্রসাদ মিত্র

চীনরাষ্ট্র ও স্বাধীনতা সংগ্রামের পাঁচ বৎসর (প্রকাশক চীন পাবলিশিং কোম্পানী। চুংকিং, চীন।

গত পাঁচ বছরের ওপর জাপানের নির্মম অভিযানের বিরুদ্ধে নিপুণতা ও দৃঢ় সঙ্কল্পের সঙ্গে আত্মরক্ষার ফলে চীনদেশ সমস্ত পৃথিবীর শ্রদ্ধা ও বিস্ময় উদ্রেক

করেছে। কিন্তু কি উপায়ে চীন জাপানের মত প্রবল শত্রুর প্রতিরোধ করেছে সে সম্বন্ধে আমাদের অনেকেরই ধারণা অতি অস্পষ্ট। আলোচ্য বইটি পড়লে এই বিষয়ে আমরা অনেক কথা জানতে পারব। চীনের সামরিক প্রচেষ্টার পিছনে ও এই প্রচেষ্টার সহায়করূপে সমগ্র দেশের জাতীয় জীবন কী ভাবে গড়ে তোলা হচ্ছে বইখানিতে অল্পকথায় তার আলোচনা আছে। বর্তমান চীনের শিল্প ও শিক্ষা-ব্যবস্থার বিবরণ বিশেষ শিক্ষাপ্রদ। বইটিতে অনেকগুলি চিত্তাকর্ষক ফটো আছে।

WHAT TO EAT AND WHY—by N. Gangulee.
Oxford University Press. Rs 3.

আজ সারা ভারতবর্ষে আহার্য এমন দুষ্প্রাপ্য যে কি খাওয়া উচিত ও কেন, এই বিষয়ে মাথা ঘামাবার মতন অবস্থা বেশির ভাগ লোকেরই নাই। কিন্তু এই দুর্দিনেও আহার্যের ভালো মন্দ বিচার উপেক্ষণীয় তো নয়ই, বরঞ্চ বেশি করেই করা দরকার, কেননা অল্প পরিমাণের মধ্যে বেশী পুষ্টির ব্যবস্থা কি উপায়ে করা যায় এই হ'ল আমাদের সমস্যা। এই সমস্যার সমাধানে বইখানি অনেক সাহায্য করবে। লেখকের দৃষ্টিভঙ্গি বৈজ্ঞানিক, তাঁর রচনা-পদ্ধতি মনোগ্রাহী। নিছক বৈজ্ঞানিক কৌতূহল নিয়ে যাঁরা বইখানি পড়বেন তাঁরা নিরাশ হবেন না। খাদ্য পরিপাক প্রসঙ্গে লেখক শরীরতত্ত্বের অনেক জটিল তথ্য সুন্দর ক'রে বুঝিয়ে দিয়েছেন।

ভ্রম সংশোধন

৬৫০ পৃষ্ঠায় ১৩ লাইনে "ধাত্রীদেবতা" স্থলে "গণদেবতা" হইবে।
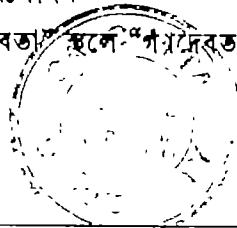
শ্রীকুন্দভূষণ ভাদুড়ী কর্তৃক পরিচয় প্রেস, ৮ বি, দীনবন্ধু লেন,
কলিকাতা হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

১২শ বর্ষ, ২য় খণ্ড, ৪র্থ সংখ্যা

বৈশাখ, ১৩৫০

পরিচয়

উপনিষদে জড়তত্ত্ব

দ্বাদশ অধ্যায়

লোক-সৃষ্টি

আমরা তত্ত্বসৃষ্টির আলোচনায় পঞ্চতত্ত্বের কথা জানিয়াছি—ক্ষিতি তত্ত্ব, অপ্ তত্ত্ব, অগ্নি তত্ত্ব, বায়ু তত্ত্ব ও আকাশ তত্ত্ব। ইহারাই সাংখ্যের পঞ্চ তন্মাত্র। অর্থাৎ সূক্ষ্ম হইতে স্থূলে অবতরণ করিলে—শব্দ তন্মাত্র, স্পর্শ তন্মাত্র, রূপ তন্মাত্র, রস-তন্মাত্র ও গন্ধ তন্মাত্র। ইহারা প্রত্যেকেই অবিশেষ (homogeneous) ও অপঞ্চীকৃত। ঐ যে পঞ্চলোক, (Five planes)—মনুষ্যলোক, পিতৃলোক, দেবলোক, প্রজাপতিলোক ও ব্রহ্মলোক—উহাদের প্রত্যেকে নিজস্ব উপাদানে নির্মিত। কোন লোকের কি উপাদান? ক্ষিতি তত্ত্বের উপাদানে মনুষ্যলোক গঠিত, অপ্ তত্ত্বের উপাদানে পিতৃলোক গঠিত, অগ্নি তত্ত্বের উপাদানে দেবলোক গঠিত, বায়ু তত্ত্বের উপাদানে প্রজাপতিলোক গঠিত; এবং আকাশ তত্ত্বের উপাদানে ব্রহ্মলোক গঠিত। অর্থাৎ, ঐ ঐ তন্মাত্র সেই সেই লোকের 'প্রোটাইল' স্থানীয়।

ঐ ভূঃ ভুবঃ স্বঃ মহঃ জনঃ তপঃ সত্য, এই সপ্তলোক মিলিয়া ব্রহ্মাণ্ড। অথর্বশিরঃ উপনিষদে উক্ত হইয়াছে—

> যদা শেতে রুদ্রঃ তদা সংহার্যতে প্রজাঃ। উচ্ছ্বসিতে তমো ভবতি তমস আপঃ × × মথ্যমানং ফেনো ভবতি। ফেনাৎ অণ্ডং ভবতি অণ্ডাৎ ব্রহ্মা।
>
> —অথর্বশিরঃ, ৬

অর্থাৎ, প্রলয় নিদ্রার পর যখন ভগবান্ জাগরিত হন, তখন তাঁহা হইতে প্রথমতঃ তপঃ (মূল-প্রকৃতি) আবির্ভূত হয়। তমঃ হইতে অপের সৃষ্টি হয়।

ইহাই আমাদিগের কারণার্ণব, নির্বিশেষ একীভূত মহাভূত (homogeneous cosmic matter)। ইহা ঘনীভূত হইলে ফেন হয়।- ফেন হইতে ব্রহ্মাণ্ডের আবির্ভাব হয়।

এরূপ ব্রহ্মাণ্ড একটি নহে—অসংখ্য। এক একটি সৌরমণ্ডল এক একটি ব্রহ্মাণ্ড এবং এক একটি ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে এই সপ্তলোকের সংস্থান। সূর্যমণ্ডলের পরিধির আকার অণ্ডের মত, সেইজন্য ইহার নাম ব্রহ্মাণ্ড। ত্রিপাদ বিভূতি উপনিষদ্ বলিতেছেন—

অস্য ব্রহ্মাণ্ডস্য সমন্ততঃ স্থিতানি এতাদৃশানি অনন্তকোটি-ব্রহ্মাণ্ডানি সাবরণানি জ্বলন্তি। চতুর্মুখপঞ্চমুখষণ্মুখসপ্তমুখাষ্টমুখাদিসংখ্যাক্রমেণ সহস্রাবধি মুখান্তৈর্নারায়ণাংশৈ রজোগুণপ্রধানৈরেকৈকসৃষ্টিকর্তৃভিরধিষ্ঠিতানি বিষ্ণুমহেশ্বরাখ্যৈর্নারায়ণাংশৈঃ সত্বতমোগুণপ্রধানৈরেকৈকস্থিতি-সংহারকর্তৃভিরধিষ্ঠিতানি মহাজলৌঘমৎস্যবুদ্বুদানন্তসংঘবৎ ভ্রমন্তি।

'এই ব্রহ্মাণ্ডের চতুর্দিকে এইরূপ অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড ক্ষিত্যাদির আবরণে আবৃত হইয়া দীপ্তি পাইতেছে। চতুর্মুখ পঞ্চমুখ ষণ্মুখ সপ্তমুখ অষ্টমুখ সংখ্যাক্রমে সহস্রমুখ পর্যন্ত নারায়ণের অংশ ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর রজঃ, সত্ব ও তমোগুণ-প্রধানে বিভিন্ন হইয়া এক এক ব্রহ্মাণ্ডে অধিষ্ঠিত থাকিয়া সৃষ্টি, স্থিতি ও পালন কার্য সম্পন্ন করিতেছেন। মহাসমুদ্রে যেমন অনন্ত মৎস্যবুদ্বুদ ক্রীড়া করে, সেইরূপ বিশ্বের মহাকাশে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড বিচরণ করিতেছে।'

উপনিষদ্ ভিন্ন পুরাণাদিতেও এই বহু ব্রহ্মাণ্ডের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। এ সম্বন্ধে যোগবাশিষ্ঠ এইরূপ বলিয়াছেন :—

যথা তরঙ্গা জলধৌ তথেমাঃ সৃষ্টয়ঃ পরে।
উৎপত্যোৎপত্য লীয়ন্তে রজাংসীব মহানিলে।
একস্যানেকসংখ্যস্য কস্যাণোরম্বুধেরিব।
অন্তর্ব্রহ্মাণ্ডলক্ষাণি লীয়ন্তে বুদ্বুদা ইব॥

'যেমন সমুদ্রে তরঙ্গ, তেমনি পরমেশ্বরে বহু সৃষ্টি, অনিলে ধূলি-কণার ন্যায় আবির্ভূত ও তিরোহিত হইতেছে। কোন এক 'অণু' আছেন, যাহার মধ্যে সাগরে বুদ্বুদের মত লক্ষ লক্ষ ব্রহ্মাণ্ড বিলীন হইতেছে।'

সংখ্যা চেৎ রজসামস্তি বিশ্বানাং ন কদাচন—দেবী ভাগবত, ৯।।১

'বরং ধূলিকণার সংখ্যা করা যায়, কিন্তু ব্রহ্মাণ্ডের সংখ্যা হয় না।'

লক্ষ্যন্তেঽন্তর্গতাশ্চান্যে কোটিশো হ্যণ্ডরাশয়ঃ—ভাগবত, ৩।১১।৪১

'বিশ্বের মধ্যে কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডরাশি লক্ষিত হইতেছে।'

পাশ্চাত্য জ্যোতির্বিজ্ঞান (Astronomy) এখন যে উন্নত অবস্থায় উপনীত হইয়াছে, তাহাতে ঋষিদিগের অনুমোদিত অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের কথা আর কবি কল্পনা নাই। এমন দিন ছিল, যখন পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকেরা আমাদের এই ক্ষুদ্র পৃথিবীকেই সৃষ্টির কেন্দ্র মনে করিতেন এবং চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, তারাকে নগণ্য মনুষ্য জাতিকে আলোক যোগাইবার বর্তিকা স্বরূপ জ্ঞান করিতেন। কিন্তু, এখন এ ভ্রান্ত ধারণা পরিত্যক্ত হইয়াছে। বর্তমানে বিজ্ঞানেব সিদ্ধান্ত কি?

সিদ্ধান্ত এই যে, 'the earth is a mere point in the heavens'—পৃথিবী অনন্ত সৃষ্টি-সাগরের একটি বুদ্‌বুদ্ এবং মঙ্গল বুধ বৃহস্পতি প্রভৃতি অন্যান্য গ্রহের ন্যায় সূর্যকে কেন্দ্র করিয়া ভ্রাম্যমান একটি ক্ষুদ্র গোলক মাত্র।—'an insignificant body in the solar system'. আর আমাদের সূর্য? নভো-মণ্ডলে বিলম্বিত অসংখ্য তারকারাজির মধ্যে একটি নাতিবৃহৎ তারা। বিজ্ঞান আরও বলেন, ঐ সকল তারা 'are really suns for other systems of worlds' (Daper, p. 243)। সৃষ্টিসাগরে ঐরূপ কত কোটি কোটি তারা সূর্য ভাসিয়া বেড়াইতেছে। বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক স্যার্ জেম্‌স্ জিন্‌সের গণনায় তারার মোট সংখ্যা দশ হাজার কোটির কম নহে। আমাদের সূর্য—যিনি 'জবাকুসুম-সঙ্কাশ' মূর্তিতে প্রতি প্রত্যুষে আমাদের দৃষ্টিগোচর হন, সেই সূর্য যে galaxyর অন্তর্গত, তাহাতেই নাকি তিন হাজার কোটি তারা আছে।

By extrapolating the results of actual counts of stars, Seares and Van Rhiju obtained a total of 30,000,000,000 stars in the galaxy.

স্যার আর্থার এডিংটনের (Sir Arthur Eddington-এর) গণনা আরও বিস্ময়াবহ। তিনি বলেন আমাদের সূর্য যে Milky way বা ছায়াপথের অন্তর্গত, উহা একটি galaxy বা বৃন্দক। সৃষ্টিতে এইরূপ এক লক্ষ মিলিয়ন অর্থাৎ ১০০০০০০০০০০০ বৃন্দক (galaxy) বিদ্যমান আছে এবং প্রত্যেক বৃন্দকে এক লক্ষ কোটি তারা আছে।

কিন্তু, সমুদ্রে সৈকতকণার ন্যায়, ব্রহ্মাণ্ড সংখ্যায় অনন্ত ও অগণ্য হইলেও, তাহারা সকলে মিলিয়া যে এক বিরাট বিশ্ব রচনা করিয়াছে—রোম্যান-রা

যাহাকে Universe বলিতেন—সে সম্পর্কে ঋষিদিগের শিক্ষা অতিশয় বিস্পষ্ট ও বিস্ময়কর, সেইজন্য বিশ্বেশ্বরকে তাঁহারা 'বিশ্বস্য সৎপতি' বলেন, এবং সৃষ্টি, স্থিতি, লয় উপলক্ষে সমষ্টি-ব্রহ্মাণ্ড বিশ্বের কথাই উত্থাপন করেন।

অক্ষরাৎ সম্ভবতীহ বিশ্বম্—মুণ্ডক, ১৷৭
পুরুষ এবেদং বিশ্বম্—মুণ্ডক, ২৷১৷১০
ব্রহ্মৈবেদং বিশ্বমিদং বরিষ্ঠম্—মুণ্ডক, ২৷২৷১১

এই অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের প্রত্যেকের মধ্যেই সপ্তলোকের সন্নিবেশ আছে এবং প্রত্যেকেই জীবের লীলাক্ষেত্র। ব্রহ্মাণ্ডের সহিত অণ্ডের তুলনা বিশদ করিবার জন্য ছান্দোগ্য উপনিষদ এইরূপ বলিয়াছেন :—

অসদেবেদমগ্র আসীৎ। তৎ সদাসীৎ তৎ সমভবৎ। তদাণ্ডং নিরবর্তত তৎ সংবৎসরস্য মাত্রামশয়ত। তন্নিরভিদ্যত তে আণ্ডকপালে রজতং চ সুবর্ণং চাভবতাম্। তদ্যদ্রজতং সেয়ং পৃথিবী, যৎ সুবর্ণং সা দ্যৌ, যজ্জরায়ুঃ তে পর্বতা যদুল্বং স মেঘো নীহারো যা ধমনয়স্তা নদ্যো যদ্বাস্তেয়মুদকং স সমুদ্রঃ। —ছান্দোগ্য, ৩৷১৯৷১-২

'সেই অদ্বিতীয় ব্রহ্ম হইতে ব্রহ্মাণ্ড আবির্ভূত হইল। তাহা সম্বৎসর পরে যেন দ্বিধা বিভিন্ন হইল—একার্ধ রজত, একার্ধ সুবর্ণ। রজতার্ধ আমাদের পৃথিবী লোক এবং সুবর্ণার্ধ উর্ধ্বলোক ইত্যাদি।'

বলা বাহুল্য ইহা রূপক-বচন। আমাদিগের লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যগত এই সপ্তলোক জীবের বিহরণ-ভূমি, তাহার লীলাক্ষেত্র। অতএব পরবর্তী অধ্যায়ে আমরা এই জীব সৃষ্টি ও জীবের দেহ সৃষ্টি সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

হীরেন্দ্রনাথ দত্ত

জীবনের পটভূমি

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

[মাঝখানে কয়দিন কেটে গেছে।

আজ ফাল্গুনের পড়ন্ত বিকেলে মৃদু মৃদু হাওয়া দিচ্ছিল। জানালার পর্দাটায় চাঞ্চল্যের ছোঁয়া লেগেছে। ঘরের মধ্যে নব বসন্তের অস্পষ্ট বিধুরতা বিরাজমান্।

সুমিত্রা দেবী অর্গানের সামনে ব'সে গুন্‌গুন্ ক'রে মৃদু গলায় গান গাচ্ছিলেন। তাঁর গানের সুরের সঙ্গে ধূসর রঙের হলুদ পাড় শাড়ীতে বেশ একটা সৌষাম্য রক্ষা হ'য়েছে।]—

সুমিত্রা (গান)

আবার আঁধার হ'য়ে আসে।
আলোর গহন ধারা
চোখে নাহি তোলে সাড়া,—
বাঁধে মন শত পাকে সংশয় পাশে।
যতবার মনে মোর
কাটাই বিষাদ ঘোর,
ততই বিপুল মেঘে ঢাকে সন্ত্রাসে।
একি নিদারুণ খেলা,
বারে বারে ভেঙে ফেলা!
জীবন হবে কি শেষ এই পরিহাসে?
পথে না বাহির হ'তে
ঘিরেছে বেদনা স্রোতে,
নিভেছে আশার দীপ ঘন নিঃশ্বাসে।—
পদে পদে সংশয়:
আর নয়, আর নয়
এ লীলার অবসান হোক পরিহাসে।

(গান শেষ ক'রে ধীরে সোফার দিকে অগ্রসর হ'লেন তিনি।—)

সুমিত্রা (যেন কতকটা নিজের মনকে শুনিয়ে) আজও দেখছি এল না।··· এ রকমভাবে···অসম্ভব। (সোফায় বসলেন। একটু পরে) সে কি সত্যিই বুঝতে পারে না?··· অথচ—। (নিশ্বাস ফেলে চুপ করলেন। তারপর ক্লান্ত ভাবে একখানা সাময়িক পত্রিকা নিয়ে যেখানে সেখানে খুলে পড়তে লাগলেন। কিছুক্ষণ এইভাবে কাটাবার পর মনঃসংযোগে অপারগ হ'য়ে বীতশ্রদ্ধ ভাবে) নাঃ, যা তা সব লেখে। (পত্রিকা সোফার এক পাশে ফেলে দিলেন। তারপর ধীরে ধীরে উঠে গিয়ে জানালার কাছে দাঁড়ালেন। ম্লায়মান সন্ধ্যার আলোকে আকাশের রঙ দগ্ধ লাল। জানালার নিচ থেকে যুঁই ফুলের মৃদু সৌরভ ভেসে এসে তাঁর মুখের ওপর একটা শান্তির স্পর্শ দিয়ে গেল।)

(কয়েক মিনিট এইভাবে কাটবার পর ধীরে ধীরে প্রিয়ব্রতের মূর্ত্তিকে দরজার পাশে দেখা গেল। ঘরের মধ্যে চারদিক চেয়ে সুমিত্রা দেবীকে জানালাব কাছে আবিষ্কার ক'রে সে দুই পা এগিয়ে একটু হাসল।—)

প্রিয়ব্রত (অনুচ্চ কণ্ঠে, কিন্তু সুমিত্রা দেবী যাতে শুনতে পান এই রকম ক'রে) অদ্ভুত প্রভাব এই বসন্তকালটার।

(তার গলার শব্দে সুমিত্রা দেবী এদিকে ফিরে চাইলেন। চেয়ে প্রিয়ব্রতকে দেখে প্রথমে তাঁর চোখ বেশ উৎফুল্ল হ'য়ে উঠল, কিন্তু পরক্ষণেই সেই তাঁর এতক্ষণ মনোকষ্টের কারণ এই কথা মনে পড়ায় বেশ ক্ষুব্ধ হ'য়ে উঠলেন। জানালা ছেড়ে এগিয়ে আসতে—)

সুমিত্রা হ্যাঁ, বন্ধু বান্ধবের সঙ্গে দেখা করার দায়িত্বটা পর্য্যন্ত ভুলিয়ে দিতে পারে—এত অদ্ভুত প্রভাব।···এস। (তিনি গিয়ে সোফায় বসলেন।)

(প্রিয়ব্রত সুমিত্রা দেবীকে অনুসরণ ক'রে একটা চেয়ারে পায়ের ওপর পা তুলে বসল।)

প্রিয়ব্রত (হেসে) ওটা একটু বেশী হ'য়ে গেল। কেননা, আমি যে কদিন এখানে আসতে পারি নি তার কারণ বসন্ত বা মলয়-কোকিল ইত্যাদি নয়, অন্য কিছু। (একটু থেমে) কদিন ছিলাম না এখানে।

সুমিত্রা এখানে মানে? কলকাতায়? (প্রিয়ব্রত মাথা নাড়ল।) কোথায় গিয়েছিলে?

প্রিয়ব্রত আসানসোলের ঐ দিকে।

সুমিত্রা (ঈষৎ বিস্মিত হ'য়ে) কেন বলতো? কয়লার ব্যবসা করবে না কি?

প্রিয়ব্রত (সহজ ভাবে হেসে) প্রায় সেই রকমই। কয়লার না হ'লেও কয়লার কুলিদের বটে। (একটু গম্ভীর হ'য়ে) আমি অনিরুদ্ধের অসমাপ্ত কাজে হাত দিয়েছি।

সুমিত্রা ও! (কিছুক্ষণ নতমুখে কী যেন ভেবে, প্রিয়ব্রতের চোখের দিকে করুণাঘন দৃষ্টিতে তাকিয়ে) তবে যেন আমাকেও সঙ্গী করা হয়।...তোমার স্থান যেখানে আমারো স্থান সেইখানেই।

(কথাটা শুনে প্রিয়ব্রতের মুখের জ্যোতি যেন নিষ্প্রভ হ'য়ে এল। কিন্তু যথাসাধ্য চেষ্টা ক'রে পর মুহূর্তেই স্বাভাবিকতা ফিরিয়ে এনে সে অনিশ্চিত ভাবে একটু হাসল। তারপর—)

প্রিয়ব্রত (কণ্ঠস্বরে অদ্ভুত আন্তরিকতার আবেশ ছড়িয়ে) দেখ, স্থানের কথা তুমি বলছ, এ ব্যাপারে স্থান কেউ কাউকে ক'রে দিতে পারে না। নিজের যোগ্যতা দিয়ে অর্জ্জন করতে হয়। (একটু থেমে, সহৃদয় ভাবে হেসে) রাজনৈতিক উত্তরাধিকার একেবারেই একটা স্বোপার্জ্জিত ব্যাপার।

সুমিত্রা (কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে, নিরীহ মৃদু গলায়) আমার কি সে যোগ্যতা নেই?

প্রিয়ব্রত (তাঁর মুখের দিকে চেয়ে, আন্তরিক সহানুভূতির সঙ্গে) না। (সুমিত্রা দেবীর মুখে বেদনার চিহ্ন প্রত্যক্ষ ক'রে) কিন্তু এতে দুঃখিত হবার কিছু নেই। সকলকেই যে প্রত্যক্ষ ভাবে রাজনীতিতেই

নামতে হবে এমন কোনো কথা নেই ।....তা না ক'রেও দেশের কাজ করা যায় ।

সুমিত্রা কেমন ক'রে ?

প্রিয়ব্রত (হেসে) ছি, অমন ভাবে প্রশ্ন করলে আমি বড় লজ্জিত বোধ করি । (তারপর পূর্ব্ব প্রসঙ্গের সূত্র ধ'রে) যার যা যোগ্য স্থান সেইখানের কর্ত্তব্য বিশ্বস্ততার সঙ্গে পরিচালনা করাও ছোট কথা নয় ।···তুমি শিক্ষার ক্ষেত্রে আছ, তুমি যদি দেশের এই দিকটাতেও কিছু সার্থক কাজ করতে পার তবে সেইটেই হবে দেশের প্রতি তোমার শ্রেষ্ঠ দান ।

সুমিত্রা (ঈষৎ ঠাট্টার সুরে) তবে কি তোমার মত, এ দেশের মেয়েরা কেবল মাষ্টারী করা ছাড়া অন্য কোনোরকমেই দেশের কাজে লাগতে পারে না ?

প্রিয়ব্রত (লজ্জিত হ'য়ে ব্যস্ত ভাবে) তা কেন হবে ? প্রত্যক্ষভাবে দেশের কাজে নামতে পারেন এমন মেয়েও নিশ্চয়ই আছেন আমাদের দেশে । তবে তাঁদের সংখ্যাও ছেলেদের সংখ্যার মতই খুব কম ।

সুমিত্রা (কিছু সময় নীরবে কী চিন্তা ক'রে) একটা কথা জিজ্ঞাসা করব ?···জয়ন্তী কি তাদের দলে পড়ে ?

প্রিয়ব্রত সে কথা আমি আজই বলতে পারব না, সুমিত্রা । তা ছাড়া এ প্রশ্নের জবাব চূড়ান্ত ভাবে কেবল জয়ন্তী দেবীই বোধ হয় দিতে পারেন ।—তৃতীয় ব্যক্তির ধারণাগুলো সব সময়ে ঠিক নির্ভুল হয় না ।···এই দেখ না, অনিরুদ্ধই যে এতটা উল্‌টে যাবে সে কথা কি আগে আমরা কেউ বুঝতে পারতাম ? আজকাল শুনতে পাই সে নাকি তাদের দেশের বাড়ীতে শ্বাস-প্রাণায়াম পর্য্যন্ত করে ।

সুমিত্রা (আন্তরিক দুঃখিত ভাবে) এতদূর গিয়েছে না কি ? আশ্চর্য্য ।

প্রিয়ব্রত (একটু চুপ করে থেকে) অথচ—(সহসা কী মনে করে) আচ্ছা একটা কথা । তোমার কি মনে হয় না, অনিরুদ্ধের প্রতি তোমার একটা কর্ত্তব্য ছিল ?

সুমিত্রা　(ধীর গলায়) ছিল না, একথা বললে মিথ্যা বলা হবে প্রিয়ব্রত। কিন্তু অনিরুদ্ধ নিজেই তো সে কর্ত্তব্যের দায় থেকে আমাকে মুক্তি দিয়েছে।

প্রিয়ব্রত　(অদ্ভুত আন্তরিকতার সঙ্গে, হেসে) না, দেয়নি। আর ওর আত্মাভিমান এত গভীর যে সে কথা মুখ ফুটে তোমাকে বলতে পারে নি পর্য্যন্ত। (একটু থেমে বিষাদময় গাম্ভীর্য্যের সঙ্গে) আমার অনেকবার মনে হ'য়েছে সুমিত্রা, তোমার উচিত তাকে এই মানস আত্মহত্যা থেকে বাঁচানো।

সুমিত্রা　(ঈষৎ বিস্ময়ের সঙ্গে) কেমন করে?

(প্রিয়ব্রত কিছু না ব'লে তাঁর মুখের দিকে তাকাল। সুমিত্রা দেবী-চোখ সরিয়ে নিলেন।)

সুমিত্রা　(অপরাধীর মত অস্বচ্ছ কণ্ঠে, যেন বিশ্বাস করতে পারছেন না, এই ভাবে) তুমি কি বলতে চাও আমি তাকেই—? (তারপর রীতিমত বিস্ময়ের সঙ্গে, স্পষ্টতর ভাবে) সারাজীবন একটা খোলস আঁকড়ে পড়ে থাকব?

প্রিয়ব্রত　(নিজকে প্রতিষ্ঠা করবার মত সুরে) খোলস কেন সুমিত্রা? এ তোমার অন্যায় কথা হ'ল। আসলে এসব কথা যখন বলি তখন কত যে সংকীর্ণ দৃষ্টির পরিচয় আমরা দেই তা বলা যায় না। ...দেশের স্বাধীনতার জন্য অন্য দেশের লোকে যুদ্ধ করে। আমরা তা করতে পারছি না, করছি আন্দোলন। কিন্তু আমাদের কর্ম্মীদের সম্মান সে সব স্বাধীনতা-সৈন্যের চেয়ে মোটেই নিচে নয়। সুতরাং, দেশের জন্য যুদ্ধ ক'রে যে সব সৈন্য পঙ্গু হয় তারাও যেমন করুণার নয়, শ্রদ্ধার পাত্র,—কেননা তারা নিজেদের অঙ্গহানি স্বীকার ক'রে অন্যান্যকে অটুট রেখেছে, সেই রকমই শ্রদ্ধনীয় হবেন আমাদের কর্ম্মীরা, যাঁরা অনেক ক্ষেত্রে পোড়া কয়লার মত নিষ্প্রাণ, কিন্তু নিজের প্রাণের দাহিকাশক্তি দিয়ে যাঁরা আন্দোলনের ইঞ্জিনে ষ্টীম জুগিয়েছেন।...এ শুধু সুন্দর কথার বক্তৃতা নয় সুমিত্রা, এই আমার সত্যিকার অভিমত।

(সুমিত্রা দেবী নত মুখে চুপ ক'রে ব'সে রইলেন অনেকক্ষণ। তারপর চেপে চেপে একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে তার মুখের ওপর দৃষ্টি তুলে)

সুমিত্রা তুমিও হয়ত তা হ'লে একদিন আন্দোলনের আগুনে পুড়ে ছাই হবে, তাই বলতে চাও ?

প্রিয়ব্রত আশ্চর্য্য কি। (তারপর উঠে গিয়ে সুমিত্রা দেবীর পাশে সোফায় বসে, কণ্ঠস্বর গাঢ় ক'রে) আমাকে যে তুমি কতখানি আন্তরিকতার সঙ্গে গ্রহণ করতে চাও তা আমি জানি, কিন্তু উপায় নেই সুমিত্রা। আমি ছিলাম কবি, হ'তে চাই স্বদেশের তুচ্ছ একজন সেবক, আমার জীবনে এ ছাড়া অন্য কিছু ঘটা সম্ভব নয়। (একটু থেমে) তার মানে এ নয় যে আমি জিদ ক'রে প্রমাণ করতে চাই, অনিরুদ্ধের সমস্ত শ্লেষ সত্ত্বেও কবিরা অপদার্থ এই উক্তি মিথ্যা। আমি শুধু এইটুকুই প্রমাণ করতে চাই যে, কবিরাও আর দশজন সাধারণ দেশবাসীর মতই বাস্তবের মুখোমুখী মাথা উঁচু ক'রে দাঁড়াতে পারেন, এবং একজন কবি হ'য়েই দেশকর্ম্মী হ'তে পারেন।

সুমিত্রা (স্বাভাবিক অবস্থাকে কিছু পরিমাণে ফিরিয়ে এনে) ঠিক বুঝলাম না কিন্তু তোমার কথা।...কবি হ'য়েও দেশকর্ম্মী হ'তে পারে—এ কথার দ্বারা কি তুমি এই বলতে চাও যে কবি কবিতা লিখেই দেশের কাজ করতে পারেন ? তা যদি হয় তা হ'লে তো তোমার— ?

প্রিয়ব্রত (বাধা দিয়ে সংশোধন করবার ভঙ্গীতে) না না, তা আমি বলছিলাম না। কবিতা লিখে কবি অবশ্যই দেশের কাজ করতে পারেন, আর সেটা কিছু নিচু স্তরের দেশের কাজও হয়ত নয় ; কিন্তু স্থান কাল পাত্র ভেদ আছে। সাধারণ-ধরণের যাঁরা কবি তাঁরা স্বাভাবিক অবস্থায়—শান্তির সময়—বেশ দেশের কাজ করতে পারেন সাহিত্যের সমৃদ্ধি সাধন করে, কিন্তু অস্বাভাবিক অবস্থায়—বিপ্লবের সময়—তাঁদের সাহিত্য করা ব্যর্থ। সে সময়ে যাঁরা সাহিত্য করবেন তাঁরা ক্ষণজন্মা সাহিত্যিক,—তাঁদের সাহিত্য

করাও সঙীন উড়িয়ে যুদ্ধ করার চেয়ে অনেক কঠিন কাজ। কিন্তু সাধারণের দলে যাঁরা, তাঁদের ওটা উচিত হবে না। তাঁদের উচিত হবে সংগ্রামে ভিড়ে পড়া। শুধু সংগ্রামে কাঁধ জুড়েই নিজেকে সার্থক করতে পারেন তারা। এবং হয়ত, তাঁদের এ আচরণটা কোনো একটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা হবে না,—সাধারণভাবে সাহিত্য করবারই একটা স্বাভাবিক যুক্তিসম্মত পরিণতি হবে শুধু। সাহিত্য দিয়ে জীবন আরম্ভ করবেন, আর জীবন শেষ করবেন দেশের কাজ দিয়ে,—এই জিনিষটাই আমি বোঝাতে চেয়েছিলাম একজন মূলত কবি হ'য়েই দেশকর্ম্মী হ'তে পারেন, এই কথার দ্বারা।

সুমিত্রা কিন্তু দেশের কাজে যে রকম শৃঙ্খলা এবং আদর্শনিষ্ঠা দরকার তাতে কবি-প্রকৃতির কি মৃত্যু ঘটবে না ?

প্রিয়ব্রত না ঘটাই স্বাভাবিক। কেননা সত্যিকার কবি-প্রকৃতি প্রায়ই নতুন অবস্থায় নিজকে খাপ খাইয়ে নিতে পারে। ঘটবে শুধু রূপান্তর, কিন্তু তার মধ্যেও কবি-প্রকৃতি খুব বেশী ব্যাহত হবে বলে মনে হয় না। কবির সৃজনীশক্তি নতুন ক্ষেত্রে নতুন পথে নিজেকে নতুন রকমভাবে সার্থক ক'রে তুলবে, এ-ই আমার সব চেয়ে দৃঢ় বিশ্বাস। (একটু থেমে) আর শৃঙ্খলা এবং আদর্শনিষ্ঠার কথাও যা বললে সেগুলোও কবি-প্রকৃতির কাছে অপরিচিত কিছু নয়। কেননা, কবির চেয়ে বড় আদর্শবাদী অন্য কেউ হ'তে পারে ব'লে আমার বিশ্বাস হয় না,—সাধারণ লেখকেরও যে অংশটা আদর্শ-বাদী সে অংশটা কবি,—ছন্দোমিলবদ্ধ সংক্ষেপে বাক্য রচনা করতে করতে কবির মন স্বভাবতই শৃঙ্খলানিষ্ঠ হ'য়ে পড়ে। মাঝে মাঝে কবিদের বাহিরটা যে আগোছালো মনে হয় সে ঐ মনের শৃঙ্খলা নিষ্ঠারই পরিবর্ত্তিত বহিঃপ্রকাশ মাত্র।

সুমিত্রা (ক্ষীণভাবে হাসবার চেষ্টা ক'রে, ঠোঁট চেপে) তা হ'লে তুমি যাবেই ?

প্রিয়ব্রতা (চোখের দৃষ্টি অপরূপ ক'রে, মোহনীয় ভঙ্গীতে) স্বাভাবিক যুক্তি-সম্মত উপায়ে, তাছাড়া আর উপায় কি ?

সুমিত্রা (মনের উত্তেজনা লুকোবার জন্মে সংক্ষেপ ক'রে) ও। (ব'লে অন্যদিকে মুখ ফেরালেন।)

প্রিয়ব্রত (তাড়াতাড়ি তার হাত ধ'রে) আমাকে ভুল বুঝ না, সুমিত্রা।

(এই স্পর্শ এবং কাতর মিনিতির স্বর আশ্চর্য্যভাবে প্রভাব বিস্তার করল সুমিত্রা দেবীর মনে। কিছুক্ষণ স্থিরভাবে অপেক্ষা ক'রে করুণ, গাঢ়কণ্ঠে—।

সুমিত্রা আমার দুর্ব্বলতার জন্ম আমি সত্যিই লজ্জিত, প্রিয়ব্রত।

প্রিয়ব্রত (তাঁর হাত ছেড়ে দিয়ে, হাতের ওপর আঙুল বুলাতে বুলাতে) দুর্ব্বলতা কেবল তোমার একারই যদি একচেটিয়া জিনিষ হ'ত তা হ'লে হয়ত লজ্জিত হ'তে পারতে। কিন্তু আমরা যারা সরলতার ভান করি, মনে মনে আমরাই কি কম দুর্ব্বল না কি? (আত্ম-করুণার ভঙ্গীতে হেসে) এক সময়ে আমাদের মধ্যে অনিরুদ্ধের মত সবলচেতা লোক আর দ্বিতীয় কেউ ছিল না। তখন তাকে দেখে কত বিস্মিত হ'য়েছি, ভেবেছি কী ক'রে একটা লোক হৃদয়-বৃত্তিকে এইভাবে পদে পদে বিড়ম্বিত ক'রে আনন্দ পায় মনে! তাকে সম্পূর্ণ ক'রে বুঝতেই পারতাম না। কতদিন অক্ষম গাত্র-দাহে তার কাঠিন্যকে জড় বস্তুর সমপর্য্যায়ে ফেলে মনে মনে তৃপ্তি লাভ করেছি; কতদিন অনুকরণ করবার ব্যর্থ প্রয়াসে তাকে অমানুষ ব'লে গাল দিয়েছি মনে মনে। কিন্তু কিছুতেই সেদিন তাকে স্পর্শ করতে পারে নি। অথচ, এই অদ্ভুত দৃঢ়তার মধ্যে কোথায় যে দুর্ব্বলতার কীট ছিল, দেখতে না দেখতে অটল গাম্ভীর্য্যের মহীরুহ আজ অন্তঃসারশূন্য,—প্রবল সংশয়ের ঝড়ে ভূতলশায়ী। (বলতে বলতে হঠাৎ থেমে সুমিত্রা দেবীর চোখের ওপর দৃষ্টি ফেলে গাঢ় কণ্ঠে) সে পতিত, কিন্তু তবু তুচ্ছ নয়। জানি না, কিন্তু মনে হয়, হয়ত এখনো তাকে রক্ষা করা যেতে পারে। তুমি দেশের কাজ করতে চাও,—এই পরাজিত, পর্য্যুদস্ত দেশ-কর্ম্মীকে মানস সম্পদে পুনরায় সঞ্জীবিত ক'রে তোলাও কি কম দেশের কাজ সুমিত্রা? এতে হয়ত সাধারণ্যে তোমার নাম ছড়াবে

না, কিন্তু একটি আত্মার নিভৃত জীবনযাত্রায় পাবে তুমি নতুন স্বীকৃতি।...আমার সব কথা হয়ত স্পষ্ট ক'রে বুঝতে পারবে না তুমি আজ, যদি কোনো দিন সময় আসে তোমাকে জানাব, কিন্তু আজ আমি যা বলি সেইটুকুই তুমি শুনে রাখ। খোঁজ কর তুমি অনিরুদ্ধের।

সুমিত্রা　(ম্লানভাবে হেসে) দেখ অনেক কথাই তুমি বললে, কিন্তু একটা কথা শুধু ভেবে দেখলে না যে, মানুষের মন সব সময়ে যুক্তির ছক কেটে চলে না। (তারপর চেপে চেপে একটা নিশ্বাস ফেলে) তুমি যে আমার সত্যিকার মনের অবস্থাটা বুঝতে পেরেছ সেই আমার পক্ষে এখন সবচেয়ে বড় সান্ত্বনা। (কেমন বিমনা সুরে) অনিরুদ্ধের খোঁজ আমি নেব। কিন্তু এ আমি কী ক'রে তোমাকে বলি যে তাকে আমি—(সহসা উত্তেজিত হ'য়ে) মানুষের মন কি একটা যন্ত্র, প্রিয়ব্রত ? (ব'লে মুখ ফিরিয়ে হাত দিয়ে মুখ ঢাকলেন।)

প্রিয়ব্রত　(ধীরে তাঁর একখানি হাত তুলে নিয়ে কণ্ঠস্বরে গাঢ় সহানুভূতির আবেশ ছড়িয়ে) যেদিন মানুষের মন এমন যন্ত্রের মত দুর্ব্যবহার পাবে না, সেই বন্ধনহীন দিনের জন্যই আমার সাধনা, সুমিত্রা। যতদিন তা না ঘটে ততদিন আমরা আত্মকর্তৃত্বহীন ক্রীতদাস, আমাদের মন আবেগমর্য্যাদাহীন যন্ত্র।...ইতিমধ্যে একটু কষ্ট, (অকস্মাৎ সুমিত্রা দেবীর দুখানি হাত ধ'রে সহজ হাসির সঙ্গে মিনতি সুরে) সহ্য করলেই বা একটু সুমিত্রা ?

(সুমিত্রা দেবী তার এই অপ্রত্যাশিত সহজ কিন্তু সুলভ সরল আচরণে বিস্মিত হ'য়ে তার মুখের দিকে চাইলেন। তারপর ধীরে ধীরে হাসলেন—সহজ শিশুসুলভ সরল হাসি।)

ক্রমশঃ

মণীন্দ্র রায়

ভারতীয় সমাজ-পদ্ধতির উৎপত্তি ও বিবর্ত্তনের ইতিহাস

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

হিন্দু সামাজিক রাষ্ট্র

এই সমস্যা নিয়াই কথা উঠে—হিন্দু-রাষ্ট্র মধ্যে বিভিন্ন শ্রেণীর স্থান কোথায় ? এ সম্বন্ধে ইতিপূর্ব্বে আলোচনা হইয়াছে। এখানে স্মরণ করিতে হইবে যে হিন্দু-রাষ্ট্র যোদ্ধৃ ও ধর্ম্মভাব সমন্বিত রাষ্ট্র (military-sacerdotal state)। প্রাচীন ইউরোপীয় আর্য্যভাষীদের রাষ্ট্রও তদ্রূপ ছিল। কিন্তু ঐতিহাসিকেরা বলেন যে হিন্দুরাষ্ট্র কখনও দেব-রাষ্ট্রে (Theocratic state) পরিণত হয় নাই। অথচ পুরাণ ও স্মৃতি পাঠে এই তথ্যই প্রাপ্ত হওয়া যায় যে রাজা "বিশেষ যত্নে বর্ণাশ্রমের ব্যবস্থা করিবেন। তাম্রলিপিসমূহে রাজাকে বর্ণাশ্রমের "আশ্রয়স্থল" অথবা 'সর্ব্ব বর্ণাশ্রম ব্যবস্থাপণপ্রবৃত্ত' বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। (১ক) যাহারা ধর্ম্মচ্যুত রাজা পুনরায় তাহাদিগকে স্বধর্ম্মে স্থাপন করিবেন * (মৎস্য, ২১৫।৬২-৬৩); পুনঃ যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা (১।৪৬) বলে—রাজা কুল, জাতি, শ্রেণী, গণ এবং জনপদসমূহ স্বধর্ম্মভ্রষ্ট হইলে তাহাদিগকে অপরাধ অনুযায়ী দণ্ডপ্রদান করিয়া পুনঃ ধর্ম্মপথে আনয়ন করিবেন। হিন্দুরাষ্ট্র জনসাধারণের দ্বারা গঠিত আইনের (constitution) উপর ভিত্তি স্থাপিত, ধর্ম্মসম্পর্ক-বিরহিত হালের ন্যায় রাষ্ট্র (secular state)

---

* জনৈক শূদ্র তপস্যা করিতেছিল বলিয়া তাঁহার বিরুদ্ধে ব্রাহ্মণদের আনীত অভিযোগক্রমে রামচন্দ্র তাঁহার মস্তকচ্ছেদন করেন বলিয়া রামায়ণে যে-কাহিনী বর্ণিত আছে তাহা উক্ত নীতি-প্রসূত।

(১ক) দেব পালদেবের তাম্র শাসন (৫ম পংক্তি), গৌড়লেখমালা ; ৩য় বিগ্রহ পালদেবের তাম্রশাসন, গৌড়লেখমালা, সর্ব্ববর্ম্মণের আশীড়গড় তাম্রশাসন, Corpus Inscriptionum Indicarum, Vol. III. P221, [এবং হর্ষবর্দ্ধনের মধুবন তাম্রশাসন (P232)] দ্রষ্টব্য।

ছিল না (১খ) বা এখনও নয়—ইহার সহিত ধর্ম্মের সম্পর্ক বিভিন্ন ও পৃথক করা যায় না। ধর্ম্ম রক্ষা করাই হইতেছে রাষ্ট্রের কর্ত্তব্য; ইহা বর্ণাশ্রমীয় ও বৌদ্ধ উভয়ের মত হইতে পারে বলিয়াই মনে হয়। পুনঃ "ধর্ম্মরাজ্য সংস্থাপন" করিবার কথাও মহাভারতে উল্লিখিত আছে। ইহার ফলে প্রাচীন আর্য্যদের যে সামাজিক-রাষ্ট্র (Social State) সমুদ্ভূত হইল তন্মধ্যে বিভিন্ন শ্রেণী সমূহের পদও নির্দ্ধারিত হয়। হিন্দুরাষ্ট্র কোনকালেই শ্রেণী-বিহীন ছিল না। হিন্দু-রাষ্ট্র সম্পর্কে অধ্যাপক সরকার বলেন "প্রজা রাষ্ট্রে সংঘবদ্ধ হইলেই পৃথিবীর যে-কোন অংশে বা যুগেই হউক না কেন বর্ণাশ্রমের উদ্ভব হয়—রাষ্ট্র সমুদ্ভূত হইবে অথচ বর্ণাশ্রম থাকিবে না, একথা অচিন্তনীয়। "As soon therefore, as the praja is organised into a state, be it in any part of the world or in any epoch of history, a *Varnasrama* spontaneousy emerges into being. It is inconceivable, in this theory, that there should be a state and yet no Varnasrama." (২) যখন হিন্দু রাষ্ট্র বর্ণাশ্রমের সহিত বিজড়িত ও উহা রক্ষা করিবার ভার রাজার উপর ন্যস্ত ছিল (৩) এবং এই রাষ্ট্রে ব্রাহ্মণবর্ণ অবধ্য, আর যখন ধর্ম্মানুশাসনে বিবিধ বর্ণের মর্য্যাদা আইন ও সম্পত্তি প্রভৃতির ব্যবস্থা বিভিন্ন প্রকারের ছিল তখন সেই রাষ্ট্রকে Secular State কি প্রকারে বলা যাইতে পারে ?

• (১খ) অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার ইহা অস্বীকার করেন। তিনি বলেন "Hindu states were thoroughly secular".—Political Institutions and theories of the Hindus, P 13. লেখক এই অভিমতের সহিত একমত হইতে পারেন না।

২। B. K. Sarkar—Op. cit. p 213. পুরাণাদিতে শাকদ্বীপ প্রভৃতি স্থানেও চতুর্ব্বর্ণের অস্তিত্বের বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে।

(৩) বাঙ্গলার সম্রাট ধর্ম্মপালদেব ব্রাহ্মণাদি বর্ণের স্ব-স্ব ধর্ম্মে প্রতিষ্ঠাপয়িতা [(শাস্ত্রার্থ ভাজা চলতো) স্থপাস্ত বর্ণান্ প্রতিষ্ঠাপয়তা স্বধর্ম্মে] বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। [দেবপাল দেবের মুঙ্গের লিপি; গৌড়লেখ মালা, পৃঃ ৪১—৪৪]

তৃতীয় বিগ্রহপালদেবের আমগাছি লিপিতে তাঁহাকে (বিগ্রহপালদেবকে) বর্ণাশ্রমের আশ্রয়স্থল [cf. চাতুর্ব্বর্ণ্য সমাশ্রয়ঃ সিতযশঃ (পুত্র), ১৩শ শ্লোক—গৌড়লেখমালা; পৃঃ ১২৬]

বর্ণাশ্রমীয় সামাজিক রাষ্ট্রে যখন বিভিন্ন শ্রেণী ছিল এবং তাহাদের মধ্যে উচ্চ ও নিম্নশ্রেণীয় বিভাগ ছিল তখন এই বিভাগের মধ্যে অধিকারী-ভেদ স্পষ্টই ধরা পড়ে। মোটামুটি দেখা যায়—দ্বিজ, সৎশূদ্র ও অসৎশূদ্র, এই তিনটি ভেদ রহিয়াছে। অন্ত্যজ ইহার বাহিরে অবস্থিত। এই সামাজিক ভেদ দ্বারা হিন্দু রাষ্ট্রে যে রাষ্ট্রিক অসুবিধা ভোগের বিভেদ ছিল তাহা অনুমান করিতে পারা যায়। তুলনামূলক পাঠ হইতে প্রাচীন রাষ্ট্র সমূহে দেখা যায় যে রাষ্ট্রীয় অধিকার-ভেদের সহিত সামাজিক অধিকার-ভেদও বিজড়িত ছিল। হিন্দুরাষ্ট্রে যখন 'বৈরদেয়', ব্যবহার ও দণ্ডে, বিবাহাদির নিয়মে, দ্বিজ ও শূদ্রে প্রভেদ ছিল, যখন দ্বিজের অনেক সুবিধা ভোগের অধিকার হইতে শূদ্র বঞ্চিত ছিল তখন তাহার পশ্চাতে যে রাষ্ট্রিক সুবিধা-অসুবিধা-অধিকারী-ভেদ ছিল না তাহা বলা চলে না। এইজন্যই কৌটিল্য শূদ্রকে 'আর্য্যগণ' বলিয়া তাহাকে পূর্ব্ব-বঞ্চিত অনেক অধিকার পুনঃ প্রদান করিয়াছিলেন।

এই আলোচনা দ্বারা ইহা বেশ বুঝা যায় যে চতুর্ব্বর্ণের সুখ-সুবিধা ভোগের বিবিধ ব্যবস্থার পশ্চাতে ছিল রাষ্ট্রীয় অধিকার (privilege) ভোগের পার্থক্য। কৌটিল্য যখন শূদ্রকে 'আর্য্য' বলিয়া গণ্য করিলেন তখন সে পূর্ণ নাগরিক অধিকার প্রাপ্ত হইল বলিয়া ধরিতে হইবে। কিন্তু হিন্দুর রাষ্ট্র-প্রসূত সামাজিক ক্ষেত্রে দ্বিজদের বিভাগের ন্যায় শূদ্রদেরও দুইটি বিভাগ দেখা যায়। শূদ্র চতুরাশ্রমের অন্তর্গত, কিন্তু অসৎ শূদ্র ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের সমস্ত সুবিধা ভোগ করে না। সে জলচল নহে, ব্রাহ্মণ্য পুরোহিত সে পায় না—যদিও বা তাহা (ব্রাহ্মণ পুরোহিত) পায় তাহা হইলে ঐ ব্রাহ্মণ পতিত হয়। আবার অনেক অসৎ শূদ্র অস্পৃশ্য, তাহারা ধোপা নাপিত পায় না।

এই অনুষ্ঠানগুলিকে শুধু ব্রাহ্মণ্যবাদের খামখেয়ালী প্রসূত না বলিয়া আবিষ্কার করিতে হইবে যে ইহার পশ্চাতে কি অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক কারণ ছিল। দেখা যায়, হিন্দুর সামাজিক-রাষ্ট্রে অধিকার সমূহ স্তরে স্তরে নিম্নের দিকে কমিয়া যাইতেছে। সৎ শূদ্র যে-সকল অধিকার ভোগ করিতেছে অসৎ শূদ্র তাহার অনেকগুলি হইতেই বঞ্চিত হইতেছে। রাষ্ট্র-শক্তিই আবার তাহাদিগকে অধিকার প্রদান ও সৎ শূদ্রে পরিণত করিতে পারে (বল্লালচরিত দ্রষ্টব্য) এবং সৎশূদ্রকে সৃষ্টি করিয়া আরও উন্নীত করিতে পারে

(রাজার শূদ্র হইতে ব্রাহ্মণ হওয়ার প্রবাদ ভারতের সর্ব্বত্রই আছে)। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণোক্ত কতকগুলি শিল্পী জাতির বিশ্বকর্ম্মার পুত্র বলিয়া উল্লিখিত হইতে দেখা যায় (১০।৮৯-৯৫)। ইহাদের মধ্যে স্বর্ণকার প্রভৃতি তিনটি জাতিকে ব্রহ্মার শাপে 'পতিত' বলা হইয়াছে। অথচ স্বর্ণকার ও 'ভিল্ল'কে প্রথমে 'সৎ শূদ্র' বলা হইয়াছে (১০।১৫-২৩)। এখানে দেখা যায়যে পতিত হইলেই 'অযাজ্য' এবং ব্রহ্ম-বৈবর্ত্ত পুরাণেও বর্ণিত আছে "ইহাদিগকে যিনি যজনীয় বা যাজ্য করিবেন তিনিও পতিত হইবেন।" (১০।১৫–২৩)

এই উক্তি হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে সৎ শূদ্র কতগুলি অধিকার হইতে বঞ্চিত হইলে সে অসৎ শূদ্রত্বে অবনমিত হয়। তাহা হইলে এইস্থলে বক্তব্য এই দাঁড়ায় যে হিন্দুর সামাজিক রাষ্ট্রে কতকগুলি অধিকার ভোগ নিয়াই দ্বিজত্ব, সৎ শূদ্রত্ব, অসৎ শূদ্রত্ব এবং অন্ত্যজের মধ্যে ব্যবধান রচিত হইয়াছে। প্রকৃত প্রস্তাবে রাষ্ট্রীক অধিকার নিয়াই অধিকারী-ভেদ উদ্ভূত হইয়াছে। এদিকে আবার বল্লালচরিত বলিতেছে, যখন বাঙ্গলার রাজা বল্লাল সেন কৈবর্ত্তদের 'জলচল' করিলেন তখন তাহারা লোক ব্যবহার মধ্যে আসিল।" পুনঃ ব্যাসপুরাণ হইতে উদ্ধৃত করিয়া এই পুস্তকে বলা হইয়াছে "রত্নাকর, স্বর্ণকার, রৌপ্যকার, লিপিকর, তাম্রকর, লৌহকার, শঙ্খকার, তন্ত্রিণ প্রভৃতি জাতি সৎ শূদ্র" (১।১৫—৬)। কিন্তু ইহাদের মধ্যে স্বর্ণকার ব্রহ্মশাপে পতিত —ইহা উপরেই দেখা গিয়াছে (আজও সামাজিকভাবে সর্ব্বত্র ইহারা পতিত)। এই পুস্তকে আরও বর্ণিত আছে "বল্লাল সেন কুম্ভকার, কর্ম্মকারদিগকে সৎ শূদ্র করিয়া লন (২৩।২০—২১)। রাজার নিজের নাপিতকে "ঠাকুর" করা হইল (২৩।২৪), অর্থাৎ তাহাকে অভিজাত উপাধি দেওয়া হইল। বল্লাল কতকগুলি দাস ব্যবসায়ী "সুহৃর্ম্মতি" অধম ব্রাহ্মণকে ব্রাহ্মণত্ব হইতে বিচ্যুত করিলেন ; বৈদিক ব্রাহ্মণগণের সহিত পরামর্শ করিয়া ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়দিগের কুল-বিশৃঙ্খলা দেখিয়া বীজ মাহাত্ম্য অনুসারে (২৩।২২—২৩) তাহাদিগকে পুনঃ সংস্কৃত করিয়া ব্রাহ্মণত্বে ও ক্ষত্রিয়ত্বে সুদৃঢ় করিয়া দিলেন"। তাঁহার শেষ কীর্ত্তি সুবর্ণ বণিকদিগকে পতিত করা (২৩।১৫)। ব্যবহারিক জীবনে সুবিধা প্রাপ্ত হওয়ার পশ্চাতে আছে রাষ্ট্রীক অধিকার ভোগ করা। কিন্তু যেখানে

আজ হিন্দুরাষ্ট্র (৪) নাই সেখানে সামাজিক পদ ও কর্ম্মের (functions) খোলসটা (structure) আছে, কিন্তু তাহার আসল রূপটা নাই। সেইজন্য এইসব অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠান সমূহের function গুলি ধরিতে পারা যায় না।

এইস্থলে ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে, যে আজকালকার অনেক পতিত ও অস্পৃশ্য জাতির প্রাচীন পরিচয় কি ছিল? পৃথিবীর ইতিহাসে সর্ব্বত্রই আজ পর্য্যন্ত দেখা যাইতেছে যে বিজিত জাতি সমূহ বিজয়ী জাতি সমূহ কর্ত্তৃক পদচ্যুত হইয়া রাষ্ট্র ও সমাজের অতি নিম্নস্তরে অবনমিত হইয়াছে। নানাপ্রকারের বিধি-নিষেধ দ্বারা তাহাদের "জলবাহী ও কাষ্ঠ কর্ত্তনকারী" জাতিতে পরিণত করা হইয়াছে। প্রাচীন গ্রীসের Thetis ও Helots জাতিগুলি এই প্রকারের ছিল। প্রাচীন জার্ম্মাণীর Serfsরা এই প্রকারের পরাজিত কৌমোদ্ভূত ছিল। আরব মুসলমানদের দ্বারা বিজিত দেশ সমূহের জারতুষ্ট্রীয় ও খৃষ্ট ধর্ম্মাবলম্বী পুরাতন শাসক শ্রেণীর লোকেরা ঘৃণিত 'জিম্মি'রূপে অবনমিত হয় (৫)। ভারতেও প্রাচীনকালে তদ্রূপ হইয়াছিল বলিয়া ধরিতে হইবে। আজকালকার বাঙ্গলার 'পোদ' ও 'বাগদী' জাতি কি বৈদিক সাহিত্যের 'বগদ' এবং 'পৌণ্ড্র' জাতি? অনেকে তাহাই অনুমান করেন (৬)। আলেকজাণ্ডারের সমভিব্যাহারী গ্রীক্ লেখকদের বর্ণিত পরাক্রমশালী 'গন্‌গ্রি (Gangri গ্রীক্ বহুবচনে Gan-garidæ; ল্যাটিনে Gangarities) জাতি আজ বাঙ্গলা ও মগধের কোথায় লুক্কাইত রহিল (৭)? 'অঙ্গ' নামক জৈন-ধর্ম্মপুস্তকে বর্ণিত প্রাচীন রাঢ়ের "চোয়াড়" জাতি আজ কোথায় লুকাইল? লেখক নরতাত্ত্বিক পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা ইহা বুঝিয়াছেন, যে-শারীরিক আকৃতি এই সকল তথাকথিত অস্পৃশ্য জাতি সমূহের মধ্যে প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহা উচ্চ জাতিদের মধ্যেও প্রাপ্ত হওয়া যায়।

৪। পাঞ্জাবের পার্ব্বত্য হিন্দুরাষ্ট্র সমূহে এবং নেপালে এখনও রাজাই "জাতি" প্রদান করে বলিয়া পর্য্যবেক্ষণকারীগণ বলেন।

(৫) P. K. Hitti—History of the Arabs, Pp 100—101; 843.

(৬) H. P. Sastri—History of the Magadhan Literature.

(৭) আজকাল একদল বাঙ্গালী লেখক এই উল্লেখ হইতে 'গঙ্গারাঢী' নামীয় একটা প্রাচীন বাঙ্গালী জাতির সৃষ্টি করিয়াছেন। এই শব্দের গ্রীক্ ব্যাকরণানুগত বহুবচনের রূপটির অর্থ না বুঝিয়াই তাঁহারা অনর্থের সৃষ্টি করিতেছেন।

এই সকল প্রাচীন কৌমের মধ্য হইতে যাঁহারা শ্রেণী-সংগ্রাম দ্বারা বর্ণাশ্রমের মধ্যে স্থান পাইয়াছেন তাঁহারা আজ উচ্চবর্ণের ও উচ্চজাতির লোক হইয়াছেন। আর যাঁহারা পশ্চাতে পড়িয়া রহিলেন তাঁহারাই পুরাতন নাম ও প্রাচীনকালের আর্য্যভাষীদের দ্বারা পরাজয়ের কালিমা বহন করিয়া পতিত বা অস্পৃশ্য আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছেন।

বর্ত্তমানে সাম্প্রদায়িক হিন্দুদের দ্বারাই অন্ত্যজ ও আদিমবাসীরা হিন্দুধর্ম্মের প্রতি আকৃষ্ট হইতেছেন; কিন্তু হিন্দুরাষ্ট্রের অভাবে আদিমবাসীরা সরাসরিভাবে বর্ণাশ্রমের অন্তর্গত হইতে পারিতেছে না। অন্ত্যজেরা তদ্রূপ উপরে উঠিতে পারিতেছেন না। তবে যেখানে যে-সুবিধা পাওয়া যায় তাহাই গ্রহণ করিয়া অনেকেই জাতি মর্য্যাদার উন্নতি বিধান করিতেছেন। জনশ্রুতি আছে, আশী বৎসর পূর্ব্বে শ্রীহট্টের জমিদারগণ মিলিত হইয়া সেখানকার একটা অনাচারণীয় জাতিকে জলচল করেন এবং বৈষ্ণব বাবাজীদের দ্বারা তাঁহাদিগকে বৈষ্ণব করিয়া হিন্দু করেন। ময়মনসিংহেও এরূপ প্রবাদ আছে। এই প্রকারে শ্রীহট্টের কাছাড়ীরা ও চেরাপুঞ্জীর খাসিয়াগণ বৈষ্ণব-হিন্দু হন। আবার অনেকস্থলে স্থানীয় জমিদার এবং নেতৃবৃন্দ বিপক্ষতাচরণ করিয়া অনেক অস্পৃশ্য জাতিকে জলচল করিতে রাজী হন না। অনেক জাতি আজ স্বীয় শক্তি বলে উন্নীত হইয়া উচ্চ হইতেছেন এবং বর্ত্তমানের রাষ্ট্রিক-আইন এই বিষয়ে সহায়তা করিতেছে।

ক্রমশঃ

শ্রীভূপেন্দ্রনাথ দত্ত

"কিউ"

কণ্ট্রোলের সারিতে আজ তিন দিন কামিনী এসে দাঁড়াচ্ছে, কিন্তু তিন দিনই তার চোখের সামনে দোকানের দরজাটা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে অন্ধকারের আতঙ্কের মত। আজ তিন দিন। কামিনীর পেটে একটা দানা পড়েনি। শুধু কি তারই? জ্বরে ধুকে ধুকে হরিহর পাঁচদিন আগেও কাজে বেরিয়েছে, দু আনা চার আনা যা পেয়েছে ঘরে এনেছে তাতে যা কিছু সংগ্রহ হয়েছে, আর কলের জল খেয়ে তারা তাদের পেটের জ্বালা শান্ত করেছে খানিকটা। ভাগ্যি কলের জলের দাম লাগে না। নইলে—ভাবতেও কামিনীর গলাটা শুকিয়ে ওঠে।

সামনে দিয়ে সিভিক্ গার্ড রুলের গুঁতোয় লাইন ঠিক করে চলে—"এই ঠিক হয়ে দাঁড়াও এধারে।"

কামিনী আর্ত্ত স্বরে বলে, "তিনদিন ফিরে গেছি বাবু, আজ চাল পাব তো?"

"সরে দাঁড়াও", গম্ভীর গলায় তাকে পেছনে ঠেলে দিয়ে সিভিক গার্ড পরণ পরিচ্ছদে কামিনীর চেয়ে মার্জ্জিত, গয়না-পরা একটি মেয়েকে কামিনীর আগে দাঁড় করিয়ে দিল।

ফিক্ করে হেসে মেয়েটী বল্‌ল, "জানতুমই দাদাবাবু যেকালে আছে সেকালে যখনই যাই আমার চাল নেয় কে? তারপর একটু ফিস্ ফিস্ ক'রে বলে, "দু সের কিন্তুক আজ দিতে হবে দাদাবাবু, ইন্দুর আবার আজ সেই ব্যথাটা বেড়েছে, তার একসেরও আমার ঠেঁয়ে দিও বুঝলে?" আঁচল থেকে একটা পান বের করে বলে, "খাবে নাকি দাদাবাবু, ভাল জর্দ্দা আছে।"

আপ্যায়িত সিভিক্ গার্ড মেয়েটীর হাত থেকে পান নেয়। সামনে পেছনে সব মেয়েরাই অসহিষ্ণু, অত চাল, তবু তারা সবাই পায় না কেন? এক বুড়ী আর একজনের কানে কানে বলে, "বলি জানিস নাকি? চাল যে পেছু দরজা দিয়ে বেরিয়ে যায়।" ওমনি একটা গুঞ্জন ওঠে, "ওমা আমরা সেই কখন থেকে হা পিত্যেশে বসে আছি আর তলে তলে এই কাণ্ড।" একটা দশ বারো বছরের মেয়ে চারদিকে চেয়ে নিজের জায়গা ছেড়ে এগিয়ে যাবার চেষ্টা করে অমনি এক বিধবা তার গালে ঠাস করে এক চড় বসিয়ে দেয়, "আচ্ছা

মেয়েতো, আমি এসেছি সেই কখন আর তুই এখুনি এসে আগে দাঁড়াতে চাস ? বলি ও হারামির বেটী—" কথায় কথায় বচসা বাড়ে গোলমালে লাইন থেকে ছিটকে কতক কতক এদিক ওদিক হয়ে যায়, শৃঙ্খলা-রক্ষাকারীরা মেয়ে ব'লে রেয়াৎ করে না, ঘাড়ে ধাক্কা দিয়ে আবার লাইনে এনে সবাইকে দাঁড় করে। হুমকি দিয়ে ওঠে সিভিক গার্ড, "মেয়ে মানুষ হয়ে নিজেদের মধ্যে মারামারি কর, লজ্জা করে না ?" ছোট ছেলে কোলে একটা মেয়ে এগিয়ে আসে, "পেটে জ্বালা ধরলে লজ্জা থাকে না বাবু, পুরুষ হয়ে মেয়েদের গায়ে হাত দিতে তোমাদের লজ্জা করে না তো কই ?"

"চোপরাও বজ্জাত মাগী", হুঙ্কার দিয়ে ওঠে কর্ত্তব্যপরায়ণ সিভিক্ গার্ড।

ঠেলাঠেলি আর গলা ধাকায় কামিনীর দেহটা-যেন ভেঙ্গে পড়তে চায় তবু আজ কামিনী মরিয়া, চাল আজ তার চা....ই। ছেলেটা শুকিয়ে আমসি হয়েছে হরিহর জ্বরে ধুকছে। তাদের দেশটাই না হয় সমুদ্রের কোপে পড়েছিল, সব দেশেই কি আগুণ লেগেছে ? চাল নেই, ডাল নেই, কেরাসিন নেই, কাপড় নেই, নেই বলতে পোড়াদেশে কি কিছুই নেই ? সহরে এসেছিল তারা লোকের কথায়, এখানে নাকি এলেই চাকুরী। আর খুঁটে নিতে পারলেই খাবার অভাব হয় না। এতো আর সমুদ্রের লোনা জলে ধোয়া পরিস্কার গ্রাম নয়—কিন্তু কই ? কোথায় খাবার ? ময়লা ফেলবার টিনের বেড়াগুলির মধ্যে যে এঁটো পাতাগুলো পড়ে তার মধ্যে পর্য্যন্ত এক কণা ভাত লেগে থাকে না। কামিনী শুনেছে যে পশু ছাড়া মানুষও ওর থেকে খাবারের কণা সংগ্রহ ক'রে পেট ভরাত। কি যে কাল যুদ্ধ—সেদিন আর নেই।

কামিনীর মনে পড়লো সেইদিনের কথা, পুরো একদিন নয়, এক ঘন্টাও নয়, কয়েক মুহূর্ত্ত। কয়েক মুহূর্ত্তে যে এমন অঘটন ঘটতে পারে তা কে জান্তো ? কিন্তু কেউ না জানলে হবে কি ? কথায় বলে প্রকৃতির মার। তাই সমুদ্রের জল যখন প্রচণ্ড বাতাসের বেগে ফুলে, ক্ষেপে, পাগলা হাতীর পালের মত গর্জ্জন করতে করতে মানুষের সাত পুরুষের ভিটেমাটী, মাথার ঘাম পায়ে ফেলে তৈরী করা ফসলের ক্ষেত, ঘরের পোষা জীবজন্তু, গাছপালা, পশুপাখী সব নিশ্চিহ্ন করে নিয়ে গেল, তখন কাপড়ে বাঁধা পরস্পরের দেহ

ছুঁয়ে কামিনী আর হরিহর বুঝলো তারা বেঁচে আছে, মাটীতে আছে, ভেসে যায়নি। এমন যে বাঁচা। তার পরেও তাদের না হোল শোক না হোল আনন্দ, কেবল দু'জনের মুখের ওপর দু'জনের দৃষ্টি ফ্যাল ফ্যাল করে ইতস্তত: ঘুরতে লাগলো। ব্যাপারটা যেন ভেল্কি।

এমন সময় খানিকটা দূরে কি যেন একটা নড়ে উঠলো; হরিহরের দিকে চেয়ে কামিনী বলেছিল, "ওমা, ওখানে ওটা কিগো? বড় মাছ টাছ উঠে এসেছে বুঝি?"

কাপড়ের গাঁট খুলতে খুলতে হরিহর বলছিল, "দুত্তোর মাছের নিকুচি করেছে, ভাগ্যি খড়ের গাদাটা ছিল তাই প্রাণে বেঁচে গেলাম, এমন সময় আবার মাছের সখ দেখ—"

কামিনীর চোখ কিন্তু সেই নড়ন্ত জীবটার দিকেই নিবদ্ধ ছিল, গাঁট খোলবার সঙ্গে সঙ্গেই সে এগিয়ে গেল, "দেখ এসে কাদের ছেলে যেন—।" এগিয়ে গিয়েছিল হরিহরও, মাছ নয়, কুকুর নয়, বেড়াল নয় কামিনীর দুই বাহুর ওপর সেদিন খাবি খাচ্ছিল একটা অসহায় মানব শিশু। হরিহরের কিন্তু ইচ্ছে ছিল না যে কামিনী ছেলেটাকে রাখে—একটু চুপ করে থেকে বলেছিল, "রেখে দে কামিনী, যাদের ছেলে তারাই নিয়ে যাবে, আমরাই এখন কোথায় যাব তার ঠিক নেই।" সেদিন কামিনী হরিহরের কথা শোনেনি। অসহায় শিশুটাকে নিজের উষ্ণ নিটোল বুকে চেপে ধরে সন্তানহীনা কামিনী সদ্য সন্তান লাভের একটা মধুর অনুভূতি অনুভব করেছিল। তারপর দিনের পর দিন তারা মৃত মানুষ আর পশুর ভাসমান অসংখ্য মৃতদেহের ভীষণ একতার মধ্যে দিয়ে, বিষাক্ত গন্ধের মধ্যে দিয়ে এসেছিল অপেক্ষাকৃত জনসঙ্কুল গ্রামে; কতকগুলো দিন তাদের কেটেছিল ভিক্ষা আর মিনতি করে, বিনিময়ে কোথাও সদয় ব্যবহার পেয়েছে কোথাও পেয়েছে নির্দ্দয় নির্ম্মম অবহেলা। তবু নৌকো নিয়ে যে বাবুরা গিয়েছিল তাদের দয়ায় তারা অনেক লোক তখনকার মত বেঁচে গিয়েছিল। সেই থেকে আজ ছয় মাস কামিনীর আর হরিহরের মধ্যে মূর্ত্তিমান বিবাদ ওই ছেলেটা। আহা অতটুকু নি:সহায় শিশু, হয়ত ওর হতভাগা মা বাপ কোথায় কোন অতলে তলিয়ে গেছে, তাকে কামিনী ফেলে দেবে কোথায়? যদি তার নিজেরই হত। পারতো কি হরিহর এমন করে বলতে?

তবুও এতদিন যা জুটেছে আগে হরিহরকে দিয়ে পরে যা হয় দিয়ে ছেলেটাকে বাঁচিয়ে রেখেছে কামিনী—তাও ছেলেটাকে যেটুকু দেয় তাতেই হরিহর চটে যায়, বলে, "হুঁ আপনি শুতে ঠাঁই নেই শঙ্করাকে ডেকে আন মাধ্যখানে শোওয়াই, দেব যেদিন টান মেরে রাস্তায় ফেলে—।" টুকরো টুকরো কথা তন্ময় হয়ে ভাবছিল কামিনী, সিভিক গার্ডের ধমকানি শোনা যায়, "আরে! এ যে দেখছি কাণে শোনে না, এই—চাল নেবার ইচ্ছে টিচ্ছে আছে নাকি ?"

সচকিত হয়ে ওঠে কামিনী, আঁচল পেতে বলে, "হেই বাবা, দয়া করে দুঃখীর দিকে তাকাও।" মুচকি হেসে সিভিক গার্ড আর চাল বিক্রেতা দৃষ্টি বিনিময় করে।

তিন দিন পরে আজ কামিনী চাল পেয়েছে। হোক না তা লাল টক্‌টকে, হোক না আর্দ্ধেক ধান আর ছটাক-খানেক কম, তাতে কি! তবু চাল! তবু তার সৌরভ কামিনীর নাক পর্য্যন্ত উঠে আসছে। মনে হয় যেন কতদিন কামিনী চাল দেখেনি—একদিন ছিল যেদিন তাদের গোবর মাটী দিয়ে নিকোনো ধব ধবে উঠোনে ধান শুকাতো। সিদ্ধ ধানের হাঁড়ি কামিনী নাবাতে পারতো না, হরিহরকে ডাক্‌তো, "ওগো, একটু ধরবে এসো না, হাঁড়িটা যে বড্ড ভারি—"

হরিহর হাসত, বলত, "ছেলে নেই, পুলে নেই, কার জন্যে যে তুই খেটে মরিস কামিনী! এত চাল করে হবে কি ?"

কামিনীও হাসতো, মুখটা নীচু করে বলতো, "বারে! তুমি না বলেছিলে এবার ধান বেচবো না, চাল করে বেচলে লাভ হবে বেশী; তারপর সেই বাবা বৈদ্যিনাথের ওখানে গিয়ে ধন্না দেব, আরও যেন কি কি করবে ?"

"ওহো।" হো হো করে হেসে উঠতো হরিহর, "এসব কথা তো তোর ভুল হয় না কামিনী, যত ভুল বুঝি শুধু আমার বেলাতেই, না ?"

অপ্রতিভ কামিনী অকারণেই হয়ত ধান সেদ্ধর ন্যাতাখানা দিয়ে মুখ মুছতো বার বার।

চাল! চাল সেকি কম নাড়াচাড়া করেছে ? কোথায় গেল সে সব ভোজ-বাজীর মত মিলিয়ে, এক ফোঁটা খাবার জল শুদ্ধ গ্রামে তাদের ছিল না।

চালের আঁচলটা সাবধানে ধরে কামিনী বস্তিটাতে ঢুকলো, এরি একটা ঘরে তারা আশ্রয় নিয়েছে, পায়রার খোপের মত একখানা ক'রে ঘরে একটা

করে সংসার—প্রায় সন্ধ্যা হয়ে এসেছে, ঘরের মধ্যে ভাল করে দেখা যাচ্ছে না, সন্তর্পণে কামিনী ঘরে গিয়ে দাঁড়ায়। ঘরের এককোণে ছেলেটা অঘোর ঘুমুচ্ছে, পাশে হরিহর এপাশ ওপাশ কচ্ছে। কামিনী ঘরে ঢুকতেই সে খেঁকিয়ে উঠল, "বলি রোজ চাল আনবার নাম করে তুই যাস কোথায় বল দেখি? এদিকে জ্বর গায়ে পড়ে থাকি তার ওপর রেখে যাস ওই কাঁদুনে ছেলেটাকে; তবু দেখছি আজ এখন কাঁদছে না, হুঃ যেন নবাব পুত্তুর, কাঁদলেই অমনি খাবার মুখের কাছে এসে যাবে—বলি হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইলি কেন? চাল পেয়েছিস?"

"হাঁ", বেশী কথা বল্‌বার সামর্থ্য আর ইচ্ছে কামিনীর নেই। ছেলেটার দিকে একবার চেয়ে দেখে কামিনী উনন্ জ্বালতে গেল। কতকগুলো ডাবের খোলা পানওয়ালার দোকানের সামনে থেকে কুড়িয়ে শুকিয়ে রেখেছিল, তাই দিয়েই কোন রকমে চাল তার সেদ্ধ হবে।

ভাত চড়িয়ে কামিনী হরিহরের কাছে গিয়ে বস্‌ল; একখানা হাত তার কপালে দিয়ে বল্‌লো, "জ্বর তো তোমার নেই এখন, মাথা তো ঠাণ্ডা।"

"আরো জ্বর থাকতে বলিস্ তুই? ব'লে একদিন উপোষ কল্লে জ্বর পালাতে দিশে পায়না তা তিন তিনটে দিন শুধু জলের ওপর—" তারপর কামিনীর দিকে চেয়ে একটু ক্রুর হাসি হেসে বলে, "জ্বর থাকলেই বোধ হয় খুসী হতিস তুই নয়? দিব্যি গরাসে গরাসে ভাত তুলে নিজে খেতিস আর তোর সোহাগী ছেলের মুখে দিতিস, কেমন?" উত্তেজনায় হরিহর ক্লান্ত হয়ে পড়লো।

"চুপ করে শুয়ে থাকোতো, ভাত হলে আগে তোমার পেট ঠাণ্ডা কর তারপর যা হয়......" বাঁকী কথাটা কামিনীর গলায় আটকে গেল, শুধু চোখের কোনটা একটু চিক্ চিক্ করে উঠ্‌ল।

মুখ নীচু করে উননের পাশে গিয়ে বস্‌ল কামিনী একটা কাঠি হাতে করে। মাটীর হাঁড়ি, আর বাঁশের কাঠি, এই তার রান্নার সরঞ্জাম। খান কয়েক শালপাতা ঘরের এক কোনে জড় করা রয়েছে, ও হ'তেই খাবার কাজ চলবে।

ভাত ফুটছে—ফুটন্ত ভাতের ঘ্রাণ ছোট্ট ঘংখানির রন্ধ্রে রন্ধ্রে ছড়িয়ে পড়েছে। ভাতের যে এমন সুঘ্রাণ বেরোর তা আগে হরিহরের জানা ছিল না, প্রত্যেক নিঃশ্বাসকে দীর্ঘতর করে হরিহর সেই ঘ্রাণ টেনে নিতে লাগলো।

"হলো ভাত ?" তার ধৈর্য্য আর মানে না।

শান্ত স্বরে উত্তর দিল কামিনী, "হলো বলে," ভাতের গন্ধে তারও তিন দিনের উপোষী নাড়ী চঞ্চল হয়ে উঠেছে।

"হলো বলে", ভেংচি কেটে হরিহর বল্‌ল, "কত দেরী তাই বল্ না ?"

হরিহরের কথার মাঝখানেই কামিনী ধপাস করে হাড়িটা নামিয়ে বল্‌লো, "বসো।"

শাল পাতায় ফেন শুদ্ধ ভাত আর খানিকটা নুন ছড়িয়ে দিয়ে কামিনী এবার ছেলেটার দিকে এগিয়ে চললো। সেই কখন ওই কচি ছেলেটাকে সে রেখে গেছে, একবার ছোঁবারও অবসর পায় নি।

হন্যে কুকুরের মত একলাফে ভাতের পাতাটার সামনে গিয়ে বস্‌ল হরিহর।

"একি !" ছেলেটার গা এমন ঠাণ্ডা কেন গো ? ডুকরে উঠল কামিনী শক্ত আর ঠাণ্ডা ছেলেটাকে বুকে জড়িয়ে ধ'রে।

তার দিকে একবার চেয়ে পরম তৃপ্তির আভায় হরিহরের মুখখানা ঝলসে উঠলো। তারপর গ্রাসের পর গ্রাস ভাত সে মুখে তুলে দিতে লাগলো যেন এবার আর কোন বাধা নেই সামনে, সে একাই এই ভাতগুলোর অধিকারী।

শ্রীশান্তি দেবী

সোমেন চন্দ

মহৎ কর্ম্মপ্রেরণায় আত্মদান বৃথা যায় না। বিশ্বমানবের কল্যাণে ইংলণ্ডের তরুণ বিপ্লবী সাহিত্যিক রালফ ফক্সের (Ralph Fox) আত্মদান গণমানবের মুক্তি-সংগ্রামের ইতিহাসে উজ্জ্বল হয়ে থাকবে। বছর চারেক আগের কথা। ঢাকা বুড়ি গঙ্গার তীরে বসে তরুণ যুবক সোমেনের সাথে এই কথাটাই হচ্ছিল। আগ্রহ-ভরা গভীর প্রাণে সোমেন ভাবছিল,—স্পেনে গণসমষ্টির জাগরণ ও আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রয়াস—আন্তর্জ্জাতিক বাহিনী—বৃটেনের গণ-সাহিত্যিক, বৃটেনের বিপ্লবী কমিউনিষ্ট রালফ্ ফক্সের স্পেনের আন্তর্জ্জাতিক বাহিনীতে যোগদান—স্পেনের জনগণের ধন-সম্পদের মালিক ফ্যাসিষ্টদের বিরুদ্ধে স্বাধীনতার সংগ্রাম—বিদেশী কবি, সাহিত্যিক, অধ্যাপক ও রাজনৈতিক কর্ম্মীদের জীবন উৎসর্গ—এই সব টুকরা টুকরা কথাগুলি একত্রে মিলিয়ে সোমেনের মনে এক অপূর্ব্ব ভাব, বিস্ময় ও পুলকের সঞ্চার হল। সোমেন জিজ্ঞাসু ভরা প্রাণে বলে উঠল,—'সাহিত্যিকও মরণের মাঝে ঝাঁপিয়ে পড়ল?' আমি বললাম, অত্যাচার যখন চরমে উঠে, মানবতার বিকাশ যখন রুদ্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়, তখন কলম ছেড়ে তরবারি ধরতে হয়—বুকের রক্তে তখন নূতন সাহিত্য তৈরী হয়। ধন-শোষণ-মদমত্ত ফ্যাসিষ্ট বর্ব্বরতার বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক স্বাধীনতা রক্ষার সংগ্রামে কবি ও সাহিত্যিকগণ তাই স্পেনের আন্তর্জ্জাতিক বাহিনীতে ছুটে গিয়েছিলেন। সাহিত্য সাধনায় লাঞ্ছিত গণমানবের মর্ম্মকথা ফুটিয়ে তোলবার যে-প্রেরণা সেই প্রেরণাই লেখককে গণমানবের মুক্তি-সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ার শক্তি দিয়েছে। সোমেন চুপ করে শুনে একটু পরে বলল, 'এঁরাই সত্যিকার সাহিত্যিক।' রাত্রিতে আমরা ফিরলাম। সোমেন তার গুটি দুই তিন লেখক বন্ধুদের নিয়ে নূতন সাহিত্যের কথা বলতে বলতে বাড়ী গেল।

এরা সবাই ছোট ছেলে—২০।২২ এর বেশী বয়েস কারও নয়। সবে মাত্র কলেজের পড়া ছেড়েছে। কেউ গল্প লেখে, কেউ কবিতা, কেউ বা একটা আধটা প্রবন্ধ। একে অন্যকে পড়ে শুনায়। স্থানীয় মাসিক পত্রে মাঝে মাঝে প্রকাশ করার সুযোগও পায়।

ঢাকা সহরে ছোট বড় অনেক মত্তবিত্ত শ্রেণীর যুবকদের তথাকথিত রাজনীতিক বিপ্লব-সঙ্ঘ আছে। এরা কোন দলেই যায় নাই। সোমেন একদিন বলে, দলের টানাটানি আমাকে অনেক সহ্য করতে হয়েছে, কিন্তু আমি তাদের সঙ্গে যাই নাই—কেবল মারামারি রেশারেশি ওদের কাজ, আমার ভাল লাগে না।

আন্দামান-ফেরতা, টেররিষ্ট বিপ্লবী দলের পুরানো কর্ম্মী বলে, সে প্রথমটায় আমার দিকে আকৃষ্ট হয়। প্রথম দিনের পরিচয়েই আমি তাকে বলি,—সাহিত্য রচনার পথেও বিপ্লবের কাজ হয়। তুমি দেশের দারিদ্র্য-পীড়িত দুঃখী জনগণের আশা উদ্যমহীন জীবনের কথা দিয়ে জীবন্ত গণসাহিত্য তৈরী কর—তা হলে তোমার ঈপ্সীত স্বাভাবিক কর্ম্মপথই ভবিষ্যৎ গণ-বিপ্লবের পথ প্রস্তুতের সহায়ক হতে পার। লেখার দিকেই তার বেশী টান এইটে বুঝেই ঐ কথা বলেছিলেম। সোমেন সব কথাই মনোযোগ দিয়ে শোনে কিন্তু কিছু বলে না। তবু তার আগ্রহটা বোঝা যায়।'

১৯৩৯ সালের মাঝামাঝি সোমেন তার দক্ষিণ মৈশণ্ডী পাড়ায় আমাদের কমিউনিষ্ট পাঠ চক্রে যোগ দেয়। গোপনে ক্লাশ হত। সে সমস্ত মন-প্রাণ দিয়ে শুনত—বেশী প্রশ্ন করত না। কৃষক-শ্রমিকের জীবন কথা, কোটি কোটি দরিদ্র জনগণের মর্ম্মব্যথা, তাদের সংগঠন, জাগরণ, মার্কস-লেনিন প্রদর্শিত সংগ্রাম পথে সাম্যবাদের নব জীবন তাকে নূতন প্রেরণা দিল। একদিন ক্লাশের পড়ার পর তার বাসায় গেলাম। নূতন কি লিখছ জিজ্ঞাসা করায় সে একটি গল্প পড়ে শুনাল। দেখলেম গল্পে আমার ক্লাশের পড়ার ছাপ পড়েছে। বেকার মধ্যবিত্ত পরিবারের দুঃখ অশান্তি, তারই পাশে মুসলমান গাড়োয়ান-দের দুর্গত বস্তী জীবন, অপর দিকে বাড়ীওয়ালা মহাজনের ধনৈশ্বর্য্যপূর্ণ প্রাসাদ—ধনীর নিদারুণ ঔদ্ধত্যপূর্ণ জীবনের দাম্ভিকতার ছবি ফুটেছে সোমেনের লেখায়। চাকা ঘুরছে, লেখকের বিষয়বস্তু, দৃষ্টিভঙ্গী আর পূর্ব্বের মত নাই। রসবোধ নূতনতর, গল্পসৃষ্টি ও লেখনভঙ্গী আগে থেকেই সুন্দর। বেশ ভাল লাগল সোমেনকে। শান্ত স্বভাব, সবল, কিন্তু গভীর ভাবের উদ্দীপনা জেগেছে প্রাণের পরতে পরতে। সোমেন কমিউনিষ্ট পার্টিতে ভিড়ে পড়ল। আগ্রহশীল বিশ্বস্ত কর্ম্মীর প্রশংসমান দৃষ্টি তার উপর। পুলিশের

খাতায় এখনও নাম ওঠে নাই, কাজেই 'দক্ষিণ মৈশণ্ডীর প্রগতি পাঠাগারের' পরিচালনভার পড়ল সোমেনের উপর। সোমেনের অমায়িক স্বভাবে পাড়ার ছেলেরা তার গুণমুগ্ধ। প্রগতি পাঠাগারের সাপ্তাহিক বৈঠকে সোমেনের গল্প ও প্রবন্ধ হত সব চেয়ে ভাল।

তখন ঢাকায় ৬।৭টা মাসিক ও সাপ্তাহিক পত্র ছিল। মধ্যযুগীয় ভাবধারা মিশ্রিত আধুনিক বুর্জোয়া মতের গল্প, প্রবন্ধ, আর্ট ও অস্পষ্ট রাজনীতি ছিল ঐ কাগজগুলির উপজীব্য। প্রগতিশীল নূতন লেখকগণ অজ্ঞাতকুলশীল ও অপাংক্তেয় ছিল—তেমন লেখন-প্রতিভাও এদের ছিল না। এই লেখকদের সংগঠন করে প্রতিক্রিয়াশীল বড় বড় সাহিত্যিকদের মাঝে একটা নূতন সাহিত্য-চক্র দাঁড় করানই ছিল আমাদের উদ্দেশ্য। নূতন গণসাহিত্য সৃষ্টির কাজে রনেশ দাশগুপ্তের উৎসাহ, রচনা-ক্ষমতা ও জ্ঞানবুদ্ধি যথেষ্ঠ প্রখর। এই যুবক মেধাবী লেখকের জোরেই আমরা "ঢাকা প্রগতি লেখক সঙ্ঘ" গঠনের কাজে অগ্রণী হলেম। বিভিন্ন পাড়ায় অজানা লেখকদের সঙ্গে সঙ্ঘ গঠনের কথাবার্ত্তা চলল। সোমেনের খুব উৎসাহ। মনের মত কাজ পেয়েছে। সনাতনী সাহিত্যের গোঁড়ামি এবার ভাঙ্গবে। সে তার পরিচিত অজানা অচেনা যুবক লেখকদের প্রগতি লেখক সঙ্ঘে টেনে আনল। বড়দের বাধা ঠেলে একত্রে দাঁড়াতে পারবে বলে নূতন লেখকদলের সকলেরই আগ্রহ, উৎসাহ খুব প্রবল। কমিউনিজম্ বা শ্রমিক-কৃষকের কথা আমরা কিছুই উল্লেখ করলাম না, কারণ তা সাম্রাজ্যবাদী শাসক ও দেশীয় বুর্জোয়া উভয়েরই রুচিবিরুদ্ধ। ভারতীয় ঐতিহ্য-প্রণোদিত চিরাচরিত রসাভিব্যক্তির স্থানে প্রগতিশীল মনোভাব, নূতন রসবোধ, নূতন দৃষ্টিভঙ্গী ও তার নব অভিব্যক্তির প্রতি তীব্র আকর্ষণ পুরানোর বিরুদ্ধে নূতনের বিদ্রোহ সূচনা করত। আমরা সেই বিদ্রোহী নবীন বুর্জোয়া লেখকদের নিয়ে নবযুগের সমাজতান্ত্রিক প্রগতির পথে নতুন সাহিত্যসৃষ্টির আশায় সংঘ গঠনে মনোযোগ দিলাম। এ সময়ে দরিদ্র গণশ্রেণীর প্রতি দরদ দিয়ে গল্প লেখার রেওয়াজ যুবক লেখকদের মধ্যে দেখা দেয়; প্রবীণেরা একে বিদ্রূপ করতেন, নিন্দা করতেন। আমরা নবীন প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ যুবক লেখকদের নিয়ে প্রগতি লেখক সঙ্ঘ গঠন করলাম। সপ্তাহে একদিন সঙ্ঘের বৈঠক হত। কবিতা, গল্প, সমালোচনা মূলক প্রবন্ধ পাঠ

করা হত এবং সাহিত্য বিষয়ে নানাবিধ আলোচনা হত। মিটিং-এর ব্যবস্থা করা, সকলকে খবর দেওয়া, নূতন সভ্য সংগ্রহ করার কাজে সোমেনের উৎসাহ থাকায় তারই উপর এ সকল কাজের ভার পড়ল। সে প্রত্যেক সভায় উপস্থিত থাকত, প্রায়ই গল্প লিখে নিয়ে আসত। ক্রমে তার লেখার ধারা ভাবাবেগ-সিক্ত বেদনার অভিব্যক্তি থেকে রূঢ় বাস্তবের চেতনায় রূপায়িত হয়ে বিপ্লব-খাতে প্রবাহিত হল, যা কিছু জড়, অনড়, সনাতন; যা কিছু গতানুগতিক, প্রগতি বিরোধী সবেরই মূলে সে করল কুঠারাঘাত। ফ্যাসিষ্ট স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে সে লিখবে এবং নিপীড়িতগণের বিপ্লবী সঙ্ঘ গঠন করবে এমনই তার সঙ্কল্প। পরে সে প্রগতি লেখক সমিতির সম্পাদক হয়।

সোমেন গল্প লিখত। ঢাকার মাসিক ও সাপ্তাহিকে মাঝে মাঝে তা বের হত। শ্রীহট্টের একটি মাসিকপত্রে এবং কলকাতার কোন কোন মাসিক পত্রেও তার গল্প প্রকাশিত হত। অনেক গল্প খাতাতেই থাকত—অজানা লেখকের লেখা কেই বা নেবে?

সোমেনের বন্ধুরা প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য, নারী জীবনের মাধুর্য্য এবং অজানার সুন্দর পরিকল্পনা নিয়ে কবিতা ও সাহিত্য রচনা করত—পাণ্ডিত্যপূর্ণ সমালোচনামূলক প্রবন্ধ লিখত। প্রগতি লেখকদের দলে ভিড়ে তাদের দৃষ্টিভঙ্গীর আমূল পরিবর্ত্তন হল, লেখন-প্রতিভার স্ফুরণ হল,—তারা ক্রমে ক্রমে বাস্তব-বাদী হয়ে উঠল—আত্মগত ভাবসৃষ্টির স্থানে বস্তুগত ভাব প্রকাশের দ্যোতনা হল তাদের মনে। সমাজ মনের সত্যিকার পরিচয় রূপায়িত হয়ে উঠল তাদের নূতন লেখায়—নূতন ভাবধারায়, নূতন চিন্তায় ও আলোচনায়। এক কথায় সকলেই গণ-মানবের দরদী সাহিত্যিক হয়ে পড়ল। সোমেনের চেষ্টায় ও আগ্রহে আমরা তার বন্ধুদের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করলাম—ক্রমশঃ তারা রাজনৈতিক কমিউনিষ্ট আন্দোলনের প্রভাবে এসে পড়ল। সোমেন ঐ দলের অগ্রণী কর্ম্মীরূপে তাদের আগে আগে চলেছিল!

সোমেনকে ঢাকার একজন প্রবীণ সাহিত্যিক বলেছিলেন, 'কি হে তোমরা নাকি একটা প্রগতি-লেখকর দল বেঁধেছ। সাহিত্যের আবার প্রগতি পশ্চাদ গতি কি? সাহিত্যে রস সৃষ্টি করতে পারলেই তা প্রকৃত সাহিত্য হয়।' সোমেন সৌজন্যের সহিত উত্তর দেয়—'রসবোধ ত সকলের সমান নয়, তাইতেই

যত দ্বন্দ বিরোধ। সেকালের জমিদারের প্রতাপ ঐশ্বর্য্য শাসন শোষণ দিয়ে পল্লী-গাথা রচিত হত, একালে পল্লীবাসী প্রজার দারিদ্র্য, অন্যায় উৎপীড়নের বিরুদ্ধে স্বাধীন প্রতিষ্ঠার প্রয়াস ফুটিয়ে তুলে সাহিত্য প্রাণবন্ত করে তুলতে হয়। প্রবীণ চায় জমিদারের প্রতিষ্ঠা, নবীন চায় জনগণের প্রতিষ্ঠা ও স্বাধীনতা। বুদ্ধিমান কোন লেখক হয়ত দুই বিবদমান পক্ষের মধ্যে একটা মধ্যম পন্থার মীমাংসা দিয়ে সাহিত্যে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করতে চাইবেন।' প্রবীণ ব্যক্তিটি উষ্মাভরে বলে উঠলেন, 'তোমাদের সেই এক কমিউনিজমের বুলি। রুশিয়া থেকে আমদানী করা সাহিত্য এ-দেশে চলবে না। তোমাদের প্রগতি লেখক-দলের সঙ্গে এইখানেই আমার বিরোধ।' 'এ শুধু আপনার মনের কথা—আপনার সঙ্গে তর্ক করা বৃথা'—এই বলে সোমেন চলে এল।

১৯৪০।৪১ সালে ঢাকার অনেক কমিউনিষ্ট জেলে গেল—অনেকে গোপনে কাজ করার জন্য ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়ল। সোমেন তখন বৈপ্লবিক কাজে আরো তৎপর হয়ে উঠল। সাহিত্যচর্চার অবসর বড় একটা রইল না। সে ঢাকা রেলওয়ে মজুর-ইউনিয়নে যোগ দিয়ে কাজ করতে লাগল; মজুরের বস্তিতে, কারখানার গেটে, এঞ্জিন সেডের কাছে কয়লার ধোঁয়ার নীচে দাঁড়িয়ে শোষিত শ্রমক্লান্ত মজুরদের সঙ্গে কথা কয়—ইউনিয়নের লাল পতাকার তলে সকলকে ঐক্যবদ্ধ হতে উৎসাহ দেয়। রেল-মজুররা তাদের তরুণ নেতা সোমেনকে বিশ্বাস করত—ভালবাসত। ফ্যাসিষ্ট বর্ব্বরতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার উদ্দীপনা তারা পেয়েছিল তাদের নেতা কমরেড সোমেনের কাছে থেকে।

সোমেন আগে একবার ঢাকেশ্বরী মিলে কিংবা নারায়ণগঞ্জের পাটকলে গিয়ে মজুরের জীবনের সঙ্গে পরিচিত হতে ইচ্ছা প্রকাশ করেছিল। কিন্তু লেখক-সঙ্ঘের থেকে তখন তাকে ছাড়া যায় নাই। পার্টির স্বার্থে আমরা তাকে লেখক-সঙ্ঘে রাখা অপরিহার্য্য মনে করেছিলাম। লেখক সঙ্ঘের স্বার্থেও ফ্যাসী-বিরোধী বিপ্লবী সাহিত্যিকের উপস্থিতি একান্ত বাঞ্ছনীয় ছিল।

সে মাঝে মাঝে ঢাকা সহরের আসে পাশে গ্রামে গিয়ে কৃষকদের দুঃখ দারিদ্র্যপূর্ণ একঘেঁয়ে জীবনের সন্ধান নিত। মজুর-কৃষকের লাঞ্ছিত অনাদৃত জীবন থেকে সে গণসাহিত্য রচনা করার প্রেরণা পেয়েছিল। 'সাহিত্যকে

শ্রমিক বিপ্লবের সহায়ক হতে হবে, ফ্যাসিজম্ ও ধনতন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাতে হবে।' আন্তর্জাতিক কমিউনিষ্ট সঙ্ঘের বিশ্ববিখ্যাত সম্পাদক ডিমিট্রভের লেখকদের প্রতি ঐ নির্দ্দেশ সোমেনের জীবনে প্রতিফলিত হয়ে ওঠার সম্ভাবনা দেখা গিয়েছিল।

তার অন্তরের প্রেরণা সাহিত্যে রূপ দেওয়ার আগেই ফ্যাসিষ্ট ঘাতকের ছুড়ি তার বক্ষ বিদীর্ণ করে দিল। প্রতিক্রিয়াশীল বর্ব্বর ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে প্রগতিশীল উন্নত গণতন্ত্রবাদের সংগ্রামে তরুণ বিপ্লবী সাহিত্যিক সোমেন চন্দই এদেশে প্রথম জীবন উৎসর্গ করল। মুক্তি-যুদ্ধের অগ্রণী সৈনিক তরুণ সাহিত্যিক সোমেন্ চন্দ মৃত্যু বরণ করে হ'ল স্পেন, সোভিয়েট ও চীনের আত্মদানকারী গণসাহিত্য-স্রষ্টাদের সাথের সাথী।

রেলওয়ে মজুর-সঙ্ঘ গঠনের কাজে সোমেন এমন কৃতিত্বের পরিচয় দেয় যে তাকেই ইউনিয়নের সেক্রেটারী নির্ব্বাচিত করা হয়।

প্রথম থেকেই সোমেনের লেখার দিকে ঝোঁক ছিল বলে কমিউনিষ্ট পরিচালিত প্রগতি-লেখক-সঙ্ঘে তার ডাক পড়ে সবার আগে, সেও তার সাহিত্যসাধনার স্বাভাবিক কর্ম্মপথে আগ্রহশীল ভরা প্রাণে যোগ দিয়ে নিজের লেখন-প্রতিভা বিকাশের সুযোগ করে নেয়। রাজনীতিক কর্ম্ম প্রেরণা তাকে উদ্বুদ্ধ করেছিল,—বিপ্লবী গণ-আন্দোলনকে বাদ দিয়ে শুধু সাহিত্য-সাধনায় নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখতে সে পারে নাই। ফ্যাসিষ্ট দানবের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা রক্ষা প্রচেষ্টায় সকল শক্তি দিয়েই অগ্রসর হওয়া তার কাম্য ছিল—তার জন্যেই সে সাহিত্য ছেড়ে শ্রমিক সংগঠনে লেগে যায়। তার লেখক বন্ধুদেরও সোমেন প্রথম টেনে আনে নূতন লেখক সঙ্ঘে। পরে তাদের কমিউনিজমের বিপ্লবী রাজনীতিতেও আকৃষ্ট করে তোলে। এইখানেই বাইশ বছরের যুবকের প্রতিভা ও কর্ম্মকুশলতার পরিচয়। লেখা দিয়ে ভাব-বিপ্লব আর কাজ দিয়ে রাষ্ট্র-বিপ্লব হয় সোমেন তা শিখেছিল।

ঢাকা জিলা ফ্যাসিষ্ট-বিরোধী সম্মেলনে রেল-মজুরদের একটি প্রশেশন নিয়ে আসার সময় প্রকাশ্য রাজপথে ফ্যাসিষ্ট রাজনীতিক গুণ্ডার দল সোমেনকে অতি নৃশংসভাবে হত্যা করে। তারা তাকে ভোজালী দিয়ে আঘাত করেছিল—মাথায় লোহার ডাণ্ডা মেরেছিল—চোখ উপড়ে দিয়ে-

ছিল। লাল পতাকা হাতে নিয়ে সে এসেছিল—লাল পতাকার নীচে দাঁড়িয়েই সে মরেছে। সোমেনের বুকের রক্তে লাল পতাকা উজ্জ্বল রঙীন হয়ে রইল, পৃথিবীর লাল ঝাণ্ডা উড্ডীন রাখতে গিয়ে পৃথিবীর দেশে দেশে যত লোক মৃত্যুর কোলে শুয়েছে সোমেন তাদের পাশেই ঘুমিয়ে পড়ল। স্পেনে আন্তর্জাতিক বাহিনীর নিহত রাল্‌ফ্‌ ফক্স ও অন্যান্য সহীদের আদর্শে যে জীবন আরম্ভ তাদের মরণ পথেই সে জীবনের অবসান। ভারতে তার তুলনা মেলে না।

সোমেনের সাহিত্য-প্রতিভা ছিল কিন্তু তা বিকাশের সময় হল না—গণ সংগঠনের বিপ্লবী কর্ম্মকুশলতা ছিল কিন্তু প্রকাশের সময় হল না। বিপ্লবের শত্রুর নির্ম্মম আঘাতে তরুণ বয়সেই তার জীবনান্ত হয়ে গেল। তবু এ জীবনের রক্তরেখায় বিপ্লব এগিয়ে চলবে উদ্বুদ্ধ গণজীবনের পথে।

সোমেনের শান্ত অমায়িক স্বভাব সকলকে আকৃষ্ট করেছিল—কারও সাথে তার শত্রুতা ছিল না। ঘটনার কয়েক মাস পরে শান্তভাবে আলাপ করতে করতে ফ্যাসিষ্ট দলের এক সরল যুবক অসতর্ক মুহূর্ত্তে আমাকে বলেছিল, সোমেন বাবুকে মারা ঠিক হয় নাই, তার প্রতি আমাদের কোন আক্রোশ ছিল না বরং তার শান্ত স্বভাবের জন্য আমরা তাকে ভালই মনে করতাম।

বিপ্লবী সোমেন, কমিউনিষ্ট সোমেন, ভারতের স্বাধীনতাকামী সোমেন ফ্যাসিষ্ট-বিরোধী সংগ্রামে আন্তর্জাতিক জন-যুদ্ধের বীর সৈনিক রূপে ২২ বছর বয়সে আত্মজীবন উৎসর্গ করে গণ-মানবের উদ্বুদ্ধ চেতনা সংগ্রামে মুখী করে রেখে গেল। তার অস্পষ্ট অর্দ্ধস্ফুট সাহিত্য ফুটে উঠবে, স্পষ্ট হয়ে উঠবে নূতন বিপ্লবী সাহিত্যে—নিপীড়িত গণ-মানবের মনোবেদনার দুর্জ্জয় হিংসার অভিব্যক্তিতে। *

শ্রীসতীশচন্দ্র পাকড়াশী

---

* কলিকাতা ফ্যাসি-বিরোধী লেখক ও শিল্প সঙ্ঘের উদ্যোগে আহূত সোমেন-স্মৃতি সভার বক্তৃতা।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত

আধুনিক জ্যোতির্বেত্তার হিসাবে আমাদের এই পৃথিবীকে বলা হ'য়েছে, অসংখ্য গ্রহ-তারকাকীর্ণ বিপুল এক নক্ষত্র-নগরীর ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ। দিনের আলোয় জীবনের অনির্বাণ কোলাহল, রাতের অন্ধকারে জ্যোতিষ্কের আশ্চর্য দীপ্তি—এই তো আমাদের বিশ্বজননীর রূপ। কিন্তু নীহারিকার চক্রপথ অতিক্রম ক'রে বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টি এগিয়েছে। ছায়াপথ পার হ'য়ে আবার কোটি যোজনের অন্ধকার, তারপর নতুন জগতের সীমারেখা, নতুন নগরীর দীপাবলী।

সাহিত্যের পথিমিতি-ও যেন এই হিসাবেরই অনুকূল। এই বিস্তীর্ণ সমুদ্রে শক্তিমান লেখকরা বিচ্ছিন্ন এক একটি মহাদেশের মতোই ভাসমান, তাঁদের মধ্যবর্তী ব্যবধানেই স্বল্পক্ষম রচয়িতাবর্গের অবস্থান। বাংলা সাহিত্যের আলোচনায় ভারতচন্দ্র থেকে মধুসূদন, এক মহাদেশ থেকে আর এক মহা-দেশের মতোই বিযুক্ত। কবিওয়ালার প্রতিনিধি ঈশ্বর গুপ্ত এই দুই ভূখণ্ডের মধ্যবর্তী সঙ্কীর্ণ এক যোজক।

এই পরিদৃশ্যমান জগতের অন্তর্গত কার্য-কারণ শৃঙ্খলের অস্তিত্ব বিস্মৃত না হ'য়েও, প্রতিভা-কে স্বয়ম্ভু বলা চলে। ভারতচন্দ্র মঙ্গলকাব্যের ধারা অনুসরণ ক'রেছিলেন সত্য, কিন্তু অন্নদামঙ্গল উচ্চ বংশের উত্তরপুরুষ মাত্র নয়—সৌন্দর্যে এবং ভাস্বরতায় অন্নদামঙ্গল আকস্মিক। মধুসূদন দত্তের আবির্ভাবও এই অর্থে আকস্মিক, সুতরাং বিস্ময়কর।

ধর্মের প্রাধান্য বিচারে বাংলাদেশ বাউল-বৈষ্ণবের দেশ। সাহিত্যের প্রবাহে এই ধর্মের রহস্যবোধ এবং আলুলায়িত, বিস্তারপ্রিয়, মন্থর প্রকাশরীতি উল্লেখযোগ্য দায়িত্বপালন ক'রেছে। এ দেশের শাক্ত সাহিত্য-ও এই প্রভাব থেকে মুক্তি পায়নি। রামপ্রসাদের গান বৈষ্ণব পদাবলীর অতি নিকট সম্পর্কিত। রামপ্রসাদ রাধা-কৃষ্ণের বিগ্রহের মধ্যস্থতায় মধুর রসাস্বাদনে ব্রতী ছিলেন না বটে, কিন্তু তাঁর বাৎসল্য-ভাবের ধর্মসঙ্গীতগুলি বৈষ্ণব পদাবলীর তুলনায় কম আবেগধর্মী অথবা অল্প আলুলায়িত নয়। একদা এই বাংলা দেশে তন্ত্রের বিপুল আলোচনা হয়েছে; নব্য ন্যায়ের জন্মভূমি হিসাবেও

আমাদের দেশ স্মরণীয়। কিন্তু তন্ত্রের ধর্ম গণতান্ত্রিক নয় এবং ন্যায়শাস্ত্রও জনসাধারণের মনোরঞ্জন করে না। সম্ভবতঃ এই সব কারণে আমাদের সাহিত্যের প্রকাশ-রীতিতে তন্ত্রের সংহতি অথবা ন্যায়ের যৌক্তিকতা এ দু'য়ের একটিও প্রভাব বিস্তার করেনি। পক্ষান্তরে, গণতান্ত্রিক বৈষ্ণব ধর্মের আলিঙ্গনে কার্পণ্য ছিল না ; বৈষ্ণব সাহিত্য-ও বাংলা এবং ব্রজবুলীর উদ্বাহ বন্ধনে, শব্দের মাধুর্যে এবং ছন্দের ঐশ্বর্যে জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সমস্ত দেশের হৃদয় হরণ ক'রেছিল। ভারতচন্দ্রের রচনায় সংহতি যে একেবারে ছিল না, এমন নয়। এই সংহতির গুণেই ইংরাজি সাহিত্যে Bacon এর কোনো কোনো উক্তির মতো ভারতচন্দ্রের বহু পংক্তি প্রবচনের প্রচলন-বাহুল্য লাভ ক'রেছে। এ দেশের সাহিত্যের ভাষায় মধুসূদনই প্রথম আনলেন মন্ত্রের সংহতি। তথাপি মধুসূদনের অল্প কয়েকটি উক্তিও যে ভারতচন্দ্রের রচনার মতো জনসাধারণের মুখে-মুখে প্রচলিত হ'তে পারেনি, তা'র কারণ মধুসূদনের কবিতার ভাষা জনসাধারণের ভাষার ধার ঘেঁষেও চলে না। কিন্তু যে সময়ে তাঁর সাহিত্যিক সাধনার সূত্রপাত, সেই উনবিংশ শতাব্দীর ষষ্ঠ দশকেই বাংলা গদ্যের ভাষা-প্রবাহে মোড় ফেরবার উপক্রম হ'য়েছে। রাধানাথ শিকদার এবং প্যারীচাঁদ মিত্র এই নতুন ধারা প্রবর্তনের অগ্রণী। মধুসূদন তখন হিন্দু কলেজের ভূতপূর্ব বিশিষ্ট ছাত্র, রাজনারায়ণ দত্তের মতো বিশিষ্ট ব্যক্তির সন্তান, বিশিষ্ট দেশীয় খ্রীষ্টান্, রাজভাষায় তাঁর অধিকারও বিশেষ প্রশংসনীয়। এতোগুলি বৈশিষ্ট্যের প্রভাবে মধুসূদন দত্ত খাঁটি বাঙালির সাধারণ, বিশেষত্বহীন লোকালয়ে অবতীর্ণ হ'তে সম্ভবতঃ কিছু কুণ্ঠিত ছিলেন। সে সময়ে কিশোরী চাঁদ মিত্রের দমদম রোডের, বাগানবাড়ীটি ছিল নব্যতন্ত্রের বঙ্গীয় সাহিত্যিকদের 'মারমেড্ ট্যাভার্ণ'। একদিন এই বাড়ীতে এক বৈঠকে প্যারীচাঁদ মিত্রের "আলালের ঘরের দুলাল"-এর ভাষার আলোচনা প্রসঙ্গে বাংলার চলিত ভাষা সম্বন্ধে মাইকেল দত্ত বলেছিলেন, "It is the language of Fishermen, unless you import largely from Sanskrit।" একমাত্র তাঁর দুটি প্রহসন ছাড়া অন্যান্য সমস্ত রচনায় মাইকেলের ভাষা তাই গুরু গম্ভীর। তাঁর নাটকে অবশ্য ভাষা অপেক্ষাকৃত সরল কিন্তু সেও সংস্কৃত গদ্যের অনুসরণে লেখা।

অলঙ্কারবাদী বামন বলে গেছেন, "কাব্যং গ্রাহ্যমলঙ্কারাৎ।" কিন্তু শুধু অলঙ্কারের কল্যাণে রমণীমাত্রই যেমন সুন্দরী হয় না, শুধু ভাষার নবত্বে রচনামাত্রই তেমনি নবীন হয় না। কাব্যশরীরের উৎকর্ষ সাধনের সঙ্গে সঙ্গে কাব্যের আত্মার বিকাশের দিকেও সমান দৃষ্টিপাত করা আবশ্যক। প্রকৃত মহৎ কাব্যে শব্দও প্রধান নয়, অর্থও প্রধান নয়,—প্রধান হ'চ্ছে এ দু'য়ের ব্যঞ্জিত অর্থ। এবং "স ধ্বনিরিতি সূরিভিঃ কথিতঃ।" পণ্ডিতেরা তাকেই বলেন 'ধ্বনি'। বাংলা কাব্যের ইতিহাসে বৈষ্ণব পদাবলী এবং লোকসাহিত্য ছাড়া অন্যান্য বিভাগে রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব পর্যন্ত মোটামুটি বহিরঙ্গ সাধনার বাহুল্যই লক্ষিত হয়। এর ব্যতিক্রম দেখা যায় মধুসূদনের চতুর্দশপদী কবিতাবলীতে। কিন্তু এই চতুর্দশপদী কবিতাগুলি ছাড়া তাঁর অন্যান্য কাব্যে 'ধ্বনি'-সৃষ্টি-র দিকে তিনি যথোচিত মনোনিবেশ করেন নি। 'মেঘনাদ-বধ-কাব্য' য়ুরোপীয় অর্থে epic নয় এবং সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রোক্ত মহাকাব্যের লক্ষণ বিশিষ্ট-ও নয়। তথাপি মেঘনাদ-বধ উৎকৃষ্ট কাব্য। কিন্তু এই গ্রন্থের চাকচিক্যময় শব্দাবলীর জ্যোতিঃ এবং অমিত্রাক্ষর ছন্দের তরঙ্গাঘাত অতিক্রম ক'রে,—কৃত্তিবাস, বাল্মীকি এবং মধুসূদনের রচিত কাহিনী পরম্পরার প্রবাহ অনুসরণান্তে পাঠক যখন নবম সর্গের সীমান্তে উপনীত হন তখন কোন্ আশ্চর্য message-ই বা তাঁর হৃদয়ায়ত্ত হয়? প্রকৃত মহাকাব্য বিশাল মহীরুহের মতোই ছায়া দেয়, আশ্রয় দেয়। মেঘনাদবধের আখ্যান এবং শৈলী লেখকের চাতুর্য এবং পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক সন্দেহ নেই, কিন্তু চাতুর্য এবং পাণ্ডিত্য কাব্যের বহিরঙ্গ সজ্জীকরণেই সমধিক পটু। তিলোত্তমা সম্ভব এবং বীরাঙ্গনা-কাব্যেও মধুসূদন ভাষা, ছন্দ এবং রীতির নৈপুণ্য-ই প্রকাশ ক'রেছেন। রোমক কবি Ovid এর Heroic Epistles এর আদর্শে ভারতীয় বীরাঙ্গনাকুলের চিত্রাঙ্কণ কবির ব্যাপক দৃষ্টির পরিচয় বহন ক'রে সত্য, আমাদের সাহিত্যের বহির্ভাগ প্রকৃতি পরিবর্তনে বঙ্কিম যেমন সহায়তা ক'রেছেন গদ্যে, মধুসূদন তেমনি করেছেন কাব্যে, তথাপি "বীরাঙ্গনা কাব্য" দেশের মাটিতে পদার্পণ ক'রতে সঙ্কুচিত। পৌরাণিক চরিত্রের স্বাভাবিক দূরত্বের দ্বারা এই সব বীরাঙ্গনারা আমাদের পরিচিত পরিবেশের বহু দূরবর্তী, তদুপরি, আলোচ্য কবির কৃত্রিম প্রকাশভঙ্গী বহুলাংশে এই দূরত্বের পরিমাণ বৃদ্ধির

সহায়তা করে। এর ফলে, তারা, রুক্মিণী, কেকয়ী, শূর্পনখা প্রভৃতি একাদশ বীরাঙ্গনা যাদুঘরের একাদশ মূর্তির মতো মৃতকল্প। চতুর্দশপদী কবিতাবলীতেই মধুসূদন কাব্যের হৃদয়াভিমুখে দৃষ্টিপাত ক'রেছেন। এর কারণ, বোধ হয়, প্রথমতঃ, মধুসূদন তখন তাঁর জীবনের শেষাংশে পদার্পণ করেছেন। নানা অভিজ্ঞতার তাড়নায় তখন জীবনে অপেক্ষাকৃত স্থির হবার দিন এলো,—তিনি নিজের হৃদয়ের গভীরতায় দৃষ্টিক্ষেপ করবার অবকাশ পেলেন। তারপর, এদেশে অবস্থানকালেই তিনি প্রথম 'সনেট্' লিখতে আরম্ভ ক'রলেও, চতুর্দশপদী কবিতাবলীর প্রায় সবগুলিই সুদূর বিদেশে ফ্রান্সে লেখা হয়। প্রবাসে স্বদেশের স্মৃতি স্বভাবতঃই মধুর এবং বিষাদকর। তৃতীয়তঃ, সনেটের form বা গঠনের প্রয়োজনেই তাঁকে অন্তর্মুখী হ'তে হ'য়েছে। সনেটের অষ্টক-ষষ্ঠকের বিভাগ ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ের মতোই হৃদয়-জিজ্ঞাসু।

ভারতচন্দ্র এবং মধুসূদনের কাব্যের বৈষম্য শুধু যে উভয়ের বৈদগ্ধ্যাশ্রয়ী, তাই নয়। ভারতচন্দ্রের এবং অন্যান্য বাঙালি কবির তুলনায় মাইকেল অবশ্য অনেক বেশি পণ্ডিত ছিলেন। কিন্তু মাইকেলের বৈশিষ্ট্য তাঁর ব্যক্তিত্বে। ছন্দের উৎকর্ষ সাধনে এবং নতুন ছন্দ সৃষ্টির পরীক্ষা-নিরীক্ষায় ভারতচন্দ্র প্রভূত সাহায্য ক'রেছেন। মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর ছন্দ-সৃষ্টি অথবা বাংলায় সনেটের প্রচলন এ হিসাবে কিয়দংশে ভারতচন্দ্রের প্রারব্ধ প্রবাহাশ্রিত বলা চলে। অবশ্য Blank verse এবং sonnet, এ দুই-ই তিনি বিদেশ থেকে আমদানি করেছিলেন। কিন্তু মধুসূদনের ব্যক্তিত্ব তাঁর পূর্ব্ববর্তী কোনো বাঙালি কবির-ই ছিলো না। বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে তাঁর প্রথম জীবনে অবজ্ঞা ছিলো। কিন্তু সে অবজ্ঞা কৃতবিদ্য, শক্তিমান, সাহিত্যরসিক, উন্নাসিক প্রতিভার অবজ্ঞা। তাঁর আত্ম-প্রত্যয় এবং সাহস অবিস্মরণীয়। বাংলা সাহিত্যে তাঁর আবির্ভাবের জন্য তাঁর বন্ধু গৌরদাস বসাক-কে অবশ্যই ধন্যবাদ দিতে হয়। Captive lady, Rizia প্রভৃতি ইংরাজি কাব্যের লেখক, মাদ্রাজ-প্রবাসী মধুসূদনকে বাংলা সাহিত্য জগতে লেখনী ধারণ করতে প্রথম প্রণোদিত করেন তিনি-ই। তারপর তৎকালীন 'শিক্ষা-সমাজের' সভাপতি বেথুন সাহেব-ও মধুসূদনের Captive lady পড়ে তাকে বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে আত্মনিয়োগ করবার উপদেশ দিয়ে-ছিলেন। এই মাদ্রাজ-প্রবাস কালেই তিনি বাংলা রামায়ণ এবং মহাভারত

নতুন ক'রে প'ড়তে আরম্ভ করেন। ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই আগষ্টের এক চিঠিতে বন্ধু গৌরদাসকে তিনি তাঁর তৎকালীন রোজনামচার পরিচয়ে, হিব্রু, গ্রীক্, তেলেগু, সংস্কৃত, ল্যাটিন এবং ইংরাজি পাঠে তাঁর অকল্লেয় অধ্যবসায়ের কথা লিখে উপসংহারে প্রশ্ন ক'রেছিলেন, "Am I not preparing for the great object of embellishing the tongue of my fathers ?" তাঁর এই অধ্যবসায়-ও বাঙালি কবিদের ইতিহাসে নতুন দেখা গেল। এবং এই পরিশ্রমে তাঁর কোনোদিন ক্লান্তি ছিল না। এই অধ্যবসায়ের ফলেই তিনি অসীম আত্ম-প্রত্যয়ের অধিকারী হ'য়েছিলেন। তার নিদর্শন পাওয়া যায় তাঁর প্রথম যুগের নাটক রচনার ইতিহাস প্রসঙ্গে।

বাংলা নাট্যাভিনয়ের ইতিহাসে ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দ একটি স্মরণীয় বৎসর। এর পূর্বে ক'লকাতা সহরে স্বদেশী এবং বিদেশী চেষ্টায় এখানে-সেখানে অভিনয়ের ব্যবস্থা হ'য়েছিল বটে, কিন্তু, যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর এবং পাইকপাড়ার রাজাদের আন্তরিক উদ্যোগে 'বেলগেছিয়া থিয়েটরের' যখন জন্ম হ'লো, তখন থেকেই অভিনয়ের প্রতি বঙ্গীয় রসিক মণ্ডলীর আগ্রহ উত্তরোত্তর বর্ধিত হয়। এখানে রামনারায়ণ তর্করত্নের "রত্নাবলী" নামক নাটকখানির অভিনয়ের ব্যবস্থা হয়। দর্শকদের মধ্যে ইংরেজ এবং বাংলা ভাষায় অনভিজ্ঞ অন্যান্য সম্প্রদায়ের লোক-ও ছিলেন অনেক। সুতরাং ইংরেজি ভাষায় এর অনুবাদ প্রকাশ আবশ্যক বিবেচিত হ'লে পাইকপাড়ার রাজাদের আমন্ত্রণে মধুসূদন দত্ত অনুবাদের দায়িত্ব গ্রহণ ক'রলেন। বাংলা নাটকের ক্ষেত্রে এইভাবে যখন তাঁর দৃষ্টি আকৃষ্ট হ'লো, তখন তিনি ঐ ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দেই মহাভারতের আদিপর্বে বর্ণিত শর্মিষ্ঠা-যযাতি-দেবযানীর কাহিনী অবলম্বন ক'রে একখানি নাটক রচনা করেন। পাইকপাড়ার সভাপণ্ডিত ,খ্যাতনামা প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ এই শর্মিষ্ঠা নাটকে সংস্কৃত নাট্যসূত্রে বর্ণিত রীতির ব্যত্যয় লক্ষ্য করে যখন এই বইখানির নিন্দা করেন, তখন আত্মপ্রত্যয়শীল, মধুসূদন বলেন, "I shall either stand or fall by myself।" এই উক্তি থেকেই বোঝা যায় সমন্বয় এবং সমাহারের ঔচিত্যে তাঁর কী দৃঢ় আস্থা-ই না ছিলো। প্রেমচাঁদ মধুসূদন-কে সংস্কৃত রীতি অনুসরণ করে 'শর্মিষ্ঠা' রচনা করবার পরামর্শ দেন, পক্ষান্তরে, মাইকেল এই গ্রন্থের পাশ্চাত্ত্য সৌরভে বিশেষ প্রসন্নতা লাভ করেছিলেন ; কিন্তু আধুনিক পাঠকের

চোখে শুধু "শর্মিষ্ঠা" কেন, "পদ্মাবতী" এবং বিয়োগান্ত ঐতিহাসিক নাটক "কৃষ্ণকুমারী"-তেও সংস্কৃতের প্রভাব নগণ্য নয়। বিশেষ ক'রে "শর্মিষ্ঠা" এবং "পদ্মাবতী"—এই দু'খানি নাটকে সংস্কৃতের ছোপ অনপনিত। তৎসত্ত্বেও উপরোক্ত তিনখানি গ্রন্থে তাঁর আত্মনির্ভরশীল, বিদগ্ধ, কবি-হৃদয়ের ক্রমিক বিবর্তনের যে-পরিচয় পাওয়া যায় তা'র মূল্য অসামান্য।

"চতুর্দশপদী কবিতাবলী" এবং "ব্রজাঙ্গনা কাব্য" ব্যতিরেকে নাটক এবং কাব্য রচনায় মধুসূদন সংস্কৃত সাহিত্যের ঐতিহ্য অনুসরণ করেছেন। কিন্তু পূর্বোক্ত দুই কাব্যে এবং তাঁর দুখানি প্রহসনে তিনি বঙ্গীয় কবিকুলেরই উত্তরাধিকারী স্বরূপ। বৈষ্ণব পদাবলীর প্রভাব রবীন্দ্রনাথেও স্পষ্ট এবং "ভানুসিংহের পদাবলী" ব্রজাঙ্গনাকাব্যেরই পরবর্তী সার্থকতর সংস্করণ। বৈষ্ণব পদাবলীর গতানুগতিক ভাষা এবং রীতি অনুকরণ করলেও, বৈষ্ণব কাব্যের আর্তি মধুসূদন উপলব্ধি করেন নি, তথাপি কাব্যরূপ বিশেষের পরীক্ষা হিসাবে 'ব্রজাঙ্গনা কাব্য' তাঁর সজীবতারই পরিচায়ক।

উনবিংশ শতাব্দীর বঙ্গীয় সমাজ ও সাহিত্যের ইতিহাসে ১৮৫৬ থেকে ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত যে সময় অতিবাহিত হয়েছে, শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় তাকে বলেছেন, মাহেন্দ্রক্ষণ। এই সময়ের মধ্যেই বিধবা-বিবাহ আন্দোলন, সিপাহী বিদ্রোহ, নীলকর-ঘটিত সামাজিক চাঞ্চল্য, বিখ্যাত সাংবাদিক হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের আবির্ভাব, সোমপ্রকাশ-পত্রের অভ্যুদয়, দেশীয় নাট্যশালার প্রতিষ্ঠা, কেশব সেনের সহায়তায় ব্রাহ্মসমাজের শক্তি-বৃদ্ধি, কবি ঈশ্বর গুপ্তের তিরোভাব এবং মাইকেল মধুসূদন দত্তের সাহিত্য ক্ষেত্রে আবির্ভাব ঘটে। সামাজিক ইতিবৃত্তের এই পরিপ্রেক্ষিতে কবি মধুসূদন বর্তমান ছিলেন, একথা ইতিহাস-অনভিজ্ঞ পাঠকের পক্ষে বিশ্বাস করা কঠিন হ'তো, যদি না, তিনি দুখানি প্রহসন লিখে যেতেন। মধুসূদন দত্ত এবং তাঁর উত্তর-জীবনের সমসাময়িক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—এঁরা উভয়েই ছিলেন রোম্যান্সের ভক্ত। নব্য তন্ত্রের বাংলা সাহিত্যের সেই উন্মেষকাল অতীত বীরত্ব এবং গতানু সমারোহের স্মৃতিমুক্ত ছিলো না সত্য, কিন্তু এই সব পথিকৃৎ যুগ-প্রবর্তক তাঁদের কোনো কোনো রচনায় সমসাময়িক সমাজ-ব্যবস্থার কিছু চিত্রাঙ্কণেও কার্পণ্য করেন নি। "বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ" এবং "একেই কি বলে সভ্যতা,"

"মেঘনাদ-বধ-কাব্যের" রচয়িতার লেখা,—এ যেন এক প্রহেলিকা। এ দু'খানি প্রহসনই তিনি বেলগেছিয়া থিয়েটারের জন্য লিখেছিলেন। তখনও 'পদ্মাবতী' রচিত হয় নি। কবি-জীবনের সেই প্রথমাংশেই আত্মবৈশিষ্ট্য-সচেতন মধুসূদন তাঁর আভিজাত্য-বোধের গণ্ডী অতিক্রম ক'রে হানিফ-ফতেমা-পুঁটি-বাচস্পতি-নিতম্বিনী-পয়োধরীর ক্লেদপিচ্ছিল কুটীরাঙ্গনের পরিচয় সংগ্রহ ক'রেছিলেন, এবং "এই সব মূঢ় ম্লান মূক মুখে" ভাষা দেবার চেষ্টাও তিনি ক'রে গেছেন। বাংলা দেশের দরিদ্র কৃষকের দুঃখে সহানুভূতি পোষণ করা এবং তৎকালীন সমাজের 'ফ্যাশান' ছিলো না। তবু মধুসূদন লিখেছেন "বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ", বঙ্কিম লিখেছেন, "সাম্য", দীনবন্ধু লিখেছেন "নীলদর্পণ"। "একেই কি বলে সভ্যতা"-য় মধুসূদন মদ্যপানের অপকারিতা সম্বন্ধে সমসাময়িক সমাজকে অবহিত হবার পরামর্শ দিয়েছেন। এই প্রসঙ্গে একথা উল্লেখযোগ্য, যে, পরবর্তী কালে দীনবন্ধু মিত্র এই বই খানির ছায়াবলম্বনেই তাঁর "সধবার একাদশী" গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তা ছাড়া এর অন্তর্গত রীতি-র প্রভাবও পরবর্তী কালের সাহিত্যে সুদূর প্রসারিত। উত্তরকালের অন্যতম খ্যাতনামা বাঙালি প্রহসন-লেখক, অমৃতলাল বসুর একটি উক্তি এর প্রমাণস্থল: "একেই কি বলে সভ্যতা"-র অনুকরণে আমি একখানা Farce রচনা করিলাম—"একেই কি বলে তোদের বাঙ্গালা সাহিত্যের উন্নতির ধারা?" বলা বাহুল্য, অমৃতলালের এই বইখানি অধুনা লুপ্ত।

মধুসূদন দত্তের এই প্রহসন দুখানির বিশেষত্ব অন্য কারণেও স্বীকার্য। তিনি প্রধানতঃ কবিতার গঠন এবং ছন্দের রূপ অবলম্বন ক'রেই নানা পরীক্ষা করে গেছেন। কিন্তু গদ্যের গঠন সম্বন্ধেও তিনি চিন্তা করেছেন এবং পরীক্ষা করেছেন,—তার প্রমাণ তাঁর প্রথম জীবনের প্রহসন, তাঁর নাটকের গদ্য এবং তাঁর শেষ জীবনের "হেক্টরবধের" ভাষা।

মধুসূদনের সমসাময়িক বিদ্যাসাগর এবং বঙ্কিমচন্দ্র। এই তিন উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের চারিদিকে অন্যান্য বহু শক্তিমান লেখকের আবির্ভাব ঘটেছিল। এঁদের প্রতিভার জ্যোতিঃপাতে বাংলা সাহিত্যের রূপান্তর এবং জন্মান্তর লাভ হ'য়েছে। তারপর, কিছুকাল অতিবাহিত হবার পূর্বেই আবার নতুন নক্ষত্র-নগরীর দীপ্তি। সেই তারকালোকের এবং সমগ্র বঙ্গ-সাহিত্যের অনাকলনেয় বৃহস্পতি, রবীন্দ্রনাথ।

হরপ্রসাদ মিত্র

শিরস্ত্রাণ

নিয়ত দক্ষিণ হাওয়া স্তব্ধ হ'লো একদা সন্ধ্যায়,
অজ্ঞাতবাসের শেষে নিদ্রাভংগে নির্বীর্য জনতা
সহসা আরণ্য-রাজ্যে স্তম্ভিত সভয়ে ;
নির্বায়ু মণ্ডল ক্রমে দুর্ভাবনা দৃঢ়তর করে।
দূরাগত স্বপনের কী দুর্দিন। মহামারী, অন্তরে বিক্ষোভ,
সঞ্চারিত রক্তরোগ পৃথিবীর প্রতি ধমনীতে ;
অবসন্ন বিলাসের সংকুচিত প্রাণ।

বণিকের চোখে আজ কী দুরন্ত লোভ ঝ'রে পড়ে :
মুহুর্মুহু রক্তপাতে স্বধর্ম সূচনা ;
ক্ষয়িষ্ণু দিনেরা কাঁদে অনর্থক প্রসব ব্যথায়।
নশ্বর পৌষ-দিন, চারিদিকে ধূর্তের সমতা—
জটিল আবর্তে শুধু নৈমিত্তিক প্রাণের স্পন্দন ;
শোকাচ্ছন্ন আমাদের সনাতন মন
পৃথিবীর সম্ভাবিত অকাল মৃত্যুতে :
দুর্দিনের সমন্বয়, সম্মুখেতে অনন্ত প্রহর
দৃষ্টিপথ অন্ধকার সন্দিহান আগামী দিনেরা।
গলিত উদ্যম তাই বৈরাগ্যের ভাণ,
কণ্টকিত প্রতীক্ষায় আমাদের অরণ্যবাসর।

সহসা জানলায় দেখি, দুর্ভিক্ষের স্রোতে
জনতা মিছিলে আসে সংঘবদ্ধ প্রাণ,
অদ্ভুত রোমাঞ্চ লাগে সমুদ্র-পর্বতে ;
সম্মিলিত প্রতিহাতে দৃঢ় শিরস্ত্রাণ॥

সুকান্ত ভট্টাচার্য

চিরকালের

মনে পড়ে সেই কবে বেসেছিনু ভালো
প্রথমা প্রিয়ারে মোর, বলেছিনু, 'আজিকে ফুরালো
অনাদিকালের মোর তীর্থযাত্রা তোমারেই চাহি',
চলিব অনন্তকাল পাশাপাশি পথ অতিবাহি'
এরপর। তুমি চিরকালের আমার।'
সত্য বলেছিনু। তার মুখখানি আর
ভালো ক'রে মনে নাই, বহুবর্ষ হয়ে গেছে গত,
দুজনার দুটি পথে ব্যবধান জন্মান্তের মত।

আবার বাসিনু ভালো আর-একজনে। তারও কানে
কহিলাম, 'ফুরায়েছে এতদূরে আজি এইখানে
অনাদিকালের মোর তীর্থযাত্রা তোমারেই চাহি,
চলিব অনন্তকাল পাশাপাশি পথ অতিবাহি',
এরপর। তুমি চিরকালের আমার।' এও আমি
সত্য বলেছিনু, তাহা জানেন আমার অন্তর্যামী।

তাঁর আছে জানা, এরা দুজন হয়েও নহে দুই,
মন দিয়ে মন ছুঁয়ে দুজনারই মাঝে কারে ছুঁই
দুজনার চেয়ে বেশী, সেথা নাই প্রথম-দ্বিতীয়,
আছে চিরন্তন প্রেম, আর আছে চিরন্তন প্রিয়,
নানারূপে একজন। ভালবেসে নিজেরে পারায়ে
যারই কাছে যাই সে যে তাহারেই দুহাত বাড়ায়ে
ধ'রে দেয়। যারই কানে বলি, 'ভালবাসি,'
কান পেতে শোনে সে যে, মুখে ফোটে কি মধুর হাসি
প্রেম-পরিমল ঝরা। কে সে আমি কেমনে ক'ব তা?
সব মানুষের সে কি নামহীন একটি দেবতা,
অথবা সে 'সকল-মানুষ', তুমি আমি
শুধু তার প্রতিনিধি? জানি জানি, ধরি যেই নামই

ডাকি মোর মনের মানুষে, ভালোবেসে,
ওর বুকে সাড়া জাগে, লুকায়ে চকিতে কাছে এসে
একবার ঘুরে যায় ;—সবাকার মাঝে একজন,
যার লাগি' পথ চলা, যার লাগি' সব আয়োজন,
সকল বিরহ ॥

পথে সহসা কাহারে দেখে চমকিয়া উঠি,
মুগ্ধ ধ্রুবতারা সম মনে হয় যেন ছিল ফুটি'
আঁখিদুটি হৃদয়ের গোপন-আকাশে
আজীবন। মনে আসে আসে, নাহি আসে
চকিত প্রথম দরশনে,
সে কোন্ সুদূর-জন্মে জানাশোনা ছিল তার সনে।
কোথা কোন্ ছায়া যায় সরে,
প্রিয়মুখে ওরই মুখ দেখি কি গো চকিতের তরে,
এই মোর সকল-মানুষে, সকলের
যে মোদের সকল-কালের ?
দুটি চোখে
প্রেমের অঞ্জন মেখে চাও তুমি, হয়ত বা ওকে
দেখিবে আমারও মাঝে।

তাই বলি আলো
যেথা যত দীপ আছে, আঙিনায় ঢালো
গন্ধজল, দুয়ার জুড়িয়া হোক লিখা
সুমঙ্গল আলিপনা, টেনে দাও স্বপ্ন-যবনিকা
সুনিবিড় ক'রে চারিপাশে, তোলো সুর
বীণাতারে॥ সে যে আছে, সে যে নহে দূর,
যে চিরকালের তব মনের মানুষ, যার তরে
চ'লে এলে পথ ক'রে জন্ম হতে নব জন্মান্তরে;
সে চলে বাহির-পথে সব-মানুষের সাথে সাথে,

আজি এ সান্ত্বনাহীন অন্ধকার বিরহ-নিশাতে।
নিজেরে শুধাও,
হৃদয়ে প্রেম কি জাগে? তারপরে দ্বার খুলে দাও।
জানি না সে কোন্ ছদ্মবেশে
দেবে দেখা, তবু যদি চাও ভালোবেসে
তার পানে, বুঝিবে সে সেই, সে যে সেই, যার লাগি' তুমি সহ
অনাদিকালের এই পথ-চাওয়া দুস্তর বিরহ।

শ্রীসুধীরকুমার চৌধুরী

তে হি নো দিবসাঃ গতাঃ

প্রাসাদের ভগ্নস্তূপে অশ্বত্থ প্রাচীন
মন্ত্র জপে, অতীতের লুপ্ত ইতিহাস।
মাটির কন্দরে খুঁজি বিগত সে দিন।
বাস্তব নির্মম হাস্যে করে পরিহাস।
বিধ্বস্ত জীবনে বাজে দূব করাঘাত,
স্মৃতি বৈদিক মন্ত্র···ক্ষাত্র অভ্যুদয়।
স্তিমিত নয়নে নামে স্বপ্নাতুর রাত
পাণ্ডব গৌরব গাথা···কুরু পরাজয়।
দিনান্তের আকাশেতে হাসে অরুন্ধতী
বিশীর্ণ বাহুতে বধূ জানায় প্রণাম।
নিষ্প্রাণ স্থবির ক্লান্ত জীবনের গতি।
জপি শুধু অতীতের সঞ্জীবনী নাম।
এখনো জীবিত মোরা ; অসন্তুষ্ট মন
জিঘাংসু অরণ্যে খোঁজে নন্দন কানন।

মন্টুরাণী মিত্র

ক্ষণিক

পথে ভাঙা মিনারের সারি। ম্লান, স্বর্ণ গম্বুজে
শোণিত প্রলেপ তমিস্রার। হয়তো এমনি হয়—
যখন শতাব্দী শেষ, সভ্যতার চোখ আসে বুজে,
প্রাসাদ, দিল্লীর দ্বার লক্ষ অশ্বখুরে বিষময়।
ক্ষীণ সন্ধ্যালোকে পথ চলি। গুণ-গুণ করে গাই
প্রহরশেষের গান; শূন্যে জাপ পুষ্পকের সারি
ছিন্ন করে শেষ স্তব্ধতাকে। নীচে নিরুক্ত সবাই
শীতাতপে কণ্টকিত। রাত্রি জাগরণে চোখ ভারী।
বিষন্ন আমলাতন্ত্র। নিঃশেষিত নিজ ক্ষমতায়
আজো আস্থাবান। আর, নিত্য নব সঙ্কট অনেক
সৃষ্টি করে দৈন্যে মূঢ়তায়। যুগান্তের গলিত পাতায়
এদিকে বিক্ষিপ্ত লোক দৃঢ় ঐক্য গড়ে তোলে এক।
কালের সমরে আজ রিক্ত উষ্ট্র বালুঝড়ে মরে,
এখানে অনেক লোক মরে গিয়ে সিনেমার ঘরে।

কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত

পুস্তক-পরিচয়

সাধারণী

বর্ত্তমান মহাযুদ্ধের অচিন্তনীয় আর্থিক পরিবেশের মধ্যে, বিশেষ ভাবে খাদ্য, বস্ত্র ও ছাপার কাগজের মহার্ঘতা ও অনটনের মধ্যেও যে বাংলা দেশের সাহিত্যিক সচেতনতা তেমন করে ক্ষুণ্ণ হয় নাই তাহার প্রমাণ শ্রীযুক্ত মোহিত লাল মজুমদার মহাশয়ের "আধুনিক বাংলা সাহিত্য" নামক সু-বৃহৎ সাহিত্য-সমালোচনা-মূলক গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণের অতি-সাম্প্রতিক প্রকাশ। মোহিত বাবু শক্তিশালী সমালোচক ; কাব্য-বিচারে তাঁহার রচনায় স্থানে স্থানে যে গভীর রসাশ্রিত জিজ্ঞাসু মনের পরিচয় পাওয়া যায়, তাহাতে তাঁহার বিশ্লেষণী প্রতিভা একটী বিশেষ গৌরব ও সার্থকতা লাভ করিয়াছে। নিজে কবি হইলেও মোহিত বাবু সাহিত্য-বিচারে কাব্য-পন্থা অবলম্বন করেন নাই, বিশ্লেষণী-রীতিই অনুসরণ করিয়াছেন। এবং বিচারকের আসনে বসিয়া অনেকে যেমন কাব্যকে ছাড়িয়া নিজেকেই সমালোচনা করিতে ব্যস্ত থাকেন, মোহিত বাবু সেই প্রকার আত্ম-বিভ্রম হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত। মোহিত বাবুর সমস্যা-তন্ময়তা বিস্ময়কর—ইহা তাঁহার ভাবময় অভিজ্ঞতার একান্ত বস্তু-নিষ্ঠার পরিচায়ক।

তাহা হইলেও আলোচ্য গ্রন্থখানিতে মোহিত বাবুর ব্যক্ত বহু মতামতের সঙ্গে, তাঁহার সাহিত্যাদর্শ, তাঁহার রূপতত্ত্ব ও তাঁহার জীবন-দৃষ্টির সঙ্গে আমাদের বিরোধের অন্ত নাই। মোহিত বাবুর সাহিত্যাদর্শ কি? গ্রন্থের বহুস্থলে এ সম্বন্ধীয় আলোচনা থাকিলেও কোথায়ও তাহার একটা সুনির্দ্দিষ্ট বিবৃতি নাই। বেশীর ভাগ প্রবন্ধ পড়িয়াই মনে হয় যে বাংলা সাহিত্যে বিংশ শতাব্দীর প্রথম হইতে, বিশেষতঃ রবীন্দ্র-সাহিত্যের বিরুদ্ধ সমালোচনার সঙ্গে সঙ্গে, যে একটী রক্ষণশীল সাহিত্যাদর্শ ক্রমশঃ আত্মপ্রতিষ্ঠা করিয়া আসিয়াছে—যে আদর্শের মর্ম্মকথা এই যে সাহিত্য হইবে জাতির প্রাচীন সংস্কৃতি-অনুগত—মোহিত বাবু বুঝি সেই আদর্শই গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার মতে, আজি-কার দিনের "কালচার"-বিলাসী বাঙ্গালী সাহিত্য ও জাতীয়তার যোগসূত্র বুঝিতে পারে না—বুঝিতে পারে না যে সাহিত্যই জাতীয় জীবনের মুকুর, তাই "এ-কালের অ-বাঙ্গালী"র পক্ষে "চিরকালের বাঙ্গালী" দীনবন্ধুর সাহিত্য-

প্রতিভার প্রতি যথোচিত শ্রদ্ধাঞ্জলি দেওয়া অসম্ভব। এই "আর্ট-সর্ব্বস্ব সাহিত্য-চর্চ্চা" কিংবা এই "মর্কট-লীলার অভিনয়ে লাঙ্গুল-দৈর্ঘ্যের আস্বাদন-কারী" আধুনিক বাঙ্গালী সাহিত্যিকের প্রতি মোহিত বাবুর যে মনোভাব দেখা যায় তাহাতে স্বতঃই মনে হয়, এই সব রচনা বুঝি "সাহিত্য" "বিজয়া" কিংবা "নারায়ণের" পুরাণ ফাইল হইতে উদ্ধৃত উক্তি। কিন্তু এই অনুমানের সার্থকতা যতই থাক, "শনিবারের চিঠি"কে যদি "সাহিত্য" ও "নায়কের" যুগ্ম-কলেবরের বর্ত্তমান সংস্করণ বলিয়া ধরিয়াও লওয়া যায়—তাহা হইলেও মোহিত বাবু ঠিক সুরেশচন্দ্র সমাজপতি কিংবা পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় নহেন। কেননা মোহিত বাবু রূপসৃষ্টি হিসাবে কাব্য ও আর্টের স্বকীয় মর্য্যাদা দান করিতেও ব্যগ্র; রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে আলোচনা করিতে যাইয়া ১৩৬ পৃষ্ঠায় মোহিত বাবু কবি-মানস-নিরপেক্ষ কাব্য-সৃষ্টির স্বাতন্ত্র্য দাবী করিয়াছেন; ২৩৯ পৃষ্ঠায় রবীন্দ্রনাথ যে মুখ্যতঃ আর্টিষ্ট—অর্থাৎ "আর্টের উপাদান হিসাবে সকলই তাঁহার বশীভূত, কিছুই তাঁহার আর্ট-সাধনার বহির্ভূত নহে"—সেই জন্য কবির ভাষা-ঘটিত বিরুদ্ধ মত এবং তাঁহার "মতবাদী ব্যক্তির দৃঢ় প্রত্যয়ের" অভাবকেও মার্জ্জনা করিয়াছেন। শুধু তাহাই নহে, রস-সৃষ্টির ঐকান্তিকতা স্বীকার করিয়াও তিনি ক্ষান্ত হন নাই, ২০১ পৃষ্ঠায় সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের আলোচনা করিতে যাইয়া "সৃষ্টির যাবতীয় রূপের যে বাগ্মশ্রী" তাহাই কাব্যকলা বলিয়া প্রচার কবিতে দ্বিধা করেন নাই। ইহাতে মনে হইতে পারে মোহিত বাবু রসাদর্শে শুধু যে আদর্শবাদী তাহা নহে বস্তুবাদীও, আধুনিক ইংরাজ সমালোচক Herbert Read এর মত Platonic.

মোহিত বাবু হয়ত তাঁহার এই মত-দ্বন্দ্বের সমাধান করিবেন এই বলিয়া যে সাহিত্যের আছে একটী সৃষ্টি-ধর্ম্ম, অপর আছে তাহার রস-ধর্ম্ম। সাহিত্যের এই দ্বৈত-লক্ষণ তিনি তাহার প্রথম প্রবন্ধে একাধিকবার উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু এই প্রভেদের যাথার্থ্য কোথায়? সাহিত্যের সৃষ্টি-তত্ত্বের কথা বুঝাইতে গিয়া মোহিতবাবু বলেন, "ভাব যতই বিশ্বজনীন হউক, কবির প্রাণের ছাঁচে ঢালা না হইলে তাহা রূপময় হইয়া উঠিবে না। * * * যেখানে যাহা কিছু সাহিত্য সৃষ্টি হইয়াছে, তাহাতে যে বর্ণ আছে তাহা ব্যক্তি-বিশেষের হৃদয়-রক্তের আভা; এই ভাব-সম্পূর্ণ একটী নির্ব্বিশেষ ভাব-যন্ত্রের ক্রিয়া নয়,

কবির জাতি ও বংশ, তাহার দেশ ও কাল এই প্রাণের প্রতিষ্ঠা করিয়াছে" (৪৩৫ পৃষ্ঠা)। ভাল কথা ; "সবুজপত্রের" দিনে প্রগতিবাদীরা এই উক্তিতে মর্ম্মাহত হইতেন সন্দেহ নাই কিন্তু আজিকার দিনের প্রগতিশীল সাহিত্যিকেরা এই উক্তিকে বরণ করিয়াই লইবেন। কিন্তু হইল কি—এই যে মোহিতবাবু-বিবৃত প্রাণোৎসারী সৃষ্টি-চেতনা তাহা হইতে সাহিত্যিকের রস-চেতনা পৃথক হইল কেমন করিয়া ? তিনি বলিবেন, এবং বলিয়াছেনও, যে কেমন করিয়া সাহিত্যিকের প্রাণের নিগূঢ়তম প্রদেশে রসের উৎপত্তি হয় তাহার সন্ধান পাওয়া যায় না। যদি তাহাই হয়, তবে সৃষ্টি-বিভিন্ন রস-ধর্ম্ম ও রস-তত্ত্বের অস্তিত্ব কোথায় থাকিল ? ১২৯ পৃষ্ঠায় মোহিত বাবু যে "কল্পনা" নামীয় মানস-বৃত্তির কথা বলিয়াছেন—যাহা বাস্তবাতীত একটি আদর্শ জগত সৃষ্টি করিতে চায়—তাহাও ত' কবির পূর্ব্বোল্লিখিত সৃষ্টি-ধর্ম্ম হইতে ভিন্ন হইল না। আসল কথা মোহিত বাবু তাঁহার কাব্যাদর্শে সত্য-সত্যই রস-বাদী ; সংস্কৃতি-বাদীর মুখের জবান লইয়া যে তিনি অনবরত সাহিত্যালোচনা করেন তাহার কারণ বঙ্কিমোত্তর বাঙ্গালী সাহিত্যিকের মানস-প্রকৃতির সহিত তাঁহার আত্যন্তিক বিরোধ—আলোচ্য গ্রন্থে ইহার আভ্যন্তরিক প্রমাণ রহিয়াছে অপর্য্যাপ্ত।

রবীন্দ্র-প্রতিভার ফলে বাংলা সাহিত্য যে একটা বিশিষ্ট বিশ্বজনীন সমৃদ্ধি ও সার্থকতা লাভ করিয়াছে তাহার কথা বলিতে গিয়া মোহিত বাবু আধুনিক জগতে সাহিত্য-সৃষ্টির এক নিগূঢ় সঙ্কট ও সমস্যার কথা অবতারণা করিয়াছেন। সেই সঙ্কট মোহিত বাবুর ভাষায় 'ভাব ও রূপ' লইয়া! প্রাক-আধুনিক যুগে কবির বস্তু-কল্পনা বস্তুকে অতিক্রম করিয়া আদর্শকে, সহজে না হউক, সাধনা-দ্বারা প্রতিষ্ঠা করিতে পারিত ; কিন্তু "আধুনিক কালের কবি-কর্ম্ম আরও দুরূহ ; এখনকার কালে কাব্য আস্বাদনে এই প্রকার আত্ম-বিলোপ অতিশয় দুঃসাধ্য, কারণ তীব্রতর জগৎ-চেতনার ফলে এখন আত্ম-চেতনাও দুর্দ্ধর্ষ হইয়া উঠিয়াছে।" কাজেই আধুনিক কবি-মন পথ খুঁজিয়া পাইতেছে না এবং রবীন্দ্রনাথই তাঁহার মধ্য জীবনের (গীতাঞ্জলির পূর্ব্বতন) কাব্য-রচনায় "ভাব ও রূপের সাযুজ্য-সাধনে এক অপূর্ব্ব রসের অভিব্যক্তি" দেখাইয়াছেন যাহাতে, মোহিত বাবুর মতে, সমগ্র আধুনিক সাহিত্য-শিল্পীর পক্ষেই এক নূতন দ্বন্দ্বাতীত

কাব্য-পন্থার প্রবর্তন হইয়াছে। আধুনিক অর্থাৎ সাম্প্রতিক জীবনে সাহিত্য-পন্থার যে গভীর সঙ্কটের ইঙ্গিত মোহিত বাবু করিয়াছেন তাহাতে তাঁহার বিশ্লেষণী প্রতিভার সূক্ষ্মতা এমন কি চমৎকারিতা আছে কিন্তু সে সঙ্কটের যথার্থ স্বরূপটী মোহিত বাবুর আচ্ছন্ন দৃষ্টিতে ধরা পড়ে নাই। যে দ্বৈতের উদগ্র বিরোধ আধুনিক সাহিত্য-ধর্ম্মকে বিচলিত করিয়াছে, তাহা ভাব ও রূপ লইয়া নয়, তাহা বস্তু ও ভাব বা আদর্শকে আশ্রয় করিয়া। ধূপ ও গন্ধের যে দ্বৈত, সুর ও ছন্দের যে দ্বন্দ্ব তাহা শাশ্বত, সর্ব্বপ্রকার সৃষ্টি-প্রয়োজনের তাহা চিরন্তন লীলা। আধুনিক সাহিত্যিকের যদি সৃষ্টি-প্রতিভা থাকে, মোহিত বাবুর পরিভাষায় যদি তাহার 'প্রাণশক্তি' উৎসারিত হয়, তবে রূপদান তাহার সমস্যা সৃষ্টি করে না—সৃষ্ট করে বস্তু ও আদর্শের আত্যন্তিক বিরোধ। রস-ধর্ম্মী মোহিত বাবু কেন ভুলিয়া যান যে তাঁহার দার্শনিক পন্থা আদর্শ-বাদীর, সেখানে ভাব ছাড়া রূপের প্রশ্নই উঠিতে পারে না। তিনি যে রূপকে ভাবের অধীন করার (১৩৫ পৃষ্ঠা) সাহিত্য-রীতির কথা বলিয়াছেন, সে রীতির symbolist সাহিত্যিকেরা তাঁহার সবর্ণ নহেন—তাঁহারা sur-realists, দর্শনমার্গে তাঁহারা বস্তুবাদী। আমরা দর্শন-মার্গে মোহিতবাবুরই মত আদর্শবাদী বলিয়াই জানি যে কবি-মানসে বস্তুর প্রভাব বা আদর্শের প্রভাব যাহাই বেশী হউক না কেন, সাহিত্য-পন্থায় বস্তুরও রসাত্মক পরিণতি ভাব-তান্ত্রিক। মোটরের ইঞ্জিন যখন চলে তখন পেট্রোল যেমন, অঙ্গারও তেমনি, গ্যাসে পরিণত হইয়া পিষ্টনে আঘাত করে। আজিকার দিনে যে সাহিত্য-পন্থার সঙ্কট তাহা সম্পূর্ণই সাহিত্যিক-মানসের আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের সঙ্কট। এ কথা ত ঠিক যে সাহিত্যের ভাব-সাধনায় চাই একান্ত সত্যনিষ্ঠা এবং আধুনিক জীবনের বাস্তব পরিবেশ যখন এত প্রবলভাবে হীন তখন ইচ্ছা করিলেইত আর আদর্শকে আঁকড়াইয়া ধরা যায় না? কিন্তু সঙ্কট বা বিড়ম্বনা ঠিক এইখানেই নয়—তাহা এইখানে যে, সাম্প্রতিক জীবনে বাস্তবের হীনতায় কর্ম্মীর তাড়না সাহিত্যে ভাব-তন্ময়তাকে নিরর্থক ও উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া দিতেছে। মোহিত বাবু এই অকৃতার্থতা বুঝিতে পারেন না, কেননা সাহিত্যিক মানসের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে তিনি অনিচ্ছুক; এই অনিচ্ছার কারণ মোহিত বাবুর মতে মানুষের মানস আদর্শ সত্ত্বাগতভাবে শাশ্বত; এবং এই যে মত মোহিত বাবু

পোষণ করেন তাহার কারণ তাঁহার আদর্শ-বাদে dialectic নাই। ফলে যাহা দাঁড়াইয়াছে তাহা Ivory Tower নহে, একেবারে সাহিত্যিক ফ্যাসিবাদ।

এক্ষণে, মোহিত বাবুর আলোচনায় যে স্থানে স্থানে যুক্তির অপ্রামাণ্য, মতের স্ববিরোধ ও বিবৃতির আত্যন্তিকতা না হৌক ভ্রান্ত ক্ষেত্রে অতি-বিবৃতি আছে, তাহার মর্ম্ম উদ্ধার করা যাইতে পারিবে। প্রথমতঃ, মধুসূদন হইতে আরম্ভ করিয়া রবীন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত যে বাংলা সাহিত্য, মোহিত বাবু তাহার গতি-পরিণতি বুঝাইতে যাইয়া বলেন যে "বাঙালীর অন্তরে এই মর্ত্ত্যজীবনের প্রতি সত্যকার একটি মমতা, দেহপ্রীতি বা বাস্তবানুরাগ চিরদিন বিদ্যমান আছে।" তাহারি ফলে ইয়ুরোপীয় চিন্তাধারার প্রথম সংঘাতে এক সাহিত্য হইতে অন্য সাহিত্যের বাতি জ্বালাইয়া "কল্পনাকে ভিতর হইতে বাহিরে আনিয়া বাস্তব ক্ষেত্রে প্রসারিত করিয়া ইতিহাস বিজ্ঞান ও মনস্তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত করিবার" পরিচয় পাওয়া যায় এবং সেই প্রতিষ্ঠা-কামনার ফল হইল মধুসূদন ও বঙ্কিম-চন্দ্র। কিন্তু দেশের জলবায়ু ও ভারতীয় সাধনার প্রতিভার ফলে এই "ভোগ-স্পৃহা জীবনের বাস্তব আশা ও আকাঙ্ক্ষায় সত্য হইয়া উঠে নাই, অলস ভাব-বিলাস বা আত্মরতিতেই "এই ক্ষুধার নিবৃত্তি হইল," বাঙালীর মজ্জাগত গীতি-প্রবণতা ও আত্মভাববিহ্বলতাই" শেষ পর্য্যন্ত জয়ী হইয়া উঠিল—বঙ্কিমী সাহিত্যাদর্শের স্রোত ফিরিল, সাহিত্যের আসরে ক্রমে ক্রমে আসিলেন বিহারী-লাল অক্ষয় বড়াল ও রবীন্দ্রনাথ। মোহিত বাবুর মতে, কাজেই দাঁড়াইল এই যে মধুসূদন বা বঙ্কিমচন্দ্র যে বাস্তব কল্পনানুযায়ী সাহিত্য সৃষ্টি করিয়াছিলেন তাহার অন্তরালে রহিয়াছে বাঙালীর বাস্তবানুরাগের উপর ইয়ুরোপীয় সাহিত্যিক রূপ-সাধনার প্রভাব, আর বিহারীলাল হইতে রবীন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত যে গীতিকাব্যাত্মক সাহিত্যের সৃষ্টি হইয়াছে তাহার পশ্চাতে রহিয়াছে বাঙালীর নিজস্ব বাস্তব প্রীতির উপর বাঙালী ভারতবাসীর অতীন্দ্রিয় সাধনা-লব্ধ অন্তর্মুখী ভাব কল্পনার জয়। মোহিত বাবু এখানে কল্পনার অন্তর্মুখীনতা ও বহি-র্মুখীনতার সঙ্গে বাস্তব জীবনাসক্তি ও অতীন্দ্রিয়বাদের এক অদ্ভুত জগা-খিচুড়ি করিয়াছেন। জীবনাদর্শ বাস্তব হইলেও কল্পনা অন্তর্মুখী হইতে পারে; জীবনাদর্শ অতীন্দ্রিয় ও কল্পনা বহির্মুখী হইতে পারে—জীবনাদর্শের সহিত সাহিত্যিক কল্পনা-প্রকৃতির কোন একান্ত সম্বন্ধ নাই। আসল কথা মোহিত

বাবু ভারতীয় অধ্যাত্ম-সাধনার ব্যবহারিক স্বরূপটী বুঝিতে পারেন নাই এবং বুঝিতে না পারিয়া আত্মবিলোপী যে ব্যক্তি-প্রকৃতি (classical mind) তাহার সহিত সাহিত্যিক বাস্তব কল্পনার এবং আত্ম-সঞ্চারী যে ব্যক্তি প্রকৃতি (romantic mind) তাহার সহিত ভাব-কল্পনার এক ভ্রান্ত সম্বন্ধ করিয়া লইয়াছেন। তিনি নিজে আত্ম-বিলোপী সাহিত্যিক প্রকৃতির পক্ষপাতী। তাহা হউন তাহাতে ক্ষতি নাই। কিন্তু তিনি যে বলিয়াছেন যে বঙ্কিমচন্দ্রের বহির্মুখী কল্পনায় ইয়ুরোপীয় সাধনা-লব্ধ কাব্যাদর্শের জয় এবং বাংলা গীতি-কাব্যে সে আদর্শের পরাজয় তাহা নিতান্তই ভ্রান্ত। এই ভ্রান্তির বশবর্ত্তী হইয়াই মোহিতবাবুর মত বঙ্কিম-ভক্ত বলিতে পারিয়াছেন যে "রবীন্দ্রনাথের মত খাঁটি ভারতীয় প্রকৃতি বঙ্কিমচন্দ্রেরও নহে, বরং সে হিসাবে কবি-বঙ্কিম ইয়ুরোপের মানস পুত্র" (১২৬ পৃষ্ঠা)। এই উক্তির মারাত্মকতা আরও বেশী এই জন্য যে মোহিত-বাবু বঙ্কিমচন্দ্রকে সাহিত্যিক অপেক্ষা যুগ-স্রষ্টা হিসাবেই অতি উচ্চে স্থান দিয়াছেন এবং আমরা তাঁহার এ মতের সহিত সম্পূর্ণ ঐক্যবান। মোহিত বাবু বলেন যে কাব্যপন্থায় mysticsim এর স্থান নাই; তিনি এই উক্তির ভ্রান্তি বুঝিলেও বুঝিবেন না, কেননা তিনি আত্ম-গূঢ় যে সাহিত্যিক কল্পনা তাহাকে আত্ম সঞ্চারী ব্যক্তি-প্রকৃতির সঙ্গেই যুক্ত করিয়া রাখিয়াছেন এবং এই প্রকার ব্যক্তি-প্রকৃতিই তাঁহার চক্ষের শূল। নহিলে বঙ্কিমচন্দ্রকে যদি "সাহিত্যে কর্ম্মযোগী" মনে করা যায়, তবে রবীন্দ্রনাথকে mystic মনে করিতে আপত্তি কোথায়! বলা বাহুল্য সাহিত্যিক প্রসঙ্গ-মণ্ডলে 'কর্ম্মযোগী' কিংবা 'ধ্যানযোগী' ইহাদের কোনটীকেই সাধনাগত অর্থে ব্যবহার করা হয় না।

মোহিতবাবুর সাহিত্য-আলোচনার মর্ম্মস্থলে আছে তাঁহার এক শৃঙ্খলানুবর্ত্তী জীবন-দৃষ্টি। এই দৃষ্টি তাঁহার দ্বন্দ্বহীন দার্শনিক আদর্শবাদ হইতে লব্ধ। মোহিতবাবুর যে সাহিত্যাদর্শ তাহা যেন সাংখ্যোক্ত পুরুষ—অজর, অক্ষয়, অব্যয়—সেই আদর্শ ক্ষুদ্রকে ছাড়িয়া, হীনকে পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র বৃহৎ ও শাশ্বতকে আকৃষ্ট করিয়া আছে। অন্য কথায়, সৃষ্টি যেন কল্পনার দৃষ্টিতে অনন্তকালের জন্য নির্বিশেষ হইয়া আছে। দর্শন-তত্ত্বের কথা ছাড়িয়া দিলাম কিন্তু ব্যক্তি-প্রকৃতি আত্মবিলোপী হইলেও আজিকার দিনে এই নির্ব্বিশেষ কল্প-সাধনা অসম্ভব। সাহিত্যিক মন আজ বস্তু-নিগৃহীত নয়,

যেমন মোহিতবাবু ধিক্কার দিয়া বলিয়াছেন, তবে সাহিত্যিক আজ যে জীবনের মধ্যে সাহিত্য সৃষ্টি করিবেন তাহা আজ শতধা বিভক্ত—তাই জিজ্ঞাসু না হইলে আজ কল্পনা-জাগৃতি হয় না এবং মাটীর জগৎ ছাড়িয়া ভাবাকাশের বিমান-বৃত্তি আজ অসম্ভব। অতীশ দীপঙ্করের পিতৃভূমিতে নব-নালন্দার গ্রন্থ-গুহায় বসিয়া মোহিতবাবু যদি সে তত্ত্বের সন্ধান না রাখেন তবে কি বলিব জীবন নিশ্ছিদ্র হইয়া রহিয়াছে, না বুঝিব নালান্দার ইষ্টকগুহা অচলায়তনে পরিণত হইয়াছে ?

শ্রীক্ষেত্রমোহন পুরকায়স্থ

ভারতীয় কৃষিশিল্প-সমস্যা

THE LAND AND ITS PROBLEMS—By. Sir T. Vijayraghavacharya. Oxford Pamphlets on India Affairs.

এই পুস্তকখানির লেখক স্যর টি. বিজয়রাঘবাচার্য্য কৃষি বিজ্ঞানের বিশেষজ্ঞ কয়েকজন ব্যক্তির মধ্যে অন্যতম। Imperial Council of Agricultural Research-এর জন্মের গোড়া থেকে ছয় বৎসর পর্য্যন্ত তিনি তার সহকারী সভাপতি ছিলেন এবং কৃষি ও তাঁর নানা সমস্যার সঙ্গে বহুদিন সংশ্লিষ্ট থাকায় এ বিষয়ে তাঁর বক্তব্যের মূল্য আছে।

পুস্তকটিকে দুই অংশে ভাগ করা যায়। প্রথম অংশে ভারতীয় কৃষির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা করা হয়েছে। আমরা জানতে পাই কোন্ কোন্ শস্য ভারতে জন্মায়, বৃষ্টিপাতের উপর তাদের কতটা নির্ভর করতে হয়, জমির উর্ব্বরাশক্তি কোন প্রদেশে কিরূপ, শস্যে জলসেচন কী ভাবে হয় ইত্যাদি। দ্বিতীয় অংশে কৃষির নানা সমস্যা ও কৃষির উন্নতি সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। এ অংশে লেখক জমির অনুর্ব্বরতা, সার প্রয়োগ, জমির ক্ষয়, জমির বিখণ্ডতা ও অসম্বদ্ধতা, ফসল বিক্রয়, কৃষিকার্য্যে যন্ত্র প্রয়োগ ও গোমহিষাদির উন্নতি প্রভৃতি বিষয়ের উল্লেখ করেছেন। ভারতবর্ষের কৃষির শোচনীয় অবস্থা

সর্বজনবিদিত। এদেশে বিঘা প্রতি উৎপন্ন ফসলের পরিমাণ অন্যান্য দেশের তুলনায় যৎসামান্য এবং প্রতি জন হিসাবে তা প্রয়োজনের অনেক কম। এই দুর্গত কৃষিকে আশ্রয় করে অধিকাংশ ভারতবাসী অসামান্য দারিদ্র্যের মধ্যে জীবন কাটায়। এর কারণ সম্বন্ধে প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক। আমরা শুনি আমাদের দেশের মাটী খুব উর্ব্বর ও আবহাওয়া অত্যন্ত অনুকূল। তবে উৎপন্ন ফসল এত কম ও চাষীরা এত দরিদ্র হওয়ার কারণ কী।

লেখক এই প্রশ্নের উত্তর দিতে চেষ্টা করেছেন কিন্তু তিনি সন্তোষজনক উত্তর দিতে সক্ষম হননি। শিল্পের অভাবে দেশের লোকের বৃহত্তর অংশ—তাদের সংখ্যা ক্রমশঃই বেড়ে চলেছে—কৃষির উপর নির্ভর করছে। জমির আয়তনের অনুপাতে তাদের সংখ্যা এত বেশী যে মাথাপিছু যতটুকু জমি তারা অধিকার করে তার পরিধি স্বভাবতঃ অতি ক্ষুদ্র ও অপরিমিত। এই কারণে চারিদিকে জমির অভাব দেখা দিয়েছে এবং একাধিক ভূস্বত্ব-আইনের ফলে চাষীদের জমি বিক্ষিপ্ত ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত হয়ে পড়ায় জমির কোনও উন্নতি করাও তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। নিজ নিজ জমি ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর হয়ে যাওয়াতে চাষীরা সেই পরিমাণ দরিদ্র হয়ে পড়েছে; উন্নত প্রণালীতে কলে চাষ করা, জমিতে আরও সার দেওয়া ও জলসেচনের উপযুক্ত ব্যবস্থা করার উপযোগী অর্থ তাদের নেই।

প্রয়োজন, বর্ত্তমান ব্যবস্থা ও ভূস্বত্ব আইনের আমূল পরিবর্ত্তন। যতদিন পর্য্যন্ত দেশে শিল্পকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে চাষের কাজে প্রয়োজনের অতিরিক্ত লোক সরিয়ে এনে জমির উপর অত্যধিক লোকভার লাঘব করা না হবে ততদিন পর্য্যন্ত এদেশের কৃষির উন্নতি আশা করা বৃথা। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে বিভক্ত বিক্ষিপ্ত জমিগুলিকে জড় করে বড় বড় ক্ষেত্র সৃষ্টি করা প্রয়োজন যাতে করে যন্ত্রের দ্বারা কম পরিশ্রমে ও কম সময়ে কাজ সম্পন্ন হতে পারে। কৃষিকার্য্যে বিজ্ঞানের কার্য্যকারিতা ও তার প্রয়োগ এই দুয়ের মধ্যে বিশেষ অসামঞ্জস্য দেখা যায়। কৃষির উন্নতি-কল্পে প্রচুর গবেষণা হয়েছে কিন্তু ভূস্বামীদের ও অন্যান্য শ্রেণীর স্বার্থহানি হওয়ার আশঙ্কায় কৃষিকে বিজ্ঞানের সাহায্য থেকে তফাৎ রাখা হয়েছে। দেশের সমস্ত চাষের জমির অধিকতর অংশ অধিকার করেন অথচ জমির সাথে যাদের কোনও যোগ নাই এমন এক শ্রেণীর লোক এদেশে

বিদ্যমান। চাষের উন্নতি করার আগ্রহ তাদের নেই এবং তার প্রয়োজনও তাঁরা অনুভব করেন না।

আলোচ্য বইখানিতে জমি-সংক্রান্ত আইনকানুন এবং কৃষির উপর তার প্রভাব সম্বন্ধে কিছুই উল্লেখ করা হয় নাই। লেখক এই পর্য্যন্ত বলেছেন যে সামান্য পুঁজি নিয়ে ক্ষুদ্রায়তন কৃষি-ব্যবসায়ের কোনও ভবিষ্যৎ নেই, বেশী মূলধনে বৃহদায়তন কৃষি প্রবর্ত্তিত হওয়া দরকার। জমিতে সার-প্রয়োগ বিষয়ের আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন—if the ryot has the means and the enterprise, Indian soils will respond generously. জমির অপরিমেয়তা সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে তিনি এই মত প্রকাশ করেছেন যে ক্ষুদ্র ও খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত জমিগুলিই চাষের উন্নতির পক্ষে একটা বাধা হয়ে আছে। কিন্তু সে-গুলি ভেঙ্গে ফেলে সংহত ক্ষেত্র সৃষ্টি করা তিনি অনুমোদন করেন না। কারণ তিনি বলেছেন—"The remedy is to establish primogeniture in place of equal inheritance—which does not seem to be practical politics." দুঃখের বিষয়, অসম্বদ্ধ জমিগুলিকে সম্বদ্ধ করে সংহত কৃষি প্রবর্ত্তন না করার দরুণ যেখানে লক্ষ লক্ষ লোক উপবাসী থেকে যাচ্ছে এবং চরম দুরবস্থায় দিন যাপন করছে সেখানে কোন্ ব্যবস্থা "practical politics" তার কোনো নির্দ্দেশ তিনি দেননি। একথা সকলেই জানেন যে বৈজ্ঞানিক উপায়ে যন্ত্রের দ্বারা চাষ হলে পরে মাথা পিছু শস্যের ফলন অনেক বেড়ে যায় তৎসঙ্গে দরিদ্রতা দূর হয়। কিন্তু লেখক যন্ত্র-ব্যবহারের বিরোধী, তিনি লিখেছেন—"Improvements in agricultural implements suited to local conditions are being made and should continue to be made. But it is doubtful if there is scope for any considerable mechanization of agriculture. Machines are suitable for new countries with a sparse population and large farms such as Canada, Australia and Argentina, but not for a thickly populated country with small holdings. The serious effects of mechanical cultivation in displacing human labour and driving the peasantry into overcrowded towns should not be overlooked." যন্ত্র যদি শারীরিক শ্রমকে নিষ্প্রয়োজন না করে, তবে সে যন্ত্র

ব্যবহারের কোন অর্থ হয় না। সেই অপ্রয়োজনীয় শ্রমশক্তিকে অলসভাবে ফেলে রাখা চলবে না, তাকে লাগাতে হবে শিল্পের কাজে। কিন্তু এদেশে শিল্পের সমৃদ্ধি হলে যাদের স্বার্থে আঘাত লাগবে, তারাই দাঁড়িয়ে আছে শক্তিমান প্রতিবন্ধক রূপে।

দুঃখের বিষয় লেখক কোনও প্রতিকারের উপায় প্রস্তাব করেন নাই; সার দেওয়া, জমির ক্ষয় বন্ধ করা, ভাল জাতের বীজ ব্যবহার, ফসল বিক্রয়ের সুব্যবস্থা, গরু মহিষ ইত্যাদির উৎকর্ষ-সাধন প্রভৃতি পুরানো কথার পুনরুল্লেখ করেছেন মাত্র। উক্ত উপায়ে ভারতীয় কৃষির যে প্রকৃত উন্নতি সাধিত হয় নাই তা স্পষ্টই পরিলক্ষিত হয়। বইখানি সুলিখিত কিন্তু মূল সমস্যাকে এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে বলে এর মূল্য অত্যন্ত কম।

INDUSTRIALISATION—P. S. Lokanathan. Oxford Pamphlets on Indian Affairs. Price 4 as.

আমাদের দেশে শিল্পের ক্রমবিবর্তন ও তার বর্তমান অবস্থা এই বইখানিতে সুন্দরভাবে দেখানো হয়েছে। লেখক বলেছেন—ভারতবর্ষ একটি সম্পদশালী দেশ কিন্তু সেখানে দরিদ্রলোকের বাস। শিল্পজাত দ্রব্য প্রস্তুত করার উপযুক্ত কাঁচামাল এদেশে সুপ্রচুর। তা সত্ত্বেও দেশের লোকের এত গরীব হয়ে থাকার কারণ একমাত্র এই যে সেই কাঁচামালগুলিকে সম্পূর্ণরূপে শিল্পের কাজে প্রযুক্ত করা হচ্ছে না। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের পরে ভারতবর্ষ পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী তুলা উৎপন্ন করে; পাট তার একচেটিয়া সম্পত্তি; চীনাবাদাম, এরণ্ড, তিসি ও নারিকেল প্রভৃতি তৈলবীজ এই দেশেই সব চেয়ে বেশী হয়; যে সমস্ত দেশে তামাক উৎপন্ন হয় তাদের মধ্যে ভারতবর্ষের স্থান সর্ব্বপ্রথম এবং ভারতের পশুসম্পদ অন্য সকল দেশের পশুসংখ্যাসমষ্টির এক-তৃতীয়াংশ।

খনিজ সম্পদেও ভারতের প্রায় সমান স্থান। এদেশে যত কয়লা আছে তার পরিমাণ আনুমানিক ৫,০০০ থেকে ৬,০০০ কোটি টন, লোহা ৩৬০ কোটি টন এবং অভ্র, manganese, ilmenite, monazite, zircon প্রভৃতি ধাতুগুলির

প্রচুর সঞ্চয় আছে। তামা, সীসা, টিন ও দস্তারও অভাব নেই। গন্ধক ও উৎকৃষ্ট এলুমিনিয়ম সম্প্রতি আবিষ্কৃত হয়েছে। এ সকলের সঙ্গে যন্ত্রচালক-জলশক্তি সৃজনের উপায়ও পর্য্যাপ্ত রয়েছে।

এরূপ অনুকূল অবস্থাসত্ত্বেও এ দেশে শিল্পপ্রসারের গতি অত্যন্ত মন্দ। আলোচ্য বইখানিতে তার কারণ বর্ণনা করা হয়েছে। (১) দেশীয় মূলধন, (২) শিল্পবিষয়ে নেতৃত্ব, (৩) বৈজ্ঞানিক দক্ষতা, (৪) এবং বিশেষ বিশেষ কাঁচামাল—ইত্যাদির অভাব কয়টি প্রধান কারণ। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা বড় কারণ হচ্ছে রাষ্ট্রশক্তির পক্ষ থেকে উৎসাহ ও সাহায্য প্রদানে অনিচ্ছা। "A laissez-faire policy was quite inadequate for a country like India, which can only be developed under a well-conceived government plan." ১৯১০ সালে ভারত সচিব লর্ড মর্লি শিল্পের উন্নতি-কল্পে ভারত সরকারের পক্ষ থেকে কোনও প্রকার সাহায্য করার বিরোধী ছিলেন এবং বিগত মহাযুদ্ধের পর ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে Industrial Commission যে সমস্ত বিষয়ে সুপারিস ও প্রস্তাব করে গিয়েছিলেন সেগুলি সম্পূর্ণ পরিত্যক্ত হয়েছে।

গবর্ণমেণ্টের প্রচ্ছন্ন বিরুদ্ধতা অগ্রাহ্য করেও কোন কোন শিল্পের প্রতিষ্ঠা হয়েছে সত্য, কিন্তু যুদ্ধের দরুণ সকল রকম শ্রমশিল্পেরই যে সুবর্ণ সুযোগ উপস্থিত, সেই সুযোগ গ্রহণ করে দেশের সঞ্চিত কাঁচামালগুলিকে কাজে লাগানোর কোনও চেষ্টা দেখা যায় না। "In spite of this apparently impressive record of industrial advance, public opinion has been dissatisfied with the pace of industrialization. In the first place, it is felt that the achievement has not been commensurate with the possibilities or with the necessities arising out of a total war; and it is a poor record in comparison with that of Australia and Canada. The total war orders placed in India were only Rs. 3000 crores till the end of 1941 against Rs. 11,000 crores placed in Canada."

বইখানা পড়ে বোঝা যে যায় ভারতবর্ষকে শুধু কাঁচামালের ভাণ্ডার করে রাখার উদ্দেশ্যে তার শিল্পকে বিদেশী বণিকের স্বার্থের যূপকাষ্ঠে বিসর্জ্জন করা

হয়েছে। হতভাগ্য ঔপনিবেশিক দেশগুলির এই দুরবস্থা কারও অবিদিত নয়।

যানবাহন, বিদ্যুৎশক্তি ও শিল্পের অন্যান্য সমস্যাগুলির দায়িত্ব সরকারের পক্ষ থেকেই গ্রহণ করা উচিত একথা লেখক স্বীকার করেন। শিল্প প্রতিষ্ঠানের মালিক কাহার হওয়া উচিত এই গুরুত্বপূর্ণ ও মতদ্বৈধপূর্ণ সমস্যারও আলোচনা তিনি করেছেন। লেখক একথা স্বীকার করেছেন যে নিছক লাভমূলক ব্যক্তিগত ব্যবসার দ্বারা এদেশে শিল্পের দ্রুত প্রসার হবার সম্ভাবনা নাই, কিন্তু অর্থনৈতিক সমস্যার চরম সমাধান যে একমাত্র সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সম্ভব এই উপলব্ধিতে তিনি পৌঁছননি। আমাদের দেশে তিনি মাঝামাঝি গোছের পথ অবলম্বনের পক্ষপাতী। উপস্থিত প্রয়োজন হয়তো তাই, কিন্তু তার তাগিদে সমাজতান্ত্রিক লক্ষ্য থেকে ভ্রষ্ট হলে বিপদ আছে।

শান্তিপ্রিয় বসু

দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ

মার্ক্সীয় দর্শন—সরোজ আচার্য্য। পুঁথিঘর। ২২ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। পৃষ্ঠা ২২৭, মূল্য তিন টাকা।

বর্ত্তমান সময়ে মার্ক্সবাদ সম্বন্ধে অনেকেই অবহিত হইতে চাহেন। ইহার প্রধান কারণ এই যে বর্ত্তমান সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মূলে যে ভীষণ ক্রটী ও অসামঞ্জস্য বিদ্যমান, তাহা বিরাট-বিপ্লব, হত্যাকাণ্ড, নানারূপ অভাব ও অভিযোগের ভিতর দিয়া মানুষের নিকট ক্রমেই সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। তাই আজ মানুষের দৃষ্টি ও চিন্তা দর্শনের ও ধর্ম্মের অবাস্তব ঊর্দ্ধ লোক হইতে মাটীর পৃথিবীতে নামিয়া আসিয়াছে এবং উহা মানুষের সামাজিক জীবনধারা নিয়ন্ত্রণে ও তাহার গুরুতর সমস্যা সমাধানে নিয়োজিত হইয়াছে। জগতের গতি আজ অনির্দ্দিষ্ট, এবং সমস্ত কায়েমী ব্যবস্থা এখন ধূলিসাৎ হইবার উপক্রম। এক দিকে ইতিহাস চলিয়াছে এই ব্যবস্থার মূলে কুঠারাঘাত করিতে, অপর দিকে কায়েমী স্বার্থ চেষ্টা করিতেছে এই ব্যবস্থাকে সঞ্জীবিত করিতে ও

চিরস্থায়ী রাখিতে। ইহার ফলে ঘটিয়াছে বিষম অগ্ন্যুৎপাত এবং জগতের লোক আজ আগ্নেয়গিরির উপরে দাঁড়াইয়া এই নিষ্ঠুর অগ্নিকাণ্ডে দগ্ধ হইতেছে। পথ কোথায়? যে মার্ক্সবাদ এতদিন অস্পৃশ্য ছিল আজ মানুষ তাহার সাহায্যেই ইতিহাসের গতি এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতির স্বরূপ বুঝিবার চেষ্টা করিতেছে। বর্ত্তমান সমাজব্যবস্থার মধ্যে যে বিপরীতের দ্বন্দ্ব কার্য্যকরী এবং যাহার ফলে আজ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের তাণ্ডবলীলা চলিতেছে, তাহা যেন আজ মানুষের কাছে ক্রমেই বাস্তব হইয়া উঠিতেছে। বাস্তবিকই মার্ক্সীয় দর্শন বৈজ্ঞানিক উপায় অবলম্বন করিয়া আধুনিক সমাজের মূল ব্যাধির কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছে এবং সুচিকিৎসকের মত উহার নিরাময়ের উপায় নির্দ্দেশ করিয়াছে। তাই মার্ক্সবাদের আজ সমাদর।

মার্ক্স, এঙ্গেলস ও লেনিন মার্ক্সীয় দর্শনের সুদৃঢ় ভিত্তি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন এবং পরবর্ত্তী মার্ক্সীয় দার্শনিকগণ এই দর্শনের প্রকৃত স্বরূপ আলোচনা করিয়া ইহাকে জগতের সম্মুখে সুপরিজ্ঞাত করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত সরোজ আচার্য্য তাঁহার মার্ক্সীয় দর্শন নামক পুস্তকে মার্ক্স, এঙ্গেলস ও লেনিন-প্রদর্শিত উপায়ে বহু মার্ক্সবাদী দার্শনিকের মতামত আলোচনা করিয়া বাংলা ভাষায় মার্ক্সীয় দর্শন সম্বন্ধেএই আলোচ্য পুস্তক লিখিয়া আমাদের ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। বঙ্গ ভাষায় মার্ক্সীয় দর্শন সম্বন্ধে পুস্তক লেখা বাস্তবিকই কষ্টসাধ্য; কিন্তু তৎসত্ত্বেও আচার্য্য মহাশয় বহুলাংশে কৃতকার্য্য হইয়াছেন।

মার্ক্সীয় দর্শনের পাঠকগণ যদি মার্ক্সবাদের প্রকৃত স্বরূপ হৃদয়ঙ্গম করিতে চাহেন, তাহা হইলে প্রচলিত দর্শনের সঙ্গে ইহার যে বৈষম্য আছে তাঁহাদের হৃদয়ঙ্গম করা আবশ্যক। দর্শন বলিতে সাধারণতঃ আমরা বুঝি তত্ত্বজ্ঞান, (Metaphysics) কিন্তু মার্ক্সীয় দর্শন তত্ত্বজ্ঞান নহে, ইহা বিজ্ঞান। সত্যের স্বরূপ জানিবার জন্য মার্ক্সীয় দর্শন সর্ব্বদাই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া থাকে এবং নিরীক্ষণ ও পরীক্ষণের সাহায্যে এই দর্শন সত্যের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করিতে সর্ব্বদাই সচেষ্ট। এই দর্শন কোন অলৌকিক সত্যে বিশ্বাস করে না, সুতরাং অপ্রাকৃতিক অচঞ্চল কোন ধ্রুব সত্যেই ইহার বিশ্বাস নাই। প্রজ্ঞান (Reason) অথবা সহজাত বুদ্ধির সাহায্যে এই দর্শন সত্যের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করিতে চেষ্টা করে না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে মার্ক্সীয় দর্শনের পদ্ধতি বৈজ্ঞানিক

সুতরাং ইহা অভিজ্ঞতাবাদী। দ্বিতীয়তঃ মনে রাখিতে হইবে যে মার্ক্সীয় দর্শন বস্তুবাদী (Materialistic) কিন্তু এই বস্তুবাদ যান্ত্রিক বস্তুবাদ (Mechanistic-Materialism) নহে, ইহা দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ (Dialectical-Materialism): মার্ক্সের মতে জগৎকে জানিতে হইলে গতিশীল বস্তুকে জানিতে হইবে। আমরা এই বস্তুকে জানিতে পারি অভিজ্ঞতার সাহায্যে। এই গতিশীল বস্তুই নানারূপ স্তর অতিক্রম করিয়া জীবন ও মন সৃষ্টি করে। তৎসত্ত্বেও জীবন ও মন বস্তু হইতে স্বতন্ত্র। ইহাদের প্রত্যেকেরই স্বকীয় বৈশিষ্ট্য আছে। অভিব্যক্তির ফলে পরিমাণ (quantity) গুণে (quality) পরিণত হয়। প্রকৃতির ও ইতিহাসের গতি ডায়লেকৃটিক্। এই দ্বান্দ্বিক গতি আমরা দেখিতে পাই ঐক্যের মধ্যে। বিরুদ্ধের সংঘাত, বিরুদ্ধের ঐক্য এবং অ-স্বীকৃতির অস্বীকৃতি—ডায়লেকৃটীকের এই তিনটী মূল নিয়ম আমরা অভিজ্ঞতার সাহায্যেই জানিতে পারি। সুতরাং তৃতীয়তঃ আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে মার্ক্সীয় ডায়লেকৃটীক্ যদিও হেগেলীয় ডায়লেকৃটীকের কাছে ঋণী, তথাপি মার্ক্সীয় ডায়লেকৃটীকের দৃষ্টিভঙ্গি হেগেলীয় ডায়লেকৃটীকের দৃষ্টিভঙ্গি হইতে পৃথক। হেগেল নৈয়ায়িক সাধারণ ধারণার অভিব্যক্তি অনুসরণ করিয়া ডায়লেকটীকের গতিস্বরূপ নির্ণয় করিয়াছেন এবং তাঁহার মতে নির্ব্বিশেষ প্রজ্ঞানই মূল সত্য। মার্ক্স ও এঙ্গেলস্ প্রকৃতির ও ইতিহাসের গতি অনুসরণ করিয়াই অভিজ্ঞতার সাহায্যে ডায়লেক্টীকের গতি নির্ণয় করিয়াছেন এবং তাহাদের মতে গতিশীল বস্তুই আদিম সত্য। হেগেল প্রজ্ঞানবাদী, মার্ক্স ও এঙ্গেলস্ বস্তুবাদী, সুতরাং মার্ক্সীয় দার্শনিকদের মতে হেগেলীয় দর্শনকে বিপরীতমুখী করিলেই এই দর্শন মস্তকের উপর না দাঁড়াইয়া পায়ের উপর দাঁড়াইতে পারে। তৎব্যতীত হেগেলের দর্শন উদ্দেশ্যবাদী কিন্তু মার্ক্সের দর্শন সেরূপ নহে। মার্ক্স ও এঙ্গেলসের মতে ডায়লেকৃটীকের স্বরূপ বুঝিতে হইলে, বৈজ্ঞানিক উপায়ে প্রকৃতি ও ইহিাসের গতি অনুসরণ করিতে হইবে। মার্ক্সীয় সমাজ-বিজ্ঞান ধনোৎপাদন ও তাহার বণ্টনের স্বরূপ ও গতি বিশ্লেষণ করিয়া সামাজিক সমস্যা সমাধান করিতে চেষ্টা করে, এবং সেই জন্যই মার্ক্সীয় সমাজ-বিজ্ঞানকে ঐতিহাসিক বস্তুবাদ বলা হয়। ভাববাদী দর্শন চেতনা ও জ্ঞানকে বস্তুর পূর্ব্বে স্থাপন করে; কিন্তু বস্তুবাদী দর্শন চেতনা ও জ্ঞানকে বস্তুর পশ্চাতে স্থাপন করে।

শ্রীযুক্ত সরোজ আচার্য্য মহাশয় তাহার 'মার্ক্সীয় দর্শন' নামক পুস্তকে দ্বান্দ্বিক ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদের মর্ম্ম উদ্‌ঘাটন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি তাঁহার পুস্তকে লিখিয়াছেন: "মার্ক্সবাদ কেবলমাত্র পুঁথিগত মতবাদ নয়; মার্ক্সবাদ একটি সামাজিক আন্দোলন—আর ঐ সামাজিক আন্দোলন মার্ক্স ও এঙ্গেলস্‌-এর আকস্মিক নষ্টামি-বুদ্ধি-প্রসূত নয়। এই আন্দোলনের ঐতিহাসিক রূপ হইতেছে—বৈপ্লবিক শ্রেণী-সংগ্রাম, যাহা দীর্ঘ শতাব্দী ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে।" মার্ক্সবাদ যে কেবল একটি থিওরি নহে, ইহার সত্য যে সর্ব্বদাই ব্যবহারিক অভিজ্ঞতার সাহায্যে সংশোধিত, পরিবর্ত্তিত, পরিবর্দ্ধিত ও প্রমাণিত হয় তাহা তিনি দেখাইয়াছেন। সামাজিক শ্রেণী বিপ্লবের কারণ ও গতি নির্ণয় করিতে তিনি সর্ব্বত্রই মার্ক্সীয় দর্শনের পদ্ধতি অনুসরণ করিয়াছেন।

মার্ক্সীয় দর্শনকে যে সব বুর্জ্জোয়া লেখকগণ বিকৃত করিয়াছেন তাহাদের মতবাদ যে শ্রেণী-স্বার্থ দ্বারা প্রভাবিত, লেখক যুক্তিসহকারে তাহা প্রমাণ করিতে সর্ব্বদাই সচেষ্ট।

এই পুস্তকে পাঠকগণ দ্বান্দ্বিক ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদের স্বরূপ বুঝিতে যথেষ্ট সাহায্য পাইবেন। লেখক ভাববাদ ও বস্তুবাদের বিরুদ্ধতা দেখাইয়াছেন এবং বস্তুবাদের স্বপক্ষে যে সব যুক্তি আছে তাহা তিনি পাঠকদের সম্মুখে উপস্থাপিত করিয়াছেন। কতিপয় আধুনিক বৈজ্ঞানিক ও ধনতান্ত্রিক লেখক যে কায়েমী সমাজব্যবস্থার সুদৃঢ় ভিত্তি স্থাপন করিবার জন্য ভাববাদী দর্শনের ও ধর্ম্মের সমর্থন করিয়াছেন তাহা তিনি স্পষ্ট ভাবে দেখাইয়াছেন। লেখকের আধুনিক বুর্জ্জোয়া বৈজ্ঞানিকদের সমালোচনা উপভোগ্য। লেখক ধর্ম্মের উত্থান ও গতি যে আর্থিক সমাজ-ব্যবস্থার উপর নির্ভরশীল তাহা দেখাইয়াছেন। এই সম্পর্কে তিনি যাদুবিদ্যার সঙ্গে ধর্ম্মের সম্বন্ধ নিরূপণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন।

তিনি দর্শনের ইতিহাসের সাহায্যে মার্ক্সীয় দর্শনের সহিত পূর্ব্ববর্ত্তী দার্শনিকদের সম্বন্ধ বিশ্লেষণ করিয়াছেন। বিশেষ করিয়া ফয়ারবাকের ও হেগেলের দর্শনের সহিত মার্ক্সীয় দর্শনের সম্বন্ধ নির্দ্ধারিত করিয়াছেন। ভাববাদী দর্শন কেন নির্ব্বিশেষ সত্যে বিশ্বাস করে আচার্য্য মহাশয় তাহার

সামাজিক কারণ নির্ণয় করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। বুর্জোয়া সমাজে ব্যক্তি স্বাধীনতাকে কেন যে উচ্চ স্থান দেওয়া হইয়াছে তাহা তিনি দেখাইয়াছেন। প্রাকৃতিক নিয়মকে জানিয়াই যে স্বাধীনতা লাভ করা যায় মার্ক্সীয় এই তত্ত্ব লেখক যুক্তি সহকারে সমর্থন করিয়াছেন। জ্ঞান ও বস্তু, বিষয় ও বিষয়ী, এই উভয়ের সম্বন্ধ নির্ণয় করিতে গিয়া লেখক আপেক্ষিক সত্য ও নিরপেক্ষ সত্যের স্বরূপ সম্বন্ধে মার্ক্সীয় দর্শনের মত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ব্যবহারিক জীবনের সঙ্গে সত্য জ্ঞানের যে যোগ সুদৃঢ় মার্ক্সীয় এই থিওরীর মর্ম্ম উদ্ঘাটনে লেখক বিশেষ প্রয়াস পাইয়াছেন।

আর্থিক সমাজব্যবস্থার মূলে অর্থোৎপাদন ও অর্থবণ্টন যে কার্য্যকরী তাহা তিনি দেখাইয়াছেন। মার্ক্সের "ক্যাপিটালের" সাহায্যে তিনি বুর্জোয়া ও পূর্ব্ববর্ত্তী সমাজ-ব্যবস্থার ও শ্রেণী-সম্বন্ধের মূলে যে অর্থোৎপাদন ও অর্থবণ্টনের পদ্ধতি কার্য্যকরী তাহা প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। সমাজ শরীরের বাহিরে যে ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্য অবর্ত্তমান মার্ক্সীয় দর্শনের সাহায্যে গ্রন্থকার তাহা দেখাইয়াছেন। এই পুস্তকে দুই একজন বিখ্যাত ভারতীয় দার্শনিক কি ভাবে মার্ক্সবাদের সমালোচনা করিয়াছেন তাহা বর্ণনা করিয়া লেখক তাহাদের সমালোচনার উত্তর দিয়াছেন।

এই পুস্তক পাঠ করিয়া আমি নির্ভয়ে বলিতে পারি যে সরোজ আচার্য্য মহাশয় মার্ক্স, এঙ্গেলস্ ও লেনিন-প্রদর্শিত পদ্ধতি অনুসরণ করিয়াই মার্ক্সবাদের স্বরূপ উদ্ঘাটন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। মার্ক্স, এঙ্গেলস্ লেনিন প্রভৃতি বহু বিখ্যাত লেখকদের লেখা হইতে বহু মত উদ্ধৃত করিয়া লেখক তাঁহার পুস্তকের শ্রীবৃদ্ধি করিয়াছেন। যাঁহারা মার্ক্সবাদের সার মর্ম্ম জানিতে চান তাঁহারা এই পুস্তক পড়িয়া উপকৃত হইবেন।

তবে এই পুস্তক পাঠ করিয়া আমার এই কথা মনে হইয়াছে যে গ্রন্থকার পরিচ্ছেদসমূহের নৈয়ায়িক পারম্পর্য্য রক্ষা করিতে পারেন নাই। এই ত্রুটির ফলে পুস্তকের বিষয়-বস্তু অনুসরণ করিতে মার্ক্সবাদের প্রাথমিক পাঠকদের কিছু অসুবিধা হইবে। লেখক মাঝে মাঝে এক বিষয়-বস্তুর সঙ্গে অসাবধানতা-বশতঃ অন্য বিষয়বস্তুর অপ্রাসঙ্গিক সংযোগ করিয়া ফেলিয়াছেন, ইহার ফলেও পাঠকদের অসুবিধা হইবে। বিশেষ চেষ্টা সত্ত্বেও গ্রন্থকার মার্ক্সীয় অর্থনীতির

ব্যাখ্যা সুস্পষ্ট করিতে সম্পূর্ণ কৃতকার্য্য হন নাই। কোন কোন স্থলে আমার মনে হইয়াছে যে পুস্তকে কিছু কিছু ভাষার শৈথিল্য আছে। "প্রকৃতি" শব্দটী বহু স্থলে অসাবধানতার সহিত ব্যবহৃত হইয়াছে। এইরূপ আরও দুই একটি শব্দের প্রয়োগ সম্বন্ধে আপত্তির কারণ বর্ত্তমান; তবে এইরূপ পুস্তকে ভাষার প্রয়োগ সম্বন্ধে সমালোচনার কারণ থাকিবেই। ইহা সত্ত্বেও সরোজ আচার্য্য মহাশয় বঙ্গ ভাষায় মার্ক্সীয় দর্শন সম্বন্ধে পুস্তক লিখিয়া বাঙ্গালী পাঠকসমাজের বিশেষ উপকার করিয়াছেন। যাঁহারা মার্ক্সবাদ সম্বন্ধে অবহিত হইতে চান তাঁহারা নির্ভয়ে এই পুস্তক পাঠ করিতে পারেন।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

সামরিকী

মহত্তর যুদ্ধের প্রথম অধ্যায়—হিরণ্ময় ঘোষাল। দি ন্যাশন্যাল লিটারেচার কোং।

চেকোশ্লোভকিয়া ও পোল্যাণ্ড, এই দুইটি শান্তিপ্রিয় ও সুসভ্য শ্লাভ-জাতির বর্ত্তমান দুর্দ্দশা কোথায় গিয়ে শেষ হবে বলা যায় না। গ্রন্থকার বলেছেন প্রথম আঘাতের কথা যখন রাষ্ট্রকর্ত্তাদের অন্ধ আত্মম্ভরিতা ও মিথ্যা স্তোক-বাক্যের দ্বারা প্রতারিত জন-সাধারণের ওপর বোমা বর্ষণ সুরু হয়। সে সময় তিনি ছিলেন ভারশৌ বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অধ্যাপক এবং সে-দেশে দীর্ঘকাল প্রবাসের ফলে তথাকার সংস্কৃতি ও সুধী-সমাজের সঙ্গে তাঁর এমন প্রীতির সম্বন্ধে গড়ে উঠেছিল যে লিপিভঙ্গী হয়ে উঠেছে জ্বালাময় ও অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী।

প্রকাশক দাবী করেছেন যে আলেখ্যটি হয়েছে বর্ত্তমান যুদ্ধের একটি অরঞ্জিত বাস্তব চিত্র। দাবিটির যথার্থতা অস্বীকার করা যায় না যে-হেতু বিমান পথ উন্মুক্ত হওয়া পর্য্যন্ত যুদ্ধের প্রভাব হয়ে দাঁড়িয়েছে সর্ব্বগ ও সর্ব্বব্যাপী। সমরাঙ্গণ হতে বহু দূরেও নিরস্ত্র ও শান্তিকামী পৌরজনের ওপর মৃত্যুশেল বিকীর্ণ করা যখন যুদ্ধ জয়ের অপরিহার্য্য উপায় বলে গৃহীত হয়েছে তখন সেই ধ্বংসের আংশিক প্রতিরূপকেও যুদ্ধের বাস্তব চিত্র বলা যায়। নতুবা আধুনিক যুদ্ধবিদ্যা ও অস্ত্রশস্ত্র সম্বন্ধে বিশেষ কোন জ্ঞান গ্রন্থকারের নাই এবং সেদিক

থেকে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী হচ্ছে এতই সঙ্কীর্ণ যে বে-সামরিক এ. আর. পি. আয়োজন পর্য্যন্ত চোখে পরে নি। প্রসঙ্গ ক্রমে পোল নৌ-বল ও অশ্বারোহী-বাহিনীর প্রশস্তিও সাক্ষ্য দেয় তাঁর অপ্রশস্ত অভিজ্ঞতার। কিন্তু তিনি নিঃসংকোচে স্বীকার করেছেন যে অস্ত্র-বিশারদ তিনি নন এবং যা কিছু তাঁর দৃষ্টি ও কর্ণগোচর হয়েছে তার অতিরিক্ত কোন জ্ঞান তিনি বন্টন করতে বসেন নি।

ফলে আদ্যন্ত গ্রন্থখানি হয়েছে ভ্রাম্যমানের দিনপঞ্জিকার মত সহজপাঠ্য ও নির্ভার। গ্রন্থকারের ব্যক্তিগত পক্ষপাত ও একদেশদর্শিতা, আবেগ ও আনন্দ, বেদনা ও অনুরাগ ঐতিহাসিক ইতিবৃত্তের উপযোগী নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিপন্থী হলেও অদ্ভুত মানবীয় সৃষ্টি করেছে এবং সেইজন্য সুদূর পোলদেশের সাধারণ মানুষের প্রতি বাঙ্গালী পাঠকের সহানুভূতি স্বতঃই স্ফুরিত হয়।

গ্রন্থকারের ছোট গল্পের বই হাতের কাজ পড়ে বার বার এই কথাই মনে হয়েছিল যে দেশ বিদেশের মানুষের প্রকৃত পরিচয়ের পথে ভাষান্তরের যে প্রতিবন্ধক রয়েছে তাকে অতিক্রম করতে হলে অনুবাদের সাহায্য গ্রহণ করা হচ্ছে বিড়ম্বনা, বিশেষ করে তৃতীয় একটি ভাষায় সহায়তায়। চাই অধ্যাপক ঘোষালের মত বিদেশী ভাষা ও সংস্কৃতির গভীর অন্তরের মধ্যে প্রবিষ্ট হয়েও নিজের ভাষা ও ভাবের মধ্যে দিয়ে তার পরিচয় দেবার ক্ষমতা।

বিমান-আক্রান্ত বিভ্রান্ত জনসমুদ্রের সমষ্টিগত শঙ্কায় অভিভূত হয়ে পালিয়ে চললেও গ্রন্থকারের সজাগ ও গ্রহণশীল চিত্ত এমন অনেক কিছু ছোট বড় অভিজ্ঞতা আহরণ করেছে যা আপাত দৃষ্টিতে তুচ্ছ বলে প্রতীয়মান হয় কিন্তু অন্তর্বাহী আবেগে সিঞ্চিত হয়ে বিশেষভাবে চিত্তাকর্ষক হয়েছে।

গ্রন্থকারের জার্মান বিদ্বেষ হচ্ছে অত্যন্ত প্রকট কিন্তু একমাত্র বেতার বক্তৃতা হতে উদ্ধৃত অংশগুলি ছাড়া কোথাও প্রপাগাণ্ডার আভাস নেই। অন্যান্য শ্লাভ জাতির প্রতি পক্ষপাতিত্ব ব্যক্ত করলেও রাশিয়ার প্রতি কোন প্রীতি প্রকাশ করেন নি গ্রন্থকার। এই পক্ষপাত-বৈপরীত্য হচ্ছে পোলজাতির মজ্জাগত এবং বর্ত্তমান দুর্দ্দশার একটি প্রধান কারণ। সে কথা যদি গ্রন্থকার স্বীকার করতেন তাহলে রচনার মধ্যে কোন ত্রুটিই থাকতো না।

শ্রীশ্যামলকৃষ্ণ ঘোষ

এ যুগের যুদ্ধ—গোপাল হালদার। প্রকাশক—পুঁথিঘর। মূল্য—সাড়ে তিন টাকা।

গোপাল হালদারের লেখা বই খাঁটি জিনিসের ছাপ নিয়ে আসে। মনস্বিতার সহিত প্রেমের, তুষার-শীতল বিতর্কের সহিত বহুবর্ণ, প্রাণতপ্ত ভাবুকতার অপূর্ব সমাবেশ গোপাল হালদারের লেখায় পাই। তাঁর চিন্তা গতিধর্মী, আগামী কালকে মূর্ত করে বর্তমানের দ্বন্দ্বে, বর্তমানকে নূতনতর অদ্বন্দ্বে টেনে নিতে চায় আগামীর খরস্রোতায়। জ্ঞান ও কর্মের অঙ্গাঙ্গী-সম্বন্ধ তাঁর লেখায় পরিস্ফুট।

কথাটা আগেই পরিষ্কার করে রাখা ভাল। কেননা 'এ যুগের যুদ্ধ' বৈঠকী আলোচনার জন্য লেখা হয়নি। নিছক কৌতূহলের তাগিদ—যাকে সচরাচর আমরা জ্ঞানপিপাসা বলে থাকি—এ বইটি থেকে যে মিটবে না এমন কথা বল্‌ছি না। বরং খুবই মিটবে। যুদ্ধ বিদ্যা সম্বন্ধে বাঙ্গালীর অজ্ঞতা সুবিদিত। সাম্রাজ্যবাদ বাঙ্গালীকে ইন্‌টেলেক্‌চুয়াল বলেই বাহবা দিয়ে এসেছে, বেতন-ভোগী লেঠেলের দল সংগ্রহ করেছে ভারতীয় সমাজের এমন সব স্তর থেকে, ইন্‌টেলেক্‌ট যেখান থেকে নির্বাসিত। যুদ্ধ বিদ্যা সম্বন্ধে আমাদের একান্ত মানসিক নৈরাজ্যে যাঁরা একটু সঙ্গতি ও শৃঙ্খলা আনতে চান, শব্দের প্রতি-ধ্বনির পরিবর্তে অর্থের রসবোধ চান, গ্রন্থটি তাঁদের খুবই সাহায্য করবে। যুদ্ধ বিদ্যার ঐতিহাসিক ভূমিকা হিসাবে পড়ুয়াদের কাছে গ্রন্থটি মূল্যবান্।

কিন্তু ওই যা বলছিলাম আগামী কালের কথা। মানুষ যখন ছোট ছোট দলে বিভক্ত ছিল তখন যুদ্ধবিগ্রহে প্রায় সকলকেই যোগ দিতে হ'ত; কেউই অক্ষত থাকৃত না। সেকালের যুদ্ধ বোধ হয় 'patriotic war'ই ছিল। সামন্ততন্ত্রের যুগে রাজায় রাজায় যুদ্ধ; সামন্তেরা অবস্থানুযায়ী রাজাকে যুদ্ধের সময়ে সৈন্য সরবরাহ করতেন। রাষ্ট্রিক বিপ্লবের ঝড়, জনগনের অচলায়তনে বড় পৌঁছত না। তারপর হ'ল standing armyর অভ্যুদয়—ড্রিল করা, মাইনে পাওয়া বার মেসে সৈনিক—দুর্দ্ধর্ষ হয়ে উঠ্‌ল তারা। ফরাসী রাষ্ট্রবিপ্লবে দেখা গেল নাগরিক সৈন্য—প্রথম জনযুদ্ধ। Tribal, patrictic war জাতির বৃহত্তর রঙ্গমঞ্চে পুনরভিনীত হল। নাগরিক সেনার

কাছে পেশাদার সৈন্তেরা ঝড়ের আগে তৃণের মত উড়ে গেল ; জগৎ দেখল, জাতির চারিত্রবলই প্রধান বল।

এ যুগে চারিত্রবলের পরীক্ষা আরো কঠোর হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ যুগের যুদ্ধ—সার্বজনীন যুদ্ধ। যুধ্যমান জাতির অসামরিক-সামরিক ভেদ প্রায় উঠে গেছে। বোমারু বিমানের আক্রমণ থেকে যেমন যুদ্ধক্ষেত্রের অনেক পিছনে মানুষ হতাহত হয়, তেমনি আবার জন-সহযোগ ও জন-প্রতিরোধ ব্যতীত কোন জাতি সার্বজনীন যুদ্ধে জয়ী হতে পারে না। জার্মান তড়িৎ-সমরের কাছে ফরাসী ও ইংরাজী রণনীতি বানচাল হয়ে গেল। সোভিয়েট রাশিয়ায় মদমত্ত তড়িৎসমর তড়িৎ-বিযুক্ত হ'ল। স্তালিন বললেন, ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, জগতে অপরাজেয় সেনা বলে কিছুই নেই। কোথায় রাশিয়ার প্রতিরোধ-শক্তি? কোথায় নিরস্ত্র চীনের প্রতিরোধ-শক্তি? কেনই বা মালয়, বর্ম্মা, ফ্রান্স, বেলজিয়াম প্রভৃতি দেশ কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই কাবু হয়ে পড়ল?

বেশ বোঝা যাচ্ছে—সাম্রাজ্যবাদী রণনীতি পৃথিবীর জনগণকে ফাশিস্ত আক্রমণ থেকে রক্ষা করতে পারবে না। ফাশিস্ত গৃহশত্রু পরাজয়ের পথ পরিষ্কার করে, প্রচার চালিয়ে, সমর সমাবেশে বাধা দিয়ে এবং জনগণকে দূরে রেখে। সামরিক ও শৈল্পিক যন্ত্রের উন্নতির ফলে পৃথিবী আজ ছোট জায়গা হয়ে পড়েছে। বিপুলা পৃথ্বী আজ অবিপুলা। বেশী দলের স্থান আজ পৃথিবীতে নেই। তাই স্তালিনের মুখে শুনি, জগৎ আজ দুই তাঁবুতে বিভক্ত, একটি জনগণের তাঁবু ও অন্যটি ফাশিস্ত দস্যুর তাঁবু। সুতরাং প্রশ্ন উঠছে,—পৃথিবীর জনগণ কেমন করে আত্মরক্ষা করবে? এ প্রশ্ন ভারতের জনগণের সম্মুখেও এসেছে। সাম্রাজ্যবাদী, পরাজিতমনোবৃত্তি, উপফাশিস্ত সামরিক নেতৃগণ ভারতের জনগণকে রক্ষা করতে পারবে না। চাই সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে অভিযান জাতীয় ঐক্যের দ্বারা। জনশক্তির জাগরণে ফাশিজমের পরাজয় হলে সাম্রাজ্যবাদের ধ্বংস অনিবার্য।

দেশরক্ষার জন্য, জনগণের জয়ের জন্য, জনযুদ্ধের রীতিনীতি শিক্ষা করা, ফাশিস্ত রণনীতির ও সমরকৌশলের বৈজ্ঞানিক আলোচনা ভারতবাসীর পক্ষে অপরিহার্য কর্তব্য। গোপাল হালদারের বইটি এই মহৎ কর্তব্য পালন করতে সকলকেই সাহায্য করবে।

অমরেন্দ্রপ্রসাদ মিত্র

বিদেশ-প্রসঙ্গ

বিলাতে বঙ্গনারী—৺প্রতাপচন্দ্র দত্ত। প্রকাশক জে. সি. দত্ত, ১২১ রাসবিহারী এভেনিউ, বালিগঞ্জ, কলিকাতা। ৪৯১ পৃষ্ঠা, মূল্য ২॥০ টাকা।

একাধারে ইতিহাস ও ভ্রমণ বৃত্তান্ত। ভূমিকাতেই বলা হয়েছে, বইখানি প্রকৃতপক্ষে স্বামী ও স্ত্রী দুইজনের সৃষ্টি। বোধ হয় সেজন্যই এর ঐতিহাসিক অংশে ও সুবিজ্ঞ বিচারভঙ্গীর আড়ালে অনুভব করি পুরুষের অভিজ্ঞ মন ও নয়নকে; এবং এর যে চারু দর্শন ও ছোট সরস কাহিনী, বিলেতের সুস্নিগ্ধ বসন্ত-সবুজ তৃণরাশির বুকের উপর নানাবর্ণের ফুলের মতো, মনকে সহজেই হাস্যবিকশিত করে তোলে তা যে নারীর হৃদয়-প্রসূত সে কথা বুঝতে বেশী দেরি হয় না। পুরুষ ও নারীর দ্বৈত রচনার তীক্ষ্ণতা ও মাধুর্য, সরলতা ও কোমলতার জন্য বইখানি মনকে আকর্ষণ করে। অতএব এ রকম প্রয়াসকে প্রশংসা না করে পারি না। দুঃখের বিষয়, এঁরা দুজনেই আজ পরলোকে, নইলে হয়ত বাঙলা সাহিত্য এঁদের কুশলী হাতে ভবিষ্যতে আরো কিছু আশা করতে পারত।

ইংল্যাণ্ড, স্কটল্যাণ্ড ও আয়ার্ল্যাণ্ড, ফ্রান্স ও জেনেভা—এই কয় প্রদেশে ভ্রমণ; বর্ণনা অধিকাংশ স্থানে বাস্তবিকই সহজ ও সরল। জমকালো কিছু নয়, লটবহর নাই, বোধ হয় সেজন্যই ভ্রমণ কাহিনী ভ্রাম্যমানের বাগবহরে চাপা পড়েনি। দেশ ও দৃশ্যগুলি বেশ চমৎকাররূপে মানসপটের উপর ফুটে ওঠে, এইটিই এই বইয়ের প্রধান যোগ্যতা। বড়দের পাঠ্য ও ছোট শিশুদের গল্প বলবার জন্য এর অনেক অংশ স্বচ্ছন্দে তুলে নেওয়া যায়।

ত্রুটির মধ্যে—পড়তে পড়তে মনে হল, দ্রুত রচনার কতগুলো দোষ থেকে গেছে যা অনায়াসে এড়ানো যেত। কিছু বানান ভুল, বর্ণনার ও ভাষার কিছু জটিলতা মাঝে মাঝে পাঠককে ক্লিষ্ট করে। কয়েক অংশ গুরুপাঠ্য হয়েছে। দৃষ্ট স্থানগুলোর বর্ণনা সর্বত্র সুসমঞ্জস হয়নি। বোধ হয় যে সব দেশ ও বিষয় দর্শকদ্বয়ের চোখে ও মনে বেশি ভালো লেগেছে, সেখানকার কথা একটু অতিরিক্ত খুঁটিনাটিসহ বলেছেন; অথচ স্কটল্যাণ্ডের অতি অপূর্ব হ্রদপ্রদেশ—ট্রসাক্‌স্‌কে তাঁরা মাত্র পরশ করে গেছেন। এতে মনটা যতদূর আশা করেছিল,

ততখানি না পেয়ে নিরাশ হন। তবে এঁরা অনুসন্ধিৎসু ভ্রমণকারী মাত্র, কবির শিল্পসৃজন এঁদের রচনায় আশা করতে পারি না।

তবু বিলেত ও বিদেশ সম্বন্ধে উৎসুক মন বইটি পড়ে পরিতৃপ্ত হবে এবং সেখানকার খাওয়াপড়া চালচলন লোকাচার ইত্যাদি জেনে ওদেশ সম্বন্ধে, বই পড়ে যতদূর সম্ভব ততদূর ধারণা ও অভিজ্ঞতাসঞ্চয় করতে পারবে। এই দিক দিয়ে এই বইটির বিশেষ সার্থকতা আছে। ছাপা বাঁধাই ভালো।

জ্যোতির্মালা দেবী

সাময়িকী

সমর ও সঙ্গতি

বর্তমানের মহাযুদ্ধগুলির ব্যয় যে রকম আকাশস্পর্শী হয়ে উঠেছে এবং সেই ব্যয় মিটাবার জন্যে যে রকম ট্যাক্‌স ও ঋণের মাত্রা বেড়ে চলেছে তাতে জাতীয় ধনের পুনর্বণ্টন হওয়া অনিবার্য। গত মহাযুদ্ধের ফলে বিলেতে এবং অন্যান্য দেশে এরকম পুনর্বণ্টন ঘটেছিল সে সম্বন্ধে পণ্ডিতেরা অনেক গবেষণা করেছেন, এবারের মহাযুদ্ধে ও রকম পুনর্বণ্টন আরও বেশী হচ্ছে। সহজ কথায় এর অর্থ হচ্ছে ধনগত বৈষম্য কমতির দিকে—অবশ্য এর অর্থ এ নয় যে এই মহাযুদ্ধের ফলে ধনবৈষম্য আর থাকবে না। এ সমস্ত ব্যাপারটাই আপেক্ষিক, কিন্তু মোটের উপর দেখা যায় ধনীদের উপর করভার চাপানো এবং তাদের কাছ থেকে ঋণগ্রহণ করা এবং সেই সঙ্গে শ্রমিকদের সংখ্যাবৃদ্ধি ও মজুরী বৃদ্ধি হওয়ার ফলে ধনবৈষম্য আপেক্ষিকভাবেও কমে। তা ছাড়া যুদ্ধের সময় জিনিষপত্রের দাম অত্যধিক বাড়ার ফলে যাঁদের বাঁধা আয় তাঁদের জীবনযাত্রা দুষ্কর হয়ে ওঠে। যাঁদের আয় নির্দ্দিষ্ট অথচ অল্প তাঁদের পক্ষে চিরাচরিত ঠাট বজায় রাখা কঠিন হয়ে পড়ে। শ্রেণী বিবর্তনের ইতিহাসে দেখা যায়, এরকম সময়েই কোনো একটা শ্রেণীর সভ্যেরা তাঁদের নীচের শ্রেণীতে নেমে পড়তে বাধ্য হন। এইভাবে খসে খসে পড়াতেই বিপ্লবীর দল বৃদ্ধি হয় আর নেতৃত্বের উপযোগী লোক খুঁজে পাওয়া সহজ হয়।

বর্তমানে ভারতবর্ষে যেরকম উপপ্লব দেখা দিয়েছে তাতে এই ধরণের একটা অবস্থার উদ্ভব হওয়া মোটেই আশ্চর্য নয়। সরকারী মুদ্রানীতি, জিনিষপত্রের দুষ্প্রাপ্যতা, খাদ্যদ্রব্যের টানাটানি অথচ বাঁধা আয়ের মধ্যে পড়ে অনেকেরই—বিশেষতঃ যাঁরা এদেশে মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক নামে অভিহিত তাঁদের—বিশেষ দুরবস্থা ঘটা স্বাভাবিক। এঁদের মধ্যে যাঁরা নিম্ন মধ্যবিত্ত, অর্থাৎ বেশী টাকা রোজগার করেন না এবং সেইকারণেই 'নিম্ন' আখ্যা পান, তাঁদের অবস্থাই সবচেয়ে সঙ্কটজনক। আজকাল নানা ফ্যাক্‌টরীতে ফিটার বা অন্যান্য কাজে অনেক ভদ্র সন্তানকেই দেখা যায়, যা পূর্বে দেখা যেত না। এই হতে সন্দেহ হয়, শ্রেণীবিবর্তনের পথে আমরা দ্রুত এগিয়ে চলেছি এবং মার্কস তাঁর সাম্য-

বাদীর ঘোষণাপত্রিকায় যাকে 'খসে পড়া' আখ্যা দিয়েছেন আমাদের সমাজ শরীরে সেই 'খসে পড়ার' চিহ্ন দেখা যাচ্ছে। আমাদের জাতীয় ধনের পুনর্বণ্টন হচ্ছে কিনা বা কতটুকু হচ্ছে, আমাদের সামাজিক কাঠামো পরিবর্তিত হলো কিনা বা কি ভাবে হচ্ছে—এগুলি সম্বন্ধে আলোচনা আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির 'রিসর্চের' অন্তর্ভুক্ত হওয়া মানা। সুতরাং এ বিষয়ে আমাদের কল্পনা মাফিক সিদ্ধান্ত করা ছাড়া বহুসময়েই গত্যন্তর থাকে না।

সুখের বিষয়, বাংলার বাইরে হলেও দু'এক জায়গায় এদিকে কিছু নজর পড়েছে। সম্প্রতি পাঞ্জাব বোর্ড অফ্ ইকনমিক ইন্‌কোয়ারী পাঞ্জাবের সৈনিকেরা যা বেশী মাইনে পাচ্ছে তা কি ভাবে খরচ করছে সে সম্বন্ধে একটী সংখ্যাসম্বলিত পুস্তিকা প্রকাশ করেছেন। সেটী কোনো কারণে, এখন অপ্রাপ্য। এ ছাড়া বরোদা ইকনমিক য়্যাসোশিয়েসন হতে An Enquiry into the Economic Condition of Lower Middle Class Persons in Service in Baroda City * বলে একটি পুস্তিকা প্রকাশিত হয়েছে, যার মধ্যে অনেকগুলি কৌতূহলজনক তথ্য আছে। Lower middle class persons in service বলতে এঁরা মাসিক একশ টাকা পর্য্যন্ত মাইনের চাকরী য়াদের ধরেছেন। অনুসন্ধানের সুবিধার জন্য এঁরা কেবলমাত্র গভর্ণমেণ্ট অফিসের কেরানী এবং স্কুলের শিক্ষকদেরই ধরেছেন, তার বাইরে যায় নি। এই অনুসন্ধানের ক্ষেত্র খুব ব্যাপক না হলেও কয়েকটী বিষয় বেশ লক্ষ্যনীয়। এঁদের মধ্যে, দেখা যায়, খুব বেশী বয়সের লোকের সংখ্যা কম। যতগুলি চাকরীধাদের মধ্যে অনুসন্ধান করা হয়েছে তাঁদের মধ্যে শতকরা ১৬·৭ জনের বয়স ২০ হতে ২৪ বছরের মধ্যে, ৩০·৮ জন ২৫ থেকে ২৯ এর মধ্যে, ১৩·৪ জন ৩০ থেকে ৩৪ এর মধ্যে, ১১·২ জন ৩৫ থেকে ৩৯এর মধ্যে, ১০·৮ জন ৪০ থেকে ৪৪এর মধ্যে, ৭·১ জন ৪৫ থেকে ৪৯এর মধ্যে, ৬·৩ জন ৫০ থেকে ৫৪এর মধ্যে, ২·৯ জন ৫৫ থেকে ৫৯এর মধ্যে, এবং ০·৪ জন ষাটের উপর। তার মধ্যে আবার শিক্ষিতের পর্য্যায়ভাগ এই রকম—ম্যাট্রিক না পাশ করার সংখ্যা

---

* An Enquiry into the Economic Condition of Lower Middle Class Persons in Service in Baroda City (No 5 issued by Boroda Economic Association, Baroda) by D. Ghose & D. S. Digha, 1942. Price 8 As.

শতকরা ১৪·৬ জন, ম্যাট্রিক পাশের সংখ্যা শতকরা ৫৫·৮ জন এবং গ্রাজুয়েটের সংখ্যা শতকরা ২৯·৬ জন। আরও দেখা গেছে যে প্রথম দলের মধ্যে আবার অধিকাংশই (৭৭·১%) এই অনুসন্ধানের সময় ৪০ বছরের বেশী বয়স, কিন্তু গ্রাজুয়েটদের মধ্যে অধিকাংশই (৯০·৫%) চল্লিশের নীচে। অর্থাৎ আগে যেখানে বিনা ম্যাট্রিকে চলতো এখন সেখানে গ্রাজুয়েট চলছে। ডিগ্রির আর্থিক মূল্য কমতির দিকে।

এই শ্রেণীর সামাজিক দিকটাও বিশেষভাবে লক্ষ্য করার জিনিষ। দেখা যাচ্ছে, একান্নবর্ত্তী পরিবারের মধ্যে গ্রাজুয়েটদের সংখ্যা কম নয়, যদিচ ম্যাট্রিক-পাশ-দের সংখ্যাই সব চেয়ে বেশী। কিন্তু সেই সঙ্গে এ-ও দেখা যায় যে গ্রাজুয়েটদের মধ্যে বিবাহিতের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত কম। যাঁরা অনুসন্ধান করেছেন তাঁদের মতে গ্রাজুয়েটদের মধ্যে বিবাহিতের সংখ্যাল্পতার কারণ হচ্ছে অপেক্ষাকৃত অল্প বয়স এবং অপেক্ষাকৃত অল্প আয়—বিবাহের প্রতি বিরাগই তার কারণ নয়। গ্রাজুয়টদের পত্নীদের বয়স অপেক্ষাকৃত বেশী, তা হতেও পূর্বোক্ত সিদ্ধান্তের নির্ভুলতা প্রমাণিত হয়।

এই নিম্ন মধ্যবিত্তশ্রেণীর আয়ব্যয়ের হিসাবটা বিশেষভাবে লক্ষ্য করার মতো। এই অনুসন্ধানে একান্নবর্ত্তী পরিবার এবং পৃথক-অন্ন পরিবারের হিসেব আলাদা ধরা হয়েছে কেননা দুয়ের অবস্থা ঠিক এক নয়। তা হতে দেখা যায় পৃথক্-অন্ন পরিবারের গড়পড়তা মাসিক আয় ৫৩৲, যদিচ এর মধ্যে ত্রিশ টাকা হতে চল্লিশ টাকা এবং ষাট টাকা হতে সত্তর টাকা আয়ের পরিবারের সংখ্যাই বেশী। একান্নবর্ত্তী পরিবারের আয় এর চেয়ে কিছু বেশী। গড়পড়তা হিসেবে এঁদের পরিবার প্রতি মাসিক আয় ৫৪৸৶৬ যদিও বেশীর ভাগ পবিবারেরই আয় ৬৪৲ টাকার কাছাকাছি। কিন্তু দেখা যাচ্ছে এতে কোনও পরিবারেরই খরচের সঙ্কুলান হয় না। পৃথক-অন্ন পরিবারের বেলা দেখা যায় মাসিক আয় পঞ্চাশ টাকার বেশী না হলে প্রতি মাসেই কিছু কিছু ধার হয়ে পড়ে। যে যে পরিবারের আয় মাসিক পঞ্চাশ টাকার বেশী তাদের কোনক্রমে খরচ সঙ্কুলান হয়। একান্নবর্ত্তী পরিবারের অবস্থা আরও খারাপ, কারণ এদের আয় মাসিক আশি টাকার বেশী না হলে ধার অনিবার্য। এই শ্রেণীর খরচের হিসেব নিয়ে দেখা যায় প্রাথমিক

প্রয়োজনেই এঁদের খরচ হয় বেশী—

গড়পড়তা মাসিক খরচ (টাকার হিসেবে)।
(ব্র্যাকেটে প্রদত্ত সংখ্যাগুলি মোট আয়ের শতকরা হিসাব)

মাসিক আয়	আহার্য	পরিধেয়	বাড়ীভাড়া	যাতায়াতের খরচ	ছেলেদের শিক্ষা ব্যয়	চিকিৎসা-ব্যয়	বিবিধ
ত্রিশ টাকার নীচে	১৩·১(৫৭·৩)	৩·৭(১৬·১)	৩·৩(১৪·৪)	০·৫(২·২)	১·২(৫·২)	১·০(৪·৪)	২·১(৯·২)
ত্রিশ হতে চল্লিশ টাকা পর্য্যন্ত	১৫·০(৪৭·৮)	৪·১(১৩·১)	৪·৬(১৪·৬)	১·০(৩·২)	১·০(৩·২)	১·৪(৪·৫)	৪·২(১৩·৩)
চল্লিশ টাকা " পঞ্চাশ " "	২০·৬(৪৮·৯)	৫·৯(১৪·০)	৬·২(১৪·৭)	১·০(২·৩)	১·১(২·৬)	২·৯(৬·৯)	৪·৩(১০·২)
পঞ্চাশ টাকা " ষাঠ " "	২৪·৯(৪৮·৮)	৬·১(১২·০)	৭·১(১৩·৯)	১·৫(২·৯)	২·৫(৪·৯)	৩·৬(৭·০)	৬·০(১১·৭)
ষাঠ " সত্তর " "	৩০·৯(৫০·১)	৭·৩(১২·১)	৭·৪(১২·৯)	১·২(২·০)	৩·৬(৫·৯)	৩·০(৪·৯)	৬·৭(১১·১)
সত্তর " আশি " "	৩০·৪(৪২·০)	১০·৬(১৪·৬)	১০·১(১৩·৯)	২·৯(৪·১)	২·৯(৪·১)	৪·৮(৬·৬)	১০·১(১৩·৯)
আশি " নব্বই " "	৩৩·৬(৪০·০)	১০·৬(১৩·১)	১০·৫(১২·৮)	৩·২(৩·৯)	৪·৫(৫·৬)	৪·১(৫·০)	১১·৫(১৩·১)
নব্বই টাকা ও ঊর্দ্ধে	৩৫·৩(৩৭·০)	১০·৬(১১·০)	১২·৪(১২·৮)	২·৯(৩·০)	৮·৬(৯·০)	৩·৮(৪·০)	১৪·৩(১৪·৮)
সমস্ত আয়	২৫·৪(৪৭·২)	৭·৪(১৩·৮)	৭·৬(১৪·১)	১·৮(৩·৪)	৩·২(৫·৯)	৩·১(৫·৮)	৭·৫(১৩·৯)

উপরোক্ত হিসাব হতে দেখা যায় যদিও এঁদের আয়ের অর্দ্ধেক শুধু খাবারের খরচে যায় তবু পরিবার পিছু সে খরচ পঁচিশ টাকার বেশী নয়। পরিবার পিছু হিসেব না ধরে মাথা পিছু হিসেব ধরলে মাথা পিছু মাসিক খাবারের খরচ দাঁড়ায় ৬·৯ টাকা। অথচ জেলের হিসেবে মাথা পিছু মাসিক চালের দরকার প্রায় ২৫ সের, যার দাম, বার টাকা মণ হিসেবেও, সাড়ে সাত টাকা। বলা বাহুল্য, খাদ্যদ্রব্য অর্থে শুধুই চাল বা ময়দা নয়।

এই সমস্ত তথ্যগুলি দেবার পর ঐ পুস্তিকাকারেরা এঁদের শোচনীয় আর্থিক অবস্থার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। এঁদের আর্থিক অবস্থার শোচনীয়তা সন্দেহের অতীত নিশ্চয়ই, বিশেষতঃ এঁদের যখন এই স্বল্প আয়েও ভদ্রলোকের ঠাট বজায় রাখতে হয়। কিন্তু মনে রাখতে হবে এই অনুসন্ধান ১৯৪১ সালের প্রথমে করা হয়েছিল। তারপর জিনিষপত্রের দাম বহুগুণে বেড়েছে। যিনি ভারত গভর্ণমেন্টের অর্থনৈতিক মন্ত্রণাদাতা তাঁর হিসেবে দেখা যায় ১৯৪১ সালের জানুয়ারী মাসের তুলনায় ১৯৪২ সালের নভেম্বর মাসে খাদ্যদ্রব্যের দাম শতকরা ৬২ ভাগ বেড়েছে। এটা অবশ্য সরকারী হিসেব। তবুও এই সরকারী হিসেবেই এঁদের ক্রমিক দুর্গতিবৃদ্ধির আন্দাজ পাওয়া যায়। এঁদের খাওয়াপরার স্বচ্ছলতা কোন দিনই না থাকলেও বর্তমানে পূর্বের তুলনায় এক তৃতীয়াংশ কম খেয়ে এবং এই দুই তৃতীয়াংশ কম পরে এঁরা নিশ্চয়ই ভাল অবস্থায় নেই। এরকম অবস্থা বেশী দিন চললে এই নিম্ন মধ্যবিত্তেরা ক্রমশঃ শ্রমিক পর্যায়ভুক্ত হতে বাধ্য হবেন এ আশঙ্কা (আশা বলাই উচিত বোধ হয়) অমূলক কি ?

শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ

সম্পাদকীয়

নববর্ষ

পরিচয়ের পাঠক-গোষ্ঠীকে আমাদের নববর্ষের অভিবাদন জানাচ্ছি। এ-রকম দারুণ নববর্ষ আমাদের অভিজ্ঞতায় এই প্রথম; আগামী নববর্ষ যে দারুণতর হবে না এমন আশা দেখি না, তার জন্যে আমাদের প্রস্তুত হ'তে হবে। যে দুর্দিনের মধ্যে আমরা দিন কাটাচ্ছি তা 'পৃথিবীব্যাপী, সুতরাং তার প্রতিকার কোনো একটি বিশেষ দেশ জাতি বা সম্প্রদায়ের হাতে নাই, কিন্তু প্রতি দেশ বা জাতি যদি এই বিষয়ে সচেতন ও সচেষ্ট না হয় তা হ'লে আমাদের মুক্তি অসম্ভব। বিচ্ছিন্নভাবে সচেষ্ট হযে কোনো লাভ নাই, তাই আজকের দিনে আমাদের প্রধান কর্তব্য সম্মিলিত চেষ্টার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি ও প্রচার। এই উপলব্ধি ও প্রচারে সাহিত্যিকদের সহায়তা বিশেষভাবে দরকার। জনসাধারণের সঙ্গে একাত্মবোধ সাহিত্যের প্রেরণা, সাহিত্যিকেরা যত নিজেদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে চলেন এই একাত্মবোধ তত শিথিল হয় ও সাহিত্যের প্রেরণা হয় লঘু, ফলে প্রকৃত সাহিত্য সৃষ্টির স্রোতে ভাঁটা পড়ে সাহিত্য রচনা পরিণত হয় কৌশল ও কারসাজিতে। সমসাময়িক সাহিত্যে এই কৌশল ও কারসাজির পরিচয় আমরা যথেষ্ট পেয়েছি কিন্তু এখন তা ঝেড়ে ফেলার সময় এসেছে। আজকের দুর্দিনে জনসাধারণের সুখ দুঃখের ভাগ বহন করে, তাদের সঙ্গে একাত্মবোধ অর্জন করে সাহিত্যিকরা রসসৃষ্টির প্রশস্ততর ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত হবেন এই আমাদের আশা। এই আশা যে অসংগত নয় তার উল্লেখ করতে পারি ফ্যাসিষ্টবিরোধী লেখক ও শিল্পিসংঘ-কর্তৃক প্রকাশিত ও সুভাষ মুখোপাধ্যায় ও গোলাম কুদ্দুশ—সম্পাদিত 'একসূত্রে'—নামক কবিতা সংগ্রহে। "এর মধ্যে খ্যাতনামা ও অখ্যাতনামা কবিদের যে সম্মেলন হয়েছে, তা থেকে এই কথাই মনে হয় যে বাংলা সাহিত্যে···আজ এমন একটা যোগসূত্র আবিষ্কৃত হয়েছে, যাতে আজ নিশ্চিতভাবে একটা ঐক্যবদ্ধ অধ্যায় সূচিত হচ্ছে—"সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের এই কথাই পুস্তিকাটির শ্রেষ্ঠ পরিচয়। কিন্তু শুধু "সময় সংকীর্ণতা, স্থানাভাব ও অনভিজ্ঞতাই" যে এর দোষ ত্রুটীর জন্যে দায়ী তা' মানি না। জনসাধারণের সঙ্গে একাত্মবোধ ও নিজেদের মধ্যে সংঘবদ্ধ

ঐক্যের উপলব্ধি এখনো যথেষ্ট দৃঢ় হয় নাই ব'লে এই সংকলনে নবযুগের ইঙ্গিত যতটা আছে তার প্রকাশ ততটা নাই।

* * * * *

এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় যে 'একসূত্রে' কথাটি গৃহীত হয়েছে রবীন্দ্রনাথের ছেলেবেলায় রচিত একটি গান থেকে। শ্রীযুক্ত শান্তিদেব ঘোষ-লিখিত ও বিশ্বভারতী কর্তৃক সম্প্রতি প্রকাশিত 'রবীন্দ্র-সংগীত' বইটিতে এই গানটির ও অন্যান্য গানের যে ইতিহাস ও ব্যাপকভাবে রবীন্দ্রনাথের গান সম্বন্ধে যে আলোচনা আছে তা শুধু সংগীতানুরাগীদের নয়, সাহিত্যানুরাগীদের মধ্যেও বিশেষ সমাদর লাভ করবে মনে হয়। আমাদের ইচ্ছা আছে কোনো সঙ্গীতজ্ঞ ব্যক্তির লেখা বইটির একটি সমালোচনা পরিচয়ে শীঘ্রই প্রকাশ করা।

কাগজের দুর্মূল্যতা ও দুষ্প্রাপ্যতার কথঞ্চিৎ উপশম হয়েছে কিন্তু তবু পুস্তক ও পত্রিকা প্রকাশের অসুবিধা প্রকাশকমাত্রকেই ভোগ করতে হচ্ছে। আমাদের পত্রিকার নিয়মিত প্রকাশে এই জন্য যে ব্যাঘাত ঘটেছে আশা করি পাঠকেরা তা মার্জনা করবেন। এই দুর্দিনেও বিশ্বভারতীর গ্রন্থন-বিভাগ যে তাঁদের গ্রন্থ প্রকাশের কাজ শুধু অব্যাহত ভাবে নয়, অক্ষুন্ন সৌষ্ঠবের সঙ্গে চালাচ্ছেন, তার জন্যে তাঁরা বাংলাদেশের পাঠকমাত্রেরই কৃতজ্ঞতাভাজন। রবীন্দ্র রচনাবলী চতুর্দশ ও পঞ্চদশ খণ্ড * সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে। তা ছাড়া রবীন্দ্র-পরিচয় ও বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ এই নতুন দুটি গ্রন্থমালাও গ্রন্থন-বিভাগ প্রবর্তন করেছেন ও প্রথমটির প্রথম গ্রন্থ 'আত্মপরিচয়' ও দ্বিতীয়টির প্রথম গ্রন্থ 'সাহিত্যের স্বরূপ' সবেমাত্র প্রকাশিত হয়েছে। দুটিই রবীন্দ্রনাথের রচনা।

'আত্ম-পরিচয়' পুস্তিকার 'বিজ্ঞপ্তি'-অংশ ও রবীন্দ্র-রচনাবলীর প্রতি খণ্ডের শেষে যে মূল্যবান "গ্রন্থ-পরিচয়" সংযোজিত হচ্ছে তাতে সম্পাদকীয় অধ্যবসায় ও দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়।

---

* ১৪শ খণ্ড—কবিতা—১। পূরবী—২। লেখন।—নাটক—৩। মুক্তধারা।—গল্প—৪।—গল্পগুচ্ছ.—প্রবন্ধ—৫। শান্তিনিকেতন ৪—১০।

১৫শ খণ্ড—কবিতা—মহুয়া, বনবাণী, পরিশেষ। নাটক—রক্তকরবী। গল্প—গল্পগুচ্ছ। প্রবন্ধ—শান্তিনিকেতন ১১—১২।

শ্রীকুন্দভূষণ ভাদুড়ী কর্তৃক পরিচয় প্রেস, ৮ বি, দীনবন্ধু লেন,
কলিকাতা হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

১২শ বর্ষ, ২য় খণ্ড, ৫ম সংখ্যা
জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫০

পরিচয়

উপনিষদে জড়তত্ত্ব

দ্বাদশ অধ্যায়

(১)

দেহ-সৃষ্টি

আমরা দেখিয়াছি, আদিতে সেই একমেবাদ্বিতীয়ম্ ব্রহ্ম ভিন্ন কোন কিছুই ছিল না।

আত্মা বা ইদমগ্র আসীৎ—ঐতরেয়, ১।১

সদেব সোম্য! ইদমগ্র আসীদ্—একমেবাদ্বিতীয়ম্—ছান্দোগ্য, ৬।২।১

উহা প্রলয়ের অবস্থা,—সে অবস্থায় সমস্ত বিশ্ব ব্রহ্মে বিলীন হইয়া ছিল—

মহান্ অব্যক্তে লীয়তে, অব্যক্তং অক্ষরে লীয়তে, অক্ষরং তমসি লীয়তে—তমঃ পরে দেবে একী ভবতি। *

উভৌ এতৌ লীয়েতে পরমাত্মনি—বিষ্ণুপুরাণ, ৬।৪।৩৮

জড় ও জীব, প্রলয়ে উভয়েই ব্রহ্মে লীন হয়। বলা বাহুল্য লীন অর্থে লুপ্ত হওয়া নয়; প্রলয়ের সময় বিশ্ব ব্রহ্ম-সমুদ্রে নিমগ্ন হইয়া থাকে—সাগরে বুদ্‌বুদের স্থায়—

তস্মিন্নেব লয়ং যান্তি বুদ্‌বুদাঃ সাগরে যথা—চূলকা, ১৭

প্রলয়ের ঐ একাকার অবস্থায় চিৎ ও জড়, প্রকৃতি ও পুরুষ, জীব ও জগৎ অব্যক্ত হইয়া ব্রহ্মে অবস্থান করে।

প্রলয়ের অবসান-সময়ে ব্রহ্মের মধ্যে সিসৃক্ষা জাগিয়া উঠে। তখন তিনি 'ঈক্ষণ' করেন—'এক আমি বহু হইব—একোঽহং বহুস্যাং প্রজায়েয়'। তিনি

---

* গীতার ৭।৬ শ্লোকের রামানুজ ভাষ্যে ধৃত শ্রুতি।

প্রজাকাম হইলে কিরূপে তাঁহা হইতে রয়ি ও প্রাণের আবির্ভাব হয়, আমরা তৃতীয় অধ্যায়ে তাহার অলোচনা করিয়াছি,—এখানে তাহার পুনরুক্তি করিব না। তবে বর্তমান প্রসঙ্গে ব্রহ্মে লীন জীবসমূহের পুনরুত্থানের কথা সবিশেষ বলিতে হইবে।

যস্মিন্ ভাবাঃ প্রলীয়ন্তে, লীনাশ্চ ব্যক্ততাং যযুঃ [ভাবাঃ=জীবাঃ]—চূলিকা, ১৮

এই বিষয় লক্ষ্য করিয়া মুণ্ডক উপনিষদ্ বলিতেছেন :

যথা সুদীপ্তাৎ পাবকাৎ বিস্ফুলিঙ্গাঃ
সহস্রশঃ প্রভবন্তে সরূপাঃ।
তথাক্ষরাৎ বিবিধাঃ সোম্য ভাবাঃ
প্রজায়ন্তে তত্র চৈবাপি যন্তি।—২।১।১
ভাবাঃ=জীবাঃ—শঙ্করভাষ্য

অর্থাৎ "যেমন প্রদীপ্ত অগ্নি হইতে সহস্র সহস্র সজাতীয় স্ফুলিঙ্গ নির্গত হয়, সেইরূপ ঐ সময় ব্রহ্ম হইতে বিবিধ জীব আবির্ভূত হয়।"

এ সম্বন্ধে বৃহদারণ্যক উপনিষদের উক্তি এই :—

স যথা উর্ণনাভিস্তন্তুনোচ্চরেৎ যথাগ্নেঃ ক্ষুদ্রা বিস্ফুলিঙ্গা ব্যুচ্চরন্তি এবমেবাস্মাৎ আত্মনঃ সর্বে প্রাণাঃ সর্বে লোকাঃ সর্বে দেবাঃ সর্বাণি ভূতানি ব্যুচ্চরন্তি—বৃ ২।১।২০

অর্থাৎ "যেমন মাকড়সা জাল উদ্গীরণ করে, যেমন অগ্নি হইতে বিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হয়, সেইরূপ সেই পরমাত্মা হইতে সমস্ত প্রাণ, সমস্ত লোক, সমস্ত দেব, সমস্ত ভূত নির্গত হয়।"

উপনিষদ্ জীবকে সাধারণতঃ চারি শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন—উদ্ভিজ্জ, স্বেদজ, অণ্ডজ ও জরায়ুজ।

ইমানি চ ক্ষুদ্রমিশ্রাণীব বীজানি ইতরাণি চ ইতরাণি চ—অণ্ডজানি চ জারুজানি চ স্বেদজানি চ উদ্ভিজ্জানি চ—ঐত, ৫।৩

'এই সকল ক্ষুদ্রমিশ্র ও অন্যান্য বীজ—উদ্ভিজ্জ (যেমন বৃক্ষলতাদি), স্বেদজ (যেমন কৃমিকীটাদি), অণ্ডজ (যেমন পক্ষীসরিসৃপাদি) এবং জরায়ুজ (যেমন পশু মনুষ্যাদি)।'

এই বিবিধ জীবের প্রতি লক্ষ্য করিয়া মুণ্ডক উপনিষদ্ বলিতেছেন :—

তস্মাচ্চ দেবা বহুধা সংপ্রসূতাঃ
সাধ্যা মনুষ্যাঃ পশবো বয়াংসি।
প্রাণাপানৌ ব্রীহিযবৌ তপশ্চ
শ্রদ্ধা সত্যং ব্রহ্মচর্যং বিধিশ্চ।—মুণ্ডক, ২।১।৭

অর্থাৎ, 'তাঁহা হইতে বহুবিধ দেব, সাধ্য, মনুষ্য, পশু, পক্ষী, ব্রীহি, যব ইত্যাদি আবির্ভূত হয়।'

অতএব জীব বলিলে কেবল মনুষ্য বুঝায় না।

মুণ্ডক হইতে উদ্ধৃত মন্ত্রে ব্রহ্ম-অগ্নি হইতে বিচ্ছুরিত বিস্ফুলিঙ্গ সমূহকে 'সরূপ' (সমান-রূপ) বলা হইল। কেন 'সরূপ' বলা হইল ? যেহেতু—'The Sun Divine throws off spark-suns charged with all his attributes × × × sparks of Divinity to be fanned into flames through the great process of Evolution'. —Dr. G. S. Arundale's 'Nirvana'.

শ্রীশঙ্করাচার্যও এই মর্মে বলিয়াছেন—অগ্নের্হি বিস্ফুলিঙ্গঃ অগ্নিরেব নান্যঃ।

সমুদ্রের সহিত তরঙ্গের যে সম্বন্ধ, জলের সহিত বুদ্বুদের যে সম্বন্ধ, অগ্নির সহিত স্ফুলিঙ্গের যে সম্বন্ধ, ব্রহ্ম বা পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার সেই সম্বন্ধ, জীব ব্রহ্মের অংশ—সেই চিৎসিন্ধুর বিন্দু—'a unit of the Divine consciousness'। তাই গীতায় শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—

মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ—গীতা, ১৫।৭

বাদরায়ণেরও ঐ উপদেশ—অংশো নানা-ব্যপদেশাৎ—ব্রহ্মসূত্র, ২।৩।৪৩

অংশ ও অংশীর তত্ত্বতঃ (essentially) কোন ভেদ নাই, থাকিতে পারে না ; কারণ, উভয়ে 'সরূপ'। তাই বাইবেল বলেন—'God made man in His own image—Genesis—I-27.

অতএব জীব = ব্রহ্ম—জীবোব্রহ্মৈব নাপরঃ।

The individual soul is in no respect different from Brahman ; but is *very* Brahman, complete and entire—Deussen's Philosophy of the Upanishads—p. 245.

ব্রহ্ম = পরমাত্মা—জীব = প্রত্যগাত্মা ; ব্রহ্ম = চিদাকাশ—জীব = চিন্মাত্র—পাশ্চাত্য দর্শনের monad। চিদাকাশ ও চিন্মাত্র অভিন্ন হইলেও কিন্তু উভয়ের মধ্যে ব্যাবহারিক ভেদ আছে। ঐ ভেদ কিরূপে সিদ্ধ হয় ?

ব্রহ্ম বিন্দু, চিৎকণ, স্ফুলিঙ্গরূপী প্রত্যগাত্মা (Monad), পরমাত্মা হইতে নিজের ব্যক্তিত্ব বা ব্যাবহারিক ভেদ (phenomenal separation) সিদ্ধ করিবার জন্য স্বেচ্ছা-প্রণোদিত হইয়া শরীর গ্রহণ করেন। ঐ শরীরই তাঁহার 'লিঙ্গ'।

মনোকৃতেন আয়াতি অস্মিন শরীরে—প্রশ্ন, ৩।৩

এইরূপে অংশ-জীব অংশীব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র হন এবং তাঁহার স-দেহত্ব সিদ্ধ হয়। সেইজন্য উপনিষদের স্থানে স্থানে তাঁহার নাম 'দেহী'।

রূপাণি দেহী স্বগুণৈর্বৃণোতি—শ্বেত, ৫।১২

(দেহী=বিজ্ঞানাত্মা (Monad)—শঙ্কর)

আমরা পরে দেখিব, বিদেহ-কৈবল্যে ঐ দেহের বিলয় ঘটে—কিন্তু তদবধি তিনি 'দেহী'। অতএব ইহাই আদিম 'দেহ-সৃষ্টি'। এই দেহ-সম্পর্কে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিতে চাই।

এই প্রসঙ্গে পাঠককে স্মরণ করাইয়া দিই, শ্রীযুক্তা অ্যানি বেসান্ট তাঁহার 'A Study in Consciousness'-গ্রন্থে মোন্যাড বা প্রত্যগাত্মার নিম্নরূপ লক্ষণ করিয়াছেন—'A fragment of the Divine Life, separated off into an individual entity by the rarest film of matter.' এবং প্রত্যগাত্মার ঐ দেহের, ঐ 'rarest film of matter'—এর নাম দিয়াছেন 'Auric body'। মৈত্রায়ণী উপনিষদ্ ঐ দেহকে 'স্বচ্ছাকাশময় কোশ' বলিয়াছেন—

স্বচ্ছাকাশময়ং কোশম্ আনন্দং পরমালয়ম্—৬।২৭

এই কোশই জীবের পরম আলয়—চরমদেহ; এবং জীবরূপী ব্রহ্মার আবাস বলিয়া ঐ সুসূক্ষ্ম কোশের নাম ব্রহ্মকোশ।

ওঁকার-প্লবেন অন্তর্হৃদয়াকাশস্য পারং তীর্ত্বা * * এবং ব্রহ্মশালাং বিশেৎ। ততঃ চতুর্জালং ব্রহ্মকোশং প্রণুদেৎ। ততঃ শুদ্ধঃ, পূতঃ শূন্যঃ * * স্বে মহিম্নি তিষ্ঠতি—মৈত্র, ৬।২৮

'ওঁকাররূপ নৌকায় অন্তর্হৃদয়াকাশের পারে উত্তীর্ণ হইয়া যোগী ব্রহ্মশালায় প্রবেশ করেন। পরে শুদ্ধ পূত শূন্য হইয়া ব্রহ্মকোশ ভেদ করিয়া স্ব মহিমায় প্রতিষ্ঠিত হন।'

বলা বাহুল্য ঐ ব্রহ্মকোশ-ভেদ বিদেহ-কৈবল্যের কথা।

ঐ ব্রহ্মকোশ-উপহিত ব্রহ্মই জীব।

কোশোপাধিবিবক্ষায়াং যাতি ব্রহ্মৈব জীবতাম্—পঞ্চদশী

ঐ চরমালয় 'ব্রহ্মকোশ' ('rarest film of matter') কি উপাদানে গঠিত?

ঐ ব্রহ্ম-কোশ যখন শরীর—তখন অবশ্যই উহা জড় উপাদানে রচিত কিন্তু সে উপাদান কি? সে উপাদান প্রপঞ্চাতীত পরব্যোমের পরমাণু। *

---

* এ প্রসঙ্গে আমি অন্যত্র এইরূপ লিখিয়াছি—This body (ব্রহ্ম-কোশ) is said to be composed of nonprakritic matter (অর্থাৎ পরব্যোম) which does not belong to our system at all—matter which has not been modified by the life of our

ঐ কোশকে লক্ষ্য করিয়া নারায়ণ উপনিষদ্ বলিয়াছেন—

নীলতোয়দমধ্যস্থা বিদ্যুল্লেখেব ভাস্বরা ।
নীবারশূকবৎ তন্বী পীতা ভাস্বত্যনূপমা ॥

'ঐ কোশ অতিসূক্ষ্ম নবজাত ধান্যাগ্রের মত তনু এবং নীলঘনস্থ বিদ্যুৎ তুল্য ভাস্বর।'

উহাই বৃহদারণ্যকের 'অন্তর্হৃদয়াকাশ'—য এষ অন্তর্হৃদয়ে আকাশঃ তস্মিন্ শেতে। উহাকেই উপনিষদ্ স্থানে স্থানে 'গুহা',* 'গহ্বর', 'হৃৎ', 'হৃদয়', বলিয়াছেন—

গুহাং প্রবিশ্য তিষ্ঠন্তম্—কঠ, ৪।৬
এতদ্ যো বেদ নিহিতং গুহায়াম্—মুণ্ডক, ২।১।১০
পশ্যৎস্বিহৈব নিহিতং গুহায়াম্—মুণ্ডক, ৩।১।৭
গুহাহিতং গহ্বরেষ্ঠং পুরাণম্—কঠ, ২।১২
আত্মাস্য জন্তোর্নিহিতো গুহায়াম্—কঠ, ২।২০
সেইজন্য ব্রহ্মকে বলা হয়—গুহাচরং নাম—মুণ্ডক, ২।২।১

কারণ, ব্যাসভাষ্যধৃত প্রাচীন বচনে আমরা জানি—'গুহা—যত্র নিহিতং ব্রহ্ম শাশ্বতম্।' পুনশ্চ—স বা এষ আত্মা হৃদি। তস্য এতদেব নিরুক্তং হৃদি অয়ম্ ইতি—ছান্দোগ্য, ৮।৩।৩

প্রতিষ্ঠিতোঽন্নে হৃদয়ং সন্নিধায়—মুণ্ডক, ২।২।৭
যোঽয়ং বিজ্ঞানময়ঃ হৃদি অন্তর্জ্যোতিঃ পুরুষঃ—বৃহ, ৪।৩।৭
মনোময়োঽয়ং পুরুষঃ ভাঃ সত্যঃ তস্মিন্
অন্তর্হৃদয়ে যথা ব্রীহির্বা যবো বা—বৃহ ৫।৬।১

ঐ পরব্যোমের পরমাণু নির্মিত সূক্ষ্মাকাশময় দেহের অণুত্বকে লক্ষ্য করিয়া এখানে ব্রীহি ও যবের উপমা প্রযুক্ত হইল। ছান্দোগ্যও বলিয়াছেন—

এষ মে আত্মা অন্তর্হৃদয়ে অণীয়ান্ ব্রীহের্বা যবাদ্ বা সর্ষপাদ্ বা শ্যামাকাদ্ বা শ্যামাকতণ্ডুলাদ্ বা—৩।১৪।৩

'অন্তর্হৃদয়স্থ আত্মা ব্রীহির অপেক্ষা, যবের অপেক্ষা, সরিষার অপেক্ষা, শ্যামাকের অপেক্ষা, শ্যামাকতণ্ডুলের অপেক্ষাও অণু'।

Logos, but belongs to and forms part of the general store of Cosmic matter, a portion of which has been appropriated by our Logos for the purpose of our system. It is this 'auric body' which separates the *Jiva* into an individual.

* উপনিষদের গুহা জার্মান মিষ্টিকের 'Gamut'

এইরূপে তিনি অণোরণীয়ান। এ বিষয় লক্ষ্য করিয়া শ্বেতাশ্বতর বলিয়াছেন—

বালাগ্র শত ভাগস্য শতধা কল্পিতস্য চ।
ভাগো জীবঃ স বিজ্ঞেয়ঃ স চানন্ত্যায় কল্পতে।—শ্বেত, ৫।৯

'একগাছি কেশকে শতধা বিভক্ত করিয়া প্রত্যেক ভাগকে শতধা ছিন্ন করিলে যে পরিমাণ—অন্তর্হৃদয়স্থ আত্মার সেই পরিমাণ।'

অন্যত্র—বালাগ্র মাত্রং হৃদয়স্য মধ্যে বিশ্বংদেবং জাতরূপং বরেণ্যম্—অথর্বশিরঃ

সঙ্গে সঙ্গে তিনি মহতো মহীয়ান্—তিনি পৃথিবীর অপেক্ষা, অন্তরিক্ষের অপেক্ষা, দ্যুলোকের অপেক্ষা, বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের অপেক্ষা বৃহৎ।

এষ মে আত্মা অন্তর্হৃদয়ে জ্যায়ান্ পৃথিব্যাঃ জ্যায়ান্ অন্তরিক্ষাৎ জ্যায়ান্ এভ্যো লোকেভ্যঃ
—ছা, ৩।১৪।৩

কারণ, এই প্রত্যগাত্মাই ত' পরমাত্মা।

ছান্দোগ্য-উপনিষদের দহর-বিদ্যায় এই তত্ত্বকে সুবিশদ করা হইয়াছে।

যদিদম্ অস্মিন্ ব্রহ্মপুরে দহরং পুণ্ডরীকং বেশ্ম, দহরঃ অস্মিন্ অন্তরাকাশঃ। তস্মিন্ যদ্ অন্তঃ তদ্ অন্বেষ্টব্যম্—৮।১।১

'এই ব্রহ্মপুরে একটি পুণ্ডরীক-গৃহ (হৃৎপদ্ম) আছে। সেখানে ক্ষুদ্র অন্তরাকাশের যাহা অভ্যন্তরস্থিত, তাহারই অন্বেষণ করিতে হইবে।'

ঐ ব্রহ্মপুরে কি আছে?

ইদং ব্রহ্মপুরে সর্বং সমাহিতং
সর্বানি চ ভূতানি সর্বে চ কামাঃ।—ছা, ৮।১।৪

'সেই ব্রহ্মপুরে এ সমস্তই আছে। সমস্ত ভূত, সমস্ত কাম প্রতিষ্ঠিত আছে'।

কিং তদ্ অত্র বিদ্যতে, যদ্ অন্বেষ্টব্যম্? 'সেখানে কি বস্তু আছে যাহা অন্বেষ্টব্য? এই প্রশ্নের উত্তরে ছান্দোগ্য পুনশ্চ বলিতেছেন—এষ আত্মা অপহত পাপ্‌মা—সেখানে সেই অপাপ-বিদ্ধ অন্তরাত্মার স্থান—যিনি পরমাত্মা হইতে অভিন্ন। যাবান্ বা অয়ম্ আকাশঃ তাবান্ এষ অন্তর্হৃদয় আকাশঃ—সেই 'আকাশবৎ সর্বগতশ্চ নিত্যঃ' পরমাত্মা (ব্রহ্ম) যেমন বৃহৎ, এই 'অণুরেষ আত্মা' এই অণুভ্যোপি অণু ক্ষুদ্র দহরাকাশও তেমনি বৃহৎ। কারণ,

উভে অস্মিন্ দ্যাবা পৃথিবী অন্তরেব সমাহিতে, উভৌ অগ্নিশ্চ বায়ুশ্চ, সূর্যা চন্দ্রমসা বুভৌ বিদ্যুৎ নক্ষত্রাণি, যৎ চাস্য ইহ অস্তি যচ্চ নাস্তি সর্বং তদ্ অস্মিন্ সমাহিতম্—ছান্দোগ্য, ৮।১।৩

'উভয় দ্যৌ ও পৃথিবী ; অগ্নি ও বায়ু, চন্দ্র ও সূর্য, বিদ্যুৎ ও নক্ষত্রনিচয়—বিশ্বে যে কিছু আছে, যে কিছু নাই—সমস্তই উঁহার অন্তঃস্থিত।'

নারায়ণ উপনিষদে ইহার প্রতিধ্বনি শুনা যায়—

দহ্রং বিপাপং পরবেশ্মভূতং
যৎ পুণ্ডরীকং পুরমধ্যসংস্থম্।
তত্রাপি দহ্রং গগনং বিশোকঃ
তস্মিন্ যদ্ অন্তঃ তদুপাসিতব্যম্।

"দেহরূপ পুর মধ্যে এক অতি ক্ষুদ্র পুণ্ডরীক বিরাজিত আছে। সেই পুণ্ডরীকের অন্তরাকাশে যে শোকহীন, পাপহীন গগন-সদৃশ পরম দেবতা অধিষ্ঠিত আছেন, তাঁহাকে উপাসনা কর।" 'উপাসনা কর'—কেমনা ঐ অন্তরাত্মাই পরমাত্মা।

বৃহদারণ্যক এই কথা আরও স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন—

সেই অন্তরাত্মা অর্থাৎ অন্তর্হৃদয়স্থিত দেবতা—স এব সর্বস্য ঈশানঃ সর্বস্যাধিপতিঃ সর্বম্ ইদম্ প্রশাস্তি যদিদং কিঞ্চ (৫।৬।১)—'তিনি সকলের ঈশ্বর, সকলের অধিপতি, যাহা কিছু আছে সকলেরই শাসক।'

মাণ্ডুক্য উপনিষদে ইহারই প্রতিধ্বনি শ্রুত হয়—

এষ সর্বেশ্বরঃ এষ সর্বজ্ঞঃ এষঃ অন্তর্যামী এস যোনিঃ সর্বস্য, প্রভবাপ্যয়ৌ হি ভূতানাম্—৬

এখানে এষ=ঐ বিজ্ঞানাত্মা (monad)। ছান্দোগ্য উপনিষদ্ দেহকে 'ব্রহ্মপুর' বলিলেন—তদস্মিন্ ব্রহ্মপুরে। কেন ? ব্রহ্ম দেহরূপ পুরে জীবরূপে বসতি করেন বলিয়া দেহ 'ব্রহ্মপুর'। অন্যত্র উপনিষদ্ বলিতেছেন—

দিব্যে ব্রহ্মপুরে হ্যেষ ব্যোম্নি আত্মা প্রতিষ্ঠিতঃ—মুণ্ডক, ২।২।৭

ইহার শঙ্করভাষ্য এই :—

ব্রহ্মণঃ পুরং হৃদয় পুণ্ডরীকং তস্মিন্ যৎ ব্যোম তস্মিন্ ব্যোম্নি আকাশে হৃৎপুণ্ডরীক মধ্যস্থে প্রতিষ্ঠিত ইব লক্ষ্যতে।

এজন্য মৈত্রেয়ী উপনিষদ্ দেহকে 'দেবালয়' বলিয়াছেন ; কেন ? যেহেতু-দেহ সেই পরম দেবতার আলয় (Tabernacle)। *

দেহো দেবালয়ঃ প্রোক্তঃ স জীবঃ কেবলঃ শিবঃ—মৈত্রেয়ী, ২।১

* এ প্রসঙ্গে অভিজ্ঞ পাঠকের খৃষ্টীয় সাধু সেণ্ট পলের উদাত্ত বাণী স্মরণ হইবে। Know ye not that you are the tabernacles of God and the most high dwelleth in each of you ?

জীবের চরম দেহ দহরকোশ বা Aurio Body সম্পর্কে আমরা অনেক কথাই বলিলাম। পাঠক নিশ্চয়ই লক্ষ্য করিয়াছেন ঐ দহরকোশ পঞ্চভূতের উপরিতন পরব্যোম দ্বারা নির্মিত। ঐ দহরকোশ যাঁহার "লিঙ্গ" (distinguishing mark) ঐ দেহ দ্বারা যিনি "দেহী"—তিনি লোকোত্তর প্রত্যগাত্মা। তিনি স্ব স্ব রূপে প্রপঞ্চাতীত—"কেবলঃ শিবঃ"। স্মরণ রাখিতে হইবে প্রত্যগাত্মা দহরকোশ অঙ্গীকার করিয়া নিজের ব্যক্তিত্ব সাধন করেন বটে কিন্তু যদি তাঁহার অন্তর্নিহিত শক্তিপুঞ্জ ব্যঞ্জিত ও ব্যাকৃত করিতে হয়, তবে তাঁহার পক্ষে অপ্রপঞ্চ হইতে প্রপঞ্চে অবতরণ আবশ্যক। পঞ্চভূতের বিকারে গঠিত বিশ্বের নাম প্রপঞ্চ। প্রপঞ্চাতীত প্রত্যগাত্মা কিরূপে বহির্মুখ হইয়া কেবল নিজের অন্তর্নিহিত শক্তিপুঞ্জ ব্যঞ্জিত ও ব্যাকৃত করেন, তাহাই নয়, তিনি জীবাত্মা ও ভূতাত্মা-রূপে সঙ্গে সঙ্গে প্রপঞ্চের অন্তর্ভুক্ত ভিন্ন ভিন্ন লোকের সহিতও সম্বন্ধ স্থাপন করিতে সমর্থ হন। কিরূপে ঐ ব্যাপার সঙ্ঘটিত হয়—সে অনেক কথা। আগামী বারে আমরা তাহার যথা-সম্ভব আলোচনা করিব।

হীরেন্দ্রনাথ দত্ত

জীবনের পটভূমি

তৃতীয় অঙ্ক

দ্বিতীয় দৃশ্য

[দিন দুয়েক পর। সুমিত্রা দেবীদের বসবার ঘরে সকাল বেলায় সুমিত্রা দেবী আর অখিলেশ বাবু বসে আছেন। বেলা প্রায় আটটা হবে,—জানালার বাহিরে সামনের বাড়ীর দেয়ালের গায়ে রীতিমত রোদ দেখা যাচ্ছে।

অখিলেশ বাবুর গায়ে লংক্লথের পাঞ্জাবী, সাদা চাদর। মাথার চুলও যেন অনেকগুলো পেকে গেছে। মুখের চেহারায় শোকের ছাপ বর্ত্তমান; চোখ দুটো হাসি হাসি, কিন্তু যারপর নাই করুণ।

সুমিত্রা দেবী ব'সে ছিলেন সবুজপাড় কালো কাপড় প'রে। কালো কাপড়ের সবুজ পাড়ের মতই তাঁর মুখের ভাবে অতি ক্ষীণ একটা জীবনের চিহ্ন শোকের বিরাট ছায়ার মধ্যে কোনো মতে তখনো আত্মরক্ষা ক'রে টিঁকে ছিল।

অখিলেশ বাবু ব'সে ছিলেন সোফার ওপর, আর সুমিত্রা দেবী এ পাশের একখানা চেয়ারে। আলোচনা বোধ হয় অনেকটা অগ্রসর হ'য়ে গেছে, পূর্ব্ব প্রসঙ্গের সূত্র ধ'রে—]

অখিলেশ এই ক'রে অনিরুদ্ধকে আমরা হারালাম। ও যে শেষ পর্য্যন্ত এই রকম ভাবে সন্ন্যাসী হ'য়ে যাবে এ আমি কল্পনাও করতে পারি নি মা। (একটু থেমে নিজেকে সামলে) মাঝে মাঝে তোমার কথা শুনেছি। কিন্তু তোমার ঠিকানা তো আমি জানতাম না, তাই ও যখন চ'লে গেল জানাতে পারি নি তোমাকে। (দীর্ঘশ্বাস ফেলে) কাল তোমার চিঠি পেতেই মনে হ'ল আর দেরী করা উচিত নয়। (হাসবার চেষ্টা ক'রে) নিজে কষ্ট পেয়ে তারপর বুঝলাম কষ্টের মর্য্যাদা।···সত্যি কথা আজ তোমাকে বলব মা, তোমার কথা যখন আগে শুনেছি মনে মনে তোমার ওপর বিরূপই আমি হ'য়ে উঠেছি।—লজ্জা করব না, সত্যিই বিরূপ হ'য়ে উঠতাম। মনে হ'ত, তুমিই বোধ হয় ছেলেকে পর ক'রে দিচ্ছ।

কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত আমার ভুল ভেঙে যেতে যখন আমি দেখলাম, তুমি নির্দ্দোষ—অনিরুদ্ধ তোমাকে পর্য্যন্ত ছেড়ে যেতে দ্বিধা করল না, তখন আমার লজ্জায় অনুতাপে মাথা কাটা যেতে লাগল। (সহসা উত্তেজিত হ'য়ে) তার জন্যে তুমি কতটা সহ্য করেছ আগে যদি তা আমি জানতাম—।

(সুমিত্রা দেবী স্থিরভাবে ব'সে রইলেন। তাঁর মুখের ওপর নানারকম অনুভূতির ছায়া খেলে যেতে লাগল। কখনো দুঃখ, কখনো অনুশোচনা, কখনো লজ্জা, কিন্তু সব চেয়ে বেশী এইটেই তাঁকে পীড়ন করতে লাগল যে, তিনি আর অনিরুদ্ধকে তেমনভাবে ভালবাসেন না, অথচ অনিরুদ্ধের এই সরল বৃদ্ধ পিতা এমন ভাবে বলছেন যেন কত কষ্টই না তিনি—সুমিত্রা দেবী—অনিরুদ্ধের জন্য পাচ্ছেন। এদিকে প্রতিবাদ করবারও কোন পথ নেই, নীরবে এই ক্লেশকর পরিস্থিতিকে পরিপাক করা ছাড়া আর উপায় কি।

তাঁকে অধোমুখে নীরব দেখে—)

অখিলেশ (সত্যি মা, আমার দুর্ব্যবহারে আমি কত যে অনুতপ্ত তা তোমাকে ব'লে বোঝাতে পারব না।…অনিরুদ্ধ আমার একমাত্র ছেলে। তাকে হারিয়ে কি পরিমাণ কষ্ট পাচ্ছি তা বোধ হয় সহজেই বুঝতে পারবে। কিন্তু, বললে বিশ্বাস করবে না, তোমার জন্যেও আমার কষ্ট কিছু কম নয়। (নিশ্বাস ফেলে) আহা যদি জানতাম।

সুমিত্রা (অনেক চেষ্টা করে) এখন আর মিছিমিছি—। (ইচ্ছে বোধ হয় ছিল বলবেন, 'ভেবে কি লাভ', কিন্তু কথাটা নিজের কাছেই এত বিশ্রী শোনাল যে, মধ্যপথেই থেমে গেলেন।)

অখিলেশ (সুমিত্রা দেবীর কথায় সায় দিয়ে মাথা নেড়ে) এখন সবই একেবারে মিছিমিছি মা, সবই মিছিমিছি। তবু অবুঝ মন, সান্ত্বনা মানতে চায় না। (কিছুকাল থেমে) যাক, আমার দোষ মাপ ক'রে এইবার আমায় ছুটি দেও মা,—আমার ওপর মনে কিছু অসন্তোষ রেখ না।

সুমিত্রা (দিশেহারা ভাবে) না না, ছি, এ সব কী বলছেন? (লজ্জায় এবং দুঃখের বিড়ম্বনায় তিনি যেন মিশে যেতে লাগলেন, তথাপি

আপ্রাণ চেষ্টা ক'রে জুড়ে দিলেন) আপনি আমার গুরুজন, অযথা মাপ চেয়ে আমার দোষ বাড়াবেন না।

(কলকাতাবাসী উচ্চ শিক্ষিতা মহিলার কাছে এতটা নিরভিমান বিনয় বোধ হয় অখিলেশ বাবু কল্পনা করতে পারেন নি। আন্তরিক আনন্দিত হ'য়ে—)

অখিলেশ তাতে আর কি, তাতে আর কি। অপরাধ হ'লে সকলের কাছেই মাপ চাও যায়। (স্খলিত পদে উঠে দাঁড়িয়ে) যাক আজকের মত চলি মা। বেলাও হ'ল, আজই আবার ফিরে যাব মনে করেছি, গঙ্গায় একটা ডুবও আবার দিয়ে যেতে হবে। (যেতে যেতে) অনিরুদ্ধের যদি খোঁজ পাও আমাকে তবে জানিয়ো।…চললাম। (তিনি বেরিয়ে গেলেন।)

(সুমিত্রা দেবী পাথরের মত সেইখানে অনেকক্ষণ নিশ্চল ভাবে ব'সে রইলেন। তারপর ধীরে ধীরে একটা নিশ্বাস ফেলে স্থির ভাবে তাকিয়ে যেন কতকটা নিজেকে বলছেন এই ভাবে—)

সুমিত্রা আজ আমি একা।…ভালই হ'ল। (একটু থেমে, হাওয়ায় প্রশ্ন ক'রে) কিন্তু অনিরুদ্ধ গেল কেন?—তার কি সত্যিই বিশ্বাস জন্মেছিল, আধ্যাত্মিক শক্তির উন্মেষ ছাড়া দেশের পরিত্রাণ সম্ভব হবে না?…কে জানে! কিন্তু (দাঁতে ঠোঁট চেপে) আমি কি সত্যিই অন্যায় করেছি? (মাথা নেড়ে) না, আমি কেন অন্যায় করতে যাব? অনিরুদ্ধের স্বভাবই ওই। কারো সাধ্য ছিল না তাকে রক্ষা ক'রে। ভুল, অখিলেশ বাবু ভুল করেছেন। (রহস্যময় ভঙ্গীতে হেসে) প্রিয়ব্রতও করেছে ভুল।…প্রিয়ব্রতও মানুষ; তারও ভুল হয়। (সহসা সিদ্ধান্তের সুরে দৃঢ়তার সঙ্গে) আমি যাব, প্রিয়ব্রতের কাছে যাব তার এই চরম ভুলের কথা জানাতে। তারপর—। (হতাশার সুরে) তারপর? প্রতিকার প্রার্থনা করব? দাবী জানাব? কিন্তু সে যদি না শোনে?…না, অত ভাবলে চলে না। তার কাছে যেতেই হবে।…অসহ্য, এ নিঃসঙ্গ একাকীত্ব অসহ্য। যেতেই হবে তার কাছে।…আমি যাব!

(লালপাড় শাদা খদ্দরের সাড়ী প'রে জয়ন্তী এল ঘরের মধ্যে। চোখ মুখ উজ্জ্বল। এতদিন যে কাঠিন্য তার সমস্ত পরিবেশকে গম্ভীর করে রেখেছিল, আজ যেন কিসের স্পর্শে সেখানে শোভন সার্থকতার সমারোহ পড়েছে। তার হাতে একখানা চিঠি।)

জয়ন্তী (লঘু ব্যস্ততার সুরে) সুমিত্রা-দি, কাল থেকে আমি ছুটির দরখাস্ত করলাম তিন মাসের। ছুটি ফুরালে চাকুরী ছেড়ে দেব।

সুমিত্রা (ধীর কণ্ঠে) কেন?

জয়ন্তী (চিঠিখানি তাঁর হাতে এগিয়ে দিয়ে) প্রিয়ব্রত বাবুর চিঠি পেলাম এই সকালের ডাকে। আসানসোল থেকে কাল লিখেছেন,—আজ এখানে আসছেন। তাঁর সঙ্গে আমাকে যেতে হবে।

সুমিত্রা (পুনরায় ধীর কণ্ঠে) কেন?

জয়ন্তী সেখানে নাকি খনির মেয়েদের মধ্যে রীতিমত দুর্নীতি প্রশ্রয় পাচ্ছে। আমাকে সেখানে যেতে হবে মেয়েদের একটা সৎ শিক্ষা আশ্রমের কর্তৃত্ব নিয়ে। সমস্ত ঠিক স্পষ্ট ক'রে চিঠিতে লেখেন নি। ওঁর কাছে মুখোমুখী সব জানতে পারব। আজ সকালের মধ্যেই উনি এসে পড়বেন।

সুমিত্রা (যন্ত্রের মত নিঃস্পৃহ কণ্ঠে, কি বলছেন না ভেবে চিন্তে) কেন?

জয়ন্তী (সুমিত্রা দেবীর দিকে দৃকপাত না ক'রে) দুপুরের গাড়ীতেই আমাকে আবার যেতে হবে যে। উনি না এলে যাব কার সঙ্গে? (সুমিত্রা দেবীকে পুনরায় 'কেন' বলবার সময় না দিয়ে ব্যস্ততার সঙ্গে) যাচ্ছি, বুঝলে? বাক্স-ডেক্স গুছিয়ে নিই গে এবার। (ব'লে সে দ্রুতপদে পর্দা সরিয়ে ভেতরে চলে গেল।)

(কিছুক্ষণ ব'সে থাকবার পর সুমিত্রা দেবীর মুখে চরম গ্লানিময় একটা হাসির রেখা ফুটল। নিজেকে শুনিয়ে শুনিয়ে অস্ফুট স্বরে—)

সুমিত্রা তা হ'লে আর গিয়ে কী লাভ?...প্রিয়ব্রত যোগ্য সাহায্যকারিণী ঠিক ক'রে নিয়েছে।—সহকর্ম্মিণী!...নিজে চিঠি লিখেছে। (হঠাৎ চিঠির দিকে চোখ পড়ল; চোখের সামনে তুলে) এই সেই চিঠি।

(কিছুক্ষণ চিঠির দিকে চেয়ে থেকে উত্তেজিত ব্যগ্রতার সঙ্গে সেখানাকে কুচি কুচি ক'রে ছিঁড়লেন) অপমান করতে এসেছিল। (জ্বালাময়ী সুপ্ত ঈর্ষার সঙ্গে) ভাগ্যবতী মেয়ে জয়ন্তী। প্রিয়ব্রতের সহকর্ম্মিণী। কিন্তু (সহসা যেন বিস্মিত হ'য়ে) প্রিয়ব্রতও কি শেষ পর্য্যন্ত আমার সঙ্গে ছলনা করল?...সেদিন তবে জয়ন্তীর প্রসঙ্গ চাপা দিল কেন? কেন আমার প্রশ্নের উত্তরে বলল না যে, প্রত্যক্ষ সংগ্রামে নামবার যোগ্যতা জয়ন্তীর আছে? না কি, প্রিয়ব্রত নিজেও তখন জানত না? (ঈষৎ বিষণ্ণ সুরে) যাই হোক তার কাছে গিয়ে আর কোনো লাভ হবে না। কোনো লাভ হবে না তার কাছে গিয়ে। আমি যাব না,...যাব না। (দু'হাতে মুখ ঢেকে টেবিলে মাথা নামিয়ে ব'সে রইলেন।)

(কিছুক্ষণ এইভাবে কাটবার পর প্রিয়ব্রত এসে ঘরের মধ্যে ঢুকল। তার গায়ে খদ্দরের শাদা পাঞ্জাবী, মাথার চুল কিছু এলোমেলো, মুখের ভাব ঈষৎ ক্লান্ত, বিষণ্ণ।

ধীরে এগিয়ে গিয়ে সে সুমিত্রা দেবীর মাথার ওপর হাত রাখল। সুমিত্রা দেবী চমকে তার মুখের দিকে চাইলেন, তারপর ধীরে ধীরে প্রিয়ব্রতের হাত মাথার ওপর থেকে সরিয়ে দিয়ে স্থির দৃষ্টিতে দূরের একটা বিন্দুর দিকে চেয়ে রইলেন।

প্রিয়ব্রত নীরবে একটা চেয়ারে বসল। তারপর কিছুক্ষণ নতমুখে চিন্তা করবার পর—)

প্রিয়ব্রত　(ধীর গম্ভীর কণ্ঠে) ও ঘরে জয়ন্তী দেবীর কাছে শুনলাম অনিরুদ্ধের কথা।...কেন যে ওর এমন মতি হল? অথচ (মনের ভেতর হাতড়ে হাতড়ে) অথচ....আমি যেন...জানতামও... ।

সুমিত্রা　(তার মুখের দিকে না চেয়ে শুষ্ক, নিষ্প্রাণ গলায়) জানা সত্ত্বেও বুঝি তুমি তার খোঁজ নিতে বলেছিলে আমাকে? তারই জীবনের সঙ্গে নিজেকে আমি জুড়ে দেই, এই বোধ হয় ছিল তোমার ইচ্ছা।

প্রিয়ব্রত　(আহত হয়ে মৃদু কণ্ঠে) তোমার এত বড় ক্ষতি যে আমি কোনো দিন সজ্ঞানে করতে যাব না, এ তুমি নিজেও বেশ জানো সুমিত্রা,

অযথা কথা বাড়িয়ে লাভ কি ?…আমি ভেবেছিলাম, তুমি যদি তার কাছে সময় মত যেয়ে পড়তে তবে হয়ত তার মতি ফিরত। নিশ্বাস ফেলে) যাক, যা হোল তা হ'লই। পেছনে ফিরে দেখবার সময় নেই। (একটু থেমে) তোমার সঙ্গে দেখা করতে এলাম। আজ আমরা যাচ্ছি।

সুমিত্রা (তার দিকে না চেয়ে, প্রচ্ছন্ন শ্লেষের সঙ্গে) আমরা মানে? জয়ন্তী ?

(প্রিয়ব্রত তার শ্লেষ বুঝতে পারল। কিন্তু আঘাত ফিরিয়ে না দিয়ে ঈষৎ হেসে—)

প্রিয়ব্রত হ্যাঁ জয়ন্তী। কিন্তু তুমি কি মনে করেছ আমি ইচ্ছে ক'রে, নিজে নির্ব্বাচন ক'রে, তাঁকে দলে টেনেছি ? তা নয়, সে তোমার ভুল ধারণা।…আমি না টানলেও তিনি যেতেনই, আমি শুধু উপলক্ষ মাত্র।…তাঁর নিজের ভেতর যে আগুন আছে সেই তাঁকে চালিয়ে নিয়ে বেড়াবে,—কারো সাধ্য নেই তাঁকে আটকায়।

সুমিত্রা (শুক্‌নো, ফাঁকা গলায়) আমার ভেতরটা স—ব ঠাণ্ডা।…বরফের মত হিম। বিশ্বাস না হয় তো আমার গায়ে হাত ছুঁইয়ে দেখতে পার। (ব'লে তাঁর সাদা হাতখানা প্রিয়ব্রতের সামনে রোগীর মত এগিয়ে দিলেন।)

প্রিয়ব্রত (তাঁর হাতে ধীরে ধীরে হাত বুলাতে বুলাতে, গভীর আন্তরিকতার সঙ্গে) অবুঝ হ'য়ো না মিত্রা। সত্যি, ভেবে দেখ তো, যদি প্রকৃতই তোমার মধ্যে সেই আগুন প্রবলভাবে জ্বলত তবে কি আমার মতামতের জন্যে তুমি ব'সে থাকতে ?…কেন তুমি আমার জন্যে অপেক্ষা করছ ? (ম্লানভাবে হেসে) তুমি হয়ত বলবে, আমাকে তুমি ভালবাস। কিন্তু, ভেবে দেখতো, সে কথার মানে কি ? মানে কি এই নয় যে নিজেকে তুমি সুখী করতে চাও,— কিন্তু…স্বদেশের কাজে যাঁরা আত্মনিয়োগ করবেন, যাঁরা একেবারে আন্দোলনের পুরোভাগে থাকবেন, আত্মসুখ কি তাঁদের সর্ব্ব-প্রকারেই ত্যাগ করবার জন্য প্রস্তুত থাকা উচিত নয় ?…জয়ন্তী দেবী

তা পারেন সেই জন্যই তিনি এগিয়ে গেলেন। (একটু ইতস্তত ক'রে ঠোঁটের প্রান্তে ক্ষীণ হাসির রেখা ফুটিয়ে) জীবনে উনি কাউকে ভালবাসতে পর্য্যন্ত পারবেন না, জানো? একেবারে টিপিক্যাল স্বদেশ সেবিকার উপাদানে তৈরী ওঁর মন।

সুমিত্রা　(যেন কতদূর থেকে, ক্লান্ত—নির্জ্জীব গলায়) আর আমার?

প্রিয়ব্রত　(অল্প হেসে, স্পষ্ট মৃদু গলায়) গৃহরক্ষার উপাদানে। কিন্তু সেই সঙ্গে জুড়ে দিতে চাই, তোমার কাজটা জয়ন্তী দেবীর চেয়ে কিছু নিচু স্তরের নয়। ঘরে শৃঙ্খলা না থাকলে রণক্ষেত্রে সৈন্যদের প্রাণপাত যুদ্ধ করাও বৃথা।

সুমিত্রা　থাক, আমাকে আর সান্ত্বনা না দিলেও পারতে প্রিয়ব্রত।

(প্রিয়ব্রত আহত হ'ল। কিন্তু প্রতিবাদ না ক'রে কিছুক্ষণ নীরবে ব'সে রইল। তারপর ঘড়িতে সময় দেখে—)

প্রিয়ব্রত　ন'টা বাজে। আর দেরী করতে পারব না।—চললাম। (উঠে দাঁড়িয়ে) আমাকে ক্ষমা ক'রো। (ব'লে তার ডান হাতের আঙুলের ডগা সুমিত্রা দেবীর হাতের ওপর ছুঁইয়ে মুহূর্ত্ত কাল চোখ বুঁজে দাঁড়াল, তারপর পেছন ফিরে দ্রুত পদে বেরিয়ে গেল।)

(সুমিত্রা দেবী তার গমন পথের দিকে অনেকক্ষণ শূন্যদৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন। তারপর এক সময়ে যখন অকস্মাৎ তাঁর দুই চোখ জলে ভ'রে এল, তখন স্খলিত পদে উঠে দাঁড়িয়ে দুই হাতে মুখ ঢেকে সোফার ওপর গিয়ে লুটিয়ে পড়লেন।

সেখানে সেইভাবে কিছুক্ষণ কাটবার পর ভেতরের দরজার পর্দ্দা সরিয়ে ঝি উঁকি দিল ঘরে।)

ঝি　বড়দিদিমণি, ইস্কুলের বেলা হ'ল যে।

(সুমিত্রা দেবী উঠে বসলেন। ঝি চলে গেল।

কয়েক মুহূর্ত্ত চুপ ক'রে উদ্দেশ্যহীনভাবে বসে থেকে তিনি উঠলেন। খোপার বাঁধন এড়িয়ে কয়েকগাছি চূর্ণালক কপাল বেয়ে তাঁর ওপর প'ড়ে বেদনাশ্রান্ত মুখে অদ্ভুত একটা উদ্‌ভ্রান্তির আবহ সৃষ্টি করেছিল যেন। ঘরের মধ্যে স্খলিতপদে পায়চারী করতে করতে,—)

সুমিত্রা (নিঃশ্বাস ফেলে) যাক, এইবার সম্পূর্ণ একা। এবার আর কোনো কিছুই নেই, কেবল আমি।....আমি আর আমার কাজ। (আলমারীর কাছে দাঁড়িয়ে) কার জন্য কাজ?...আমার জন্য?... আমার তো কাজের কোনো দরকার নেই।...তবে কার জন্য? দেশের জন্য? (চরম আত্মকরুণার দীনতায় হাসবার চেষ্টা ক'রে) আমি তো সে উপাদানে তৈরী নই। আমার কাজ যে গৃহরক্ষা।...কার গৃহ?...তা আমি জানিনে। হয়ত ইস্কুল, হয়ত শুশ্রুষা। কিন্তু কাজ চাই। কাজের হাত থেকে নিস্তার নেই।...কার জন্য কাজ জানিনে, তবু কাজ।...(চলতে চলতে) কাজের জন্য কাজ। জীবনের পটভূমিতে কেবল অন্তহীন দ্রুতগামী কাজের ঘূর্ণাবর্ত।...আজ অনিরুদ্ধ নেই, ...আছি শুধু আমি একা। আমি, আর আমার কাজ। (টেবিলের কাছে দাঁড়িয়ে) শোকে মুহ্যমান হ'লে চলবে না...কাজের বিশাল স্রোতে তোমাকে ভাসিয়ে নিয়ে যাবেই।...এই আমাদের জীবন, ...আমাদের জীবনের শেষ কথা। শুধু কাজ,...কাজ...। জীবনের পটভূমিতে শুধু এক অন্তহীন নির্ম্মম কাজের জটিল আকর্ষণ।... আমি একা, আর আমার কাজ। কাজ, শুধু কাজ। (তাঁর চোখের কোন বেয়ে গালের ওপর দিয়ে দুটি সজল ধারা চকচক ক'রে উঠল,—হৃদয়ের সমস্ত শক্তি নিঙড়ে তবু তিনি একবার হাসলেন।

প্রতিপদে ব্যাহত, কিন্তু কী দুর্জ্জয় জীবনীশক্তিতে উদ্বুদ্ধ এই মানুষের মন,—অপরিসীম তার সহনশীলতা।....রক্তাক্ত বেদনায় স্খলিত, মুহ্যমান হ'য়েও তাই সে হাসে, কাজ করে, প্রতিদিন নবীন সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে নতুন ক'রে বাঁচে।)

যবনিকা

মণীন্দ্র রায়

হিন্দু নারীর বিবাহ-বিচ্ছেদ সমস্যা

একথা সর্ব্বজন বিদিত যে, সভ্য সমাজ-ব্যবস্থা, সুনীতি এবং পারিবারিক সুখ ও শান্তির মূলে রহিয়াছে বিবাহ-প্রথা। কিন্তু স্থান কাল ও সভ্যতা ভেদে বিবাহ-প্রথার স্বরূপ ও আচার-অনুষ্ঠান বিভিন্ন হইয়াছে। হিন্দু, মুসলমান ও খ্রীষ্টান, ইহাদের প্রত্যেকেরই বিবাহের আদর্শ ভিন্ন, কোন ক্ষেত্রে ইহা ধর্ম্মানুষ্ঠান, কোথায়ও চুক্তিমাত্র, কোথায় দুইয়ের সংমিশ্রন।

হিন্দুধর্ম্ম মতে, বিবাহ ধর্ম্মাচরণের জন্য নরনারীর পবিত্র মিলন (১)। শাস্ত্র-মতে ইহা দশটী সংস্কারের অন্যতম। মনুতে বিধান আছে, 'পুত' নামক নরক হইতে ত্রাণ করিতে একমাত্র পুত্রই পারে। এই উদ্দেশ্য সাধনের প্রধান উপায় হিসাবে বিবাহ ধর্ম্মানুষ্ঠানের অপরিহার্য্য অঙ্গ (২)। অন্য কোন জাতি কিংবা ধর্ম্ম বিবাহকে এইরূপ ধর্ম্মের অঙ্গ হিসাবে গ্রহণ করে নাই। ঐহিক সুখ সুবিধা কিংবা চুক্তির কোন বিধান ইহাতে নাই, সেই জন্যই বোধ হয় স্যার টি ষ্ট্রেঞ্জ বলিয়াছেন যে, হিন্দুদের অপেক্ষা অন্য কোন জাতি বিবাহের উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করে নাই (২)। প্রচলিত অধিকাংশ ধর্ম্মমতেই বিবাহ চুক্তিমাত্র, এবং সেই কারণেই এই সকল বিবাহে বিচ্ছেদের বিধান আছে। খ্রীষ্টান কিংবা মুসলমান ধর্ম্ম মতে বিবাহ দম্পতির জীবদ্দশায় কতকগুলি সুনির্দ্দিষ্ট কারণে বিচ্ছিন্ন হইতে পারে। এবং এক পক্ষের মৃত্যুতে বিবাহ-বন্ধন যে বিচ্ছিন্ন হইবে, তাহা বলাই বাহুল্য। কিন্তু হিন্দু ধর্ম্মের অনুশাসন অতি কঠোর। জীবদ্দশায় বিচ্ছেদ ত নাই-ই, স্বামীর মৃত্যু হইলেও হিন্দু স্ত্রীর বিবাহ বিচ্ছেদ হয় না। হিন্দু-বিধবা-বিবাহ আইন অনুসারে সিদ্ধ হইলেও (৩), শাস্ত্রানুমোদিত কিনা সন্দেহ এবং সমাজে আদৌ প্রচলিত নহে। হিন্দু বিবাহ অবিচ্ছেদ্য। ধর্ম্মান্তর গ্রহণ (৪), জাতি চ্যুতি (৫), ব্যাভিচার, এমন কি স্ত্রীর পক্ষে স্বামীত্যাগ কিংবা গণিকাবৃত্তি অবলম্বনেও (৬) হিন্দু বিবাহ বিচ্ছিন্ন হয় না।

১। সুন্দরা বাই বনাম শিবনারায়ণ ২। Banerjee—Marriage & Stridhan 4th Ed. ৩। Hindu Widows Remarriage Act (Act XV of 1856) ৪। গভর্ণমেন্ট অফ বম্বে বনাম গঙ্গা, ৫। অ্যাডমিনিষ্ট্রেটর জেনারেল অফ মাদ্রাজ বনাম আনন্দচারী ৬। মুত্তাম্মা পিল্লাই বনাম রামস্বামী পিল্লাই, নারাইন বনাম ত্রিলোক।

হিন্দু বিবাহের এই অবিচ্ছেদ্য প্রকৃতিই ইহার বৈশিষ্ট্য। একদিক হইতে বিবেচনা করিলে ইহার স্বপক্ষে অনেক যুক্তি দেখান যাইতে পারে। কিন্তু একথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, অনেক ক্ষেত্রেই এমন অবস্থার সৃষ্টি হইতে পারে, যাহাতে স্বামী স্ত্রী উভয়ের জীবনই দুঃসহ হইয়া পড়ে। সেই সকল ক্ষেত্রে বিবাহ-বিচ্ছেদ না হইলে, আজীবন দুঃখ, কষ্ট ও অশান্তি হইতে কোন পক্ষেরই নিষ্কৃতির কোন উপায় নাই। হিন্দুধর্ম্মে অবশ্য স্বামীর বিশেষ অসুবিধা নাই। তিনি ইচ্ছা করিলে এক স্ত্রী ত্যাগ করিয়া অন্য স্ত্রী গ্রহণ করিতে পারেন। কিন্তু স্ত্রী? কোন কোন ক্ষেত্রে তিনিও স্বামী ত্যাগ করিতে পারেন এইরূপ বিধান দেবল, পরাশর, নারদ প্রভৃতি হিন্দু শাস্ত্রকারগণ দিয়াছেন (২)। কিন্তু এক্ষেত্রেও আদালতের সাহায্য না লইলে, স্বামী যে কোন সময়েই, আদালত হইতে দাম্পত্য-অধিকার পুনঃ-প্রতিষ্ঠার ডিগ্রী লইয়া স্ত্রীকে তাহার সহিত বসবাস করিতে বাধ্য করিতে পারেন। কিন্তু ইহার সাহায্যে স্বামী হইতে স্বতন্ত্র থাকিবার অধিকার লাভ করা যায় মাত্র। বিবাহ অক্ষুণ্ণই থাকে; স্ত্রীর পক্ষে পুনর্বিবাহের পথ রুদ্ধই রহিয়া গেল। ফলে, বিবাহিত জীবন দুঃসহ হইলে স্ত্রীর পক্ষে মাত্র দুইটী পন্থা থাকে,—শত অত্যাচার ও লাঞ্ছনা সহ্য করিয়া ঘৃণ্য স্বামীর সহিত বসবাস করিয়া একমাত্র মৃত্যুই কবে শান্তি আনিবে তাহার জন্য অপেক্ষা করা, আর না হয়, যদি সম্ভবপর হয়, আদালত সাহায্যে স্বামীকে ত্যাগ করিয়া বিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও চিরকুমারীর জীবন যাপন করা।

এই গুরুতর সমস্যা সমাধানের যে চেষ্টা হয় নাই, এমন নহে। কিন্তু রক্ষণশীল আইন-প্রণেতাগণ এই পর্য্যন্ত ইহার সম্যক সমাধানের চেষ্টা করেন নাই, আইন দ্বারা পরোক্ষভাবে আংশিক মীমাংসায় অগ্রসর হইয়াছেন মাত্র। ১৮৫৬ সালে হিন্দু বিধবার পুনর্বিবাহ আইন-সিদ্ধ বলিয়া স্বীকৃত হয় (৩)। ইহার পর পাশ হয় ১৮৬৬ সালের ২১ আইন (৭)। এই আইন, মুসলমান খ্রীষ্টান ও ইহুদী ছাড়া, অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বীদের উপর প্রযোজ্য; সুতরাং হিন্দুরাও এই আইনের সুবিধা পাইবে। এই আইন অনুসারে যদি কোন হিন্দু স্বামী কিংবা

৩। Hindu Widows Remarriage Act (Act XV of 1856)

৭। Native Converts Marriage Dissolution Act (Act 21 of 1866)

স্ত্রী খ্রীষ্ট ধর্ম্ম গ্রহণ করে, এবং এই ধর্ম্মান্তর গ্রহণের-কালে খ্রীষ্টান স্বামী কিংবা স্ত্রী, তাহার হিন্দু স্ত্রী কিংবা স্বামী দ্বারা পরিত্যক্ত হয়, তাহা হইলে খ্রীষ্ট ধর্ম্মে দীক্ষিত স্বামী কিংবা স্ত্রী আদালতে দরখাস্ত করিলে আদালত উহাদের বিবাহ বিচ্ছেদ হইয়াছে বলিয়া রায় দিতে পারেন। তাহার পর পক্ষগণ ইচ্ছা করিলে পুনরায় বিবাহ করিতে পারেন। ১৯১৩ সালে এক মামলায় (৮) স্থিরীকৃত হয় যে এই আইনের বিধান অনুযায়ী ছাড়া, কোন দেওয়ানী আদালতের, হিন্দু বিবাহ সংক্রান্ত মামলার বিচার করিবার অধিকার নাই এবং কোন আদালত কর্ত্তৃক হিন্দু স্বামী স্ত্রীর বিবাহ বিচ্ছেদের রায় বে-আইনী ও বাতিল হইবে। তাহার পর পাশ হয় ১৮৭২ সালের ৩ আইন (৯), যাহাকে চলতি কথায় সিভিল ম্যারেজ আইন বলা হয়। এই আইনানুসারে বিবাহ করিতে হইলে পাত্রপাত্রী খ্রীষ্টান, হিন্দু, মুসলমান, পার্শী, বৌদ্ধ, শিখ ও জৈন প্রভৃতি কোন ধর্ম্মের অন্তর্ভুক্ত নহেন, একথা ঘোষণা করিতে হইবে। এই বিবাহ চুক্তি মূলক মাত্র সুতরাং ইহাতে বিচ্ছেদের বিধানও আছে।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, হিন্দু থাকিয়া বিবাহ বিচ্ছেদের সুবিধা পাইবার উপায় নাই। আইন-কর্ত্তাগণের হয়ত মনে হইয়াছে যে, হিন্দুধর্ম্মে নিষিদ্ধ বিবাহ-বিচ্ছেদ আইন দ্বারা হিন্দু বিবাহে প্রয়োগ করিলে হিন্দু ধর্ম্মের উপর অবিচার করা হইবে।

এই আইন পাশ হইবার পর বহুবর্ষ অতীত হইয়াছে। হিন্দু সমাজেরও অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে এবং বিবাহ-বিচ্ছেদ সমস্যা সাধারণ লোক ও আইন প্রণেতাদের বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছে। ফলে ১৯২৩ সালে স্পেশাল ম্যারেজ আইন (৯) সংশোধিত হয় (১০)। এই সংশোধিত আইন অনুসারে, হিন্দু বৌদ্ধ, শিখ ও জৈন ধর্ম্মাবলম্বী যে কোন নর নারী বিবাহ করিতে পারে, অবশ্য বিবাহেচ্ছুক নরনারীর স্ত্রী কিংবা স্বামী জীবিত থাকিবে না, পাত্রের ১৮ বৎসর এবং পাত্রীর ১৪ বৎসর পূর্ণ হওয়া চাই, আর যদি পাত্র পাত্রীর বয়স একুশ বৎসর পূর্ণ না হয়, তাহা হইলে তাহাদের পিতা কিংবা অভিভাবকের সম্মতি

৮। চন্দ্রভাগা বনাম বিশ্বনাথ

৯। Special Marriage Act (Act III of 1872)

১০। Act 30 of 1923.

প্রয়োজন। ইহাও দেখিতে হইবে যে তাহারা যে ধর্ম্মাবলম্বী, সেই ধর্ম্মানুযায়ী তাহাদের মধ্যে বিবাহের পক্ষে নিষিদ্ধ ঘনিষ্ট সম্পর্ক নাই।

এই আইন প্রণীত হইবার পরে হিন্দু নরনারী এই আইন অনুসারে বিবাহ করিয়াছেন এবং অনেক ক্ষেত্রে তাহাদের বিবাহ-বিচ্ছেদও হইয়াছে। এই মাত্র সেদিন বিজনবালা মজুমদার বনাম রঞ্জিতলাল সেনগুপ্তের মামলায় (১১), কলিকাতা হাইকোর্ট হইতে বাদিনী ১৮৭২ সালের তিন আইনে অনুষ্ঠিত বিবাহ-বিচ্ছেদের এক ডিক্রী পাইয়াছেন। স্বামী স্ত্রী উভয়েই হিন্দু বৈদ্য এবং রেজিষ্টারের দ্বারা স্পেশাল ম্যারেজ অ্যাক্ট অনুসারে তাহাদের বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়। বিবাহের মাত্র ছয় মাস পরেই স্ত্রী বিজনবালা বিবাহ বিচ্ছেদের জন্য আদালতে এক দরখাস্ত করেন। তাহাতে তিনি বলেন যে তাঁহারা উভয়েই হিন্দু এবং হিন্দু আইন অনুসারে তাঁহাদের মধ্যে নিষিদ্ধ ঘনিষ্ট সম্পর্ক থাকায় তাঁহাদের মধ্যে বিবাহ হইতে পারে না, সুতরাং তাঁহাদের মধ্যে অনুষ্ঠিত বিবাহ বাতিল ও বে-আইনী। বিজনবালার পক্ষে প্রদত্ত সাক্ষ্যে দেখা যায় যে স্ত্রী-বিজন স্বামী রঞ্জিতের মায়ের আপন মাসতুত বোনের মেয়ে। হাইকোর্টের বিচারে স্থিরীকৃত হয় যে, হিন্দু আইন অনুসারে তাহাদের মধ্যে নিষিদ্ধ ঘনিষ্ট সম্পর্ক থাকায় তাহাদের মধ্যে বিবাহ হইতে পারে না, সুতরাং উক্ত বিবাহ বে-আইনী ও বাতিল বলিয়া রায় দেওয়া হয়।

কিন্তু হিন্দুদের মধ্যে এই আইনানুযায়ী বিবাহ কমই হইয়া থাকে। এই আইন অনুসারে অনুষ্ঠিত খুব অল্পসংখ্যক কয়েকটী ক্ষেত্রে ছাড়া, হিন্দুর বিবাহ হিন্দুশাস্ত্র মতেই হইয়া থাকে। এমন কি খুব উচ্চশিক্ষিত, আলোকপ্রাপ্ত উদার মতাবলম্বী হিন্দু পরিবারের পুত্র কন্যাগণের বিবাহ সাধারণতঃ হিন্দু শাস্ত্র মতেই হইয়া থাকে। আর তাহা ছাড়া হিন্দু মতে বিবাহ না করিয়া তিন আইন অনুসারে বিবাহ করিলে হিন্দু বিবাহ-বিচ্ছেদ সমস্যার সমাধান হয় না। বর্ত্তমানে হিন্দু সমাজের অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। স্ত্রী শিক্ষা প্রসারের ফলে, স্বাধীন মত ও বিবেক বুদ্ধি দ্বারা আপন কর্ত্তব্য ও সুখের পন্থা নির্দ্ধারণ করিবার আকাঙ্ক্ষা নারীর পক্ষে প্রবলই হইতে পারে। বিবাহিত জীবনে অসুখী হইয়া এবং অনেক সময় হয়ত অন্যকারণেও, হিন্দু স্ত্রী নিম্ন-

১১। 46 C. W. N. 753

লিখিত উপায়ে সাধারণতঃ বিবাহ-বিচ্ছেদের চেষ্টা করিয়া থাকেন। তিনি মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া, স্বামীকে মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে অনুরোধ করেন এবং তাহার অনিচ্ছা প্রকাশের পর আদালতে মুসলমান আইন মতে বিবাহ-বিচ্ছেদের মামলা করিয়া ডিক্রী প্রার্থনা করেন।

মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া স্ত্রী মুসলমান আইনের সাহায্যে হিন্দু বিবাহ বিচ্ছেদ-করিয়াছেন, এইরূপ দৃষ্টান্ত অনেক আছে। আয়েসা বিবি বনাম বীরেশ্বর ঘোষ মজুমদারের মামলা (১২) তদানীন্তন কালে বিশেষ চাঞ্চল্য সৃষ্টি করিয়াছিল। বাদিনী আয়েসা বিবির পূর্ব্বের নাম পদ্মাসনা সিংহ। তিনি গ্রাজুয়েট। ১৯২৪ সালে বীরেশ্বরের সহিত তাঁহার হিন্দু মতে বিবাহ হয়। তাঁহার বিবাহিত জীবন অত্যন্ত অসুখী হওয়ায়, ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিলে তাঁহার শান্তি মিলিবে এই আশায় তিনি অনেক চিন্তার পর স্বেচ্ছায় প্রকাশ্য ভাবে ১৯২৯ সালে মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া আয়েসা বিবি নাম গ্রহণ করেন। ইহার অল্পকাল পরেই তিনি তাঁহার স্বামীকে মুসলমান হইতে অনুরোধ করেন। কিন্তু স্বামী ধর্ম্মান্তর গ্রহণের প্রস্তাব ঘৃণার সহিত প্রত্যাখ্যান করেন। তাহার পর স্ত্রী মামলা রুজু করিয়া প্রার্থনা করেন যে, মুসলমান আইন অনুসারে তাঁহাদের মধ্যে অনুষ্ঠিত হিন্দু বিবাহ বাতিল হইয়াছে ; বাদিনীর পুনরায় বিবাহ করিবার অধিকার আছে আদালতের নিকট তিনি এই ঘোষণাও প্রার্থনা করেন। স্বামী এই মামলায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন নাই। বিচারপতি প্যাংক্রিজ বাদিনীর মামলা ডিক্রী দেন এবং ঘোষণা করেন যে পদ্মাসনার সহিত বীরেশ্বরের হিন্দু বিবাহ বিচ্ছেদ হইয়াছে। ইহার কয়েক বৎসর পূর্ব্বে চেলিম্মাতোন্নেসা বিবি বনাম সুরেন্দ্রনাথ সেনের মামলায়ও (১৩) বিচারপতি বাকল্যাণ্ড বাদিনীর অনুরূপ প্রার্থনা মঞ্জুর করিয়া তাহার অনুকূলে রায় দেন। ইহা ছাড়া জেলা জজগণও অনুরূপ মামলায় বাদিনীর অনুকূলে তাহাদের প্রার্থিত বিবাহ বিচ্ছেদের ডিক্রী দিয়াছেন।

এই উপায়ে হিন্দু বিবাহ বিচ্ছেদ আইনসম্মত হইয়াছে কিনা, তাহাতে সন্দেহের অবকাশ আছে। বিবাহ হিন্দু মতে অনুষ্ঠিত। উভয় পক্ষই বিবাহের

১২। 33 C. W. N. Ed. notes CLXXIX

১৩। 33 C. W. N. Ed. notes CLXXIX এ উল্লিখিত

সময় হিন্দু থাকেন। এই বিবাহ চুক্তি নহে, ধর্ম্মাচরণের জন্য নরনারীর অবিচ্ছেদ্য পবিত্র মিলন। স্ত্রী পরে মুসলমান হইয়াছেন এবং মুসলমান আইন বলে অবিচ্ছেদ্য হিন্দু-বিবাহ-বিচ্ছেদ প্রার্থনা করিতেছেন। স্বামী হিন্দুই আছেন, বিবাহও হিন্দু বিবাহ। স্ত্রী বলিতেছেন, আমি মুসলমান, আমার ব্যক্তিগত আইন প্রযোজ্য। স্বামীও ত বলিতে পারেন, আমি হিন্দু, বিবাহ হিন্দুমতে, আমার ব্যক্তিগত আইন প্রযোজ্য। এইরূপ ক্ষেত্রে কাহার আইন দ্বারা মামলার নিষ্পত্তি হইবে ; স্ত্রীর মুসলমান আইন, না স্বামীর হিন্দু আইন। রোমান আইনে, যে ক্ষেত্রে বিবদমান পক্ষদের মধ্যে বিভিন্ন আইন প্রযোজ্য সেখানে প্রতিবাদীর আইন দ্বারাই মামলার বিচার হইত। এ দেশে প্রচলিত আইনে (১৪) আছে, যে মামলার উভয়পক্ষই মুসলমান সেই মামলায় মুসলমান আইন প্রযোজ্য এবং যেখানে উভয়পক্ষই হিন্দু সেই মামলায় হিন্দু আইন প্রযোজ্য, অন্যথায় সুবিচার ন্যায় ও বিবেকের (justice, equity and good conscience) নির্দ্দেশমত মামলার বিচার হইবে। তাহা ছাড়া, বিবাহ হিন্দু আইনে হইয়াছে ; অন্য আইন দ্বারা হিন্দু-বিবাহ বিচ্ছেদ করা যায় কিনা তাহাও বিচার-সাপেক্ষ। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে এতাবৎ যতগুলি মামলা হইয়াছে, সবগুলিরই এক তরফা বিচার হইয়াছে। হিন্দু স্বামী কোন মামলায়ই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন নাই, সুতরাং আইনের এই প্রশ্নের মীমাংসা হয় নাই, ফলে নজীরও পাওয়া যায় না।

এই প্রশ্নই উঠিয়াছিল হরিপদ রায় বনাম কৃষ্ণ বিনোদ রায়ের চাঞ্চল্যকর মামলায় (১৫)। কিন্তু অন্য কারণে তাহার বিচার হইতে পারে নাই। সুতরাং আইনের এই প্রশ্ন আজও অমীমাংসীত। তারপর প্রায় এক বৎসর পূর্ব্বে পুনরায় এই প্রশ্ন উঠে নুরজাহান বনাম ইউজিন টিসিঙ্কোর মামলায় (১৬)। বিচারপতি এজলী সেই মামলায় মুসলমান শাস্ত্র ও প্রাসঙ্গিক নজীরাদি বিস্তারিত আলোচনা করিয়া যে সুচিন্তিত রায় দেন, তাহার মর্ম্ম নিম্নে দেওয়া গেল।

১৪। Bengal, Agra and Assam Civil Courts Act, section 37 (Act XII of 1887.)

১৫। 43 C. W. N. 659

১৬। 45 C. W. N. 1047

এই সম্পর্কে মুসলমান আইনের মূলে রহিয়াছে হেদায়ার (১৭) এই অংশ, "স্বামী স্ত্রীর মধ্যে একজন মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিলে, বিচারকের অন্য জনকেও মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণে প্রবৃত্ত করান আবশ্যক। অবাধ্য হইলে বিচারক তাহাদের বিচ্ছিন্ন করিবেন। স্ত্রী যদি মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করে এবং স্বামী যদি বিধর্ম্মীই থাকিয়া যায়, বিচারক তাহা হইলে স্বামীকেও ইসলাম গ্রহণ করিতে বলিবেন। যদি সে সম্মত হয়, তাহা হইলে বিবাহ অক্ষুণ্ণই থাকিবে, কিন্তু স্বামী যদি অসম্মত হয়, তাহা হইলে বিচারক তাহাদের বিচ্ছিন্ন করিয়া দিবেন।..."

এই সম্বন্ধে Baillee's Digest (১৮) হইতে উদ্ধৃত করা যাইতেছে। সম্রাট ঔরংজীবের ফতোয়া আলমগিরীই Baillee's Digest-এর ভিত্তি। "বিবাহিত দম্পতির মধ্যে যদি একজন মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করে, তাহা হইলে অন্য জনের নিকটও ইসলাম ধর্ম্ম গ্রহণের প্রস্তাব করিতে হইবে। যদি সে গ্রহণ করে ভাল, অন্যথায় তাহাদের বিচ্ছিন্ন করিয়া দিতে হইবে। যদি সে নীরব থাকে এবং কোন কথাই না বলে, বিচারককে সাবধানতার জন্য পরপর তিনবার তাহার নিকট ইসলাম গ্রহণের জন্য প্রস্তাব করিতে হইবে। এ বিষয়ে বিচার শক্তি সম্পন্ন নাবালক ও সাবালকের মধ্যে কোনই প্রভেদ করা হইবে না এবং অসম্মত হইলে উভয় ক্ষেত্রেই, আবু হানিফা ও মহম্মদের মতে, স্বামী স্ত্রীকে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিতে হইবে।" শাস্ত্রকারগণের মতে কাজীর নিকট উভয় পক্ষেরই উপস্থিত থাকা আবশ্যক বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে এবং বিধর্ম্মী পক্ষ অনুপস্থিত থাকিলে, আইন-সম্মত ভাবে তাহাকে ইসলাম গ্রহণের প্রস্তাব করা যায় কিনা সন্দেহ। Baillee's Digest-এ বলা হইয়াছে "যদি সে নীরব থাকে এবং কোন কথাই না বলে...ইত্যাদি", ইহার উদ্দেশ্যই এই যে বিধর্ম্মী যেন মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণে অসম্মতির পরিণাম সম্যক উপলব্ধি করিতে পারে। বিচারপতি এজলীর মতে, পূর্ব্ব বর্ণিত অবস্থা বিবেচনায় বিধর্ম্মীকে মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণের প্রস্তাব করিবেন কাজী স্বয়ং; (মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত স্ত্রী কিংবা স্বামী নহে) এবং উপযুক্ত ক্ষেত্রে বিবাহ বিচ্ছেদের রায় দিবেন তিনিই।

১৭। Himilton, 2nd Ed. P. 64.

১৮। Hamilton. 2nd Ed. p. 180-181

প্রায় সকল ক্ষেত্রেই বিধর্মী স্বামীকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণের প্রস্তাব করিয়াছেন মুসলমান ধর্মে নব দীক্ষিতা স্ত্রী, কাজী নহেন। কিন্তু কোন ক্ষেত্রেই কাজী স্বামীকে ইসলাম গ্রহণের প্রস্তাব না করায়, আইনের এই বিধান প্রতিপালিত হয় নাই। এই বিধান প্রতিপালিত হইলেও, এই উপায়ে বিবাহ বিচ্ছেদের পথে অন্য বাধাও থাকিয়া যায়। বিচারপতি এজলীর মতে ভারতবর্ষে অমুসলমান মতে বিবাহিতা স্ত্রী, মুসলমান ধর্ম গ্রহণান্তর বিবাহ-বিচ্ছেদ করিতে পারেন না কারণ সম্বন্ধে তিনি বলেন যে এই সম্পর্কে প্রামাণ্য গ্রন্থ হেদায়া ও ফতোয়া আলমগিরী সঙ্কলিত হইয়াছিল সেই দেশেই ব্যবহারের জন্য, ইসলাম যেখানে রাষ্ট্র ধর্ম (State religion)। হেদায়ার গ্রন্থকার সেখ বারহানউদ্দীন আলী দ্বাদশ শতাব্দীতে ট্রানস্ অক্সিনিয়ায় জন্মগ্রহণ করেন এবং সম্ভবত বাগদাদের খালিফদের ব্যবহারের জন্য উক্ত আইন গ্রন্থ সম্পাদন করেন। আর ফতোয়া আলমগিরি অষ্টাদশ শতাব্দীতে সম্রাট ঔরংজীবের আদেশে সম্পাদিত হইয়াছিল।

এই সকল বিধান মুসলমান ধর্মে দীক্ষায় উৎসাহদান ও ধর্মত্যাগ নিবারণ করিয়া ইস্‌লামের সংহতি রক্ষার উদ্দেশ্যে প্রণীত। বিংশ শতাব্দীতে অন্য ধর্মের প্রতিকূলে কোন বিশেষ ধর্মের প্রচারে সহায়তা করা কোন রাষ্ট্রেরই নীতি নহে। এই সকল কারণে বিচারপতি এজলী বলিয়াছেন যে, যে আইনের উপর নির্ভর করিয়া মুসলমান ধর্ম নব দীক্ষিতা নারী তাহার অন্য ধর্ম মতে অনুষ্ঠিত বিবাহ বাতিল করিতে চায় সে আইন অচল (obsolete) ও সাধারণ-নীতি-বিরুদ্ধ (opposed to public-policy)। বিচারপতি এজলী এই সম্পর্কে অনেক প্রাসঙ্গিক নজীর ও আইনেরও উল্লেখ করিয়াছেন।

নুরজাহান বনাম ইউজিন টিসিঙ্কোর মামলার ডিক্রীর বিরুদ্ধে পরে আপীল হয়। প্রধান বিচারপতি, বিচারপতি আমিরালি ও নসিমালী, উক্ত মামলা আদালতের বিচারের অধিকার নাই, এই জন্য আপীল নামঞ্জুর করেন (১৯)।

সুতরাং বিচারপতি এজলীর রায় নজীর হইতে পারে নাই এবং আইনের এই প্রশ্ন পুনরায় অনিশ্চয়তার মধ্যে ফিরিয়া গিয়াছে। যদি ভবিষ্যতে কোন

১৯। 46 C. W. N. 465

হিন্দু স্বামী মুসলমান ধর্ম্মে নব দীক্ষিতা স্ত্রী কর্ত্তৃক আনীত বিবাহ বিচ্ছেদের মামলায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন, তাহা হইলে হয়ত হাইকোর্টের বিচারে এই সম্পর্কে নজীর হইতে পারে।

এই ত গেল আইনের কথা, কিন্তু ইহার আর একটি দিক আছে। হিন্দু স্ত্রী, যে কোন কারণেই হউক, যখনই বিবাহ-বিচ্ছেদ চাহিয়াছেন, তখনই মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণের পর, মুসলমান আইন বলে আদালতের একতরফা বিচারে বিচ্ছেদের ডিক্রী পাইয়াছেন। প্রায় সকলক্ষেত্রেই, ধর্ম্মান্তর গ্রহণ বিবাহ বিচ্ছেদের জন্য, নূতন ধর্ম্মের প্রতি আন্তরিক অনুরক্তির জন্য নহে। তবে এ কথা অস্বীকার করা যায় না যে কোন কোন ক্ষেত্রে বিবাহ-বিচ্ছেদের আবশ্যকতা আছে। সেইজন্যই অন্ততঃ, ব্যাভিচার, নির্য্যাতন, দুরারোগ্য ব্যাধি প্রভৃতি কয়েকটা বিশেষ কারণে, হিন্দু বিবাহ বিচ্ছেদ হইতে পারিবে এই মর্ম্মে আইন প্রণীত হওয়া প্রয়োজন। ইহাতে সমাজের কল্যাণ বই অকল্যাণ হইবে না ; স্ত্রীকেও বিবাহ-বিচ্ছেদের জন্য অন্য ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে না, আবার খুসী হইলেই নিতান্ত অকিঞ্চিতকর কারণে কিংবা হীন প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণান্তর বিবাহ-বিচ্ছেদ করিয়া পারিবারিক সুখ-শান্তি ও সমাজশৃঙ্খলার ব্যাঘাত জন্মাইতে পারিবে না।

প্রশ্ন হইতে পারে যে প্রস্তাবিত বিবাহ-বিচ্ছেদ বিধি শাস্ত্রানুমোদিত হইবে না। কথা হয়ত সত্য, কিন্তু কোন কোন শাস্ত্রকার ক্ষেত্র বিশেষে হিন্দু স্ত্রীর দ্বিতীয় স্বামী গ্রহণ অনুমোদন করিয়াছেন। পরাশরের মতে "স্বামী যদি নিরুদ্দিষ্ট, মৃত, সংসার ত্যাগী, ক্লীব কিংবা জাতিচ্যুত হয়, তাহা হইলে এই পাঁচ রকমের বিপত্তিতে স্ত্রীলোক অন্য স্বামী গ্রহণ করিতে পারে (২০)।" নারদ ও দেবলও এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন। সুতরাং বিবাহ বিচ্ছেদ যে একেবারে হিন্দু ধর্ম্মানুশাসন ও শাস্ত্র বিরুদ্ধ তাহা নহে। তাহা ছাড়া প্রচলিত প্রথানুসারে কোন কোন শ্রেণীর হিন্দুর মধ্যে বিবাহ বিচ্ছেদ প্রচলিত আছে (২১)।

এই সমস্যার গুরুত্ব সম্বন্ধে অনেকেই সচেতন এবং প্রায়ই সংবাদ পত্রে ও অন্যান্য সাময়িক পত্রিকাদিতে ইহার আলোচনা হইয়াছে। গভর্ণমেণ্টও

২০। বিদ্যাসাগরের "ম্যারেজ অফ হিন্দু উইডোজ" পৃঃ ৭
২১। গোপীকৃষ্ণ কামনধন বনাম মহম্মদ জগগো

উদাসীন নহে এবং ১৯৪১ সালে তাঁহারা এক হিন্দু ল কমিটী (Hindu Law Committee) নিযুক্ত করেন। বিবাহ সম্বন্ধে তাঁহাদের প্রস্তাব একটী বিলের আকারে কিছুদিন পূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছে (২২)। ইহা যথাসময়ে কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে উপস্থাপিত হইবে।

এই বিলের তৃতীয় ধারায় দুই প্রকার বিবাহের বিধান আছে। প্রথমটী ধর্ম্ম সম্মত বিবাহ (sacramental), দ্বিতীয়টী সিভিল ম্যারেজ। দুইজন হিন্দুর মধ্যে ধর্ম্ম সম্মত বিবাহ নিম্নলিখিত সর্ত্তে হইতে পারিবে।

বিবাহের সময় কাহারও স্বামী কিংবা স্ত্রী জীবিত থাকিবে না। পক্ষগণের জাতি এক এবং গোত্র ও প্রবর বিভিন্ন হওয়া চাই এবং তাহারা পরস্পরের সপিণ্ড হইলে চলিবে না। পাত্রীর যদি যোল বৎসর পূর্ণ না হইয়া থাকে, তাহা হইলে বিবাহে তাহার অভিভাবকের সম্মতি প্রয়োজন।

সিভিল ম্যারেজের বিধানে বস্তুতঃ স্পেশাল ম্যারেজ অ্যাক্টের (৯) বিধান গুলি অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। এই বিলে, সিভিল ম্যারেজে বিবাহ বিচ্ছেদের বিধান আছে ধর্ম্ম সম্মত বিবাহে নাই। বর্ত্তমানে এই দুই প্রকার বিবাহই হিন্দু সমাজে প্রচলিত আছে; সেদিক দিয়া ইহার বিশেষ নূতনত্ব নাই। তবে ইহার সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য এই যে ধর্ম্ম সম্মত বিবাহেও দ্বিবিবাহ নিষিদ্ধ হইয়াছে। এক স্ত্রী বর্ত্তমানে স্বামীর আর অন্য বিবাহ করা চলিবে না এবং ২৪ ধারায় দ্বিবিবাহের শাস্তির বিধানও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

কিন্তু ধর্ম্ম সম্মত বিবাহেও বিচ্ছেদের বিধান থাকা প্রয়োজন। কারণ হিন্দুদের মধ্যে সিভিল ম্যারেজ অপেক্ষা তাহাই যে অধিক জনপ্রিয় থাকিবে তাহাতে সন্দেহ নাই এবং এই বিধান না থাকিলে সমস্যারও সমাধান হইবে না। তবে এই বিল সম্পূর্ণ নহে এবং টীকাতে বলা হইয়াছে যে "এই বিলে বিস্তারিত বিবাহ আইনের মাত্র প্রথম অধ্যায়ই আছে। বিবাহ অনুষ্ঠানের বিষয়ই বিশেষ করিয়া ইহাব অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। বিবাহ হইতে উদ্ভূত অধিকার ও কর্ত্তব্যের বিষয়, বিবাহ বাতিলের বিষয়, স্বতন্ত্র বাসস্থান, ভরণপোষণ, বিবাহ বিচ্ছেদ ও অন্যান্য বিষয় পরবর্ত্তী অধ্যায়ে সন্নিবিষ্ট হইবে, কারণ প্রথম

২২। কলিকাতা গেজেট, ১৮ই জুন, ১৯৪২

৯। Special Marriage Act (Act III of 1872)

অধ্যায়ের বিষয়গুলি গৃহীত হইবে কিনা জানা না গেলে, সেগুলির আলোচনা করার অসুবিধা আছে।"

সুতরাং আশা করা যায়, ধর্ম্মসম্মত বিবাহে বিচ্ছেদের বিধান সন্নিবিষ্ট করিয়া আইন প্রণেতাগণ এই সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করিবেন।

সুশান্তকুমার সেন।

আবির্ভাব

'পিউ কাঁহা' ব'লে কোথা কাঁদিছে পাপিয়া।
প্রজাপতি বনে বনে ওড়ে মধু পিয়া।
সাদা সাদা মেঘগুলি ভেসে ভেসে চলে
বরফের স্তূপ যেন সাগরের জলে।
ঝুমকো জবার রক্তদুল্ কানে পরি'
বসে আছে বনদেবী। শুষ্কপত্র ঝরি
পড়িছে চরণ তলে। ফোটে কুন্দরাশি
উষার রক্তিম ওষ্ঠে শুচি শুভ্র হাসি
চিরন্তন যৌবনের জয়ধ্বজা তুলে
কচি কচি কিশলয় নাচে দুলে দুলে
দক্ষিণের সমীরণে। আসিল কোকিল
বসন্তের সভাকবি। ওড়ে শঙ্খচিল্।
উদাস বাতাসে চিত্ত হারাইয়া যায়,
রহি রহি কাঁদে হিয়া কোন্ বেদনায়?

বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

২৫-এ বৈশাখ, ১৩৫০

বৈতালিকের সভায় এখন নতুন পদ্য পাঠ,
মনে মনে আর লাগে না অনির্বাচ্য গাঁঠ।
এখন শুধুই দিগ্বিজয়ী বেতার-যন্ত্রে গান ;
মধ্যে মধ্যে ক্ষুদ্র আরাম, ক্লান্তি অবিরাম।
বিরল দেশে ধান্য ও ধন, স্বল্প ভোজন তাই।
অনেক দুঃখে আজ জনগণ হ'লো আমার ভাই।
শূন্য মরাই দেখে চড়াই দেশান্তরে যায়।
এমন সময় মেঘ করে কোন্ অশোক-নীপের ছায়ে।
তখন মনে ভাবি আবার হায়রে সেকাল হায়রে,
আজ এ কালের মরীচিকায় কোথায় চ'লে যায় রে!

ময়নাপাড়ার মাঠে হঠাৎ কৃষ্ণকলি ফুটলে
আবার চোখে পড়বে কি তা' ভাগ্যে-ও বা জুটলে?
শুভদৃষ্টি নয় যে সুলভ, আজ সে কথা ভুলছি।
নানা দেশের বোড়ো হাওয়ায় এই ভাবতে দুলছি।
বাহিরে, আজ হাজার শত্রু, মনে হারাই বিশ্বাস,
এই পুরাতন আঙিনাতে নাগিনীদের নিশ্বাস।
শূন্য মরাই দেখে চড়াই দেশান্তরে যায়।
এমন সময় রোদ ঝলকে কোন্ পতিতার গায়।
বন্দনা গান ঋষ্যশৃঙ্গ, জলে নদীর জল,
নয়নে কার দিব্য বিভা, আনন্দে উচ্ছল।

মসীবৃত্তি আছে সাধা। শফরী-চাঞ্চল্যে
ঘুরে বেড়াই। স্তব্ধ আবার প্রভুরা মান করলে।
দ্রৌপদী-রা রাঁধেন বাড়েন। সব কন্যাই খান।
অর্থনীতির দুর্যোগে শিব নৌকাডুবি যান।

পশ্চাৎপদ পার্থ রণে, তাই দিয়েছেন মন
কোন্ গহনে হ'লো মুখর উলূপীর যৌবন।
শূন্য মরাই দেখে চড়াই দেশান্তরে যায়,
এমন সময় ভেরীর বাদ্য ইতিবৃত্ত-ছায়ে।
পঞ্চ নদীর তীরে লুপ্ত সপ্ত শত শিখ,
মারাঠার কোন্ শৈলে সুদূর শিবাজী নির্ভীক।

রবিকরের খর দাহে, চন্দ্রকরের স্নেহে,
ছিলাম সুখে মাঝে মাঝে, ব'লেছিলাম কে হে—
এই ত্রিভুবন সৃজনান্তে মোছেন আপন নাম?
উদ্দেশে তাঁর কোটি কোটি বর্ষিত প্রণাম।
ঝড় উঠেছে হঠাৎ করে, সেই বাতাসে হায়
আমার শস্য, আমার সোনা সাগর পারে যায়।
তৈল-ঢালা স্নিগ্ধ তনু বহু দুঃখে ক্ষীণ,
তখন কবি গানে বলেন, আসে নতুন দিন।
পূজার ঘরের মঞ্চ আছে শূন্য বারোমাস,
তিনি গেছেন যে প্রান্তরে করছে চাষা চাষ।

নতুন কালের তোরণ তলে এলো তরুণ দল,
আধ মরাদের ঘা মারিবার দুর্দম তার বল।
অন্যায় যে করে এবং অন্যায় যে সহে
পাষণ্ড সেই ক্লীবের শরীর তৃণের মতন দহে।
ভারত-তীর্থে ভারতবাসী হিন্দু মুসলমান
বাংলা দেশের কবির কণ্ঠে শেখে নতুন গান।
নিপীড়িতের অপমানে আজ যারা পায় ক্লেশ
দুর্ভাগা নয়, ধন্য হ'লো সেই সেনানীর দেশ।
পায়ের তলে বিশাল মরুর কোনও চিহ্নহীন
নাই বা হ'লাম এই দেশেতে আরব বেদুইন।

এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা মধ্যিখানে চর।
জগৎ-পারাবারের তীরে বাঁধি বালুর ঘর।
সূর্য হাসে ক্ষণে ক্ষণে, মেঘের অন্ধকার
কখনও বা ঢাকে সুদূর নীল পাহাড়ের পার।
আবার কোথাও ধূ ধূ করে শুকনো ঘাসের জমি,
একটি গাছে আছে শুধু ব্যাঙ্গমা ব্যাঙ্গমি।
হঠাৎ কখন সন্ধ্যাবেলায় ঝিলম নদীর জল
কলকণ্ঠে বলে সৃষ্টি অতীব চঞ্চল।
বিহঙ্গদের মিতা বাতাস ডানায় দিলো বেগ,
পর্বতরাজ বলে, আমি নিরুদ্দিষ্ট মেঘ।

প্রাণের গোপন রহস্যতল জীবন-ধর্মে ফুঁড়ি
মঞ্জুলিকা জাগে একা শতদলের কুঁড়ি
সত্যকে যে স্বীকার করে, সাবিত্রী সেই নারী,
দেয় না বাধা তাকে কোনও নিষেধ কিংবা দ্বারী।
বিলাসপুরের ইষ্টিশানে রুক্মিনী ক'র নাম?
গিয়েছে সে দার্জিলিং-এ কিংবা আরাকান।
বিনুর বয়স বাইশ যখন সেই অতীতের ফাঁকি
ঝামরু কুলির বৌ গিয়েছে অনন্তকাল রাখি।
আবার দেখি অসামান্যা অন্তঃপুরের মেয়ে
শরৎ বাবুর কাছে বেড়ায় মুক্তিমন্ত্র চেয়ে।

বৈতালিকের কণ্ঠে এখন নতুন সুরের গান
আজ দুনিয়ায় নামাঙ্ক কার? প্রবল বর্তমান।
আমরা চলি। পিছন পানে দেখি বর্ষশেষ
গঙ্গার তীর, স্নিগ্ধ সমীর কোথায় নিরুদ্দেশ।
মেঘ উঠেছে ঈশান কোণে, নির্দয় সংসার।
ভগবানের দূত যাহারা এলো বারংবার,

চিহ্নবিহীন সবাই তা'রা, দুঃসহ দুর্দৈব।
তোমার শঙ্খ ধূলায় প'ড়ে কেমন ক'রে সইবো ?
শূন্য মরাই দেখে চড়াই দেশান্তরে যায়।
নতুন দিনের মৌমাছি-কে কেউ বলে না 'আয়'।

পথ চলাতেই আনন্দ আজ পথ আমাদের মিতা,
খাণ্ডববন গতাসু তাই জড় দেহের চিতা।
নতুন ফুলের মঞ্জরী কি কাঁপে মাটীর নীচে ?
নটরাজের প্রলয়-নৃত্য সে-ও যাবে না মিছে।
অপরূপকে কবি-র সঙ্গে দেখি নয়ন মেলে।
ইতিবৃত্তের ধারা চলে পান্থনিবাস ফেলে।
শূন্য মরাই দেখে চড়াই যাক্ না দেশান্তরে।
শিশুর নগ্ন দেহে তবু মায়ের দৃষ্টি ঝরে।
তা'রই সঙ্গে দেখি নবীন পঁচিশে বৈশাখ।
নতুন পথের প্রান্তে রচে রথের চাকার দাগ॥

হরপ্রসাদ মিত্র

ভারতীয় সমাজ-পদ্ধতির উৎপত্তি ও বিবর্ত্তনের ইতিহাস

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

অনুলোম ও প্রতিলোম বিবাহ

হিন্দুর এই সামাজিক রাষ্ট্রের শ্রেণী সমূহের মর্য্যাদার বিভিন্নতার সহিত একটি বিশেষ প্রতিষ্ঠান বিজড়িত রহিয়াছে। ইহা হইতেছে অনুলোম ও প্রতিলোম বিবাহ। স্মৃতি সমূহের মতে উক্ত বিবাহ-জাত সন্তানের সামাজিক মর্য্যাদা দ্বারা উহার উৎপত্তি ধরা যায়। যথা,—নিম্নবর্ণের পিতা এবং উচ্চবর্ণের মাতার সন্তান প্রতিলোম বিবাহজাত এবং উচ্চবর্ণের পিতা ও নিম্নবর্ণের মাতার সন্তান অনুলোম বিবাহ-জাত। যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতায় অনুলোম বিবাহ-জাত সন্তানকে "সৎ" (মনু 'অপসদ' বলিয়াছেন, ১০।১১) এবং প্রতি-লোম জাত সন্তানকে 'অসৎ' বলিয়া নির্দ্ধারিত করা হইয়াছে (১।৯৫)। কিন্তু স্মৃতি সমূহের এই সকল সংজ্ঞা সঠিক নয় বলিয়া অনুমিত হয়; কারণ ইতিপূর্ব্বে দেখা গিয়াছে যে যম সংহিতায় 'ভিল্ল'কে পতিত বলা হইয়াছে। অন্যপক্ষে ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে আবার তাহাকে (ভিল্ল) 'সৎ' শূদ্র বলা হইয়াছে। আবার সম্বর্ত্ত সংহিতায় উক্ত হইয়াছে, শূদ্র পিতা ও ব্রাহ্মণ-কন্যা জাত পুত্রকে চণ্ডাল বলিয়া গণ্য করা হয়। এরূপ পুত্র ধর্ম্মের কোন ক্রিয়া (rites) নিষ্পন্ন করিতে পারিবে না। তিন প্রকারের চণ্ডাল আছে; শূদ্র পিতা ও ব্রাহ্মণী মাতা জাত পুত্র তৃতীয় প্রকারের। বর্দ্ধকি (সূত্রধর), নাপিত, গোপ, কুম্ভকার, বণিক, কায়স্থ, মালাকার···মেড, চণ্ডাল, দাস, কোল ও গোখাদকগণ সর্ব্বনিম্ন জাতির লোক (১০—১২)। এই স্থলে বিভিন্ন জাতির মর্য্যাদা সম্পর্কে আর একটি ব্যবস্থা প্রাপ্ত হওয়া গেল। অন্যান্য পুস্তক সমূহে যে-সকল জাতিকে 'বৈশ্য' ও 'সৎ'শূদ্র বলা হইয়াছে এস্থলে তাহাদিগকে চণ্ডালের সমতুল্য করা হইয়াছে। এইজন্য স্মৃতি সমূহে জাতিতাত্ত্বিক ও সমাজতাত্ত্বিক কোন দিকেরই নিশ্চিত সংজ্ঞা প্রাপ্ত হওয়া যায় না †। হিন্দু শাস্ত্র সমূহে বিবাহ সম্পর্কে এই মত প্রকাশ

† । ভারতের বিভিন্ন স্থানে আবিষ্কৃত প্রস্তর ও তাম্র ফলক সমূহের যে পাঠোদ্ধার হইয়াছে তাহাতে জাতি সমূহের উৎপত্তি বিষয়ে অল্প সংবাদ প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই অনুশাসনগুলিতে

পাইয়াছে যে, উচ্চবর্ণের লোকের তদপেক্ষা নিম্নবর্ণ জাত স্ত্রীলোকের সহিত বিবাহ জাত পুত্র অনুলোম। এই পুত্র স্ব-বর্ণজাত পুত্র অপেক্ষা অধম বটে, তথাপি সে অনেক সুবিধার অধিকারী ; কিন্তু তদ্বিপরীত বিবাহ জাত পুত্র নিম্নজাতীয় হইয়া থাকে এবং কোন প্রকার সুবিধা ও অধিকার ভোগ করিতে পারে না (মনু, ১০।৬৭-৬৮)। ইহার কারণ প্রতিলোম বিবাহ নিষিদ্ধ (মনু, ১০।৬৪) । (১)

এই বিবাহ পদ্ধতি সমাজবিজ্ঞানে hypergamy নামে অভিহিত হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন, ইহা হিন্দু সমাজের এক অদ্ভুত ব্যবস্থা। কিন্তু তুলনা মূলক পাঠ দ্বারা ইহা অবগত হওয়া যায় যে এই প্রকারের বিবাহ পদ্ধতি প্রাচীনকালের গ্রীসেও অজ্ঞাত ছিল না। উচ্চশ্রেণীর লোক নিম্নশ্রেণীর কন্যাকে বিবাহ করিলে উহাকে epigamy বলা হইত। এই প্রকার বিবাহ দ্বারা দায়াধিকার ও ধর্ম্মাধিকার এবং কতকাংশে রাজনৈতিক অধিকার আইনতঃ সঙ্কুচিত হইত। এইজন্যই নাগরিক ও অ-নাগরিক বিবাহ সম্পন্ন হইত না (২)। এইস্থলে পূর্ণ নাগরিক-অধিকার প্রাপ্ত নাগরিকের সহিত অধিকার-বিহীন অ-নাগরিকের বিবাহ চলিত না ; এরূপ বিবাহ নিষ্পন্ন হইলে অনেক অধিকার হইতে বঞ্চিত হইতে হইত। প্রাচীন রোমের প্লেবদের পুরাতন নাগরিকদের (Patricians) সহিত বিবাহ (connubium) নিষিদ্ধ ছিল। তাহারাও ধর্ম্মের

---

*'কায়স্থ' একটি রাজকীয় পদ (ধর্ম্মপালদেবের খালিমপুর লিপি ; Malakapuram stone-piller inscription of Rudradeva in 1183 Saka year) বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে ; 'ব্রহ্ম-ক্ষত্র'দের "গোত্রজ" বলা হইয়াছে (Jaina inscription in the temple of Baijnath at Kiragram—Epigrapica Indica, p. 118)। আবার স্মৃতিতে উক্ত এবং আজকাল যাহাদিগকে "জাতি" বলা হয় তাহাদিগকে অনুশাসন সমূহে 'শ্রেণী' (guild) বলা হইয়াছে (Mandasor stone-inscriptions of Kumargupta and Bandhu Varmon, Corpus Inscriptionum Indicarum, Vol. III ; Inscription of Skandagupta 'তৈলিকশ্রেণী', Ibid, No 16, p. 71 ; "সমস্ত মালিক শ্রেণ্যা" in "The two inscriptions on the Vaillabhatta Svamin temple ; Epigrapica Indica, Vol. I, No. 20, p.155)।

১। Jones—Institutes of Hindu Law, Pp 349—350.

২। G. F. Shoemann—"Grieches Altertuemer", 4th Edn. P 105.

ক্রিয়া (cult) সম্পাদন এবং পুরোহিত পদগ্রহণ করিতে পারিত না। জীবনে তাহাদের কেবল কর্ত্তব্যই পালন করিতে হইত, তাহারা পূর্ণ-রোমীয় নাগরিক অধিকার (civitat) ভোগ করিতে পারিত না (৩)।

জার্ম্মাণীর ইতিহাসে দেখা যায়, প্রাচীনকালে রাজা (Princes), অভিজাত এবং স্বাধীন ব্যক্তিদিগের মধ্যে বিবাহ প্রচলিত ছিল; কিন্তু মধ্যযুগে শ্রেণীসমূহ বিশিষ্টভাবে আইন সমূহ দ্বারা প্রকট হওয়ায় এই প্রকারের বিবাহ কম হইয়া গিয়াছিল। আবার স্বাধীন ও অস্বাধীন (un-free) ব্যক্তিদের বিবাহ নিষিদ্ধ ছিল এবং প্রাচীনকালে দণ্ডনীয় ছিল (৪)। কিন্তু মধ্যযুগে ইহার বিশেষ পরিবর্ত্তন হয়; উচ্চশ্রেণীর লোক নিম্নশ্রেণীর সহিত বিবাহ করিতে পারিত না। যদি স্বামী ও স্ত্রী বিভিন্ন শ্রেণীয় হইত তাহা হইলে সেই বিবাহ অবৈধ বলিয়া গণ্য হইত। এই প্রকারের বিবাহে যখন একজন উচ্চশ্রেণীর স্ত্রীলোক তাহার নিম্নশ্রেণীর পুরুষকে বিবাহ করিত, তখন বিবাহিত জীবন পর্য্যন্ত সেই স্ত্রীলোক তাহার স্বামীর স্ব-শ্রেণীয় হইত, অর্থাৎ এই স্ত্রীলোক বিবাহিত জীবনে (স্বামীর জীবনকাল পর্য্যন্ত) শ্রেণী বা জাতিচ্যুত হইয়া থাকিত (প্রতিলোম বিবাহের ফলের ন্যায়)। কিন্তু একজন নিম্নশ্রেণীয় স্ত্রীলোক যখন উচ্চশ্রেণীয় একজন পুরুষকে বিবাহ করিত তখন তাহার স্বামী তাহাকে ঊর্দ্ধে তুলিয়া নিতে পারিত না (অনুলোম বিবাহের ফল—ব্রাহ্মণের সহিত অব্রাহ্মণ কন্যার বিবাহের ন্যায়)। এই প্রকারের বিবাহের সন্তানদের দস্তুর মত দুঃখভোগ করিতে হইত (৫)। খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীর এক ইতিহাস হইতে এই সংবাদ পাওয়া যায় যে 'ফ্রাঙ্ক'-দের রাজত্বের মধ্যে অভিজাতদের সঙ্গে সাধারণ স্বাধীন শ্রেণীয় লোকদের বিবাহ অবৈধ বলিয়া ধার্য্য হইত। একজন স্বাধীন বা মুক্ত পুরুষ একটি অভিজাত শ্রেণীর রমণীকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করিলে সে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হইত (৬)।

৩। Schwegler—"Roemische Geschichte, Pp. 620—62I.

৪। Jacob Grimm—"Deutsche Rechtsaltertuemer", Vol. I, p. 607.

৫। R. Schroeder—"Lehrbuch der deutsche Rechts gechischte", Pp. 501-502.

৬। H. Brunner—Duetsche Rechts geschichte, P250.

এই সকল দৃষ্টান্ত হইতে দৃষ্ট হয় যে সমাজে শ্রেণী বিভাগ পাকাপোক্ত হইলে, অর্থাৎ সমাজ সামন্ততন্ত্রীয় যুগে প্রবেশ করিলে উচ্চবর্ণ ও নিম্নবর্ণের বিবাহ সম্পর্কিত বিষয়ে কড়াকড়ি সুদৃঢ় নিয়ম বিবর্ত্তিত হয়। উচ্চশ্রেণী সমূহ নিজেদের শ্রেণী-চৈতন্য দ্বারা প্রণোদিত হইয়া নিম্নশ্রেণীর পুরুষদের নিকট কন্যাদানে অসম্মত। তাহারা "রুটী ও বেটী" দ্বারা নিম্নস্তরের লোকের সহিত সাম্য অবলম্বন করিতে চাহে না। ইসলাম ধর্ম্মেও মুসলমান নিজেকে উচ্চ মনে করিয়া অ-মুসলমানকে কন্যাদান করে না। এই সকল ব্যাপারে শ্রেণী-লক্ষণ (class-character) প্রকট হয়। হিন্দুদেরও সামন্ততান্ত্রিক যুগের প্রারম্ভ হইতে বিবাহাদি ব্যাপারে কড়া নিয়ম উদ্ভূত হয়। এ স্থলে ইহাও লক্ষণীয় যে অন্যান্য দেশের ন্যায় হিন্দু সমাজেও উচ্চ বর্ণ বা শ্রেণীয় স্ত্রীলোকের সহিত নিম্নবর্ণের লোকের বিবাহ হইলে স্ত্রীলোক অধগামী হয়, আবার নিম্ন-শ্রেণীয় স্ত্রীলোকের উচ্চশ্রেণীয় পুরুষের সহিত বিবাহ হইলে স্বামীর শ্রেণী বা বর্ণের মর্য্যাদা অথবা অধিকার প্রাপ্ত হয় না (শূদ্রাণী ব্রাহ্মণের পত্নী হইলে ব্রাহ্মণী হয় না, বিষ্ণু, ২৬।৪-৫)। এই প্রকারের বিবাহের সন্ততিগণ মিশ্র-বর্ণের বলিয়া ঘৃণিত হয়। হিন্দুর এই অনুলোম ও প্রতিলোম বিবাহ তাহার বৈচিত্র্য নয়। উহা নানাভাবে প্রাচীনকালে পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও ছিল। আজ এই প্রকারের বিবাহ অপ্রচলিত হইয়াছে—কেবল হিমালয়ের সানুদেশাবস্থিত হিন্দুদের সমূহে এখনও অসবর্ণ বিবাহ চলিতেছে।

অসবর্ণ বিবাহের সন্তান

স্মৃতিসমূহ পাঠে এই সংবাদ প্রাপ্ত হওয়া যায় যে দুই প্রকারে অসবর্ণ সন্তান উৎপন্ন হইত। এক্ষণে অনুলোমজাত সন্তানদের অবস্থা কি দাঁড়াইত তাহাই অনুসন্ধানের বস্তু। বৈদিক যুগের পর হইতেই স্মৃতিসমূহ লিখিত হইতে থাকে। বৌধায়নে (খৃঃ পূঃ ৬০০—৩০০ শতক) ব্রাহ্মণ ও শূদ্রের বিবাহের কথা এবং মিশ্রিত জাতির অস্তিত্বের উল্লেখ পাওয়া যায় (১।৪।৭—১২)। গোভিল কিন্তু ইহার বিপক্ষে ছিল (৩।২।৪২), গৌতমে মিশ্রিত জাতির (৪।১৪—১৭) উল্লেখ পাওয়া যায়। গৌতম যবন (গ্রীক্‌) জাতিকে ক্ষত্রিয় পিতা ও শূদ্রাণী-মাতা জাত বলিয়াছেন (৪।১৭)। ইহা হইতে এই সংবাদ

প্রাপ্ত হওয়া যায় যে ম্যাসিডোনীয় আক্রমণ তখন ভারতে হইয়াছে এবং ভারতের উত্তর পশ্চিম প্রান্তে হেলেনিষ্টিক রাজ্যও সংস্থাপিত হইয়াছে। যবনদের উৎপত্তি সম্পর্কে এই মতটি হিন্দু পদ্ধতি অনুযায়ীই গঠিত হইয়াছিল, কারণ পরে অনুলোমজাত সন্তান মাতার বর্ণ প্রাপ্ত হইত। এইজন্যই হয়ত মনু ও পতঞ্জলী গ্রীক্‌ ও শকদের শূদ্র বলিয়া গণ্য করিয়াছিলেন। গৌতমে অনুলোম বিবাহে "অনন্তর" পুত্রদের "সবর্ণ" বলা হইয়াছে (৪।৯)। কৌটিল্যেও এই সূত্রানুসন্ধান প্রাপ্ত হওয়া যায়: "ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়য়োরনন্তরাপুত্রা সবর্ণা একান্তরা অসবর্ণাঃ" অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের 'অনন্তর' পুত্রেরা (ঠিক পরের বর্ণের মাতাজাত পুত্র) সবর্ণ কিন্তু 'একান্তর' পুত্রেরা (দুইবর্ণ নিম্নস্থানীয় মাতাজাত পুত্র) 'অসবর্ণ' (৬০ প্রকরণ—পুত্র বিভাগ, Bk. III, Chap. VII, p. 164)।

মানবধর্মশাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে একবর্ণের পিতামাতার সন্ততিগণ 'সবর্ণ' হইবে (১০।৫)। যদি একজন দ্বিজ ঠিক তাহার নিম্নবর্ণের কন্যা বিবাহ করে, তাহা হইলে সেই সন্ততিগণ পিতার সমান হইবে, কিন্তু মাতৃদোষের জন্য নিন্দনীয় হইবে (১০।৬)। পুনঃ পরাশর (১০০—৫০০ খৃঃ) বলেন; ব্রাহ্মণের ঔরসে শূদ্রাণীর গর্ভে জাত পুত্র, যে অন্য ব্রাহ্মণ দ্বারা ব্রাহ্মণ্য সংস্কার প্রাপ্ত হইয়াছে তাহাকে "দাস" বলা হয় এবং সংস্কার-বঞ্চিত পুত্রকে "নাপিত" বলা হয়।

পরাশরের এই মতের মধ্যে এই তথ্যই নিহিত দেখা যায় যে ব্রাহ্মণের শূদ্রাণী গর্ভজাত সন্তান ব্রাহ্মণ্য সংস্কার প্রাপ্ত হইত, যদিচ সে "দাস" নাম প্রাপ্ত হইত। কিন্তু গৌতম বলিতেছেন (৪) উচ্চবর্ণের পুরুষ নিম্নবর্ণের রমণীকে বিবাহ করিলে সেই বিবাহজাত পুত্র পাঁচ কিম্বা সাত পুরুষ পর্য্যন্ত তাহার বর্ণ শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রাখে (মনুও এই প্রকারের কথা বলিয়াছেন,—১০।৬৪—৬৫)। এখানে "ক্ষেত্র হইতে বীজ শ্রেষ্ঠ" রূপ এই প্রাচীন হিন্দুমতই প্রতিধ্বনিত হইতে দেখা যায়; আরও দেখা যায়, এবম্প্রকারের সন্তান পিতার বর্ণজনিত অধিকার ভোগের দাবী রাখিত। এইক্ষেত্রে প্রাচীন স্মৃতি ঔশনস ধর্ম্মসূত্রের মত লক্ষণীয়। ইহাতে বলা হইয়াছে, "ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় কিম্বা বৈশ্যের তৎপরবর্ত্তী বর্ণের স্ত্রীলোকের গর্ভজাত সন্তান পিতার বর্ণ প্রাপ্ত হয়

(ব্রাহ্মণেন ক্ষত্রিয়ায়াং জাতো ব্রাহ্মণ এব সঃ—Chap. III, folio, 3a) (৭)। এই স্থলে 'অনন্তর' পুত্রকে সবর্ণ বলা হইয়াছে (এই শ্লোক ৺পঞ্চানন তর্করত্ন কর্তৃক সম্পাদিত গ্রন্থে নাই)।

এই সকল তথ্যাদি হইতে ইহা বোধগম্য হয় যে, বেদের পরবর্ত্তী যুগে বর্ণ সঙ্কর সন্তান পিতার বর্ণ প্রাপ্ত হইত।

অতঃপর মনু বলিতেছেন দ্বিজদের স্বয়পুত্র, অর্থাৎ সবর্ণ পুত্রেরা এবং 'অনন্তর' পুত্রেরা দ্বিজদের কর্ত্তব্য প্রাপ্ত হয়; কিন্তু আইন ভঙ্গ করিয়া যে সব পুত্রের উৎপত্তি হইয়াছে তাহারা শূদ্রের কর্ত্তব্য প্রাপ্ত হয় (১০।৪১)। ইহা হইতে বুঝা যায় যে দ্বিজবর্ণ সমূহের অনুলোম বিবাহ-জাত সন্তানেরা দ্বিজত্ব প্রাপ্ত হইত; অন্যপক্ষে প্রতিলোম বিবাহজাত পুত্রেরা শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইত।

ইহার পরের যুগে শঙ্খ বলিতেছেন, ব্রাহ্মণের ক্ষত্রিয়াণীর গর্ভজাত সন্তান মাতার বর্ণ প্রাপ্ত হয় (ব্রাহ্মণেন ক্ষত্রিয়ায়ামুৎপন্নো ক্ষত্রিয় এব ভবতি) *। এতদ্বারা অনন্তর পুত্রদের মাতার বর্ণে অবনমিত করা হইল (এই শ্লোক ৺পঞ্চানন তর্করত্ন দ্বারা সম্পাদিত পুস্তকে নাই)। †

এই বিবর্ত্তনে দেখা যায় যে, প্রথমে বর্ণ সঙ্করেরা পিতার বর্ণ অথবা শ্রেণী প্রাপ্ত হইত; তৎপর তাহারা মাঝামাঝি পদের লোক (অনন্তর) বলিয়া গণ্য হইত; অবশেষে তাহাদিগকে মাতার জাতিতে ফেলা হইল। পক্ষান্তরে প্রতিলোম বিবাহজাত সন্তানদের 'অসৎ' ও 'ঘৃণ্য' বলিয়া বিবেচনা করা হইত।

মুসলমান আক্রমণের প্রাক্কাল পর্য্যন্ত অনুলোম বিবাহের সংবাদ প্রাপ্ত হওয়া যায়। আরব দেশীয় পর্য্যটক ইবন খোরদাদ্‌বে (৯১২ খৃঃ মৃত) উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন যে ব্রাহ্মণেরা ক্ষত্রিয়ের কন্যা গ্রহণ করে কিন্তু তদ্বিপরীত হয় না। এখানে ইহা বিশেষভাবে জিজ্ঞাস্য যে সন্ততিগণ কি পিতার জাতি প্রাপ্ত হইত না?

৭। History of Dharmashastra—Quoted by Kane, p. 112.

*। Sankhya—quoted in Mitakshara on Jagnavalkya, p. 91.

†। Quoted by Kane, p. 79.

অধুনা অনুলোম ও প্রতিলোম বিবাহ প্রথা বন্ধ হইয়া গিয়াছে; কিন্তু শোনা যায় যে হিমালয়স্থিত কোন কোন পার্ব্বত্য অঞ্চলে উক্ত প্রথা এখনও প্রচলিত আছে। এই প্রসঙ্গে ব্রাহ্মণ্য প্রাধান্যের সমূর্ত্তি ভার্গব পরশুরামের জন্ম বৃত্তান্তের প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলা যায়, যে স্মৃতির দাবী সত্য হইলে পরশুরাম কোন জাতির লোক ছিলেন? পরশুরামের মাতা রেণুকা অযোধ্যার রাজকুমারী ছিলেন (মহাভারত—৩, ৯, ৪৮৫৪; ১১৬, ১১০৭২—৩)। তিনি ক্ষত্রিয়ার গর্ভজাত, অতএব বর্ণসঙ্কর ছিলেন এবং ক্ষত্রিয় বৃত্তিধারী অর্থাৎ যোদ্ধা ছিলেন। তাঁহার এবম্প্রকারের জন্মেতিহাস সত্ত্বেও ব্রাহ্মণ্য পুস্তক সমূহে তাঁহাকে ব্রাহ্মণের Champion বলিয়া গ্রহণ করা হয় কি প্রকারে? এত দ্বারাই প্রমাণিত হয় যে পুরাকালে পিতার শ্রেণী বা বর্ণ দ্বারাই লোকের সামাজিক স্থান নিরূপিত হইত।

এই স্থলে ইহাও বক্তব্য যে হিন্দুর নানা প্রকারের জাতিগুলিকে স্মৃতিকারেরা অসবর্ণ বিবাহের ফলস্বরূপ বলিয়াছেন। তাঁহারা কল্পিত চতুর্ব্বর্ণ সমাজ-মধ্যে সমূর্ত্ত দেখিবার জন্য অনুসন্ধান করিতেন। কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে অসংখ্য পেষাগত জাতি বিদ্যমান দেখিতে পান। এই সব জাতির যে পেষাগত উৎপত্তি তাহা তাঁহারা ধরেন নাই বা ধরিতে পাবেন্ নাই। তথাপি মনু বলিতেছেন, এই সব বর্ণসঙ্কর জাতিগুলি তাহাদেব বৃত্তি (occupation) দ্বারা পরিচিত (১০।৪০)। অর্থাৎ, চতুর্ব্বর্ণ পদ্ধতিই সমাজের একমাত্র পদ্ধতি; তাহার পরিবর্ত্তে বিবিধ পেষানুসরণকারী জাতিসমূহ দেখিয়া তাঁহারা ধরিয়া নিলেন যে ইহারা চতুর্ব্বর্ণ্য-ভাঙ্গা মিশ্রিত লোকদের দ্বারা সংগঠিত হইয়াছে। কিন্তু এই যুক্তি জাতিতাত্ত্বিক ও সমাজতাত্ত্বিক বিচারসহ নহে। এবং আবিষ্কৃত খোদিত লিপিসমূহে অন্য তথ্য প্রাপ্ত হওয়া যায়, কারণ এইগুলিকে তাহারা 'শ্রেণী' (guild) বলিতেছে।

বর্ত্তমান যুগেও পেষানুসারী জাতি সৃষ্টি হইতে দেখিতে পাওয়া যায়। কেবল কতকগুলি বর্ণসঙ্কর লোক নিয়া একটা জাতি (caste) অথবা সহস্র সহস্র জাতি সৃষ্ট হইতে পারে না। তবে অনেক মধ্যযুগের ও নবোদ্ভূত জাতিরা নিজেদের উৎপত্তির আভিজাত্য দাবী করিবার জন্য সংস্কৃত ধর্ম্মপুস্তক সমূহের এই সকল নাম হইতে নিজেদের নামকরণ করিতেছেন এবং তজ্জন্য স্মৃতি অনুযায়ী নিজেদেব উৎপত্তি সম্বন্ধে নানাপ্রকার গল্পও জাহির করিতেছেন। আশ্চর্য্যের কথা এই, বিভিন্ন সংস্কৃত পুস্তকে একই জাতির বিভিন্ন উৎপত্তি বর্ণিত হইয়াছে।

(ক্রমশঃ)

ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত

মৃতদেহ

মৃত্যুকে ভয় করে না সন্ধ্যা, এমন কি ভূতকেও নয়, কিন্তু মৃতদেহকে তার ভয়। মৃতদেহের কথা ভাবলেই সমস্ত শরীর তার সিরসির করে। পায়ের আঙুলের ডগা থেকে ভয়ের সাপ সিরসির করে দেহ বেয়ে উঠে, মুখ খড়ি হয়ে যায়, হাত-পা হিম হয়ে আসে। যেন হঠাৎ জ্বর হয়। সে-জ্বর তাকে টেনে আনে আতঙ্কের হিমশীতল গুহায়, যেখানে না-আলো না-অন্ধকার। সূর্য যেখানে পৌঁছায় না। ভয়ের অশরীরী ছায়ারা ঘুরে বেড়ায়: না-মৃত্যু না-জীবন সেখানে। কেন তার মৃতদেহকে এত ভয়?—বিকেলের পড়ন্ত রোদে খোলা জানলার সামনে প্রসাধনের সময় অনেকবার সে সহজ হয়ে ভাবতে চেষ্টা করেছে, কিংবা অমুরূপের পাশে শুয়ে রাত্রির পুঞ্জিত অন্ধকারে মনে করেছে। আর যতবারই মনে করেছে ততবারই সেই ভয়। ভয়ে সমস্ত পৃথিবীর রঙ বদলে গেছে, আতঙ্কে গলা শুকিয়ে এসেছে। কাঠ হয়ে সে যায়। তার সমস্ত শরীর থেকে কে যেন রক্ত শুষে নেয়: হাত নাড়াতে পারে না, ঘাড় ফেরাতে পারে না, পাশ ফেরাতে পারে না। মনে হয় পেছনে যেন একটি মৃতদেহ দাঁড়িয়ে আছে, পাশে যেন শুয়ে একটি মৃতদেহ: চোখ আধ-বোজা আধখোলা, মুখ ফ্যাকাশে শাদা, ঠোঁট ঈষৎ ফাঁক, তুষারশীতল দেহ। সেই তুষার যেন খড়েগর মতো, স্পর্শ করলেই সন্ধ্যা দ্বিখণ্ডিত হয়ে যাবে। সে-ও একটি মৃতদেহে পরিণত হবে: চোখ আধবোজা আধখোলা, মুখ ফ্যাকাশে শাদা।

সন্ধ্যা অনুভব করেছে সেই মৃত চোখের স্থির দৃষ্টি শুধু যেন তার উপরেই। সে-দৃষ্টি থেকে উদ্ধার নেই এ-ঘর থেকে ও-ঘরে পালিয়ে, এ পৃথিবী থেকে অন্য পৃথিবীতে চলে গিয়ে। সেই স্থির মৃত দৃষ্টি তার বুকের ভেতর প্রবেশ করে, হৃৎপিণ্ডকে মুঠো করে ধরে।···সমস্ত গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে, অজস্র সাপের আলিঙ্গন তার সর্বাঙ্গে। সে কথা কইতে পারে না, চুল বাঁধা বন্ধ হয়ে যায়। কতবার সে ভেবেছে যদি চেঁচিয়ে উঠতে পারতো, যদি পারতো একটু নড়তে তা হলে এই মৃতদেহের সম্মোহন থেকে বুঝি বা সে মুক্ত হোতো। কিন্তু সে শক্তি তার কোথায়, হে ঈশ্বর সে-শক্তি কোথায়? আমাকে শক্তি দাও,

আমাকে মুক্তি দাও—কতবার সে প্রার্থনা করেছে। আর যতবারই মনে মনে এই অনুচ্চারিত প্রার্থনা বেজে উঠেছে ততবারই মনে হয়েছে একটি অদৃশ্য মৃত দেহ তার দিকে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে। প্রার্থনা করতে তার ভয় হয়। তার আর ঈশ্বরের মাঝে একটি মৃতদেহের ব্যবধান।

"ওগো শুনচো," মাঝে-মাঝে তন্দ্রাচ্ছন্ন অনুরূপকে আঙুল দিয়ে ছুঁয়ে সে বলে, "আমার ভয় করছে।"

প্রথম-প্রথম অনুরূপ তাকে আদর করতো, চুলের ওপর হাত বুলিয়ে বলতো, "ছিঃ, ভয় কিসের?" কিন্তু আজকাল আর এই স্ত্রী-সুলভ ন্যাকামি (কারণ অনুরূপ তাই মনে করে) ভালো লাগে না। সমস্ত দিনের খাটুনির পর সে ঘুমুতে চায়। আজকাল তাই একরকম ধমক দিয়েই বলে, "পাগলামো কোরো না, ঘুমোও।"

সন্ধ্যার কান্না পায়। দাঁতে দাঁত দিয়ে চুপ করে থাকে। অনুরূপ ঘুমোয়। রাত্রি গভীর হয়, পুঞ্জিত অন্ধকারে নিস্তব্ধ বাড়ি। আর এক সময় হঠাৎ তার মনে হয়, কী মনে হয় সন্ধ্যা স্পষ্ট জানে না, তবে স্পষ্ট অনুভব করে একটি মৃতদেহেব স্থির দৃষ্টি তাকে যেন বিঁধছে। আতঙ্কের সাপ সিরসিরিয়ে তার বুকে এসে ঠেকে। সন্ধ্যা যেন পাথর হয়ে যায়। প্রাণপণে সে বলতে চেষ্টা করে না-না, প্রাণপণে সে চেষ্টা করে একটু পাশ ফিরতে, একটু আঙুল নাড়াতে, অনুরূপকে জড়িয়ে ধরতে। কিন্তু সে পারে না। তার চোখ তখন আধবোজা আধখোলা, মুখ ফ্যাকাশে শাদা, নিঃশ্বেস পড়ছে কি পড়ছে না নিজেই বুঝতে পারে না। মনে হয় শরীরটাই বুঝি তার নয়, মনে হয় নিজের শরীরটাই একটা মৃতদেহ।

অথচ সন্ধ্যা জন্ম-ভীতু নয়। তার দেহের আর মনের স্বাস্থ্য আশ্চর্য ছিলো। সতের বছর পর্যন্ত তার দেহ কেহ স্পর্শ করে নি, মনও না। না-অসুখ, না-মানুষ, না-ভূত। তার সতেরো বছরের আশ্চর্য দেহকে প্রথম ছুঁয়েছিলো বিজন। সেই স্পর্শের বিদ্যুতে সে নতুন করে জন্ম নিলো। গাছ যেমন মাটি থেকে রস শুষে খুসিতে সিরসির করে সন্ধ্যাও সে-রকম সিরসির করে উঠে-ছিলো। সে অনুরূপকে ভালোবেসেছিলো, স্পর্শ করেছিলো তার সতেরো বছরের আবছা-রঙীন মন দিয়ে।

অনুরূপের খাকি শার্ট আর শর্ট হাওয়ায় মেলে দিয়ে সন্ধ্যা ফিরে এলো। তখন রাত প্রায় সাড়ে-এগারটা। বললো তাই বলে তুমি যেন দেরি করে ফিরো না।"

"আমি কি আর ইচ্ছা করে দেরি করি মণি ?" অনেকদিন অনুরূপ এত মিষ্টি করে কথা বলে নি। "কী খাটুনি যে পড়েছে যদি জানতে। তা ছাড়া বাঁকুড়া থেকে ফেরার এর আগে তো কোনো গাড়ি নেই। এ-রকম দেরি হবেই।"

খেতে-খেতে অনুরূপ আরো অনেক কথা বললো। "খুব সাবধানে থাকবে। একেবারেই দৌড়-ঝাঁপ করবে না। সময়মতো খাবে, সময়মতো ঘুমোবে—বুঝেছো ?"

সন্ধ্যা ঘাড় নাড়্‌লো ; একটু লজ্জাও পেলো।

"তোমার জন্যে ভালো ভালো গল্পের বই আনিয়ে দোবো। যখন থাক্‌বো না তখন পোড়ো। মন সব সময় ভালো রাখ্‌বে ; বুঝ্‌লে ?"

"বুঝেছি বুঝেছি", হেসে ফেল্‌লো সন্ধ্যা, "একেবারে গিন্নিদের মতো কথা বল্‌তে শিখ্‌লে কী করে ?—আর একটু ভাত এনে দি ?"

অনুরূপও হাস্‌লো। সন্ধ্যার কথার উত্তর না দিয়ে বল্‌লো, "ভালো কথা। এ-সময়ে তো মেয়েরা আচার খেতে খুব ভালোবাসে। এ-পোড়া জায়গায় তো আবার আচার পাওয়া যায় না। কাল বুকিং ক্লার্ক কল্‌কাতায় যাবে। বড়বাজার থেকে তোমার জন্যে আচার আন্‌তে বলে দোবো। কিসের আচার ভালোবাসো বল তো ? পাহাড়ী মোটা মোটা লঙ্কার, না কাঁচা আমের, না কুলের ?"

"সত্যি, ভীষণ ফাজিল হয়েছো তো ?"

"বাঃ, ফাজ্‌লামির কী আছে ? মাটির হাঁড়ি কি খুরির কথা তো বল্‌ছি না।"

"বাস্তবিক, তোমার মেয়ে হয়ে জন্মানো উচিত ছিলো। কিছু জান্‌তে আর বাকী নেই।"

"জানা তো আর খুব আশ্চর্য কিছু নয়। কতবার দেখেছি আমাদের বাড়িতে নতুন ছেলেপুলে জন্মাবার আগে মেয়েরা আস্ত আস্ত জালাই চিবিয়ে মেরে দিয়েছে।"

"সত্যি ভারি অসভ্য হয়েছো।"

অন্য অন্য দিন বিছানায় শুয়েই অনুরূপ ঘুমিয়ে পড়ে। সমস্ত দিনের হাড়ভাঙা খাটুনির পর পাশ ফেরবার অবসর পায় না। পাছে বিরক্ত হয় এই ভয়ে সন্ধ্যাও আজকাল রাত্রে তাকে কোনো কথা বল্‌তো না। আজ কিন্তু অনুরূপ ঘুমুলো না। অনেক দিন পরে সন্ধ্যাকে অনেক আদর করলো। চোখ বুজে পড়ে রইলো সন্ধ্যা। আর মনে মনে আশ্চর্য হয়ে ভাব্‌লো; সব পুরুষই কি একই ভাবে আদর করে? বিজনও তো কতদিন তাকে এই ভাবে আদর করেছে।

আর সেই মুহূর্তে ভয় পেলো সন্ধ্যা, সেই অদ্ভুত সিরসিরে ভয়। বিজনকে সে ভুল্‌তে চেষ্টা করেছে কত ভাবে। ভাব্‌বো না ভাব্‌বো না তার কথা, উচ্চারণ করবো না তার নাম, মনে মনেও না—দাঁতে দাঁত ঘষে মনে মনে সন্ধ্যা বলেছে। কিন্তু এতোদিন পারেনি, আজও পারলো না। একটি মানুষকে একেবারে ভুলে যাওয়া, নিজের অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ থেকে মুছে ফেলা কি সহজ কথা? অনুরূপের বুকের কাছে ছোট্ট হয়ে শুয়ে সন্ধ্যা ভাব্‌লো যদি বিজন বেঁচে থাক্‌তো আজ তা হলে তারই বুকে সে থাক্‌তো শুয়ে, যে-শিশু অদৃশ্য জ্রূণে তার দেহের রক্ত শুষে পুষ্ট হচ্ছে তার পিতা তো বিজনই হোতো আজ। হে ভগবান, বিজনকে ভোলার শক্তি দাও—নিজের গায়ে নোখ বিঁধিয়ে মনে-মনে সন্ধ্যা বল্‌লো। আর সে-শক্তি যদি না দাও তা হলে অন্তত জীবন্ত বিজনকে ভাববার ক্ষমতা দাও।......কেন আমি বিজনকে ভাবতে পারি না, যে বেঁচেছিলো একদিন, হেসেছিলো একদিন, ভালোবেসেছিলো একদিন? তার কথা মনে হলেই কেন আমার শরীর হিম হয়ে আসে। কেন তাকে দেখ্‌তে পাই: খড়ির মতো চামড়া, চোখ আধবোজা আধখোলা, ঠোঁট দুটো ঈষৎ ফাঁক? আমার মনে কেন সে মৃত হয়েই রইলো?

সেই রাত্রে সন্ধ্যা একটি দুঃস্বপ্ন দেখ্‌লো। একটা মস্ত শাদা ঘরের চৌকাঠে সে দাঁড়িয়ে আছে। ঘরে আর কেউ নেই। দূরে একটা খাট। প্রথমে মনে হয় না কেউ সেখানে আছে। কিন্তু পরের মুহূর্তেই নিজের ভুল সন্ধ্যা বুঝতে পারলো। খাটে বিজন শুয়ে। একটা হাত ঝুলে পড়েছে, আর একটা হাত বুকে, রক্তশূন্য মুখ, চোখ দুটো সামান্য খোলা। বিজন

কী করে বিজনকে সে ভালোবেসেছিলো, কী করে তাদের প্রথম আলাপ সে কথা না জানলেও চলে। তারা ভেবেছিলো বিয়ে তাদের হবেই। দিনের পর রাত্রি যে-রকম সহজে আসে, তাদের পরিচয় ও প্রেমের পর সেই অকুণ্ঠিত বাসর-রাত্রি যে তেমনি সহজেই আসবে এ-বিষয়ে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ ছিলো না। কিন্তু তিন দিনের জ্বরে বিজন হঠাৎ মারা গেল। কী যে তার হয়েছিলো তা নিয়ে আজও ডাক্তারমহলে মতভেদ আছে। কিন্তু একটি সতেরো বছরের মেয়ের কাছে তার কোনো মানে নেই। সে শুধু একটি চরম সত্য উপলব্ধি করলো : বিজন মৃত।

বিজনের আত্মীয়-আত্মীয়ারা তখন ভিড় করে কাঁদছে। ঘরে কে যে আসছে কেউ তার হিসেব রাখে নি। তাই সন্ধ্যা যখন দরজা ঠেলে ভেতরে এসেছিলো আর মৃত বিজনকে দেখে হঠাৎ চমকে শাদা দেয়াল ধরে চোখ বুজে খানিক দাঁড়িয়েছিলো কেউ তাকে লক্ষ্যই করে নি। যখন আবার সন্ধ্যা চাইলো তার মনে হলো বুঝি একটা যুগ কেটে গেছে, ঝড় আর বিদ্যুৎ আর বজ্র-ভরা কালো একটা যুগ। কিন্তু এক মিনিটও সে দেয়াল ধরে দাঁড়িয়ে থাকে নি। এক মিনিটেরও কম। কিন্তু তার জীবনে সেইটেই সবচেয়ে মারাত্মক একটি মিনিট। তার কাণে ঝিঁ ঝিঁ ডাকতে লাগলো, গলার কাছটা আঠার মত শুকিয়ে এলো, হঠাৎ গা ঝিম ঝিম করে উঠলো আর হাত-পায়ের আঙুলগুলো ঠাণ্ডা হয়ে এলো। কেনো হোলো সে জানে না। এমন নয় ঠিক সেই একটি মিনিটে বিজনের জন্যে তার খুব দুঃখ হয়েছিলো। কারণ আসলে সেই মুহূর্তে সত্যিই সে কিছু ভাবে নি। ঘরে যাবার আগেই সে তো স্পষ্ট জানতো বিজন নেই তার মৃতদেহ শুধু আছে। তবু কে জানতো বিজন ও-রকম করে শুয়ে থাকবে: চোখ আধবোজা আধাখোলা, ঠোঁট ঈষৎ ফাঁক, সমস্ত শরীর খড়ির মতো সাদা! এই কি সেই বিজন যে তার ঠোঁটে একদিন আগুন জ্বালিয়েছিলো, তাকে স্পর্শ করেছিলো? কী আশ্চর্য বিজন সেদিন বেঁচেছিলো, আরো কী আশ্চর্য বিজন আজ মরে গেছে! তার মুখের হাঁ যেমন আছে সেই রকমই থাকবে, চোখ দুটো বুজবেও না খুলবেও না। তার খড়ির মতো চামড়ার তলা দিয়ে কোনো দিন আর রক্ত বইবে না, জীবনের তাজা উষ্ণ রক্ত!—বিজন তখন আর বিজন ছিলো না সন্ধ্যার কাছে। সে দেখলো সামনের শাদা

বিছানায় একটি দীর্ঘ মৃতদেহ পড়ে রয়েছে। সে ভাবলো একদিন সেই মৃত-দেহই তাকে স্পর্শ করেছিলো, আলিঙ্গন করেছিলো, চুম্বন করেছিলো। সেই মুহূর্তে সমস্ত শরীরে একটি মৃতদেহের আলিঙ্গন সন্ধ্যা অনুভব করলো আর সমস্ত শরীর তার সিরসিরিয়ে উঠলো।

অথচ তার এই অদ্ভুত অসুখের কথা কাউকে সে বলতে পারলো না। তাই বিজনের মৃত্যুর এগার মাস পরে অমুরূপের সঙ্গে যখন তার বিয়ে হলো মনে মনে অমুরূপকে কৃতজ্ঞতা না জানিয়ে সে পারলো না। রাত্রির নিঃসঙ্গতা তাকে প্রায় পাগল করে তুলেছিলো। বিয়ের পর পাশেই একটি জীবন্ত লোকের উপস্থিতি তাকে অনেকটা সাহস দিতো।

বিয়ের কয়েক মাস পরেই রেলের চাকরি নিয়ে অমুরূপকে আসতে হলো খড়্গপুরে। সন্ধ্যাও এলো। ছোটো বাংলো পেলো অমুরূপ, সন্ধ্যার কাছে সব সময় থাকবার জন্যে একটা বুড়ি ঝি রাখলো। বেলে ঘোরার তার চাকুরি, ভোরে বেরিয়ে যেতে হয়, ফিরতে প্রায়ই রাত এগারোটা বারোটা বাজে। এক এক দিন দূর ষ্টেসনের কাজ শেষ করতে না পারলে সেইখানেই থেকে যেতে হয়। যে-সব রাতে অমুরূপকে বাইরে থাকতে হয় সেই রাতগুলো সন্ধ্যার কাছে রীতিমতো বিভীষিকা। যতক্ষণ পারে বুড়ি ঝি'র সঙ্গে সে গল্প করে। সে ঘুমিয়ে পড়লে মৃতদেহের বিভীষিকা নিয়ে সন্ধ্যা বিছানায় পড়ে থাকে।

কতবার তার মনে হয়েছে এর চেয়ে সত্যিই কোনো ভূত তার ঘরে এলে বুঝি ভালো লাগতো। কারণ ভূতকে তার ভয় নেই, মৃত্যুকেও না, ভয় মৃতদেহকে : আধবোজা আধখোলা চোখের স্থির দৃষ্টিকে।

নিজের নিঃসঙ্গতাকে নিয়ে সন্ধ্যা যখন প্রায় পাগল হবার উপক্রম করছে এমন সময় একদিন ভাবী শিশুর খবর পাওয়া গেল। নিজের সৌভাগ্যকে বিশ্বাস করতেই সন্ধ্যার ভয় হলো। বিয়ের পর অমুরূপের কাছে যে-রকম কৃতজ্ঞ হয়েছিলো নিজের অজাত শিশুর কাছে সেই রকম কৃতজ্ঞই সন্ধ্যা হলো। সে ভাবলো : এতোদিনে ঈশ্বর বুঝি আমার প্রার্থনা শুনতে পেয়েছেন।

খবর শুনে অমুরূপও খুব খুসি। হেসে বললো, "কেবল বল একলা লাগছে। কেমন, এবার তো আর একলা লাগবে না?"

নড়ছে না, নিঃশ্বেস ফেল্‌ছে না, কথা বলছে না। সেই সামান্ত খোলা চোখ দিয়ে সে যেন সন্ধ্যার দিকে চেয়ে আছে। অদ্ভুত ঠাণ্ডা চাউনি সন্ধ্যাকে স্পর্শ করছে, সমস্ত দেহকে করে ফেলছে অবশ। বিজন কথা বলছে না, কিন্তু সেই ভয়ঙ্কর ঠাণ্ডা চাউনি যেন তার বুকের মধ্যে বরফ হয়ে কথা বল্‌ছে! কী বল্‌ছে স্পষ্ট বোঝা যায় না। শুধু যেন ডাক্‌ছে, নির্মমভাবে ডাক্‌ছে। সন্ধ্যা প্রাণপণে দেয়াল আঁকড়ে ধর্‌তে চেষ্টা করছে, চোখ বন্ধ কর্‌তে চাইছে, পালাতে চাইছে—কিন্তু পার্‌ছে না। মৃত বিজনের মৃত দৃষ্টি এমন তাকে টান্‌ছে। ভীষণ আতঙ্কে তার গলা শুকিয়ে যাচ্ছে, সর্বাঙ্গ হিম হয়ে আস্‌ছে—তবু নির্মম সেই দৃষ্টি।

এমন সময় তার ঘুম ভাঙ্গলো। জান্‌লা দিয়ে ভোরের পাণ্ডুর আলো অস্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। তার পাশে অমুরূপ বসে। ঘামে সর্বাঙ্গ ভিজে গেছে সন্ধ্যার, একটা হাত দিয়ে প্রাণপণে চেপে রয়েছে অমুরূপের কাপড়।

সে শুনলো অমুরূপ বলছে, "ও-রকম কর্‌ছো কেন? ভয় নেই, কিছু ভয় নেই। এই ছাখো আমি রয়েছি।"

আস্তে আস্তে হাতের মুঠো খুলে সন্ধ্যা বস্‌লো। ঢক্ ঢক্ করে এক গেলাস জল খেয়ে খানিকটা সুস্থ হোলো। কী তেষ্টাই তার পেয়েছিলো। এমনো দুঃস্বপ্ন মানুষে দেখে।

ভাত খেতে বসে অমুরূপ বললো, "এ-সময়ে সত্যিই তোমার একলা থাকা উচিত নয়। তেমন শ্বশুরবাড়ি যে আমার নয়, নইলে সেখানেই পাঠিয়ে দিতুম। এই সময় মেয়েরা তো বাপের বাড়িতেই থাকে। কিন্তু···যাক্, কী আর করা যাবে।"

সন্ধ্যার নিজের মা নেই। সৎমার সংসারে আবর্জনার মতো এক কোনে বড় হয়েছে।

ডিউটিতে যাবার সময় অমুরূপ আবার বল্‌লো, "দেখি, দিদি যদি এখানে কটা মাস কাটিয়ে যায়। যতদিন না দিদি আসে ততদিন বরঞ্চ ঝি-টাকেই সব সময়ে এখানে থাক্‌তে বোলো। দু'টাকা মাইনে বাড়িয়ে দাও। দিনের বেলায় ওকে আর নিজের বাড়ি যেতে দিয়ো না। দু'টাকায় রাজি না হলে আরো কিছু বাড়িয়ে দিয়ো, বুঝ্‌লে?"

সাড়ে তিন টাকার কমে বুড়ি কিন্তু রাজি হোলো না। নিজের জন্যে খরচ করতে সন্ধ্যা লজ্জা পায় কিন্তু এই বাড়তি খরচ তাকে মেনে নিতেই হোলো। তা' ছাড়া বুড়ি এদিকে লোক ভালো। মাইনে বাড়ার এবং ভবিষ্যতে আরো কিছু পাবার আশায় যে খুব যত্ন করতে লাগ্‌লো। বাড়িতেই সে কাঁচের জারে আচার তৈরি করে রোদে দেয়, নানা আজেবাজে গল্প করে সন্ধ্যাকে ভুলিয়ে রাখে। তাই সাংসারিক নানা গোলমালে অনুরূপের দিদির আসতে দেরি হলেও সন্ধ্যার সময় মন্দ কাটছিলো না। তা' ছাড়া ভুলে থাকবার মতো এক গলা কাজ সে পেয়েছে।

নানা ছিটের টুক্‌রো অনুরূপ প্রায় প্রত্যহই নিয়ে আসে আর হেসে বলে, "তোমার ছেলের জন্যে নিয়ে এলুম গো…"

সন্ধ্যা খুসি হয়েই বাধা দেয়, "ছেলে কি একলা আমার? তা ছাড়া পাগলের মতো এতো ছিট আনছো কেনো? সে কি চিরকালই ছোটো থাকবে আর এই সব লাল-নীল জামা পরবে?"

কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি জামা তৈরি করে সন্ধ্যার নিজেরি সখ মেটে না। একটা সেলাইয়ের কল থাকলে খুব সুবিধে হোতো। কিন্তু এই লড়াইয়ের বাজারে কল কেনবার কথা তো আর ভাবা যায় না। ছুঁচে সুতো পরিয়ে তাই সে যতটা পারে হাতে-হাতেই জামা সেলাই করে। বুড়ি ঝি সমস্ত দুপুর তার পাশে বসে রঙীন পাড়ের এক দিক পায়ের আঙুলে জড়িয়ে অন্য দিক হাতে টান করে ধরে সুতো তুলে গুলি পাকিয়ে রাখে। জামা তৈরির পর কাঁথা সেলাই হবে। অনেক ছেঁড়া কাপড় জমিয়েছে সন্ধ্যা কাঁথার জন্যে। স্বাভাবিক অবস্থায় যে-শাড়ি সে অনায়াসে আরো দু-চার ধোপ চালিয়ে দিতো আজকাল সেগুলোকে ছেঁড়া কাপড়ের ঝাঁপিতে বন্ধ করে রাখে। অনুরূপকে বারবার অনুযোগ জানায়, "আজকাল তোমার এতো কম কাপড় ছেঁড়ে কেন বল তো? এ-রকম করলে খোকোন শোবে কিসে?"

অনুরূপ হেসে বলে, "ভেবো না। তোমার ছেলের জন্যে নতুন তোয়ালে কিনে দেবো।"

"ফের বলছো আমার ছেলে!" সন্ধ্যা মিথ্যা রাগ দেখাবার চেষ্টা করে হেসে ফেলে।

যত দিন যেতে লাগলো একটা নতুন স্বাদে ততই সন্ধ্যা ভরে উঠতে লাগলো। এ-রকম তো আগে কখনই তার মনে হয় নি: একটি নতুন জীবনের স্বাদ। প্রেমে সে পড়েছিলো, সে ভালবেসেছিলো প্রথম যৌবনে। তখনো তার সমস্ত দেহ টলমল করে উঠেছিলো। নিজেকে নিয়ে কী যে সে করবে ভেবে পায় নি। এখনো সে টলমল করে উঠেছে। কিন্তু উচ্ছ্বাস নয়, পরিপূর্ণতায়। সে নতুন হয়ে উঠছে প্রত্যহ। অদ্ভুত গর্বে সে যেন ফুলে ফুলে উঠছে। প্রথম প্রেম যেন ঝড়: ছিঁড়ে ফেলবে উড়িয়ে নিয়ে যাবে। প্রথম মাতৃত্ব যেন ঝড়ের পরের শান্ত আকাশ: মেঘে মাজা, নীল। নিজের মধ্যে সবচেয়ে আশ্চর্য। সৃষ্টির ঘটনা ঘটছে ভাবতেই তার রোমাঞ্চ হয়। একটি নতুন জীবন তার দেহ থেকে সৃষ্টি হচ্ছে তিল তিল করে, প্রতি মুহূর্তে। সে যখন ঘুমিয়ে থাকে, যখন জেগে থাকে, যখন ভবিষ্যৎ সন্তানের কথা ভাবে, যখন ভাবে না—সব সময়েই সেই আশ্চর্য সৃষ্টির কারুকার্য এগিয়ে চলেছে।

সন্ধ্যা আবিষ্কার করলো গাছের সঙ্গে মেয়েদের অদ্ভুত মিল আছে। যে-গাছ ফল দেয় না, সে-গাছ সখের হতে পারে, কিন্তু তার দাম নেই, প্রয়োজন নেই। যে-মেয়ে মাতৃত্বের আভায় ঝলমল করে ওঠে না সে মেয়েও সখের হতে পারে কিন্তু সত্যিই তার দাম নেই, প্রয়োজন নেই, অনর্থক। অনুরূপের পরিবর্তন দেখেই এই কথা সন্ধ্যার মনে এলো। বিয়ের পর প্রথম কয়েক মাস অনুরূপ তাকে খুব আদর-যত্ন করেছিলো, সত্যি। সে তো সব স্বামীই করে। কিন্তু তার দেহ নিয়ে অনুরূপের সখ মিটে যাবার পরেই সে সাধারণ হয়ে এলো। এতোই-সাধারণ যে অনুরূপ যেন মাঝেমাঝে অবজ্ঞাই করতো। কিন্তু এই মাতৃত্বের সম্ভাবনায় অনুরূপের চোখে আবার সে নতুন হয়ে উঠেছে। আগে ডিউটি থেকে ফিরে বিছানায় শুয়েই অনুরূপ ঘুমিয়ে পড়তো। এখনো আগেকার মতোই ক্লান্ত হয়ে সে ফেরে, কিন্তু ঘুম তার কোথায়? কত রাত পর্যন্ত নানা আবোল-তাবোল কথা বলে সন্ধ্যাকে সে আদর করে। সন্ধ্যার জন্যে ভাবনার তার শেষ নেই। অনুরূপের আবার যেন নেশা ধরেছে: তার দু'বছরের পুরোনো বৌ-এর সঙ্গে আবার যেন নতুন করে সে প্রেমে পড়েছে।

এমনি করে মাস আষ্টেক কাটলো। হাসপাতালের এক ডাক্তারকে অনুরূপ ঠিক করেছে। মাসে বার দুই সে সন্ধ্যাকে পরীক্ষা করে যায়। প্রত্যেকবারই

উদ্বিগ্ন হয়ে অনুরূপ জিগগেস করে, "কী রকম দেখলেন? কোনো কমপ্লিকেশন্‌স্‌ নেই তো।"

সেদিন ডাক্তার হেসে বললো, "পাগল হয়েছেন? কমপ্লিকেশন্‌স্‌ আবার কী? ভারি হেল্‌দি চাইল্ড হবে, মিঃ রায়। আজ তো চমৎকার হার্ট-বিটস্‌ পেলুম।"

পাশের ঘর থেকে সন্ধ্যা কথাগুলো স্পষ্টই শুনতে পেলো: তার মধ্যে একটি স্পন্দমান নতুন জীবন। এর চেয়ে আশ্চর্য ঘটনা কি পৃথিবীতে আর কখনো ঘটেছে? কার প্রতি জানে না, কিন্তু অপূর্ব এক কৃতজ্ঞতায় সমস্ত মন তার ভরে উঠলো।...আর ভয় নেই, হে ঈশ্বর, আর ভয় নেই। মৃতদেহের আলিঙ্গন থেকে আমাকে তুমি বাঁচিয়েছো। আমার মধ্যে একটি স্পন্দমান জীবন, সাধ্য কী কোনো মৃতদেহের সম্মোহন আমাকে স্পর্শ করে।

বাইরের ঘরে তখনো ডাক্তার আর অনুরূপ গল্প করছিলো। তাদের জন্যে চা আর ডালমুট ট্রেতে সাজিয়ে নিজেই সন্ধ্যা নিয়ে এলো। এতো খুসি সে জীবনে সে হয় নি।

অনুরূপের চেয়ে ডাক্তার কিছু বড়। খুব ফুর্তিবাজ হাসিখুসি লোক। যে-বাড়িতে যায় সে-বাড়িতেই খানিক গল্প না করে ওঠে না।

"মিসেস রায়, আপনি আশ্চর্য। কী করে বুঝলেন চা না খেয়ে উঠবো না?"

ছোটো কেরোসিন কাঠের টেবিলে ট্রে নামিয়ে সন্ধ্যা তৃপ্তির হাসি হাসলো। এতো তৃপ্তি পৃথিবীতে যে আছে তা সে জানতো না। আজকাল তার শরীর নতুন শিশুর ভারে মন্থর। অপরূপ আলস্যে সে ভরে উঠেছে। মধুর আলস্য।

চায়ের পেয়ালা শেষ করে ডাক্তার বললো, "মিঃ রায়কে বলছিলুম ডেলিভারির সময় আপনাকে হাসপাতালে নিয়ে যাবার কথা। আমার মতে সেইটাই সবচেয়ে সেফ জায়গা। আপনার কোনো আপত্তি নেই তো?"

আপত্তি? কোনো কিছুতেই সন্ধ্যার আজকাল আপত্তি নেই।

সেদিন সকালে অনুরূপ ডিউটিতে বেরিয়ে যাবার পর একটা ছোটোখাটো দুর্ঘটনা ঘটলো।

বাড়ির ভেতরে মাঝারি একটি উঠোন আছে। উঠোন পেরিয়ে খিড়্‌কির দরজা। দরজার দু'পাশে কয়েকটা পেঁপে গাছ ও একটি মাধবী লতা।

মাধবীলতার গোড়াটা বেশ মোটা, তার লতানে হাত-পাও অসংখ্য। খিড়্‌কির দরজা ছোঁয়, পাঁচিল বেয়ে এদিকের ঘরগুলোর ওপরেও ছড়িয়ে পড়েছে। অজস্র ফুল তাতে, সাদার ওপর লালের ছিটে দেয়া, কুঁড়িও অনেক। এই ফুল সন্ধ্যার অত্যন্ত প্রিয়। প্রত্যহ সে কুঁড়িতে ফুলে মিশিয়ে বস্‌বার ঘরের ফুলদানিতে সাজিয়ে রাখে। সমস্ত দিন ঘরের বাতাসে একটা আন্‌মনা ফিকে গন্ধ ভেসে থাকে। ছোটো-ছোটো জামা সেলাই করতে করতে সমস্ত ছপুর সন্ধ্যা গুন্‌গুন্ করে, মাঝে মাঝে দাঁতে সুতো কাট্‌বার সময় আড়চোখে ফুলগুলো দেখে। কি যেন ভাবে, নিজের মনেই খুসি হয়ে ওঠে।

অনুরূপ বেরিয়ে যাবার পরেই ভেতরের দালান থেকে হাত বাড়িয়ে সন্ধ্যা একটা ফুলের ডাল টেনে আন্‌তে গেল। পায়ের বুড়ো আঙুল তার দেহের টাল সাম্‌লাতে পার্‌লো না। দালান থেকে হাত দেড়েক নিচু উঠোনে সন্ধ্যা আছ্‌ড়ে পড়্‌লো।

পড়ে গিয়ে যতটা তার লাগ্‌লো তার চেয়ে ভয় পেলো সন্ধ্যা অনেকটা বেশি···একি, একি তার হোলো। বুড়ি ঝি উঠোনের এক পাশে বাসন মাজছিলো। বাসন ফেলে ভিজে অপরিষ্কার হাতেই সন্ধ্যাকে সে তুল্‌লো' বল্‌লো, ছিছি বৌমা; এখন খুব সাবধানে থাক্‌তে হয়। দেখে চল্‌বে, দেখে ওঠানামা কর্‌বে। এ-রকম পড়ে যাওয়া ভালো নয়। অলুক্ষুণে কাণ্ড। —ওঠো, লাগে নি তো?"

অলুক্ষুণে কাণ্ড? কথাগুলো তীরের মতো তার বুকে বিঁধলো। বুড়ির প্রশ্নের কোনো উত্তর না দিয়ে সন্ধ্যা বল্‌লো, "অলুক্ষুণে কেন পাম্নব মা?"

"ওমা, অলুক্ষুণে নয় আবার? পোয়াতি মানুষকে খুব সাবধানে থাক্‌তে হয় বৌমা। কত খারাপ বাতাস আছে, কত খারাপ দিষ্টি আছে। ডাইনেরা তো পেটের ছেলে খাবার জন্য সব সময় ঘুর ঘুর করে বেড়ায়। সন্ধ্যেবেলায় এলোচুলে যদি থেকেচো, ছপুর বেলায় ভিখারির ডাকে একা যদি বেরিয়ে এসেচো তা হলেই সব্বোনাশ। এক নিমিষে তারা খেয়ে ফেল্‌বে।—তোমরা মা সহরের মেয়ে তোমরা তো আর এ-সব মানো না। কিন্তু আমি মানুষটা বুড়ি হলুম, অনেক দেখেছি। আমার চোখের সামনে, জানো বৌমা, পটলিকে ডাইনে ধরেছিলো। ওঝা এসে অনেক ঝাড়ফুঁক করে পট্‌লিকে

বাঁচালো, কিন্তু ন' মাসের মেয়েটা বাঁচ্‌লো না। পেট থেকে মরা মেয়ে বেরুলো।"

বুড়িকে ধরে কোনো রকমে ঘরে এলো সন্ধ্যা। নিজেকে অত্যন্ত অসুস্থ বোধ করলো। বিছানায় শুয়ে বল্‌লো, "কি যেন হোলো পানুর মা। ফুল তুল্‌তে গিয়ে পা দুটো টলে গেল আর পড়ে গেলুম।"

"ও রকমই হয় বৌমা, ও রকমই হয়। আমি একটা মাদুলি দোবো, যতদিন না ছেলেপুলে হয় ততদিন পোবো।" তারপর কপালে হাত ঠেকিয়ে বল্‌লো, "কে জানে কোন্ দেব্‌তা তখন গাছে ছিলো।"

বুড়ির একটা শিরাবহুল লোল হাত চেপে ধরে সন্ধ্যা বল্‌লো, "তুই যাস্‌নি পানুর মা, আমার ভয় করছে।"

বুড়ি এবার সাহস দিয়ে বললো, "না বৌমা, ভয় পেয়ো না। ভয় পেলেই ওরা পেয়ে বস্‌বে।....কিন্তু আমাকে যে বৌমা, একবার বাড়ি যেতেই হবে। মেয়েটা অনেকদিন পর শ্বশুরঘর থেকে ফিরেচে। কোথায় ভাব্‌লাম দুদিন একটু বাড়িতে আমোদ করবে, হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে-বসে থাক্‌বে—সেখানে তো আর বস্‌তে পায় না, খেটে-খেটে হাড় কালি হয়ে গেল—কিন্তু বৌমা, কপালে কি আর সুখ আছে। কথায় বলে ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে। আমার মেয়েটারো হয়েচে তাই। বাড়িতে এসেই কোলের মেয়েটা জ্বরে পড়েচে। কী ভীষণ জ্বর যদি জান্‌তে বৌমা। গায়ে হাত দেয়া যায় না। যেন পুড়ে যাচ্ছে। সমস্ত রাত মেয়ে কোলে ধরে বসেছিলো। আজ আমি যদি মেয়েটাকে একটু না ধরি তা হলে ওর তো নাওয়া-খাওয়া হয় না। তুমি ভেবো না বৌমা, দরজা বন্ধ করে শুয়ে থাকো। কিছু ভয় নেই। আমি যাবো কি আস্‌বো। আর আস্‌বার সময় সেই মাদুলিটা নিয়ে আস্‌বো।"

এই অবস্থায় ঝি-কে ধরে রাখা অত্যন্ত স্বার্থপরের মতো দেখায়। তাই তাকে যেতে দিতে হোলো। ঝি চলে গেলে বাইরের দরজা বন্ধ করে সন্ধ্যা আবার বিছানায় শুয়ে পড়্‌লো। সমস্ত শরীরময় একটা বিশ্রী অস্বস্তি।

সন্ধ্যার মনে কোনো কুসংস্কার নেই। এই নিয়ে অনেকবার সে গর্ব করেছে। কিন্তু শরীরের সঙ্গে মনের সম্বন্ধ খুব নিকট। তাই সুস্থ শরীরে যা সে উড়িয়ে দিতে পার্‌তো অসুস্থ শরীরে আজ তা পারলো না। তা' ছাড়া

ভাবী শিশুর অমঙ্গল আশঙ্কা তাকে আজ কুসংস্কারে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে।

কড়া রোদে বাইরের পৃথিবী ভরা। সকালের পর হঠাৎ যেন এখানে দুপুর হয়। আর দুপুরগুলো কী অদ্ভুত নিস্তব্ধ, যেন খাঁ-খাঁ করে। সন্ধ্যার উঠে বস্‌তে ইচ্ছে করলো। সেলাইয়ের ঝাঁপি সে ছুঁলো না।

বাইরে রোদ আরো কড়া হচ্ছে। বরফওলা পথ দিয়ে হেঁকে গেল। দুপুরের ট্রেনটা কলকাতায় চলে গেল। একটা কাক উঠোনে নেমে মোটা বিশ্রী গলায় ডাক্‌তে লাগ্‌লো ; কা-কা-কা।

আর সেই মুহূর্তে একটা আশঙ্কায় সন্ধ্যা চম্‌কে উঠ্‌লো, আর কথাটা মনে হতেই বিদ্যুৎস্পর্শী মানুষের মতো সে সোজা হয়ে উঠে বস্‌লো : তার ভাবী সন্তানের কিছু হয়নি তো ? সে বেঁচে আছে তো ?

আর সেই মুহূর্তে সেই সিরসিরে ভয় সন্ধ্যার দেহে কাঁটা দিয়ে উঠ্‌লো। তার ভাবী সন্তান নিশ্চয়ই বেঁচে নেই। নিজের নিঃশ্বেস বন্ধ করে সে শুন্‌তে চেষ্টা কর্‌লো শিশুর স্পন্দন। "খোকোন্‌, খোকোন্‌," খুব ফিস্‌ফিস্ করে সন্ধ্যা দু'বার ডাক্‌লো আর অবুঝের মতো আশা কর্‌লো তার সন্তান সাড়া দেবে। আর পরের মুহূর্তে সেই মৃতদেহের ভয়ে সে অসাড় হয়ে গেল। যে মৃতদেহকে তার এতো ভয় নিজের মধ্যেই আজ সেই মৃতদেহ এসেছে।

এতো জোরে বুক ধ্বক্‌-ধ্বক্ করতে লাগলো যে তার মনে হোলো এখুনি সে মরে যাবে। সে উঠে দাঁড়ালো। পা কাঁপছে, তার শরীরের ভার পা দুটো তুলে ধরতে পারছে না। ঘর থেকে বেরিয়ে টলতে টলতে উঠোনে এসে দাঁড়ালো। আঁচল খসে মাটিতে লুটুচ্ছে। কড়া রোদে উঠোনের সিমেণ্ট আগুন হয়ে রয়েছে। বাইরে বাতাস নেই। সেই ঝাঁ-ঝাঁ রোদে মাধবী ফুলের ফিকে গরম গন্ধ। পেঁপে গাছের শুক্‌নো পাতার মধ্যে একটা গিরগিটি খড়খড় করে চলে গেল। তার ওপরের কচি পাতা দিয়ে ফিকে সবুজ আলো বেরুচ্ছে যেন। একটা কাক এসে পাঁচিলে বসলো, মিস্‌কালো রঙ, চোখগুলো রক্তের মত লাল। সন্ধ্যাকে দেখে ভয় পেলো না। সেখান থেকেই কর্কশ গলায় ডাকতে লাগলো।

এই মৃতদেহকে ফেলে কোথায় সন্ধ্যা যাবে। বাড়ি ছেড়ে তার দৌড়তে ইচ্ছে হোলো। কিন্তু সে-শক্তি এখন নেই। দৌড়্‌নো তো দূরের কথা, দরজার

ছিটকি খুলতেও সে পারবে না। কোনো রকমে টল্‌তে টল্‌তে সন্ধ্যা খাটে এসে শুলো। ক্রমশ আলো মিলিয়ে এলো তার চোখ থেকে। কানে ঝিঁঝিঁ ডাকছে, বাইরে ঝাঁ-ঝাঁ রোদ। মাঝে মাঝে একটা কাক মোটা ভাঙা গলায় ডাকছে।

বিছানায় শুয়ে সন্ধ্যা জন্তুর মতো হাঁপাতে লাগলো। আজ তার নিজের শরীরে মৃতদেহ, আজ তার উদ্ধার নেই। পৃথিবীর কোনোখানে এমন একটু জায়গা নেই যেখানে গেলে সে বিপদমুক্ত।

ক্রমশ সে যেন বিছানায় তলিয়ে যেতে লাগলো। চোখ খোলবার সাহস তার নেই। সে স্পষ্ট অনুভব করলো একটি মৃতদেহের মৃত দৃষ্টি তার দেহকে স্পর্শ করছে। তার দেহকে কেটে কেটে সেই দৃষ্টি ক্রমশ যেন ভেতরে আসছে। ঠাণ্ডা হয়ে এলো বুকের ভেতরটা, একটা ঠাণ্ডা মৃত হাত যেন তার হৃৎপিণ্ডকে নিংড়ে নিচ্ছে।

সেই আধজাগা অবস্থায় সন্ধ্যা বুঝতে পারলো তার শিশু আর কেউ নয়, সে বিজন। বিজন এসেছে তার মধ্যে মৃতদেহ হয়ে। বিজন তো একদিন বলেছিলো : তোমায় কখনো ভুলবো না ; যদি কখনো আমাকে ভুলে যাও তা হলেও আমি থাকবো, আমি আসবো, তুমি যদি কোথাও সরে যাও সেখানে গিয়ে তোমাকে মনে করিয়ে দেবো।—ঠিক এই কথাগুলোই বিজন বলেছিলো কিনা সন্ধ্যার মনে নেই, তবে এই ধরণের কথাই যেন সে বলেছিলো।

সেই অবস্থায় সন্ধ্যা একটি স্বপ্ন দেখলো : বিরাট এক মাঠ। সেই মাঠের মাঝখানে এক বুড়ি দারুন রোদে বসে রয়েছে। তার চুল শনের মতো শাদা, সাম্‌নের দিকে দুটো বড়-বড় দাঁত, অন্য দাঁত নেই, সমস্ত দেহের মাংস চামড়ার মধ্যে যেন গলে গিয়ে টলটল করছে। রোদে পুড়ে মুখটা ঝামার মতো কালো, সেই কালো মুখের ওপর ভোঁতা ছুরি দিয়ে কে যেন ক্ষতবিক্ষত করে সহস্র আঁচড় কেটেছে। বুড়ি উঁচু হয়ে বসে, শুধু কোমরে এক টুকরো গেরুয়া কাপড়। পিঠ শামুকের মতো বাঁকা, রোদে পুড়ে লোহার মতো তেতে উঠেছে। দুটো স্তন শুকিয়ে শক্ত হয়ে গেছে। সূর্য আগুন ছড়াচ্ছে। কিন্তু তার চোখের দিকে চাইলে সূর্যকেও ঠাণ্ডা মনে হয়। বুড়ি নিজের মনে বিড়বিড় করছে, একটা কাঠি দিয়ে মাটিতে আঁচড় কাটছে, মাঝে-মাঝে এক-এক মুঠো ধুলো তুলে

বাতাসকে ছুঁড়ে মারছে আর রক্ত চোখ তুলে চাইছে। আর সে-দিকের সমস্ত কিছু পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে। বুড়ি তার মাধবী গাছটার দিকে ধুলো ছুঁড়লো আর দেখতে দেখতে গাছটার সবুজ তাজা রঙ্ প্রথমে হলদে, পরে তামাটে, শেষে একেবারে ধুলোর মতো হোলো আর গাছটা জীবন্ত প্রাণীর মতো ছটফট করতে করতে মরে গেল। ধুলো হয়ে গেল। বুড়ি আবার এক মুঠো ধুলো ছুঁড়লো মাঠের মধ্যেকার দু'শো বছরের পুরোনো বটগাছের দিকে। বটগাছটাও দেখতে দেখতে শুকিয়ে গিয়ে কঙ্কালের মতো রিক্ত হ'য়ে দাঁড়ালো, তারপর মড়মড় করে ভেঙে পড়লো। তারপর বুড়ি এক মুঠো ধুলো তুলে দাঁড়িয়ে উঠলো আর বীভৎস এক চীৎকার করে সেই ধুলো আকাশের দিকে ছড়িয়ে। দেখতে দেখতে আকাশ অন্ধকার করে ধুলোর ঝড় উঠলো। চারিদিকে সোঁ-সোঁ শব্দ। কিছু দেখা যায় না। পৃথিবী বুঝি আজ ধ্বংস হোলো। সেই ঝড়ের মধ্যে বুড়িকে মাঝে মাঝে দেখা যায়: দু হাত তুলে উলঙ্গ হয়ে নাচছে আর ভয়ঙ্কর চীৎকার করে হাসছে—তার সামনের দাঁত দুটো বড় ভয়ঙ্কর।......ঝড় যে রকম হঠাৎ উঠেছিলো সে-রকম হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল। কোনো দিকে বাড়ি বা গাছপালা দেখা যায় না। ধূ ধূ করছে বালির সমুদ্র, আর সূর্য মাথার ওপর, ক্ষমাহীন নিষ্ঠুর। সেই বালির সমুদ্রে সন্ধ্যা একা। এগিয়ে চলেছে, কোথায় জানে না। কিছু দূরে সে দেখলো অনেক হাড়, একপাল শীর্ণ শেয়াল সেখানে ঘুরে বেড়াচ্ছে, অধিকাংশ শেয়ালেরই একটা করে চোখ নষ্ট হয়ে গেছে। কতকগুলো মন্থর পায়ে ঘুরছে, কতকগুলো মাথার ওপর উড়ছে। সন্ধ্যার দিকে তারা কটমট করে চাইতে লাগলো। একটা শেয়াল সামনের বিশ্রী বড় দুটো দাঁত বার করে খিঁচিয়ে এলো। ভয়ে দুরদুর করে উঠলো তার বুক। মরুভূমির সেই রুদ্র শ্মশান দিয়ে যেতে যেতে সন্ধ্যা একটা কাঠের বাক্স দেখতে পেলো। সেদিকে সন্ধ্যা এগিয়ে চললো, কেন্ চললো জানে না। যতই কাছে আসতে লাগলো ততই সেই বাক্সটা আয়তনে যেন বাড়তে লাগলো। একেবারে কাছে এসে সন্ধ্যা দেখলো বাক্সটা একটা পাহাড়ের মতো বিরাট। ছোটো-ছোটো সিঁড়ি ওপর পর্যন্ত উঠে গেছে। বহু কষ্টে সন্ধ্যা সেই সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠলো। আর ওপরে উঠতেই ভীষণ শব্দ করে বাক্স'র ডালাটা গেল খুলে। ওপর থেকে ঝুঁকে

সন্ধ্যা দেখতে লাগলো ভেতরে কী আছে। প্রথমে অন্ধকারে কিছু দেখতে পেলো না। ক্রমশ সেই অন্ধকার ফিকে হয়ে এলো, কোথায় যেন অস্পষ্ট আলো জ্বলছে। সে আলোয় কোনো প্রাণ নেই, আনন্দ নেই, স্পন্দন নেই। সন্ধ্যা ভেতরে নেমে এলো, ভীষণ আতঙ্কে সমস্ত শরীর তার ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। সে হাঁটতে পারছে না, তবু হাঁটতে হচ্ছে। কারা যেন তার পাশ দিয়ে চলে গেল। মাথা নীচু, ফিস্‌ফিস্ করে কথা কইছে, কিছুই শোনা যায় না। সন্ধ্যাকে তারা দেখেও দেখলো না। সন্ধ্যা তাদের দেখতে পেয়েও দেখতে পেলো না। অনেকটা পথ আসার পর একটা ঘরের সামনে সন্ধ্যা দাঁড়ালো। বুক কাঁপতে লাগলো তার ভয়ে আর উত্তেজনায়। দরজা দিয়ে অনেকে নিঃশব্দে বেরিয়ে যাচ্ছে। কারুর মুখ সন্ধ্যা দেখতে পেল না। খোলা দরজা দিয়ে সেও ভেতরে ঢুকলো। দূরে মস্ত এক খাট। সেখানে শাদা কাপড় বিছানো। সন্ধ্যাকে দেখে দুটো লোক সেই চাদর তুলে ফেললো আর পাশের শাদা দেয়াল আঁকড়ে সন্ধ্যা যেন পাথর হয়ে গেল : সেই শাদা বিছানায় বিজনের মৃতদেহ, চোখ আধবোজা আধখোলা, ঠোঁট ঈষৎ ফাঁক, রক্ত খড়ির মতো। সন্ধ্যার সমস্ত দেহ অসাড় হয়ে এলো, এতোদিন পরে আবার তাদের দেখা হোলো।

যখন অনুরূপ এলো, যখন ডাক্তার এলো তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে। রাত্রি প্রায় একটার সময় ডাক্তার ঘর থেকে বেরিয়ে এলো, অনুরূপ বাইরে অপেক্ষা করছিলো। একটি নতুন শিশুর তীব্র চীৎকার খোলা দরজা দিয়ে স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে।

কপালের ঘাম মুছে ডাক্তার বললো, "বি ষ্ট্রং মিঃ রায়। ও'জনকে বাঁচাতে পারলুম না। আপনার ছেলে বেঁচেছে।"

রাত্রে চমৎকার বাতাস বইছে। বাতাসে মাধবী ফুলের আনমনা গন্ধ।

কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

কাব্যে শব্দ-চিত্র ও রবীন্দ্রনাথ

কাব্যের উপাদান—ভাব, ভাষা ও ছন্দ।

সাহিত্যের দুইটী সম্পদ বা উপাদান—ভাব ও ভাষা—একথা সকলেই জানেন। আবার কাব্য-সাহিত্যের উপাদান তিন—ভাব, ভাষা ও ছন্দ। এই তিন বিষয়েই সাধারণ ব্যক্তি হইতে কবির স্বাতন্ত্র্য পরিলক্ষিত হয়। তাঁহার ভাবগ্রাহী শক্তি তীক্ষ্ণ ও সদাজাগ্রত। যে ভাব অপরের মনের বা কল্পনার রুদ্ধ দ্বারে আঘাত করিয়া ফিরিয়া আইসে, তাহা কবির মনের উন্মুক্ত দ্বার দিয়া সহজেই প্রবেশ করিয়া তাঁহার হৃদয়-তন্ত্রীকে স্পন্দিত করে, এবং তিনি সেই ভাব ভাষা ও ছন্দের সাহায্যে সাধারণের নিকট প্রকাশ করেন—ইহাই কবির প্রকৃতি ও কার্য্য। কবি কিরূপে তাঁহার মনের ভাব ভাষার সাহায্যে সুন্দর এবং সম্যকরূপে প্রকাশ করিয়া থাকেন—ইহাই এই প্রবন্ধের বক্তব্য বিষয়।

ভাব কাব্যের প্রধান উপাদান—ভাব কবিতার প্রধান উপাদান বা প্রাণ। সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রে কাব্যকে পুরুষরূপে কল্পনা করা হইয়াছে; শব্দ ও অর্থ এই কাব্য-পুরুষের শরীর, 'রস' বা ভাবসৃষ্টি তাহার আত্মা।

এই ভাব, ভাষা (বা শব্দ) ও ছন্দ উভয়কে আশ্রয় করিয়া প্রকাশিত হয়। ভাষা ও ছন্দের সাহায্যে তাহার প্রকাশ বিচিত্র—তাহা আমাদের উপভোগ্য বা আস্বাদনীয়; এই জন্যই তাহা 'রস' (রস্ ধাতুর অর্থ আস্বাদন করা)। ভাষা ও ছন্দ এই দুইটীই কবির ভাব প্রকাশের সহায়। যে কবি এই দুইটীর সাহায্যে তাঁহার ভাব সম্যক্রূপে প্রকাশ করিতে পারেন না তিনি শ্রেষ্ঠ কবি নহেন। এই জন্যই অষ্টাদশ শতাব্দীর ইংরাজী কবি Gray, গ্রামবাসী প্রচ্ছন্ন-শক্তি (potential) কবিকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন "Some mute inglorious Milton here may rest";—যে কবি mute অর্থাৎ সম্যক্ প্রকাশশক্তি হীন, তিনি অবশ্যই inglorious হইবেন।

শব্দ ও শব্দচিত্র

এক্ষণে প্রবন্ধের মূল বিষয়—ভাষা কিরূপে ভাবের অনুগামী হইয়া তাহাকে সম্পূর্ণ প্রকাশ করে। এই 'ভাষা', অর্থাৎ "কাব্যের ভাষা" (diction), বলিতে বুঝি—বিশিষ্ট শব্দ বা বাক্য চয়ন ও তাহার সুষ্ঠু প্রয়োগ। ভাব, ভাবেব অনুগামী

শব্দ চয়ন, ও তদনুযায়ী ছন্দ যোজনা—এই তিনের মিলন দ্বারা কবির মনের দ্বার আমাদের নিকট উদ্ঘাটিত হয়—তাঁহার ভাব কেবলমাত্র শব্দের অর্থদ্বারা প্রকাশিত ও কোনও রূপে বোধগম্য না হইয়া মূর্ত্তিমান হয়। এই তিনের সম্যক মিলন সম্পাদন না করিতে পারিলে কবি artist হন না, dreamer মাত্র।

কাব্যের উৎস ভাব (emotion), ইহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। রাগ, ভয়, হর্ষ, বিস্ময় প্রভৃতি মনোভাব যেমন নানাপ্রকার দৈহিক মূর্ত্তি বা অঙ্গ চালনায় মূর্ত্ত বা প্রকাশিত হয়, কবিতায়ও সেইরূপ নানা প্রকার ভাব তদনুযায়ী বিশেষ বিশেষ শব্দ বা বাক্য চয়ন ও বিন্যাসের মধ্য দিয়া মূর্ত্তিমান বা পরিস্ফুট হইয়া থাকে। একই অর্থবোধক বহু শব্দ আছে তাহাদের মধ্যে একটি মাত্র শব্দ বা বাক্য কবির কল্পনায় সৃষ্ট ছবিকে (তাঁহার পাঠকদিগের নিকট) পরিস্ফুট করিবে, বা ঐ ছবি তদ্দ্বারা সম্পূর্ণরূপে চিত্রিত হইয়া পাঠকের মানস নেত্রে প্রতিভাত হইবে। একার্থবোধক অন্য একটী শব্দ দ্বারা এই চিত্রণ কার্য্য কিছুতেই সেরূপ সুষ্ঠু সম্পাদিত হইবে না। দৃষ্টান্ত—

গভীরে অম্বরে যথা নাদে কাদম্বিনী (১৪ অক্ষর)

এবং

গভীর আকাশে যথা ডাকে মেঘমালা (১৪ অক্ষর)

এই দুইটী পংক্তিই ১৪ অক্ষর যুক্ত ও একই অর্থ প্রকাশক, কিন্তু প্রথম পংক্তিতে 'অম্বর' ও 'কাদম্বিনী' এই দুই বাক্যের উচ্চারিত শব্দ-পরম্পরা দ্বারা যে গাম্ভীর্য্যের ভাব স্পষ্টতর করিয়াছে শুধু তাহাই নয় পরন্তু মেঘ গর্জ্জনের শব্দানুকরণ দ্বারা তৎকালীন সমগ্র দৃষ্টি ও শ্রুতিগ্রাহ্য অবস্থা পাঠকের মানস-নেত্রে পরিস্ফুট করিয়াছে। এইরূপে কোনও বাক্য বা শব্দ বা শব্দমালা-বিন্যাস দ্বারা একটী বস্তু বা ব্যক্তির আকৃতি বা ব্যবহার, বা কোনও নৈসর্গিক অবস্থা (দৃশ্যমান অথবা শব্দায়মান) পাঠকের মনশ্চক্ষুর সম্মুখে সম্যক ফুটাইয়া তোলা বা মূর্ত্তিমান করা—ইহাকেই ইংরাজীতে word-painting বলা হইয়া থাকে। বাংলায় তর্জ্জমা করিয়া ইহাকে "শব্দ-চিত্র" বা "ভাষা-চিত্র" বলা যাইতে পারে। সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রে এই অর্থে "শব্দ-চিত্র" ব্যবহৃত হইয়াছে; এ জন্য এই প্রবন্ধে "শব্দ-চিত্র" ব্যবহৃত হইবে।

এই শব্দ-চিত্র তিন প্রকারের হইতে পারে।—

[১] শব্দানুকার। প্রথমটী অতি সাধারণ এবং কবির শিল্পচাতুর্য্যের দিক দিয়া নিকৃষ্ট স্তরের চিত্রণ কার্য্য। এই বর্ণনায় কোনও শব্দায়মান অবস্থাকে কেবলমাত্র শব্দানুকারী বাক্যের ধ্বনি-বৈচিত্র দ্বারা প্রতিধ্বনিত করা হয়, অর্থাৎ ঘটনাস্থলে উপস্থিত থাকিলে আমরা যাহা শুনিতাম ঠিক তাহাই যেন শুনিতে পাই ; ইংরাজীতে ইহা onomatopœia, সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রে "শব্দানুকার" —শব্দকে অনুকরণ করিয়া সৃষ্ট বাক্য ; যেমন ইংরাজীতে,—murmuring leaves ; বাংলায়,—"শুনি মর্ম্মর পল্লবপুঞ্জে" (রবীন্দ্রনাথ) ; এইরূপ—rustling, সর্‌সর্‌, drizzling, ঝির্‌ঝির্‌ ইত্যাদি। কবি ভারতচন্দ্রকে প্রশংসা করিয়া দ্বিজেন্দ্রলাল লিখিয়াছিলেন (সাহিত্য, ২২ বর্ষ, দশম সংখ্যা) "ভারতচন্দ্রের ভাষা চিরকাল ভাবের অনুগামী" ; কিন্তু এই উক্তি সম্পূর্ণ ঠিক বলিয়া মনে হয় না ; কারণ "ভাবের অনুগামী ভাষা"—ইংরাজীতে যাহাকে "sound echoing sense" বলে—ইহা হইতে কিছু উচ্চস্তরের ; এবং ইহার পরেই তাহার আলোচনা করা হইবে। কিন্তু ভারতচন্দ্রে আমরা যাহা দেখিতে পাই তাহা কেবলমাত্র "শব্দানুকার"।—

দক্ষযজ্ঞ নাশ

ভূতনাথ ভূতসাথ
দক্ষযজ্ঞ নাশিছে
যক্ষরক্ষ লক্ষ লক্ষ
অট্ট অট্ট হাসিছে
প্রেতভাগ সানুরাগ
ঝম্প ঝম্প ঝাঁপিছে।

শিবের দক্ষালয়ে যাত্রা

মহারুদ্ররূপে মহাদেব সাজে
ভভম্ভম্ ভভম্ভম্ শিঙ্গাঘোর বাজে।
লটাপট্ট জটাজুট্ট সংঘট্ট গঙ্গা
ছলচ্ছল্ টলট্টল্ কলক্কল্ তরঙ্গা।

স্বর্গীয় রায়বাহাদুর দীননাথ সান্ন্যাল মহাশয় তাঁহার সম্পাদিত মেঘনাদ বধ-কাব্যের ভূমিকায় মন্তব্য করিয়াছেন "ভারতচন্দ্র কতকগুলি শব্দানুকারী বাক্যের দ্বারা ও দ্রুতগামী ছন্দে দক্ষযজ্ঞ নাশ স্বল্পের মধ্যেই সারিয়াছেন ; কিন্তু যদি তাঁহাকে আর একটা যজ্ঞ-নাশ করিতে হইত, তাহা হইলে শব্দানুকারী বাক্যে কুলাইত কিনা সন্দেহ।" স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র দত্তও তাঁহার "ভারতচন্দ্র ও মুকুন্দরাম" শীর্ষক প্রবন্ধে কটাক্ষ করিয়া বলিয়াছেন "এই শব্দবিন্যাস যদি কবিত্ব হয়, তাহা হইলে ভারতচন্দ্রের ন্যায় কবি জগতে জন্মগ্রহণ করেন নাই।" সকল শ্রেণীর কবিই প্রয়োজনানুসারে শব্দানুকারের ব্যবহার করিয়া থাকেন—

শুনিলা চমকি—
কোদণ্ডঘর্ঘর ঘোর, ঘোড়াদড়বড়ি,
হুহুঙ্কার, কোষে বদ্ধ অসির ঝনঝনি।—মেঘনাদবধ

সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রে ইহার স্থান অতি নিম্নে : এবং সেই সম্পর্কে কাহারও মত ভিন্ন হইবে না সন্দেহ নাই।

গুরু গুরু মেঘ গুমরি গুমরি
গরজে গগনে গগনে। —রবীন্দ্রনাথ।

শব্দানুকার অপেক্ষা উচ্চস্তরের এক প্রকার শব্দচিত্র আছে।—

[২] (ক) শব্দের ধ্বনি-বৈচিত্র্য দ্বারা বস্তু বা প্রাকৃতিক অবস্থার দ্যোতনা। ইহাতে শব্দানুকারী বাক্যের ব্যবহার হয় না, কিন্তু বাক্যের মধ্যে এমন একটি স্বর বা ব্যঞ্জনবর্ণ বা যুক্তাক্ষর আছে যাহার পুনঃ পুনঃ বিন্যাসের ফলে যে ধ্বনি উৎপন্ন হয় তাহা একটা বিশেষ ক্রিয়া (special effect) দ্বারা বক্তব্য বস্তুর বা প্রাকৃতিক অবস্থার ছবি আমাদের মানস নেত্রে পরিষ্কার রূপে ফুটাইয়া তুলে বা তাহার সম্যক ধারণা জাগাইয়া দেয়। ইংরাজী হইতে একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া হইতেছে—

He stepping down,
By zigzag paths, and juts of pointed rock,
Came on the shining levels of the lake.—Tennyson.

রাজা আর্থারের সেনাপতি Bedivere আহত রাজাকে পৃষ্ঠে বহন করিয়া পর্ব্বতগাত্র হইতে আঁকাবাঁকা বন্ধুর পথে নামিতেছেন; প্রস্তরখণ্ডে অবশ্যই তাঁহার পাদুকা বাধা প্রাপ্ত হইতেছে—এই প্রকার আয়াসসাধ্য অবতরণের সবিশেষ বর্ণনা বাক্যে বিস্তৃত ভাবে না করিয়া বাক্যের শব্দ দ্বারা কল্পনার চক্ষে সম্পূর্ণভাবে সমস্ত অবস্থাটি উপস্থিত করিতেছেন— Coleridge-এর কথায় "paints to the imagination।" প্রথমতঃ zigzag paths—আঁকাবাঁকা পথ (zigzag বা আঁকাবাঁকা-ইহাদের কোনওটিই শব্দানুকারী বাক্য নহে, অথচ বর্ণনীয় অবস্থার ভাব প্রকাশক); তারপর 'juts of pointed rock'— পর্ব্বত গাত্রে যে প্রস্তরের "ঠোক্কর" আছে তাহার উপর দিয়া চলিবার সময়কালীন অবস্থা বর্ণনা না করিয়া অনুমান বা অনুভব করিবার প্রকৃষ্ট উপায় করা হইল

't' এই hard consonant-এর পুনঃ পুনঃ বিন্যাসের দ্বারা—ইহাদের সাহায্যে পাঠকের কল্পনাশক্তি আপনা হইতেই ছবিটি সম্পূর্ণ করিবে। তারপর বন্ধুর পর্ব্বতগাত্র হইতে নামিয়া সম্মুখে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র দৃশ্য—বিস্তীর্ণ উজ্জ্বল সমতল জলরাশি; ইহার বর্ণনার জন্য ব্যবহার হইতেছে liquid consonant 'l'। এই 'l' এর ব্যবহারের সার্থকতা আছে কিনা দেখা যাউক। —উপরের শেষ পংক্তির পরিবর্ত্তে যদি লেখা যায়—came to the shining surface of the lake—তবে ছন্দের কোনও ব্যতিক্রম হয় না; কিন্তু দৃশ্যটি মানস পটে অঙ্কিত হয় না; প্রথমতঃ 'surface' দ্বারা জলের সমতল অবস্থা সেরূপ ভাবে তো বুঝানো হইলই না পরন্তু 'rock'-এর বন্ধুর গাত্রের সহিত জলের সমতল অবস্থার বৈপরীত্য (contrast)-ও পরিস্ফুট করা হইল না। এইখানেই কবির diction বা শব্দচয়নের ও বিন্যাসের চাতুর্য্য বা art। কিন্তু ছন্দ যেরূপ কবির নিকট আপনা হইতেই ধরা দেয়, কবিতার ভাষাও ঠিক সেইরূপই আপনা হইতেই তাঁহাকে ধরা দেয়; কারণ ছন্দ ভাষাকে আশ্রয় করিয়া আইসে, ভাষা হইতে স্বতন্ত্র হইয়া ছন্দ থাকিতে পারে না, সুতরাং ছন্দ আপনা হইতেই আইসে স্বীকার করিয়া লইলে ভাষা বা শব্দ-বিন্যাসও অবশ্যই তৎসঙ্গে আপনা হইতে আসিবে ইহা স্বীকার করিতে হইবে—কারণ ইহা স্বতঃসিদ্ধ বা self-evident। ইহার যৌক্তিকতা ছাড়াও এই উক্তির পক্ষে মূল্যবান সাক্ষ্য বা authority আছে। স্বয়ং কবিগুরুলিখিত এই সম্পর্কের একটি কথা অল্পদিন হইল লেখকের চক্ষে পড়িয়াছে—"'কড়ি ও কোমল' রচনার পূর্ব্বে কাব্যের ভাষা আমার কাছে ধরা দেয়নি…তখনো পাইনি ভাষা-ভারতীর প্রসাদ"—কবির ভণিতা, প্রভাতসংগীত (রবীন্দ্র রচনাবলী ১ম খণ্ড, ১৩৪৬)। ছন্দ ও ভাষা একত্রে আসিয়া থাকে ইহা সাধারণ নিয়ম; তথাপি দুই একটি ছন্দাশ্রিত শব্দ কবি পরে প্রয়োজনবোধে পরিবর্ত্তন করিয়া থাকেন; সুতরাং ছন্দের ন্যায় প্রত্যেকটি শব্দ অপরিবর্ত্তনীয় নয়।

সকল ভাষায়ই কতকগুলি বিশেষ শব্দ বা বাক্য আছে যাহার ধ্বনির একটা বিশেষ ভাবসাহচর্য্য (association) আছে; সেই association দ্বারা কবির কল্পনাঙ্কিত ছবিকে ফুটাইতে পারা সেই সকল শব্দের সম্পদ, এবং কবি স্বীয় প্রতিভাবলে সেই সকল শব্দ অনায়াসে বাছিয়া লইয়া তাঁহার কল্পনার

প্রতিভাত ছবিকে আমাদেরও মনে আঁকিয়া দেন। ইংরাজীতে বিশেষ উদ্দেশ্যে 'l' এর ব্যবহার উল্লিখিত হইয়াছে; বাংলায়ও 'ল' যুক্ত শব্দের অনুরূপ ব্যবহারের কয়েক প্রকার দৃষ্টান্ত দেখা যায়। ইংরাজীর মত 'ল', জল বা তরল বস্তুর সাবলীল প্রবাহ, ফুল প্রভৃতি কোমল বস্তুর ভাব, ও দ্বিত্ব 'ল' বায়ু বা জলের তরঙ্গায়িত অবস্থা বুঝাইবার সাহায্য করে; যথা, 'ফুল-দল', 'হিল্লোল' ('কল্লোল' শব্দানুকারের দৃষ্টান্ত)

ফুলে ফুলে ঢলে ঢলে বহে কিবা মৃদু বায়
তটিনী হিল্লোল তুলে কল্লোলে চলিয়া যায়। —রবীন্দ্রনাথ।

এই উদ্দেশ্যে 'ল' ব্যবহারের অতি পুরাতন প্রসিদ্ধ দৃষ্টান্ত—"ললিত-লবঙ্গ-লতা-পরিশীলন কোমল মলয়সমীরে" (জয়দেব)। ইহা ভিন্ন বাংলায়, যাহা হইতে দ্রুতগতিশীল আলোক বিকীর্ণ হয় তাহা, অথবা তাহার অবস্থা বুঝাইবার জন্যও 'ল'-এর ব্যবহার বিশেষ অবস্থায় হইয়া থাকে। 'চঞ্চলা চপলা' ইহার সহিত তুলনা করা যাউক 'অস্থির বিদ্যুৎ'; ইংরাজীতে আছে lightning flash; "flashed all the sabres bare" (Tennyson);

উজলিয়া অসিরাশি, কার্মুক টঙ্কারি
আস্ফালি ফলকপুঞ্জে ঝক্‌ঝক্ ঝকি। —মাইকেল মধুসূদন।

—মাইকেল মধুসূদন বাংলা কবিতায় যুক্তাক্ষরের ধ্বনির সাহায্যে এই প্রকার চিত্রণকার্য্য সুষ্ঠু সম্পন্ন করিয়াছেন। "ছন্দের ঝঙ্কার এবং ধ্বনি-বৈচিত্র্য যুক্তাক্ষরের উপরেই অধিক নির্ভর করে···মাইকেল মধুসূদন ছন্দের এই নিগূঢ় তত্ত্বটি অবগত ছিলেন" (রবীন্দ্রনাথ)। "গম্ভীর অম্বরে যথা নাদে কাদম্বিনী"—এই পংক্তির শব্দ-চিত্রণের কথা পূর্ব্বেই ব্যাখ্যাত হইয়াছে। অম্বর শব্দের অর্থ 'আকাশ' হইলেও 'গাম্ভীর্য্যের' সহিত 'অম্বর' শব্দের অতি নিবিড় যোগ মনে হয়। অনেক স্থলেই দেখা যায় আকাশ বুঝাইতে 'অম্বর' শব্দের সুষ্ঠু ব্যবহার হইয়াছে,—হয় দিবাভাগে তাহার মেঘাচ্ছন্ন অবস্থা বুঝাইতে, অথবা রাত্রিতে তমসাবৃত, কিম্বা অন্ততঃ ক্ষীণালোকে অস্ফুট দৃশ্যমান অবস্থা বর্ণনার জন্য। এই সকল সময়েই আকাশের আকৃতি গম্ভীর; আলোর অভাব বা অন্ধকার গাম্ভীর্য্যব্যঞ্জক; (যেমন গম্ভীর মুখকে বলি 'অন্ধকার')। এজন্য অন্ধকারপূর্ণ গম্ভীরাকৃতি আকাশকে আকাশ বা নভোতল ইত্যাদি

না বলিয়া 'অম্বর' বলিলে বেশী অর্থদ্যোতক বা suggestive হয়—কেন হয় বলা যায় না—সম্ভবত: 'গম্ভীর' শব্দের সহিত "অম্বরের" ধ্বনিসাদৃশ্য হেতু এই ভাব সাহচর্য্য (association of ideas)। ঘনতমসাবৃত আকাশ বলিলেও আকাশের গাম্ভীর্য্যপূর্ণ অবস্থা যতটা বুঝি, ঘনতমসাবৃত অম্বর ধরণী" এই বাক্য হইতে সে অবস্থা আরও ভাল করিয়া আমাদের মানসপটে চিত্রিত হইয়া উঠে। কিন্তু "নীলাম্বরে সূর্য্য উদিত হইয়াছে" এইরূপ ব্যবহারও দূষণীয় নয়।

কতকগুলি স্বরবর্ণেরও এইরূপ ধ্বনি-বৈচিত্র্য দ্বারা ছবি অঙ্কিত করিবার গুণ আছে। ইংরাজীতে Milton হইতে আরম্ভ করিয়া অনেক শ্রেষ্ঠ কবিই ইহার বহু দৃষ্টান্ত দিয়াছেন—"The rising world of waters dark and deep"—

এই চরণের বর্ণনায় লক্ষ্যের বিষয়-দুইটী 'w' এবং 'dark' ও 'deep' এর দুইটী দীর্ঘস্বর বিস্তৃতির ভাব প্রকাশক। ইংরাজীতে এই প্রকার বহু দৃষ্টান্তের মধ্যে আর একটী দেওয়া হইতেছে—

And may there be no moaning of the bar
When I put out to sea,.........
When that which drew from out the boundless deep
Turns again home.

এখানে 'bar' হইতে আরম্ভ করিয়া কতকগুলি উদাত্ত স্বর ('আ'র মত) বহুদূর প্রসারিত দৃশ্যের ভাব জাগায়। ইহাই কবির শব্দ-চয়নের কৌশল বা art, কিন্তু ইহা তাঁহার প্রতিভাবলে সহজলভ্য, আয়াসলব্ধ নয়। এইরূপ শব্দচিত্রকেই লক্ষ্য করিয়া অষ্টাদশ শতাব্দীর ইংরাজ কবি Pope বলিয়াছিলেন —"The sound must seem an echo to the sense."

রবীন্দ্রনাথের কবিতায় এই প্রকার বহু দৃষ্টান্ত আছে ; সেগুলির মধ্য হইতে দুইটী মাত্র উদ্ধৃত হইল , ইহাতে দীর্ঘস্বর 'আ' শব্দার্থের অতিরিক্ত বা অনুপূরক ভাবে বিস্তৃতি বা ব্যাপকত্বের ভাবদ্যোতক—

(১) যাহা কিছু আছে সকলি ঝাঁপিয়া, ভুবন ছাপিয়া জীবন ব্যাপিয়া, দাঁড়াও হে।
(২) এই অপার অম্বর পাথারে, স্তম্ভিত গম্ভীর আঁধারে, কে জাগে।

যথাস্থানে রবীন্দ্রনাথ হইতে আরও দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত হইবে। 'রঘুবংশে' কালিদাসের দূর হইতে দৃষ্ট সমুদ্রতীরের প্রসিদ্ধ বর্ণনা এই প্রকার শব্দচিত্রের দৃষ্টান্ত—

দূরাদয়শ্চক্রনিভস্য তন্বী
তমালতালীবনরাজিনীলা
আভাতি বেলা লবণাম্বুরাশে—
র্ধারানিবদ্ধেব কলঙ্করেখা।

২(খ)। শব্দের ধ্বনি দ্বারা মনের ভাব (mood)-এর দ্যোতনা।

শব্দের ধ্বনি যে শুধু দৃশ্যমান বস্তুর ছবি চিত্রিত করে তাহা নয়, মনের হর্ষ ক্রোধাদি ভাবও ফুটাইতে পারে। হর্ষক্রোধাদি বিভিন্ন - মনোভাব যেরূপ বিভিন্ন দৈহিক রূপ দ্বারা প্রকাশিত হয়, সেইরূপ ঐ সকল বিভিন্ন মানসিক ভাব এবং তাহার দৈহিক মূর্ত্তি প্রকাশার্থ তদুপযোগী শব্দের ব্যবহার হয়। সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রমতে স্থায়ী ভাবকে 'রস' বলা হয়। রৌদ্র, বীর, বীভৎস প্রভৃতি রসের জন্য দুঃশ্রব শব্দ কার্য্যকরী, অর্থাৎ দুঃশ্রব শব্দের দ্বারা এই সকল রসের মূর্ত্তি ফুটাইতে হয়। মধুসূদন হইতে বীররসের দৃষ্টান্ত—

সভাতলে বাজিল দুন্দুভি
গভীর জীমূতমন্দ্রে। সে ভৈরব রবে,
সাজিল কর্ব্বুর-বৃন্দ বীরমদে মাতি;
দেব-দৈত্য-নর ত্রাস।

শব্দের আড়ম্বর মাত্রেই কবিতার দোষ বলিয়া গণ্য হইতে পারে না; অনেক স্থলে উহা ভাব প্রকাশের জন্যই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। মনোভাব বা রসের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে শব্দেরও রূপ বা প্রকৃতির পরিবর্ত্তন হয়। বীররসের ন্যায়, রৌদ্র-রস-মূর্ত্তিও আড়ম্বরপূর্ণ দুঃশ্রব বাক্যের দ্বারা গঠন করা হইয়া থাকে। রবীন্দ্রনাথের "বৈশাখ" ইহার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত—

হে ভৈরব, হে রুদ্র বৈশাখ!
ধূলায় ধূসর রুক্ষ উড্ডীন পিঙ্গল জটাজাল,
তপঃক্লিষ্ট তপ্ত তনু, মুখে তুলি' পিনাক করাল
কারে দাও ডাক।

আদ্যোপান্ত সমস্ত কবিতাটিতে ভাষা ভাবের অনুপূরক হইয়া রুদ্র মূর্ত্তি প্রকাশে সহায়তা করিতেছে।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

শ্রীপ্রফুল্লকুমার দাস

পুস্তক-পরিচয়

সাহিত্য ও ব্যক্তিস্বরূপ

আত্ম-পরিচয়—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (বিশ্বভারতী, মূল্য ১৷৹)

সাহিত্যের স্বরূপ—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (বিশ্বভারতী, মূল্য ।৶৹)

আমাদের যতদূর জানা, কবিগুরুর তিরোধানের পর এই দুই খানি পুস্তকই তাঁহার রচনা-সংগ্রহের প্রথম প্রকাশ। প্রথমোক্ত গ্রন্থে কবির বিভিন্ন সময়ের লেখা তাঁহার নিজের ধর্ম্ম, শিল্প ও সাহিত্য-সাধনা-মূলক কয়েকটী প্রবন্ধ বা অভিভাষণ সন্নিবিষ্ট করা হইয়াছে; এবং দ্বিতীয় পুস্তিকায় স্থান পাইয়াছে তাঁহার ১৯৪০-৪১ ইং সালের লেখা কাব্য ও সাহিত্যাদর্শমূলক কয়েকটী রচনা—যাহার প্রায় অনেকগুলিই রচনাকালে ত্রৈমাসিক পত্র 'কবিতা'য় প্রকাশিত হইয়াছিল। বিশ্বভারতীর প্রকাশ-বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষের এই দুইটী সঙ্কলনের পরিকল্পনাই প্রশংসার্হ। তাহা হইলেও সঙ্কলয়িতার বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগ নাই, এমন কথা বলিব না। প্রথমতঃ, আমাদের মতে "আত্ম-পরিচয়" এই সংগ্রহাখ্যাটী ভ্রান্ত ও অশোভন হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের ধর্ম্ম কিংবা শিল্প-সাধনার পরিচয় কয়েকটী আত্মোক্তি-মূলক গদ্য-রচনায় ধরা পড়িবে কিংবা ধরা পড়িতে পারে এ প্রকার আখ্যা-গত ইঙ্গিতে যে কোন রবীন্দ্র-সাহিত্য-রসিক যে ব্যথিত হইবেন তাহাতে আমাদের বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। দ্বিতীয়তঃ, 'সাহিত্যের স্বরূপ" পুস্তিকায় সঙ্কলন-কার কেন যে "সাহিত্যের ঐতিহাসিকতা" শীর্ষক রচনার শেষ অংশটী ও "সাহিত্য-বিচার" শীর্ষক পত্রটীর মাঝের একটী অংশ বাদ দিয়াছেন তাহা ঠিক বুঝিতে পারিলাম না। ঐ সব বর্জ্জিত অংশে দুই-চারিটি প্রগাঢ় অর্থ-সূচক উক্তি ছিল যাহা এই পুস্তিকায় স্থান পায় নাই। অন্য পক্ষে 'সাহিত্যের মূল্য" প্রবন্ধে Falstaff-এর নামের বদলে Shakespeare-এর যে পুস্তকের নাম বসাইয়া দেওয়া উচিত ছিল, সঙ্কলনকার সেদিকে উদাসীন রহিয়াছেন। তাহা হইলেও বিশ্বভারতী কর্ত্তৃপক্ষের এই সঙ্কলন আয়োজনের সার্থকতা অপরিসীম।

সত্য সত্যই আমরা মনে করি যে এই দুইটী রচনা-সংগ্রহের সার্থকতা অপরিসীম—কেননা আজকাল দেখিতে পাই কোন কোন সাম্প্রতিক সাহিত্যিক

মণ্ডলী আপন আপন নিজস্ব রঙীন স্ফটিকে রবীন্দ্র-সাধনার বৈচিত্র্য-রশ্মিকে ঝলসাইয়া ধরিবার চেষ্টা করেন। বাংলা সাহিত্যের আসরে যাঁরা মার্ক্সীয় জড়-বাদী তাঁহারাও যেমন রবীন্দ্রনাথের আধুনিকতম রচনায় "প্রগতি"র সন্ধান পাইয়া কবির-চরণে প্রশস্তি-অর্ঘ্য বহন করিয়া আনেন, অন্যদিকে দেখিতে পাই সাহিত্য-বৃত্তির আর্থিক সমস্যায় বিভ্রান্ত হইয়া যাঁহারা Philistine সমাজের কাছে room to live in দাবী করেন তাঁহারই আবার রবীন্দ্র-সাধনাকে সব আকাঙ্ক্ষার পরিসমাপ্তি মনে করিয়া নিজেদের রবীন্দ্রনাথের "মানস পুত্র" বলিয়া ঘোষণা করেন। সাহিত্যের আসরে অতখানি মনন-দৈন্যে লজ্জা ও ক্ষোভের সীমা থাকিত না যদি না জানা থাকিত যে বাংলার জনাকীর্ণ সংস্কৃতি-দেউলে রবীন্দ্রনাথই আজ একমাত্র জাগ্রত দেবতা। কিন্তু রবীন্দ্রনাথকে ত পূজা করিতে হইবে রবীন্দ্রনাথেরই ফুলে। রবীন্দ্রনাথের জীবনাদর্শের সঙ্গে যে একান্ত ব্যক্তি-কেন্দ্রগ, কল্পনা-সর্ব্বস্ব, প্রকাশধর্ম্মী অধ্যাত্মবাদ ওতপ্রোতভাবে জড়িত হইয়া রহিয়াছে—যাহা তাঁহার জীবন ও কাব্যসাধনাকে একটী বিশিষ্ট সার্থকতা দান করিয়াছে—তাহাকে পরিহার করিলে রবীন্দ্রনাথকেই পরিহার করা হয়, কবিগুরুর আজন্ম সাধনাকে অবমাননা করা হয়।

যে সকল সাহিত্যিক বা সাহিত্য-পাঠকেরা এ কথা স্বীকার করেন না কিংবা স্বীকার করিতে চান না, তাঁহারা যেন গ্রন্থ দুটীতে কবির আসন্ন তিরো-ধানের স্পষ্ট ছায়া-মাখা রচনাগুলি একবার পড়িয়া দেখেন। দেখা যাইবে যে কবির চল্লিশ বৎসরের পূর্ব্বেকার যে জীবন-দৃষ্টি, যাত্রাপত্রের শেষ খেয়ার পারে আসিয়াও তাহার কিছুমাত্র ব্যতিক্রম হয় নাই—তাঁহার প্রকাশধর্ম্মী অধ্যাত্ম-বাদ আধুনিক চিন্তা-বিবর্ত্তনের মধ্যে তেমনি অক্ষুন্ন ও অটুট রহিয়াছে। কবি তাঁহার আশি বৎসরের জন্মদিনে যে অভিভাষণ প্রদান করেন তাহাতেও যাহা বলিয়াছেন, সেই বাণী আশি বৎসরের রবীন্দ্রনাথের নয়, এই জীবন-দৃষ্টি তাঁহার আবাল্যের। অথচ মার্ক্সবাদীরা "চাষী ক্ষেতে চালাইছে হাল" "আমার সুরের অপূর্ণতা" "কৃষাণের জীবনের শরিক্ যে জন" প্রভৃতি কয়েকটি উক্তিকে প্রামাণ্য ধরিয়া রবীন্দ্রনাথের মধ্যে তাহাদের বিশেষার্থে "প্রগতির" সন্ধান করিয়া বেড়ান। রবীন্দ্রনাথ বলেন "এ কথা বলব সৃষ্টিতে আমার ডাক পড়েছে এইখানেই, এই সংসারের অনাবশ্যক মহলে।

* * * জীবনের প্রয়োজন আছে অন্নে, বস্ত্রে, বাসস্থানে, প্রয়োজন নেই আনন্দ-রূপে অমৃতরূপে" এবং এই আনন্দময় লীলায়নেই কবে জেনেছেন তাঁর জীবন-শিল্পের শ্রেষ্ঠ সার্থকতা। জীবনের সমস্ত বৈষয়িক প্রয়োজনকে ক্ষুদ্র জানাইয়া রবীন্দ্রসাধনা মানুষের অন্তরতম সৃজনী প্রেরণাকে যতখানি গরীয়ান করিয়া প্রচার করিয়াছে, আধুনিক বিশ্বচিন্তার ক্ষেত্রে তাহার সমতুল্যতা আছে কি না জানি না। কিন্তু থাকুক আর নাই থাকুক, জিজ্ঞাস্য এই যে মার্ক্সবাদীর দৃষ্টিভঙ্গিতে ইহা যদি নিতান্ত ফ্যাসিবাদ না হইল, তবে Spengler ফ্যাসীবাদী হইলেন কেমন করিয়া? বলা বাহুল্য রবীন্দ্রনাথের জীবনধর্ম্মের উপর আমরা নিজের মন্তব্য প্রয়োগ করিতেছি না, মার্ক্সবাদীদের রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে যে একটা বোঝা পড়া করিবার চেষ্টা দেখিতে পাই তাহারই প্রতি কটাক্ষপাত করিতেছি। সব চাইতে বড় কথা, সাম্প্রতিক জগতে চিন্তা-মনীষীদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের মত উগ্র ব্যক্তি-বাদী আর আছেন নাকি না বলা শক্ত; ভিতর হইতে যাহা উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠে না কবির কাছে তাহা ধর্ম্ম নহে, উপকরণ মাত্রই তাঁহার কাছে যন্ত্রজালের প্রতীক, সিদ্ধির (ends) সঙ্গে সাধনার (means) কোন একান্ত যোগ-সূত্র তিনি স্বীকার করেন না। অথচ বাংলা সাহিত্যের হালে আমদানী মার্ক্স-বাদীদের কাছে রবীন্দ্রনাথও পাইলেন "প্রগতির" সম্মতি-টিকা। Dialectic এর অঘটন-ঘটন-পটিয়সী ক্ষমতায় ধৈর্য্যরক্ষা শক্ত হইয়া পড়িয়াছে—তাই অত কথা লিখিলাম।

এইবার "মানস-পুত্র"দের কথা। রবীন্দ্রনাথের জীবনদৃষ্টি ইহাদের নাই। কবির আদর্শবাদকে গ্রহণ করা দূরে থাক, আদর্শকে বিড়ম্বিত করাই ইহাদের সাহিত্যিক প্রেরণা। এমন কথা বলা আমাদের উদ্দেশ্য নয় যে সাহিত্যিক মাত্রই আদর্শ-বাদী হইবেন। জীবনদৃষ্টির তারতম্য অনুসারে খাঁটি সাহিত্যিক আদর্শবাদী কিংবা বস্তুবাদী হইতে পারেন, ইহা লইয়া বিরোধ করা চলে না। তবে যাহারা রবীন্দ্রসাধনার বিমুগ্ধ স্তাবক তাহাদের পক্ষে সাহিত্যাদর্শের হিসাবে "আধুনিক" কিংবা বস্তুবাদী হওয়া তখনই চলে যখন রবীন্দ্রপ্রশস্তিকে ফ্যাসান কিংবা পাসপোর্ট হিসাবে ব্যবহার করার অভিপ্রায় থাকে। রবীন্দ্রনাথ বলেন কবির কাব্যের "সকল সুরই যে উদাত্তধ্বনির হ'বে এমন কথা বলি নে। কিন্তু সমস্তের সঙ্গে এমন কিছু থাকা চাই যার ইঙ্গিত ধ্রুবের দিকে। দূরকাল

ও বহুজনকে যে-সম্পদ দান করার দ্বারা সাহিত্য স্থায়ীভাবে সার্থক হয়, কাগজের নৌকায় বা মাটির গামলায় ত তা সইবে না।” আবার “আধুনিক এই ত্বরা-তাড়িত যুগে প্রয়োজনের তাগিদ কচুরিপানার মত সাহিত্যধারার মধ্যে ভুরি ভুরি ঢুকে পড়েছে। তারা বাস কত্তে আসে না, সমস্যা সমাধানের দরখাস্ত হাতে ধন্না দিয়ে পড়ে। সে দরখাস্ত যতই অলংকৃত হোক, সে খাঁটি সাহিত্য নয়, দরখাস্তই।” “সাহিত্যের স্বরূপ” প্রবন্ধে কবি তলানি তেলের শিশি, দাঁতভাঙ্গা চিরুণী ও ক্ষয়ে-যাওয়া পাতলা সাবানের টুকরা লইয়া যে “আধুনিক রূপকথা”র অবতারণা করিয়াছেন তাহার নিহিত যে গভীর শ্লেষাত্মক ইঙ্গিত তাহাতেও কবি একই মত ব্যক্ত করিয়াছেন—যে আধুনিক সাহিত্য-শিল্পীরা তাঁহাদের রুগ্ন-দৃষ্টিতে বিষয়-নির্ব্বাচনের মর্ম্ম বুঝিতে পারেন না, ঐতিহ্য (tradition) যে সাহিত্য-শিল্পের প্রাণ সে তত্ত্বের সন্ধান রাখেন না, বস্তুবাদের যে মহার্ঘ মূল্য দাবী করা যাইতে পারে তাহা নির্ভর করে সম্পূর্ণভাবে সাহিত্যিকের দৃষ্টিভঙ্গিতে, আলোচ্য বিষয়-বস্তুর অকিঞ্চিৎকরতায় কিংবা কদর্য্যতায় নয়। “সাহিত্যের ঐতিহাসিকতা” প্রবন্ধের যে অংশ রচনা-সংগ্রহে বাদ দেওয়া হইয়াছে কবি সেখানে বলিয়াছেন, “সাহিত্য যদি এমন কিছু হয় যা চিরকালের মানুষের সম্পূর্ণ বিপরীত, যা কদর্য্যের স্বরূপ দেখে রস পায়, তাহলে বুঝব মানুষের আর্টের সঙ্গে মানুষের যথার্থ মহিমার কুৎসিত বিচ্ছেদ ঘটেছে।” এই সব উক্তির পর কি এ কথা বলা যাইতে পারে যে বাংলার সাম্প্রতিক সাহিত্যে যাহারা “আধুনিক” কিংবা তথা-কথিত বস্তুবাদী তাহারা রবীন্দ্র-সাধনার যথার্থ মর্য্যাদা দান করিতে পারিয়াছেন? রবীন্দ্রনাথের লোকোত্তর সাহিত্যিক প্রতিভার কাছে প্রত্যেক সাহিত্যিকই অসামান্যভাবে ঋণী কিন্তু সে স্বতন্ত্র কথা। মানস-পুত্র হইবার দাবী তখনই করা চলে যখন পিতা-পুত্রের মধ্যে আদর্শগত সঙ্গতি থাকে।

রবীন্দ্রনাথকে লইয়া একখানেই সমস্যা যে তাঁহার আশ্চর্য্য সৃজনী প্রতিভা আমাদের কল্পনাবোধকে এতখানি বঙ্কৃত করিয়া তুলিয়াছে যে তাঁহার সম্বন্ধে আমাদের অনেকেরই বিচার-বুদ্ধি স্তব্ধ হইয়া ফিরিতেছে। অথচ রবীন্দ্র-সাহিত্যের সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ দান তাঁহার জীবনদৃষ্টি—যাহাকে যাচাই করিতে হইলে বিচারের প্রয়োজন। বিশেষতঃ আমরা, যাহারা সাহিত্যকে মনন-সাধনার ক্ষেত্র-স্বরূপ গণনা করি, তাহাদের পক্ষে এ বিচারের আবশ্যকতা আরও

ঐকান্তিক। প্রথম কথা, রবীন্দ্রনাথের যে অতি সূক্ষ্ম-গভীর কল্পনানুভূতি, যাহাকে আশ্রয় করিয়া তাঁহার প্রকাশ-ধর্ম্মী অধ্যাত্ম-দৃষ্টি ও রস-প্রাচুর্য্য পরিস্ফুট হইয়াছে, তাহা নিতান্তই অনন্যসাধারণ; কাজেই আশঙ্কা করি তাঁহার ব্যক্তি-বাদী বাউল-দৃষ্টি বাংলার সমাজে তেমন শিকড় গজাইতে পারিবে না। রবীন্দ্র-সাধনার প্রভাবে বাংলার শিক্ষিত সমাজে ব্যক্তিবাদী আদর্শই নূতন সার্থকতা লাভ করিয়া সুপ্রতিষ্ঠ হইবে, ইহাতে অধ্যাত্ম চেতনা জাগ্রত হইবে না। দ্বিতীয়তঃ, জীবনে প্রয়োজন ও অ-প্রয়োজনের যে দ্বৈত-বিভাগের উপর কবি তাঁহার ব্যক্তি-ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন তাহা সম্ভবপর হইয়াছে শুদ্ধ এই জন্য যে তাঁহার যৌবনের কিংবা প্রৌঢ় বয়সের পৃথিবীতে কালান্তের বান ডাকিয়া উঠে নাই। যদি সেই ঈশানের পুঞ্জ-মেঘ রবীন্দ্র-অন্তরকে বিক্ষুব্ধ করিত, তাহা হইলে হয়ত মানুষকে এক মাত্র ব্যক্তি বলিয়া প্রচার করিতেন না, যন্ত্রকে জঞ্জাল বলিয়া গণ্য করিতেন না, জরাকে ব্যাধি মনে করিয়া অবসরকে কীর্ত্তিমান বলিয়া জানাইতেন না, কর্ম্মকে কাব্যের গৌরব দান করিবার বৃথা চেষ্টা হইতে ক্ষান্ত হইতেন, সর্ব্বোপরি পুঞ্জীকৃত শুভেচ্ছার নৈবেদ্য সাজাইয়া ভাবালু দৃষ্টিতে আসন্ন বিশ্বমানবের আগমন-প্রতীক্ষায় ভ্রষ্ট লগ্ন কাটাইতেন না। *

শ্রীক্ষেত্রমোহন পুরকায়স্থ

সাম্প্রতিক কবিতা

চন্দ্রকলা—বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। 'এক পয়সায় একটি' গ্রন্থমালা। কবিতা ভবন। দাম চার আনা।

বিমলাপ্রসাদের কবিমনটি চিরদিনই মিঠে। 'চন্দ্রকলা'য় তাঁর হাতটিও মিষ্টি হয়েছে। সূক্ষ্ম, তেজালো বোধ ও মৃদু স্পর্শ বেশ একটি কারুণ্যমণ্ডিত, বয়স্ক, সাঁঝালো সৌন্দর্য ফুটিয়ে তুলেছে। কবিতা যখন অন্তরের অতল থেকে

* লেখক রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে মার্ক্সবাদীদের ধারণা সম্বন্ধে যে সকল মন্তব্য করেছেন ইতিপূর্বে একবার সম্পাদকীয় আলোচনায় তার প্রতিবাদ প্রকাশিত হয়েছিল, এই লেখকেরই আর একটি রচনা-প্রসঙ্গে। দ্বিতীয়বার এই প্রসঙ্গের সম্পাদকীয় আলোচনার আগে এই বিষয়ে পাঠকদের মতামত জানলে অনুগৃহীত হব।—স. প.

স্বকীয় শ্রী নিয়ে বেরিয়ে আসে তখনই তা হয় ভাল কবিতা। গভীর অনন্যমনা সাধনায় এই শ্রীটুকু অর্জিত হয়। আলোচ্য গ্রন্থটিতে মেকি ও ফাঁকি নেই। নিষ্ঠা ও ধৈর্য শব্দের সহিত কল্পনার মিলন ঘটিয়েছে। কবিতাগুলি অন্তর থেকে বেরিয়েছে মৌলিক রূপলিপির অলঙ্কার প'রে। এই জিনিসটির দিকে যাঁরা চোখ রাখেন, তাঁদের ভাল লাগ্‌বে।

দেখ্‌ছি এই আধুনিক কবিটির মনে যৌবন সীমান্তের কারুণ্য ও আস্তিক্য ভাব জেগেছে; তারই সঙ্গে জড়িয়ে আছে প্রতিভাদীপ্ত, শিক্ষিত যুবকের চোখা বাক্যবাণ ও কাল্‌চারের রসে জরানো ঝাঁজালো, মহার্ঘ প্রেম। প্রজ্ঞার সহিত চটুলতার, যৌবনের সহিত প্রৌঢ়ত্বের, সারল্যের সহিত জটিলতার সুন্দর মিশ্রণ ঘটেছে কবিতাগুলিতে। কাঁচা মনের ও পাকা মনের, উভয়েরই পরিচয় আছে। এই ভাবটি আমার ভাল লাগ্‌ল।

দু'টি একটি ছাড়া প্রায় সব কবিতাতেই রস ছড়িয়ে আছে, মাত্রায় কম, কিন্তু খাঁটি জিনিস। বেশ লতাপাতায় জড়িয়ে নিজের বাগানে নিজেরই রুচি অনুযায়ী ফুল ফোটানো হয়েছে। মান্‌তেই হবে বিমলাপ্রসাদের রুচি আছে এবং কারুকার্যের শোভা তিনি ফলাতে পারেন।

'যাত্রী' কবিতাটিতে প্রিয়জনবিরহের শোক আধুনিক মনের জটিল অরণ্যে যে মিশ্র সুরে ও রূপে বিলাপ করে বেড়িয়েছে তা বিমলাপ্রসাদের শক্তির পরিচয় দিচ্ছে। 'উদ্ধার' কবিতাটির কল্পনা হয়ত morbid কিন্তু তার মৌলিকতা চমক জাগায়।

"ছড়ালে তখন দীঘল পালকজাল।
অবিরল আঁখিপল্লব ঘন
মোহন চিকণ জাল
জড়ালে আমারে, বাঁধিলে আবার, টানিলে তুলে।"

'বুর্জোয়া' কবিতাটির দুটি লাইন মনে অনেকক্ষণ গুন্‌ গুন্‌ করতে থাকে:

"মাটির শিরায় বাজ্‌ল যে সুর
করল না বেপরোয়া"

'ছবি', '২২শে শ্রাবণ', 'সকালে', এগুলিও উচ্চাঙ্গের। '২২শে শ্রাবণ'-এর শেষ দুটি ছত্রে পরিণত মনের ও পাকা হাতের ছাপ আছে:

"নিখিল মানস-সম্ভূত রূপ মর্ত্ত্যে উধাও আজি,
তালীরোমাঞ্চ গেরুয়া মাটিতে, উপমাশিহর তার।"

ছন্দবৈচিত্র্য গ্রন্থটির একটি লক্ষ্য করবার বিষয়—যদিও একথা বল্‌বো মনের তালের সঙ্গে কবিতার তাল সকল ক্ষেত্রে মেলাতে পারিনি। নাম-কবিতাটির রসগ্রহণ করতে পাবলুম না। 'বাস্তব' কবিতাটির ব্যঙ্গ অতিরিক্ত তির্যক্ বলে মনে হলো।

খুঁত্‌খুঁতে মন নিয়ে কবিতা পাঠ করতে নেই। রুদ্ধ দ্বার দেখ্‌লে রস লাজুক বধূর মতো ফিরে যায়। ছোট কবিতা যাঁদের সত্যই ভাল লাগে, রাজনৈতিক মনোভাব নিয়ে যাঁরা কবিতা পাঠ করেন না, তাঁদের কাছে 'চন্দ্রকলা' নিশ্চয়ই বিমলাপ্রসাদের কবিপ্রতিষ্ঠা বাড়াবে একথা নিঃসন্দেহেই বলা যেতে পারে।

অমরেন্দ্রপ্রসাদ মিত্র

সোভিয়েট সংবাদ

সোভিয়েট নারী—অনীলকুমার সিংহ।

• **সোভিয়েটের ষষ্ঠ বাহিনী**—জাতীয় যুদ্ধ ফ্রন্ট হইতে প্রকাশিত।

বর্ত্তমানে সার্ব্বিক প্রগতির প্রথম সোপানই হ'চ্ছে সাম্যবাদ। বিপ্লবোত্তর রাশিয়া তার একমাত্র জ্বলন্ত প্রমাণ। তাই আজ প্রায় সকল বিষয়ে রাশিয়া অন্যান্য দেশের চেয়ে অগ্রসর। রুশ নারীদেব অবস্থা গত পঁচিশ বছরের মধ্যে কি ভাবে পরিবর্ত্তিত হয়েছে তার ইতিবৃত্ত পাওয়া যাবে অনীলকুমার সিংহের "সোভিয়েট নারী" নামক পুস্তিকায়। রুশ মেয়েদের এই বিস্ময়কর প্রগতির মূলে রয়েছে তাদের অর্থনৈতিক রাজনৈতিক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে পুরুষের সমানাধিকার লাভ। বলা বাহুল্য, রুশ সমাজ-ব্যবস্থার রূপান্তরেব ফলেই এটা সম্ভব হয়েছে। এবং সেই কারণেই জয়া কসমোডেমিয়ানস্কায়া বা আলেকজাণ্ডা ড্রিম্যান্‌-এর মতো কম্যুনিষ্ট মেয়ে দেখা দিয়েছে সোভিয়েট রাশিয়ায়। বইখানা বিশেষ করে সেই সব মেয়ের জন্যে লেখা যাঁরা এখনও

সোভিয়েট সমাজ-ব্যবস্থার সঙ্গে পরিচিত হন নি। লেখকের এ-উদ্দেশ্য সফল হ'বে, আশা করি।

"সোভিয়েটের ষষ্ঠ বাহিনী" হ'চ্ছে লণ্ডনের সোভিয়েট প্রচার বিভাগ থেকে প্রকাশিত "We Are Guerillas" পুস্তিকার প্রথম খণ্ডের অনুবাদ। সোভিয়েট গেরিলা বাহিনীর কার্য্যকলাপ এই বইয়ে নিপুণভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। "গরিলাদের যুদ্ধ করতে হয় গোপনে, আড়াল থেকে, খুন করতে হয় স্থির-মস্তিস্কে এবং মৃত্যু বরণ করতে হয় অম্লান। গভীর জঙ্গলে সমগোত্রহীন অবস্থাতেই। অস্ত্র তাদের কেউ দেয় না। শত্রুর হাত থেকে কেড়ে নিতে হয়। কাজেই যুদ্ধে তাদের বুদ্ধি, কৌশল, সাহস ও চাতুর্য্যের খেলাই দেখাতে হয় বিশেষ করে। যার যার নিজের বুদ্ধি দিয়ে, নিজের কৌশল দিয়ে শত্রুকে মারবেই—এই হল গরিলারীতি।* * নির্ম্মম প্রতিহিংসাই গরিলাদের অস্ত্র, বুদ্ধি ও কৌশল যোগায়। দশ বছরের শিশুও অপ্রতিদ্বন্দ্বী নাৎসি সেনাপতিকে নাজেহাল করতে ভয় পায় না। এরাই আজ সোভিয়েটের ষষ্ঠ বাহিনী।" অনুবাদের ভাষা প্রাঞ্জল ও স্বচ্ছ। এই পুস্তিকা সকলেরই পড়া উচিত।

মিনতি দেবী

শ্রীকুন্দভূষণ ভাদুড়ী কর্ত্তৃক পরিচয় প্রেস, ৮ বি, দীনবন্ধু লেন,
কলিকাতা হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
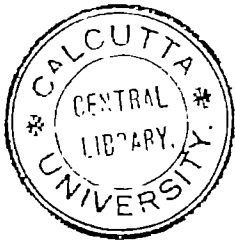
১২শ বর্ষ ২য় খণ্ড, ৬ষ্ঠ সংখ্যা
আষাঢ়, ১৩৫০

পরিচয়

বাংলার পঞ্চায়তি জীবনের গতি-পরিণতি

সভা-সমিতি-মূলক যে আধুনিক শহুরে পঞ্চায়তি জীবন বাংলা দেশে তার প্রতিষ্ঠা হ'ল ক'লকাতায় ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে, যখন রাজা রামমোহন রংপুরে তাঁর সেরেস্তার পাট গুটিয়ে এলেন বাস ক'র্ত্তে এই কলকাতা শহরে। আমার যতদূর জানা, রাজার প্রতিষ্ঠিত "আত্মীয় সভা"ই আধুনিক বাংলার পঞ্চায়তি জীবনের সর্ব্বপ্রথম প্রতিষ্ঠান। এই প্রসঙ্গে দুটো কথা স্মরণ রাখা আবশ্যক; প্রথমতঃ, উনিশ শতকের প্রথম দিকে বাংলা দেশে যে সভাসমিতি-মূলক নাগরিক পঞ্চায়তি জীবনের সূত্রপাত হয়, রাজনীতি বা রাষ্ট্রীয় আন্দোলন তার মোটেই প্রধান উপজীব্য ছিল না; দ্বিতীয়তঃ, যে-পঞ্চায়তি জীবন উনিশ শতকের বাংলায় ক্রমে ক্রমে দেশের মাটী ও নূতন শাসনের বিধি-ব্যবস্থার প্রতিক্রিয়ার মধ্যে গড়ে' উঠেছিল তা' সম্পূর্ণভাবে এই কলকাতা শহরকেই কেন্দ্র করে। আধুনিক বাংলার সংস্কৃতি-গঠনে কলকাতার এই একান্ত কেন্দ্র-কর্ষী প্রভাব একটী লক্ষণীয় ব্যাপার—বাংলার বাহিরে ভারতের অন্য কোন প্রদেশে এই প্রভাবের কোন তুলনা নেই ব'ল্লেই চলে। এই প্রভাব-বৈশিষ্ট্যের কারণ দু'টী। প্রথম কারণ ঐতিহাসিক—তা এই যে সমগ্র বাংলায় যে সংস্কৃতি-গত ঐক্য ছিল, আর কোন প্রদেশের ভৌগলিক সীমাকে পরিব্যাপ্ত করে তেমন একটি বৈশিষ্ট্য-পূর্ণ সাংস্কৃতিক ঐক্য ছিল না। দ্বিতীয়তঃ পশ্চিমের সংঘাত বাংলার সনাতনী সংস্কৃতিকে যতখানি গভীরভাবে ও যতখানি সৃজনী শক্তি নিয়ে রূপায়িত করেছিল আর কোন প্রদেশে তেমনটি হয় নাই। বাংলার সংস্কৃতি-গঠনে এবং সেই সঙ্গে বাংলার পঞ্চায়তি জীবনের গতি-বিবর্ত্তনে কলকাতার কেন্দ্রিক প্রভাবের এই হ'ল নিগূঢ় তাৎপর্য্য।

কিন্তু যে আলোচনা এখানে বিশেষ করে ক'ত্তে চাই তা' হ'ল আমাদের বিবর্ত্তমান পঞ্চায়তি জীবনে শ্রেণী-নেতৃত্বের প্রাধান্য হ্রাস-বৃদ্ধির কথা। বাংলার সর্ব্বপ্রথম পঞ্চায়তি নেতা রাজা রামমোহনের শ্রেণীসংজ্ঞা দেওয়া কঠিন। তিনি প্রভূত ভূমি-সত্বের অধিকারী হলেও তা' ছিল তাঁর সম্পূর্ণ স্বোপার্জ্জিত সম্পত্তি—আসলে তিনি ছিলেন কোম্পানীর আম্‌লা—কাজেই ভূমি-সত্বের মালিক হ'য়েও তাঁর মন ছিল বর্দ্ধিষ্ণু মধ্যবিত্তের—ষোল আনা সংস্কার-কামী। পক্ষান্তরে এ কথা নিতান্ত অর্থপূর্ণ যে রাজার অসাধারণ যুক্তি-প্রতিভায় যত প্রকার-সংস্কারের পরিকল্পনাই দীপ্যমান হয়ে উঠুক না কেন, ভূমি-বন্দোবস্তের সংস্কার তার মধ্যে একটিও ছিল না। তা হ'লেও রাজা রামমোহনের একান্ত ব্যক্তি-নির্ভরশীল নেতৃত্ব শ্রেণী-সংজ্ঞাহীন, কিন্তু ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে তাঁর দেশত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে কলকাতার পঞ্চায়তি জীবনের যাঁরা নেতৃ-স্থান অধিকার কর্লেন তাঁরা হলেন সকলেই ভূস্বামী অর্থাৎ ভূমি-সত্ব-বান জমিদার সম্প্রদায়ের অগ্রণী, যেমন শোভাবাজারের রাজা স্যার রাধাকান্ত দেব, উত্তরপাড়ার রাজা জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও পাথুরেঘাটার প্রসন্নকুমার ঠাকুর। এই সব ভূমি-নিষ্ঠ নেতারা সকলেই বিদ্বান না হলেও বিদ্যোৎসাহী ছিলেন, তবে এঁদের নেতৃত্ব ও জনপ্রিয়তার ভিত্তি ছিল দান-দক্ষিণা বা সাধারণের কার্য্যে অর্থ বিতরণ নয়—সে ভিত্তির প্রতিষ্ঠা ছিল সম্পূর্ণভাবে এঁদের শাসক-দরবারে ওমরাহি বৃত্তির উপর। লক্ষ্যের ব্যাপার এই যে এই নেতৃ-সম্প্রদায় নিজেদের বৈষয়িক স্বার্থের বলে নূতন শাসনতন্ত্রের সঙ্গে আত্মীয়তা স্থাপন কর্ত্তে গিয়ে একদিকে যেমন নিজেদের অনেকখানি সম্প্রসারণ কর্ত্তে বাধ্য হয়েছিলেন, তেমনি ধর্ম্মাদর্শ ও সামাজিক আচার-ব্যবহারে নিজেদের একান্ত সঙ্কুচিত করে রক্ষণশীলতার পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছিলেন। ব্রিটিশ রাজত্বের প্রথম যুগে বিদেশী শাসকেরা ভারতীয় প্রজার কাছে আর্থিক ও রাষ্ট্রিক সহযোগিতাই চেয়ে এসেছেন—কেননা এইটেই ছিল তাঁদের কাম্য, সহযোগের ক্ষেত্রকে বৃহত্তর করে অভীষ্ট সহযোগকে বিপন্ন না করার সাবধানী বুদ্ধি ও সচেতনতা তাঁরা বোধ হয় আজও হারান নি। কাজেই উনিশ শতকের দ্বিতীয় পঁচিশ বৎসরে আমরা যে জমিদার নেতৃত্বে রাজনৈতিক সহযোগের সঙ্গে সাংস্কৃতিক অসহযোগ বা রাষ্ট্রিক উদারতার সঙ্গে সনাতনী ধর্ম্মাদর্শের অদ্ভুত

গলাগলি দেখ্‌তে পাই তা'র একদিককার কারণ যেমন দাস মনোভাবের complex, অন্যদিককার কারণ তেমনি শোষক মনোভাবের simplex.

১৮৩০-৪০ খৃষ্টাব্দের এই সনাতনী অথচ সহযোগী নেতৃত্বের বন্যাব সঙ্গে সঙ্গে রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক উভয়মার্গেই সংস্কার-কামী নেতৃত্বেরও একটা ক্ষীণ-ধারা পুষ্টিলাভ করে আস্‌ছিল। রাজা রামমোহনের সাংস্কারিক নেতৃত্বের শিষ্য ছিলেন রবীন্দ্রনাথের পিতামহ দ্বারকানাথ ঠাকুর। তিনি কোম্পানীর আমলাগিরি থেকেই সঙ্গতিবান হ'ন এবং সেই স্বোপার্জ্জিত সম্পত্তি হ'তে যে একমাত্র ভূমি-সত্বের অধিকারী হন তা নয়, সঙ্গে সঙ্গে সেই সঙ্গতিকে তিনি ব্যবসায়ে নিয়োগ করেন। রাজা রামমোহনের অসাধারণ যৌক্তিক মেধার তিনি অধিকারী না হলেও, রাজারই মত তিনি ছিলেন ব্যক্তি-নির্ভর এবং কাজে কাজেই মানসিক প্রকৃতিতে সংস্কার-পন্থী। ব্যক্তি-সম্ভ্রম ও কালোপ-যোগিতাই ছিল দ্বারকানাথের সংস্কার-প্রয়াসের প্রাণ—এমন কি তা এ বিষয়ে দেশী বিদেশীর বিচার কর্ত্ত না। তাই ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে যখন ইংরাজ মহলে প্রথম "কালো আইন" আন্দোলন হয়, অর্থাৎ এদেশে ইংরাজদের দেওয়ানী বিচার একমাত্র উচ্চ দেওয়ানী আদালতে হওয়ার বিরুদ্ধে আইন প্রণয়নের যখন প্রস্তাব হয়, তখন টাউন হলের প্রতিবাদ সভায় যোগদান ক'রে দ্বারকানাথ বলেন, এই নূতন প্রস্তাব সত্যই ন্যায়-পরিপন্থী, কেননা মফঃস্বলে তাঁর মতে সত্যিকার বিচার হয় না এবং যেহেতু এ দেশের লোকেরা কুবিচারের দাস হয়ে আছে, তার জন্য ইংরেজদেরও কেন সেই দাসত্বের সামিল করা হবে। ইংরাজের স্বপক্ষে হ'লেও এই উক্তি দ্বারকানাথের একান্ত মানব-ধর্ম্মী ও ব্যক্তি সম্ভ্রমাত্মক সংস্কারিক মনেরই পরিচায়ক। সে যাই হোক, ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে যখন লাখেরাজ বাজেয়াপ্তির প্রস্তাব এল, তখন জমিদারী নেতৃত্বের পালে লাগল উল্টা হাওয়া এবং সহযোগী ও সাংস্কারিক মাঝি মিলে একই সঙ্গে পঞ্চায়তি নৌকায় গুণ টান্‌তে সুরু করে দিলেন। প্রসন্নকুমার ঠাকুরের তীব্র প্রতিবাদে লাখেরাজ বাজেয়াপ্তির প্রস্তাব খানিকটা মন্দীভূত হ'লেও রদ হ'ল না এবং দ্বারকানাথ ঠাকুর স্বয়ং অগ্রণী হয়ে প্রতিষ্ঠা কর্লেন Bengal Landholders Society. ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে বিলাত হতে দ্বারকানাথ পার্লামেন্টের সদস্য George Thompsonকে এদেশে নিয়ে এলেন, ৩১নং ফৌজদারী বালাখানায় সপ্তাহের পর

সপ্তাহে ইংরাজের ভারত শাসনের বিরুদ্ধে আবেগময়ী বক্তৃতার ধূম পড়ে গেল, British India Societyর প্রতিষ্ঠা হ'ল—এক কথায়, স্বত্ব-সম্ব জমিদার-নেতাদের প্রতিবাদী ক্ষুব্ধ পরিমণ্ডলের আওতায় অ-সহযোগী পেশাজীবী মধ্যবিত্ত সমাজের ভবিষ্যৎ আন্দোলনের গোড়াপত্তন হ'ল। ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দের বৈষয়িক পরিস্থিতিতে Thompson আন্দোলন স্থায়ী হ'ল না, তবে এর ফলে দ্বারকানাথের সাংস্কারিক নেতৃত্ব যে বেগবান হ'য়ে উঠল তা'তে সন্দেহ নেই। দ্বারকানাথের সঙ্গে ঐ সময়ে রামগোপাল ঘোষ—তিনিও ছিলেন একজন প্রতিষ্ঠা-লব্ধ ব্যবসায়ী—পঞ্চায়তি রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হ'লেন। ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে ইংরাজদের ফৌজদারী বিচার সম্পর্কে যে দ্বিতীয় "কালো আইন" আন্দোলন হয় তার বিরুদ্ধে রামগোপাল ঘোষই ভারতীয় প্রতিপক্ষদের আন্দোলনের নেতৃত্ব করেন। রামগোপালের বাগ্মী-প্রতিভা ছিল অসাধারণ। ১৮৫১ খৃষ্টাব্দের তৃতীয় "কালো আইন" আন্দোলনের নেতৃত্বের ভারও পড়েছিল তাঁরই উপর। ইতি-মধ্যে Hindu Patriotও হস্তান্তরিত হ'য়ে হরিশ মুখুয্যের সম্পাদনতায় প্রাণবাণ হয়ে উঠেছিল। এদিকে ১৮৫১ খৃষ্টাব্দের আন্দোলন যে শুধু সার্থক হ'ল তা নয়, ফলপ্রসূও হ'ল—আন্দোলনের অবসানে British Indian Association-এর প্রতিষ্ঠা হ'ল, সভাপতি নির্ব্বাচিত হ'লেন রাজা স্যার রাধাকান্ত দেব এবং যুগ্ম সম্পাদকের অন্যতম হ'লেন দ্বারকানাথের পুত্র দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। সহযোগী জমিদার-নেতৃত্বের বিষ-দাঁত ভেঙ্গে গেল। ভূ-স্বামীদের কুল গৌরবের সহিত ব্যবসায়ীর ধনাভিজাত্যের অন্তর্নিহিত বিরোধ মিটে গেল, শাসন-তন্ত্রের নির্বিচার পোষকতার কাচারী-বাড়ীতে সতর্ক প্রতিবাদীর হাল্‌কা রঙের বিজয় নিশান উড়াল হ'ল। এইরূপে ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে শক্ত হ'য়ে উঠল ক'লকাতার পঞ্চায়তি জীবনের বনিয়াদ।

বলা বাহুল্য যে এ বনিয়াদের চৌহদ্দী-সীমানার মধ্যেও যাকে বলি আমরা সত্যিকার মধ্যবিত্ত তার স্থান ছিল না। আসলে বাংলা দেশের কথা দূরে থাক, ক'লকাতায়ও ১৮৫০-৬০ খৃষ্টাব্দের যুগে ইংরাজী শিক্ষায় শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজ গড়ে ওঠে নি—শুধু সেই সমাজের একটা অস্পষ্ট চেতনা জীবন-দৃষ্টির উচ্চ পর্দ্দায় বিক্ষোভিত হয়েছে। এ যুগের মধ্যবিত্ত সমাজের একমাত্র আভি-জাত্য-বঞ্চিত পঞ্চায়তি নেতা ছিলেন হরিশ মুখুয্যে। কিন্তু হরিশ মুখুয্যেকে

অভিজাত সমাজ আত্মসাৎ করে ফেলেছিলেন, তাই Hindu Patriot বিদ্রোহী সিপাইদের নির্য্যাতন-প্রস্তাবের বিরুদ্ধাচরণ করে এবং নীলকরের অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী কণ্ঠ উত্তোলন করেই দেশ সেবার আদর্শকে উজাড় করে ফেলেছিল এবং হরিশ মুখুয্যের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই তাঁরি Patriot হয়ে দাঁড়িয়েছিল ষোলআনা British India Association-এর মুখপাত্র। উনিশ শতকের মধ্যভাগে আভিজাত্য-নেতৃত্বের এই অভিনব পরিণতির সম্ভাব্য ও মর্ম্ম উপলব্ধি ক'র্ত্তে হলে দু'টো কথা বিশেষ করে স্মরণ রাখা দরকার। প্রথমতঃ বিলাতে ১৮৩২ খৃষ্টাব্দের Reform Bill এর ফলে ভূমিনিষ্ঠ সম্প্রদায়ের রাজনৈতিক প্রাধান্য প্রবর্ত্তিত হ'ল, তার একটা ঔপনিবেশিক রূপও ছিল—ভূমিসর্ব্বের অধিকারীদের যথেচ্ছ শোষণ-পন্থার বিরুদ্ধে বিদেশী সরকার এদেশেও তীক্ষ্ণদৃষ্টি হ'য়ে উঠলেন। বাংলার ভূস্বামীরা অজ্ঞাতে তাঁদের ভবিষ্যৎ সত্ত্ব-বিচ্যুতির আশঙ্কায় সাবধানী হ'য়ে উঠলেন—কাজেই নির্ব্বিকার সহযোগিতার পরিবর্ত্তে সাংস্কারিকের অসহযোগিতার আদর্শকে স্থান দেওয়া সহজ হ'য়ে পড়ল। রাধাকান্ত দেব যখন আগ্রার লরেন্স উদ্যানে বড় লাটের খেতাব-পত্র নিয়ে ব্রজবাস ও রাজভক্তির দ্বন্দ্ব মিটাতে ব্যস্ত ছিলেন, প্যারীচরণ মুখার্জ্জি মহাশয় ঐ সময়ে উত্তরপাড়ার বাড়ীতেও লাট পরিষদে Rent Actএর পাণ্ডুলিপির ধারা শুনছিলেন। এ ছাড়া ১৮৫০ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি যখন যোড়াসাঁকোর বাড়ীতে ব্রাহ্ম সমাজের ভিত্তি পাকাপোক্ত হ'য়ে বস্‌ল, তখন রাষ্ট্রিক সংস্কার ও ধর্ম্ম-সংস্কারের পূর্ব্বতন অবিচ্ছিন্ন স্রোত স্বতন্ত্র ধারায় বিভক্ত হ'য়ে পড়ল, রাজনীতির ক্ষেত্র হ'তে ধর্ম্ম সংস্কার ও সমাজ সংস্কারের নেতৃত্ব নির্ব্বাসিত হ'ল, রামমোহন অনুপ্রাণিত দ্বারকানাথ ঠাকুরের পুত্র দেবেন্দ্রনাথ ও রামগোপাল ঘোষ এই দুই বিভিন্ন নেতৃত্বে পর্য্যবসিত হ'ল।

১৮৫২ খৃষ্টাব্দে সহযোগী ও অসহযোগী আভিজাত-নেতৃত্বের যে মিলন ঘট্‌ল, অল্পদিনের মধ্যেই তার অন্তঃশীলা সাংস্কারিক স্রোত স্বার্থ-নিষ্ঠ রক্ষণশীলতার বালিতে শুকিয়ে মরল; ফলে অসহযোগ-আস্ফালন এক বিরোধী সহযোগিতায় পরিণত হ'ল—কৃষ্ণদাস পাল ও স্যার যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর ১৮৬০ হ'তে ১৮৮২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এই অভিনব আভিজাত্য-নেতৃত্বের কাণ্ডারী হ'লেন। এই আদর্শ পরিবর্ত্তনের গূঢ় কারণ এই যে ১৮৬০-৭০ খৃষ্টাব্দের যুগে রামগোপাল

ঘোষের স্থলবর্ত্তী কোন অ-ভূস্বামী দক্ষ নেতার আবির্ভাব হ'ল না। বাংলায় বোম্বাইর মত Crimean Warএর সঙ্গে সঙ্গে ধনিক বৃত্তির কোন সম্প্রসারণই হ'ল না, এ প্রদেশের বৈষয়িক পরিণতি হ'ল পেশাদারী ও চাকুরীজীবী নিম্ন-মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের উদ্ভবে। কাজেই ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে যখন Bengal Tenancy Act পাশ হ'ল, সে সময়েই বাংলার পঞ্চায়তি জীবনে অভিজাত সমাজের নেতৃ-দণ্ড খসে পড়ল মধ্যবিত্ত সমাজের হাতে।

অভিজাত সমাজ কিন্তু ধাক্কা পেলেন ১৮৮২ খৃষ্টাব্দের শ্রাদ্ধ ক্রিয়ার বহু আগে থেকেই—১৮৬৬ খৃষ্টাব্দ থেকে। "অমৃত বাজার পত্রিকার" সম্পাদক শিশিরকুমার ঘোষকেই বলা যেতে পারে বাংলার পঞ্চায়তি জীবনের সর্ব্বপ্রথম মধ্যবিত্ত সমাজের নেতা। ঐ সময়ে কলকাতায় ও মফঃস্বলে শিশিরকুমার People's Association প্রতিষ্ঠা করলেন, কলিকাতা কর্পোরেশনে নির্ব্বাচনী প্রথা প্রবর্ত্তন করার স্বপক্ষে সর্ব্বসাধারণের পক্ষ হ'তে আন্দোলন চালালেন। লক্ষ্যের ব্যাপার শুধু এই যে যদিও ১৮৬৫ সালে পাবনা জেলায় জমিদার প্রজায় তুমুল হাঙ্গামা হ'য়ে গেল এবং হাইকোর্টে কুড়িজন জজের সাক্ষাতে পনর দিন ব্যাপী Great Rent Case-এর শুনানি হ'ল, এই নিয়ে কোন পঞ্চায়তি নেতারই বিক্ষোভ উপস্থিত হ'ল না।

রাজনৈতিক নেতৃত্বের সঙ্গে সঙ্গে, ধর্ম্ম ও সমাজ বিষয়ক ব্যাপারের নেতৃত্বেও মোড় ফিরল—১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে বিরুদ্ধাচরণ করে কেশবচন্দ্র "ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম সমাজ" প্রতিষ্ঠা করলেন। কেশবচন্দ্র বেঙ্গল ব্যাঙ্কের দেওয়ানের পুত্র; তিনি সঙ্গতিসম্পন্ন পরিবারের সন্তান হলেও মধ্যবিত্ত সমাজেরই লোক। মহর্ষির প্রচারিত বর্ণাভিজাত্য তিনি অস্বীকার করলেন; বিবাহ প্রথার আইন শোধিত করার কল্পনাও তাঁরই ছিল; তিনি মফঃস্বলের সহরে সহরে বক্তৃতা ক'রে নব্য-শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজের নিকট ধর্ম্মসংস্কারের বাণী ঘোষণা করলেন, ফলে—১৮৬৭-৬৮ খৃষ্টাব্দের বাংলায় তরুণ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মনে আগুন লেগে উঠল। যোড়াসাঁকোর সংস্কার-ধর্ম্মের আভিজাত্য-আসন টলে উঠল। কিন্তু ধর্ম্ম ও সমাজ সাধনার ক্ষেত্রে মধ্যবিত্ত সমাজের আভিজাত্য-বিজয়ী সার্থকতার বায়ু উচ্ছ্বাস বা effervescence উৎপত্তির সঙ্গে সঙ্গেই তলিয়ে গেল। এক নূতন মধ্যবিত্ত নেতৃত্বের সূচনা হ'ল

—এঁদের ধারণা হ'ল সংস্কার মানেই প্রগতি নয় ; প্রগতির যথার্থ রূপটা এঁদের কাছে স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়ল না—ফলে সংস্কারের যুগে এল সংস্কৃতির উপর ঝোঁক এবং পঞ্চায়তি জীবনে কোন সুনির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম-পরিকল্পনার পরিবর্ত্তে এক ভাবালু nostalgia. বঙ্কিমচন্দ্রই ছিলেন এই শেষোক্ত মধ্যবিত্ত নেতৃত্বের উৎস। আশ্চর্য্য যে কেশবচন্দ্র ও বঙ্কিমচন্দ্র জন্মান একই বৎসরে—১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে। কিন্তু ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে কেশবচন্দ্র যখন বিলাত থেকে প্রত্যাবৃত্ত হ'য়ে এদেশে বিলাতী home অর্থাৎ ভিক্টোরীয়ান মধ্যবিত্তের পরিবারাদর্শ প্রবর্ত্তন ক'র্ত্তে ব্যগ্র, ঠিক সেই সময়েই আবার জন্ম নিল বঙ্কিমচন্দ্রের "বঙ্গদর্শন"। বঙ্কিমচন্দ্রের যে রক্ষণশীলতা ছিল তা' ১৮৩০ খৃষ্টাব্দের সনাতনী আভিজাত্য নেতৃত্বের রক্ষণশীলতা নয়, কেননা তাঁর মনে দাস মনোভাবের complex ছিল না, মানব-ধর্ম্মকে বিকৃত করার যে গ্লানি তা' কিছুতেই তাঁর প্রত্যক্ষবাদী সহানুভূতির অনুগত হওয়া সম্ভবপর ছিল না। বঙ্কিমচন্দ্র মধ্যবিত্ত রাজনৈতিক নেতৃত্বের গলদ স্পষ্ট করেই জানতেন, শিশিরকুমারের People's Associationকে তিনি কোন মূল্য দেন নাই কারণ তাঁর মতে যে প্রতিষ্ঠান জমিদারের সঙ্গে কৃষকের পক্ষ হ'য়ে বিরুদ্ধাচরণ ক'র্ত্তে পারবে না সে প্রতিষ্ঠান নিতান্তই সৌখীন ব্যাপার। তা হ'লেও বঙ্কিমচন্দ্রের মনের একটা অভিজাত্য-ধর্ম্ম এবং সেটা ছিল সম্পূর্ণ সাংস্কৃতিক। আমার বিশ্বাস যে মনের অন্তরতম প্রদেশে বঙ্কিমচন্দ্র যে সক্রিয় কর্ম্মপন্থার অর্গলবদ্ধতা তীব্রভাবে অনুভব করেছিলেন তা থেকে পলায়ন ক'র্ত্তে গিয়েই তিনি অজ্ঞাতে এক উচ্চশির আভিজাত্য-বাদী সংস্কৃতি-আদর্শের আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনের এই ট্র্যাজেডি সজ্ঞানভাবে একক হ'লেও তাই ছিল সে যুগের মধ্যবিত্ত-মানসের সাধারণ সঙ্কট। ঐ যুগের "নবজীবন" ও "ভারতীর" দ্বন্দ্ব, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে শশধর তর্কচূড়ামণি ও কৃষ্ণপ্রসন্ন সেনের বিরোধ, "বঙ্গবাসীর" সঙ্গে "সঞ্জীবনী"র কলহ—এক হিসাবে তাদের বস্তুনিষ্ঠা থাকলেও অন্য হিসাবে এ সব দ্বন্দ্ব-বিরোধই ছিল অর্থহীন—আজকের বিচারে দু'পক্ষেরই পরাজয় হয়েছে। আসল কথা ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৯০৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত যে মধ্যবিত্ত নেতৃত্বের যুগ তার লাক্ষণিক ভাব ছিল এক সুতীব্র nostalgia.

১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে যে মধ্যবিত্ত নেতৃত্বের সূচনা ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে Indian Asso-

ciation ও সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে তার পূর্ব পরিচয়। Bengali পত্রিকার জন্ম হয় তার দুবছর পর থেকেই। সুরেন্দ্রনাথ বানার্জি, আনন্দমোহন বসু, নরেন্দ্রনাথ সেন প্রভৃতি নেতা যাঁরা এ যুগের গোড়াতে পঞ্চায়তি রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হ'লেন তাঁরা সকলেই মধ্যবিত্ত, তবে সম্পন্ন মধ্যবিত্ত বা তাঁদের সন্তান। এক আনন্দমোহন বসুর কথা বাদ দিলে এ যুগের নেতারা সকলেই ছিলেন বাগ্মিতা-কুশলী। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে Ilbert Bill আন্দোলন উপলক্ষে মনোমোহন ঘোষ যে বক্তৃতা করেন, Separation of Judicial and Executive আন্দোলনের স্বপক্ষে লালমোহন ঘোষ যে ঢাকা শহরে কয়েকটী বক্তৃতা প্রদান করেন, রাণী ভিক্টোরিয়ার মৃত্যু উপলক্ষে লর্ড কার্জনের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে সুরেন্দ্রনাথ যে অপরাজেয় বাগ্মি-খ্যাতি অর্জন করেন, সে সবই আজ ঐ যুগের পঞ্চায়তি জীবনের কিংবদন্তীর স্থান জুড়ে আছে। এই বাগ্মিতা-প্রাধান্য সত্য সত্যই অর্থসূচক—তা এ যুগের পঞ্চায়তি-নেতৃত্বের অভিনায়ক রূপেরই সাক্ষ্য দেয়। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দের বঙ্কিমচন্দ্রের কৃষি-সমৃদ্ধির স্বপ্ন সফল হয় নি কিন্তু তিনি নিজ জীবনেই বাংলার পেশাদারী সম্প্রদায়ের বৃত্তি-সার্থকতা ও আর্থিক সফলতা দেখে গিয়েছিলেন। ধ্যানস্থ বিবেকানন্দের চক্ষে এই পেশাজীবী বাঙ্গালার আত্মঘাতী কদর্য্যতা ধরা পড়েছিল, তাই তিনি ঘোষণা করেছিলেন, "বল সগর্ব্বে বল, চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই।" কিন্তু স্বামী বিবেকানন্দের অধ্যাত্ম-বুদ্ধি-নির্ধ্যাসিত ভৎসর্নায় কান দিবার ফুর্সত মধ্যাস্থি নেতৃত্বের সে যুগে ছিল না। স্বদেশী যুগের তিনটী বৎসর তখন অবসন্নপ্রায়। রাজনৈতিক তথাগতের পদার্পণ হ'ল বাঙ্গালার আঙিনায় কিন্তু বাঙালী তাকে বরণ করল অভিসারিকার সৌখীন পাদ্য-অর্ঘ্য দিয়ে, সাধকের কৃচ্ছ্র-কঠোর আত্মদানেচ্ছা দিয়ে নয়। স্বদেশীর দিনে বাংলার সার্থক-বৃত্তি পেশাজীবী মধ্যবিত্ত বিদেশী শাসনের বাস্তব রূপটী কিছুতেই ধরতে পারল না—ফলে ভাটার লগ্নে পে'ল শুদ্ধ বাস্তব প্রয়াসকে ভাবাচ্ছন্ন করে দেখবার এক মারাত্মক অভ্যাস—আজকের বাঙালায় ৩৫ বৎসর পরেও সে অভ্যাস কাটিয়ে উঠবার দৃষ্টি-রূঢ়তা লাভ কর্ত্তে পারে নি।

১৯০৮ হ'তে ১৯২১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বাংলার পঞ্চায়তি জীবনে রাজনৈতিক তরঙ্গ শান্ত হ'য়ে এসেছিল, তার কারণ স্বদেশী যুগের ব্যর্থ ভাবাতিশয্যের

প্রতিক্রিয়া। বঙ্গ-বিচ্ছেদে বাঙালী মধ্যবিত্তের মনে যে ভাবালু বিক্ষোভের সৃষ্টি হ'য়েছিল, এ যুগে বঙ্গভঙ্গ রদের ফলে তার অনুরূপ কোন উল্লাসের সৃষ্টি হয় নি। তার কারণ সমাজের বৈষয়িক রন্ধনশালায় যে প্রক্রিয়া চল্‌ছিল, তাতে নীচের হাঁড়ির উপরের হাঁড়িতেও "বাংলার সোনার ফসল" আর তেমন করে সুসিদ্ধ হচ্ছিল না। ১৯২১ সাল হ'তেই বাংলার পঞ্চায়তি নেতৃত্বের কাণ্ডার এসেছে অ-সম্পন্ন বা নিম্ন মধ্যবিত্তের হাতে। তবে সে নেতৃত্ব-পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে এসেছে বিলাতী ডিমোক্রেশির প্রবল ধাক্কা—ধনিকতন্ত্রের অশরীরী সূক্ষ্ম অথচ অতি তীব্র প্রভাব। কাজেই মধ্যবিত্ত আজ সজ্ঞানে নেতার আসনে আছে না অজ্ঞানে নেতৃত্বের বেনামদারীর কাজ ক'চ্ছে, সে কথা কে বলে দেবে। *

শ্রীক্ষেত্রমোহন পুরকায়স্থ

---

* ইংরাজী ১৯৪৩ সালের ২৭শে মার্চ্চ তারিখে লেখক কর্তৃক "শনিবারের বৈঠকে" প্রদত্ত আলাপনী বক্তৃতার সারাংশ।

কসাইপাড়ার মুখটায়

তা হ'লে শোন বলি এক গল্প।

বেতো ডান পা টা ছ'হাতে আঁকড়ে ধ'রে অতি কষ্টে কোলের ওপর ভেজে বাবু হয়ে বসলেন নিধুখুড়ো। বেদনাকর প্রচেষ্টায় খুড়োর সারা মুখখানার ওপর যেন একটা টনটনে ব্যথা মুহূর্তের জন্ত আর্তনাদ ক'রে উঠে মিলিয়ে গেল। নিধুখুড়ো একটু হাসলেন। চোখ ছুটো ওঁর ছুর্নিরীক্ষ্য একটা চাপা কৌতূহলে অন্ধজলের সরপুঁটির মত থেকে থেকে চিকিয়ে উঠছিল।

আঙুলের চুণ দাঁতে কেটে মুখিয়ে উঠলেন নিধুখুড়ো, তা অত দূর দূর কেন? এগিয়ে এসো তোমরা সব।

অষ্টসখীর মত বেষ্টন ক'রেই বসেছিলাম; তবু বল্লেন যখন খুড়ো তখন আগ্রহে আরও খানিকটা এগিয়ে ব'সতে হ'লো।

ঢোক গিলে খুড়ো বল্লেন, এ আর তোমার কিন্তু সেই উপকথার রাজরাণীর গল্প নয়। পক্ষীরাজ ঘোড়াও এতে নেই আর অলস কোন তন্বী রাজছুলালী পালঙ্কের ওপর আধশোয়া হ'য়ে কাকাতুয়ার গলা চুলকেও দেবে না। এ তোমার একেবারে জাজ্বল্যমান সত্যিকারের গল্প। রূপকথার রঙীন রঙ্গরস হয়তো এতে তুমি পাবে না, কিন্তু এমন কাব্য এতে আছে হাড়মাসের ব্যূহভেদ ক'রে যা তোমার প্রত্যেকটা শিরা উপশিরাকে টনটনিয়ে তুলবে। রিয়ালিজম্ রিয়ালিজম্ কর দেখবে রিয়ালিজম্। আই-ডিয়ার চোদ্দ পুরুষের গুষ্টির.........ষাগ্‌গে সে কথা। দেখবে যে রিয়ালিটির ভেতরটা ঠিক পশ্চিমের বালুসাই-এর মত মিঠে, রস শুকিয়ে মিছরি দানা বেঁধে গেছে। তবে কি জান।......আচ্ছা তা হ'লে এবার গল্পটা বলি শোন।

খুড়োকে মধ্যমণি ক'রে আগ্রহের আতিশয্যে আমরা সব চারদিক থেকে চেপে ব'সলাম। পেছনে প'ড়ে রইল বিস্তীর্ণ সাদা ফরাস—আপন রিক্ততায় মুখখানা যেন ওর চুণ হ'য়ে রইল।

মুখ নীচু ক'রে স্থির হ'য়ে ব'সেছিলেন নিধুখুড়ো। কি যেন ভাবছিলেন। উস্কোখুস্কো চুলের ছ এক গোছা খুড়োর কপাল বেয়ে সাপের ফণার মত ছল-

ছিল সামনে। আমরা সাগ্রহে প্রতীক্ষা করছিলাম—এই একটু ভেবে নিয়েই আরম্ভ ক'রবেন আর কি খুড়ো।

হঠাৎ ভ্রূ কুঁচকে মাথাটা ঝেঁকে খুড়ো ব'লে উঠলেন, জানলে, বাইরের সঙ্গে ভেতরের এতখানি বৈসাদৃশ্য আর কখনও আমার চোখে পড়ে নি। কত লোককেই তো দেখলুম আজ পর্য্যন্ত কিন্তু কই। ও রকম একটা ক্যারেক্টারের গ্রিপ। ওঁর হাতখানা সহসা আমার নাকের ডগার ওপর মুঠিয়ে উঠে কাঁপতে লাগলো।

আমরা সব মুখ চাওয়া চাওয়ি ক'রে চোখে হাসছিলাম।

খুড়ো বল্লেন, ফলো ক'রতে একটু অসুবিধে হচ্ছে—না।

বল্লাম, বিলক্ষণ।

—আচ্ছা তা হ'লে আমি গল্পের মত ক'রেই বলি এইবার। শোন তোমরা সব।

খুড়োর মুখখানা আড়াল ক'রে সামনেই ব'সেছিলাম আমি। পেছন থেকে কমলবাবু, আমাদেরই একজন ইয়ার, আমাকে লক্ষ্য ক'রে ব'লে উঠলেন, আপনি কি কোন স্বচ্ছ পদার্থ?

সচকিত হ'লাম।

ভাবলাম, বন্ধুবর হয়তো বা কোন জটিল বৈজ্ঞানিক ফ্যাকড়ার সমাধান খুঁজছেন।

বল্লাম, মাপ করবেন। মানে সায়ান্সের ল-ব-টও আমার জানা নেই।

কমলবাবু বল্লেন, যাগগে, এখন আপনি একটু পাশ ফিরে ব'সবেন কি। খুড়োর মুখখানা আমি একেবারেই দেখতে পাচ্ছি না।

সবাই হেসে উঠল। আমিও হাসলাম—একটু পরে।

উরোতে একটা চপেটাঘাত ক'রে খুড়ো আবার তেতে উঠলেন, তা হ'লে বলি শোন।

আমরা সব নাক টেনে গলা ঝেড়ে ঢোক গিলে খুড়োর ওপর নাক তুলে ধ'রলাম।

দৃষ্টিটা আমাদের ওপর আর বাঁ হাতখানা আলিপুরের দিকে বেঁকিয়ে ধ'রে খুড়ো বল্লেন, আচ্ছা, ঠিক ফলসা বাগানের ব্রীজটা পেরিয়ে ডানহাতি

পোটোপাড়ার দিকে মোড় ঘুরতেই একটা তেলেভাজার দোকান আছে লক্ষ্য করেছিস্? পাশেই একটা সেকেণ্ড হ্যাণ্ড লোহালক্কড়ের দোকান, তার সামনেই দাঁড়ে বসানো ঝুঁটীওয়ালা একটা আফগানী বুলবুল—বাজী লড়ে দুশ-পাঁচশ'—হাজার। আরে কি যে বলে ওর নামটা……। খুড়ো দাড়িতে হাত বুলোতে লাগলেন।

কামাক্ষীপ্রসাদ বল্লে, আপনার ঐ কসাইপাড়ার মুখটায় তো।

খুড়ো কামাক্ষীপ্রসাদের প্রস্তাবের ওপর তর্জ্জনীর একটা খোঁচা মেরে হাঁ হাঁ ক'রে উঠলেন। হেসে বল্লেন, ঠিক ধ'রেচো এইবার।

অবস্থানটা মোটামুটি বোঝা গেল। চোখ বুঁজে কড়া জর্দ্দা দেওয়া পানের এক ঢোক পিক গিলে খুড়ো বল'লেন, ঠিক ঐ রাস্তার মোড়ের মাথায় ছিল যজ্ঞেশ্বর স্যাকরার দোকান।

কামাক্ষীপ্রসাদ বলে, যজ্ঞেশ্বরটা কে? বিরক্ত হন খুড়ো। হাত তুলে খেঁকিয়ে বলেন, আহা শোনই না ব'লছি। মাঝখান থেকে যজ্ঞেশ্বরটা কে!

কামাক্ষীপ্রসাদ অপ্রতিভ'এর ভাব দেখিয়ে আচ্ছা আচ্ছা ব'লে ঠোঁটে আঙুল ছোঁয়ায়।

খুড়ো বলেন, যজ্ঞেশ্বরটা কে—কোত্থেকে এলো তা অবিশ্যি আমার জানা নেই। তবে ছোটবেলা থেকেই দেখতুম যে লাল কাপড়ের প্যানেলিং করা অন্ধকার ছোট্ট ঘরখানার মধ্যে আগুনের মালসা সমুখ ক'রে ব'সে একটা বুড়ো নেয়াই'এর ওপর কি যেন দিনরাত ঠুক ঠুক ক'রে ঠোকে, আর কাশে। কাশে আর ঠিক দোকানের সামনে এক খাবলা ক'রে গয়ের ফেলে। জ্ঞান হবার পর থেকে বুড়ো বয়স পর্য্যন্ত ঐ একই ভাবে দেখে এসেছি বুড়োকে। দৈনন্দিন জীবন যাত্রার মধ্যে কোনদিন কোন বৈচিত্র্য দেখতে পাই নি। ঐ সেই সুতো বাঁধা ওভাল সেপের চশমাটা নাকের ডগার ওপর ঝুলিয়ে ভোরবেলা সেই যে তিনমাথা এক ক'রে কাজে ব'সতো, সন্ধ্যার পর ঘরের ভেতর অন্ধকার জমে যেতো তবু দেখতুম ঐ একই ভাবে ব'সে আছে আর চেঁচাচ্ছে, ওরে শেতল রে—ে—ে—ে—ঃ। ডাকও পড়তো আর ঘড়িতে এদিকে সাতটাও বাজতো। আর এ রকম একদিন নয়, দুদিন নয়, নিত্যি তিরিশ দিন। এমন কি যজ্ঞেশ্বরের ডাক শুনে ঘড়ি মিলিয়ে নিয়েছি। সময়ের কোনদিন এতটুকু অদল বদল হয়

নি। ভাবছো প্রকৃত ঘটনা যা তার ওপর রং চড়াচ্ছি। কিন্তু বিশ্বাস করো আমি একটুকু বাড়িয়ে ব'লছি নে।

আমি বল্লাম, যা হোক গল্প তা হ'লে আপনার ঐ যজ্ঞেশ্বর স্যাকরার দোকান থেকেই আরম্ভ হ'লো তো।

খুড়ো মাথা নেড়ে বল্লেন, না ঠিক ওখান থেকে নয়, তবে···হ্যাঁ ব'ল্লেও ব'লতে পার।

খুড়ো আর এক ঢোক পিক গিলে ব'লে যান, এখন শেতলের বয়স যখন এই ধর তোমার পনোরো কি ষোল বছর তখন যজ্ঞেশ্বরের বউ হঠাৎ একদিন রাত্রে গেল মারা। এখনও সে রাতের কথা আমার স্পষ্ট মনে পড়ছে। বর্ষাকাল, অন্ধকার ঘুরঘুটি রাতে, টিপ টিপ ক'রে জল প'ড়ছে। দড়ির খাটের ওপর চাদর ঢাকা মৃতদেহটা ভাল ঠাহর করা যাচ্ছিল না। দোতলার রেলিং'এর কাছে চুপটি ক'রে দাঁড়িয়ে আমি লক্ষ্য করছিলাম শেতলকে—এপোলো ফার্মেসীর সিঁড়ির ওপর ব'সে কাঁদছে। কাঁদছে আর ব'লছে, ম'রেছে না বেঁচেছে। মা'য়ের ওপর বাবা নাকি যা অত্যাচারটা ক'রেছে, অন্য কোন মেয়েমানুষ হ'লে কবে বিষ খেয়ে মরতো। শুধু মা ব'লে তাই য্যাদ্দিন সহ্য ক'রে গেল।·········বাবার ঐ চশমখোর ব্যবহারের জন্যে আজকাল আমার সঙ্গেও তাই এক মুহূর্ত বনে না। দিনরাত এটা সেটা নিয়ে খুটিনাটি বেঁধেই আছে। তা আমারও আর বেশীদিন এখানে থাকা হবে না। একদিক ব'লে চ'লে যাব ভাবচি।

বল্লাম, তোর বাবা কোথায় গেছে রে শেতল?

—কি জানি। বোধ হয় পাড়ার লোক ডাকতে গেছে।

একটু চুপ ক'রে থেকে শেতল আমায় অনুরোধের সুরে বলে, আমায় ক'টা ফুল দিবি নিধে। তোদের বাগানের ঐ গোলাপ ফুল। এত রাতে বাজারে তো এখন আর ফুল কিনতে পাওয়া যাবে না।

সাগ্রহে বললাম, ফুল, ফুলের কথা ব'লছিস্?

—হ্যাঁ ফুল। এই দু'চারটে হ'লেই চলবে। বড্ড ইচ্ছে হ'চ্ছে মায়ের···।

শেতলের গলাটা হঠাৎ কেঁপে ভেঙ্গে গেল।

বল্লাম, তুই দাঁড়া, আমি বাগান থেকে তুলে নিয়ে আসছি।

পেছন থেকে শেতল বলে, দেখিস আবার বেশী তুলে ফেলিস নি যেন দাদু টের পেলে তোকে আবার বকবে।

শেতলের গলার স্বরটা কেমন যেন ভেজা ভেজা মনে হ'লো। হয়তো কাঁদছিল।

ফুল, মৃতমা, অন্ধকার রাত, অসহায় শেতল—আমার চোখেও জল ভরে এলো।

তারপর কিছুদিন কেটে গেল। যজ্ঞেশ্বরের জীবনে কিন্তু কোন পরিবর্ত্তন দেখা দিল না। সেই আগুনের মালসা হাতুড়ি আর নেয়াই। সকাল থেকে সন্ধ্যে অবধি কাজই ক'রে যাচ্ছে। অথচ কি যে কাজ তা কেউ বলতে পারে না। তবে শুনতুম, অনেক রাজরাজরার বাড়ীর গহনা গ'ড়ে যজ্ঞেশ্বরের টাকায় ছাতা ধ'রে যাচ্ছে। ছাতা ধ'রে যাচ্ছে—কথাটা অবিশ্যি একটু বাড়িয়ে বলা কিন্তু রোজগার যজ্ঞেশ্বরের বেশই হ'তো। কিন্তু ঐ নেশা। দিনরাত একেবারে চুব হ'য়ে আছে। শেতলটাও এদিকে একেবারে ব'য়ে গেল। মাঝখানে কোথায় কি গুণ্ডামি ক'রে পাঁচ ছ'মাস জেলও খেটে এলো। তারপরই আজ ওকে ছুরি মেরেছে, কাল তাকে বেইজ্জৎ ক'রেছে—পাড়ায় শেতলটা হ'য়ে উঠল তোমার সে রীতিমত একটা 'টেরার'। তবে আমাদের সঙ্গে অবিশ্যি, বরাবরই সদ্ভাব ছিল। ভাল বই কোনদিন মন্দ করে নি। কখনও না। নিজে মদ খেতো কিন্তু শেতলকে কেউ কখনও মাতাল হ'তে দেখে নি। আর গুণ্ডামি যে করতো, সেটা কি ধরণের ব'লবো,—এই ধর তোমার বড়বাজারে সোনাচাঁদির দোকান লুট হ'য়েছে পুলিশ এসে ধ'রে নিয়ে গেল শেতলকে। টালিগঞ্জের ওধারে কোন ব্রীজের নীচে অমুক ব্যাঙ্কের কি ন. কি পাওয়া গেছে—অমনি দশহাজার টাকার একটা মেলব্যাগ লুট করবার দায়ে শেতল বছর খানেক সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ ক'রে এলো। এই রকম সব বড় বড় ব্যাপার আর কি!

এই রকমভাবে কিছুদিন চলবার পর কি সুমতি হ'লো, মদ খাওয়া ছেড়ে দিলে, কুসঙ্গে মেলামেশা একেবারে বন্ধ ক'রে দিলে, ধ'রলো গানবাজনা। ছোটকাকার কাছে আবার ব্যায়লা বাজনা শিখতে সুরু ক'রে দিলে। দেখ মানুষের মন! শেতল হ'লো আর্টিষ্ট। সেবারে আমাদের বারোয়ারী 'সীতা

প্লে'তে শেতলের ব্যাকগ্রাউণ্ড মিউজিকের কথা আমি আজও ভুলি নি। ওঃ, সে কি বাজনা! কোথায় লাগে তোমার গিয়ে নাইনথ সিমফনী। সময় ও দৃশ্যটা এখনও যেন আমার চোখের সামনে ভাসছে। এই রাত তোমার দেড়টা আন্দাজ হবে। অডিটোরিয়ামে লোক একেবারে থৈ থৈ ক'রছে। কিন্তু কারো মুখে টু-শব্দটি পর্য্যন্ত নেই। রামের পার্ট ছিল পাটিকাকার। দেখিস্ নি তোরা কেউ পাটিকাকে। রেগুলার একটা জিনিয়াস। বেঁচে থাকলে রঙ্গমঞ্চের ভোল ফিরিয়ে দিত—জানিস। সে কি অভিনয় পাটিকার। দুপুর রাত। চারদিকে সব নিথর হ'য়ে আছে। পেট্রোম্যাক্সের শুধু একটা একটানা সোঁ—ও—ও—আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। আর তার মাঝখানে থেকে থেকে পাটিকার সেই প্রজানুরঞ্জন প্রজানুরঞ্জন ব'লে বুকফাটা আর্ত্তনাদ। চোখে জল নেই কিন্তু মুখের দিকে তাকাতেই মনে হচ্ছিল বুঝি তক্ষুনি পাটিকার চোখ ফেটে রক্ত বেরিয়ে যাবে। ডেলিভারির মধ্যে সে কি দরদ। আর ওদিকে তেমনি তোমার শেতলের ব্যায়লা। সে কি তান! কি-ই-বা তার বিস্তার। সুরের হাত ধ'রে মন যেন রাতারাতি বেরিয়ে যেতে চাইছিল।

যা হোক শেতলের এই আকস্মিক পরিবর্ত্তনে সকলেই আশ্বস্ত হ'লো। আজীবন সঞ্চিত পুঁজীটা অদানে অব্রাহ্মণে একেবারে যা তা ভাবে খরচ হ'য়ে যাবে ভেবে ভেবে যজ্ঞেশ্বরের চোখে এতদিন ঘুম ছিল না। আজ সে আশঙ্কাও তার খানিকটা দূর হ'লো। মনে কিন্তু বুড়োর স্বস্তি এলো না। বেয়াড়া মেজাজের অবাধ্য সন্তান, কখন কি ক'রে বসে কে জানে! এ সংশয় যজ্ঞেশ্বরের মনে কিন্তু র'য়েই গেল। সাত পাঁচ ভেবে কাউকে না জানিয়ে বুড়ো গোপনে আর একটা বিয়ে ক'রে নিয়ে এলো। হঠাৎ দু'চারদিন নিরুদ্দিষ্ট থাকবার পর শেতলের বাবা দেখি এক ষোড়শী তন্বীকে সঙ্গে নিয়ে এসে উপস্থিত। শেতল প্রথমটা একটু থতমত খেয়ে গিয়েছিল কিন্তু বুড়ো নিজেই সব সন্দেহের নিরসন ক'রে শেতলকে বল্লে, তোমার মা হন, প্রণাম কর। এমনিতে তো বাপকে শেতল বাঘের মত ভয় ক'রতো। বুড়োর কথা মত ষোড়শীর পায়ের ওপর সশ্রদ্ধ প্রণিপাত ক'রে শেতল হাসতে হাসতে ঘরের বাইরে এসে ব'ল্লে, বহুৎ খাপসুরাৎ মালুম হোতা!

আমি বল্লাম, যাঃ, মা হন না উনি তোমার!

উত্তরে শেতল খুব গম্ভীরভাবে ব'লে উঠল, ও নিশ্চয়ই।

ষোড়শীর উদ্দেশ্যে যুক্তকর কপালে ঠেকিয়ে বলে উঠলো, আলবাৎ আমার মা। মাথায় ক'রে রাখবো দেখিস্।

এর পর মাসখানেক কি মাস দেড়েক কেটেছে। হঠাৎ একদিন শুনি যজ্ঞেশ্বরের বউও নেই শেতলও নেই। তাজ্জব ব্যাপার।

সে পাড়ায় একেবারে সঙ্গে সঙ্গে ঢি ঢি প'ড়ে গেল। কত খোঁজ কত সন্ধান, কোথাও তাদের হদিস পাওয়া গেল না।

এদিকে তো এত গোলমাল। যজ্ঞেশ্বর কিন্তু যেমন তেমনই। এত বড় যে একটা কাণ্ড ঘ'টে গেল তার জন্যে যেন তার কোন রকম মাথা ব্যথা নেই।

কিন্তু এ সব ব্যাপারে তো জান, বাইরের লোকের কৌতূহল অনেক। লোকে গায়ে প'ড়ে মীমাংসা ক'রতে আসে। পাড়ার কয়েকজন এই যেমন ধর তোমার বিষ্টুকা, বুধুজেঠা, বটু ভট্‌চাষ, আচায্যি মশাই এঁদের মাথার মধ্যে অমনি পর হিতৈষণার বীজাণুগুলো সব কিলবিলিয়ে উঠল। এগিয়ে এলেন সবাই—এর একটা বিহিত ক'রতেই হবে। যজ্ঞেশ্বরকে ডেকে নিয়ে নানা রকম পরামর্শ দিতে লাগলেন এঁরা। বিষ্টুকা ব'ললেন, ছেলেকে তুমি ত্যজ্য পুত্তুর ক'রে দাও যজ্ঞেশ্বর। হারামজাদা কুলাঙ্গার কোথাকার। বেটা ছেলে হ'য়ে বাপের এই সর্ব্বনাশটা করলি।

এত কথা এত পরামর্শ—যজ্ঞেশ্বরের কিন্তু কি রকম যেন একটা উদাসীন ভাব, কারো কথায় যেন কোন ভ্রুক্ষেপ নেই। তারপর হঠাৎ একদিন কর্ত্তাদের মুখের ওপর ব'লে দিলে, আমার একান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপারে আপনারা আমায় কোন পরামর্শ না দিতে এলেই বরং আমি খুসী হব। যখন তখন দল বেঁধে আপনারা আমার কল্যাণকামনা করতে আসবেন, আমার কি হ'লো এই দুর্ভাবনায় আপনাদের মাথার চুলগুলো মিথ্যেমিথ্যি সাদা হ'য়ে যাবে, এ যেন আমার কাছে একেবারে অসহ্য হ'য়ে উঠেছে। আপনারা আমায় রেহাই দিন। একটু শান্তিতে থাকতে দিন।

খোঁতা মুখ ভোঁতা বানিয়ে কান লাল ক'রে তো সব ফিরে এলেন। পাড়ার পঞ্চায়েতের পক্ষে এ তো আর কম অপমানের কথা নয়। মনে মনে

আমি নিজে কিন্তু ভারী খুসী। ঠিক ক'রেছে যজ্ঞেশ্বর, আরও দু কথা শুনিয়ে দিলে পারতো। আমার মনের ভাব তখন এই রকম আর কি। কিন্তু কর্তাদের মাথা হেঁট ক'রে দিয়েছে যখন যজ্ঞেশ্বর, তখন তার কি আর ক্ষমা আছে নাকি! এত বড় স্পর্দ্ধা সামান্য একটা স্যাকরার! বটু ভট্‌চাযের দল তো চ'টেই আগুন। পাবে তো তক্ষুনি বুড়ো যজ্ঞেশ্বরের মাথা মুড়িয়ে ঘোল ঢেলে পাড়ার বার ক'রে দেয়। বিষ্টুকার দল আবার একটু উদারনীতিক রক্ষণশীল। বল্লে না ও সব অত্যাচার টত্যাচার আর ক'রে দরকার নেই। এমনিতেই বুড়ো যা ঘা খেয়েছে। তার চেয়ে বরং ওকে এক ঘ'রে ক'রে রাখ। একদম পুরোপুরি অসহযোগ। ময়রা মুদি ধোপা নাপিত সবাইকে জানিয়ে দাও কেউ যদি বুড়োর সঙ্গে আধলা পয়সার লেনদেন ক'রেছে কি ব্যস্, আমাদের সঙ্গে তার আর কোন সম্বন্ধ থাকবে না। দেখি তা হ'লে বুড়োকে একবার। কত সোজা শিরদাঁড়া বলে এই ক'রে বেঁকিয়ে দিলাম এ পর্য্যন্ত তার আবার যজ্ঞেশ্বর। থেঃ।

বটু ভটচায হাতে তালি বাজিয়ে বল্লে, তো তাই। কর বেটাকে একঘরে। দেখি একবার মুরোদখানা বুড়োর। বলে কি না পাড়ার বুকের ওপর ব'সে তল্লাট শুদ্ধ সব লোকের প্রতি তেনাস্থা। চালাও বয়কট।

গল্পের মাঝখানে হঠাৎ টিপ্পনী কেটে খুড়ো ব'ল্লেন, ভাবছো কলকাতার সহরে আবার বয়কট চলে কেমন ক'রে। কিন্তু আমি যখনকার কথা বলছি তখন তো এই ক'লকাতার কালিকটের হাল ছিল কিনা! স্রেফ পাল্কী আর ছ্যাকড়া ঘোড়ার গাড়ীর যুগ। সহরে গ্যাস লাইট তখন সবে জ্বলেছে কি জ্বলে নি, ঠিক মনে ক'রতে পারছি নে।

যা হোক যজ্ঞেশ্বরকে তো সবাই মিলে একঘরে করা হ'লো। মুদি, ময়রা, ধোপা, গয়লা, সেলাও-জুতি সকলের কাছ থেকে কথা নেওয়া হলো যে বুড়োর সঙ্গে কেউ আর কোন সম্বন্ধ রাখবে না। মায় নাপিত পর্য্যন্ত নরুন ছুঁয়ে দিব্যি গেলে গেল—স্যাকরার দাড়িতে খুর ধ'রেছি কি আমার নামে আপনারা একটা কুকুর পুষবেন।

অবরোধ ব্যবস্থা একেবারে পাকাপাকি হ'য়ে গেল।

এখন যজ্ঞেশ্বর তো আগেই ব'লেছি একটু অসামাজিক ধরণের মানুষ। এমনিতেই বাইরের লোকের সঙ্গে তার বড় একটা সম্বন্ধ ছিল না। এখন তো

আর কোন কথাই রইলো না। যজ্ঞেশ্বর যেন মিয়িয়ে চাঁদ হ'য়ে গেল। সে একেবারে চুপচাপ। দিন রাত চব্বিশ ঘণ্টা সমস্ত বাড়ীটা মনে হতো একটা কফিনের মত—নিঝুম, নিস্তব্ধ। ভেতর যে একটা প্রাণী আছে তা মালুমই হ'তো না। অনেক সময় রগড় করবার জন্যে পাড়ার দু'চারটে দুষ্টু ছেলে চুপিচুপি যজ্ঞেশ্বরের জানালা গলিয়ে ঘরের মধ্যে ধুলো বালি ছড়িয়ে দিয়ে আসতো। অবশ্য পেছনে বড়দের উস্কোনি ছিল। তা নয় তো কি আর সাহস পেতো। আমার কিন্তু ভারী বিশ্রী লাগতো। কেন খামখা একটা বুড়োর পিছনে এমনি লাগা। লোকসান বা ক্ষতি তো আর সে তোমাদের কিছুই করে নি। কিন্তু কার কাছে সে কথা বলি। ঘরের মধ্যে বিভীষণ। বু'ড়ার ওপর ছোটকা চ'টে একেবারে কাঁই হয়ে আছে। সে বার বারোয়ারীতে যজ্ঞেশ্বর তো একটা আধলাও ঠেকায় নি কি না। অনেক সময় চুপি চুপি, কেন না জানিয়ে তো আর যজ্ঞেশ্বরের ঘরে ঢোকবার উপায় ছিল না, আমি যেতুম। একেবারে বুড়োর শোবার ঘরে গিয়ে উঠতুম। বলতুম তোমার ওপর ওরা কিন্তু ভারী অবিচার করে ঈশ্বর জেঠা। তুমি কিছু বল না কেন ওদের?

পুরোনো একটা টিনের বাক্সের মধ্যে টুকিটাকি জিনিষ নাড়তে নাড়তে যজ্ঞেশ্বর বলতো, কে কার ওপর অবিচার করছে।

যজ্ঞেশ্বর তার নাকের ওপর মরচে ধরা একটা নাটবল্টু তুলে ধ'রলো।

আমি বলতুম, ওরা, পাড়ার সবাই। বাক্সটার ভেতর থেকে যজ্ঞেশ্বর একগাছা লাল সুতো টেনে বার করে নিরীক্ষণ করতে লাগলো।

আমি ব'লতুম, এই বিষ্টুকা, বটুজেঠা, ছোটকা, তারপর চৌধুরীরা।

লাল সুতো রেখে দিয়ে যজ্ঞেশ্বর তারপর দেখি হঠাৎ একখানা পুরানো চিঠির পাঠোদ্ধার করতে ব্যস্ত হ'য়ে পড়েছে। বলছে, তুই ব্যায়লা বাজাতে পারিস নিখে?

একেবারে অবান্তর প্রশ্ন। তাড়াতাড়ি একটা না ব'লে অক্ষমতা জানিয়ে আমি ব'লতুম, তোমার ঘরে টুকু, খুকি, মায়ারা সেদিন ধুলো ছড়িয়ে দিয়েছিল কার উস্কানিতে জান ঈশ্বরজেঠা?

চিঠিখানার দিকে চেয়ে আপন মনেই কি সব বিড়বিড় ক'রতে ক'রতে যজ্ঞেশ্বর বলতো, কেন?

যজ্ঞেশ্বরের কথার এ হেন অসংলগ্নতায় আমার ভারী রাগ হ'তো। চ'টে ম'টে বলতুম, কি কেন।

বাস্ হাতড়ে যজ্ঞেশ্বর হয়তো আর একটা কি না কি টেনে বার ক'রে ব'লতো, ঐ যে কে ধূলো ছড়ালে না কি একটা ক'ল্লে বল্লি।

আমি উৎফুল্ল হ'য়ে ব'লতুম, সেই কথাই তো বলছি। ধূলো তো ছড়ালে কিন্তু কে শিখিয়ে দিয়েছিল খবর রাখ? খালি তো বাক্সই ঘাঁটিছো। যজ্ঞেশ্বর একবার ব'লতো, কে।

খুঁধে গোয়েন্দার মত আদ্যোপান্ত আমি একেবারে সমস্ত খবর উজাড় ক'রে দিতুম। প্রথমে কি হ'য়েছিল, পরেই বা হ'লো কি। বটু জেঠারা কি ক'রতে চেয়েছিল; তারপর বিষ্টুকারাই বা ক'রলে কি। ছোটকা কাদের দলে আর এ পর্য্যন্ত কি কি ক'রেছে। কারা কারা জানালা দিয়ে ধূলো ছিটোয়; রাস্তায় বেরুলে পেছন থেকে কারা লুকিয়ে লুকিয়ে ছুয়ো দেয় ইত্যাদি যাবতীয় সংবাদ। কিন্তু আশ্চর্য্য। আপন মর্জ্জিমত ব'লে গেলুম তো এত কথা! যজ্ঞেশ্বর তার কিছুই শোনে নি। বলা শেষ ক'রে চেয়ে দেখি তন্ময় হ'য়ে গেছে যজ্ঞেশ্বর পুরোনো একখানা চিঠির পাঠোদ্ধার ক'রতে। মাঝে মাঝে হাসছে আর কি সব মন্তব্য ক'রছে আপন মনে।

সেদিন আমার অভিমানটাই হ'য়ে উঠেছিল বড়।

চ'টে ম'টে বল্লাম, এই বুঝি তোমার শোনা হচ্ছে ঈশ্বরজেঠা।

কোন উত্তর নেই।

প্রথমটা রাগই হ'তো। কি খালি খালি আজ বাজে ঘাঁটছে। কিন্তু পরক্ষণেই মনে হ'তো কেমন এই মানুষটা। খামখা অত্যাচার নিরবে সহ্য ক'রে যাচ্ছে। একটা ক্ষীণ প্রতিবাদ পর্য্যন্ত ক'রছে না।

মায়া হ'তো যজ্ঞেশ্বরের ওপর। আর কোন কথা বলতুম না। খানিকক্ষণ চুপটি ক'রে ঐখানেই দাঁড়িয়ে থাকতুম। তারপর পা টিপে টিপে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়তুম। কেমন যেন একটা শ্রদ্ধার ভাব জাগতো যজ্ঞেশ্বরের ঐ তন্ময়তাটা ঘিরে। ঠিক বুঝিয়ে ব'লতে পারবো না।

বাইরে কেউ যদি জিজ্ঞেস করতো কোথায় ছিলিরে এতক্ষণ, তো অন্য একটা জায়গার নাম ক'রে দিতুম। ঈশ্বরজেঠার ঘরে গিয়েছিলাম বল্লে জন-

মতের আদালতে যে বেশ খানিকটা নাস্তেহাল হ'তে হবে, একথা আমি আগেই জানতুম। একাই যেতুম কিন্তু বরাবরই এই রকম লুকিয়ে চুরিয়ে। আর যজ্ঞেশ্বরও কেমন যেন একটু স্নেহের চক্ষে দেখতো আমায়। অবিশ্যি মুখফুটে কোনদিন কিছু বলেনি আমায় কিন্তু একটা সাধারণ বোধ তো আছে মানুষের। আমি বুঝতুম, ঈশ্বর জেঠা আমায় ভালবাসে।

এই রকম ক'রে কিছুদিন কেটে গেল। যজ্ঞেশ্বরের সঙ্গে পাড়ার লোকদের আর কোন সম্বন্ধই রইল না। তারপর একদিন, একটা পাঁচীলের সীমানা না কি না কি নিয়ে বিষ্ণুকাদের সঙ্গে যজ্ঞেশ্বরের বিরোধটা চরমে পৌঁছল। বিষ্ণুকাদের দল যজ্ঞেশ্বরের জমির ওপর জোর ক'রে পাঁচীল তো তুললই, আরও বরং বুড়োকে যাচ্ছেতাই ব'লে অপমান ক'রে শাসিয়ে গেল।

যজ্ঞেশ্বর বল্লে, হাতখানেক জমিই তো। ওতো চাইলেই পেতিস শালারা।

এই গেল এক দফা শেষ হ'য়ে। তারপর আর কি ফিকিরে বুড়োকে জব্দ করা যায় সকলে মিলে তখন সেই ফন্দীই বার করতে লাগল।

বটুজেঠা বল্লে, ব্যাটাকে ধ'রে কষে ঘা কতক.........। তবে কথা হচ্ছে বুড়ো মানুষ, মারবই বা কোথায়। এক ঘায়েরও তো তাল সামলাতে পারবে না। শালাকে ভাতে মারতে হবে।

সে কত জল্পনা কত আলোচনা, যজ্ঞেশ্বরের কিন্তু ওদিকে কোন ভ্রুক্ষেপই নেই। কোমরে বাত ছিল বুড়োর। ঠিক বিকেলটি হ'তো আর বাঘের তেলের শিশি হাতে ক'রে সোজা রাস্তা পথ ধরে যজ্ঞেশ্বর মাগী বাড়ী গিয়ে উঠতো। কেউ যদি কিছু জিজ্ঞেস ক'রতো তো কোমরে হাত চেপে ব'লতো, আরে ভাই বাতে একেবারে পঙ্গু করে ফেল্লে। তাই এই একটু মালিশ করাতে যাচ্ছি। সারাটা রাত কাল যা কষ্টে কেটেছে। দু চোখের পাতা এক ক'রতে পারি নি।

—কোমরে বাত তা কাঁধে করে আবার কাঠের কুঁদো টেনে নিয়ে যাচ্ছ কেন।

যজ্ঞেশ্বর হেসে বলতো, ঐ যে মালিশ। মালিশের পরই সেক দিতে হয় কি না। মাগীরা বলে, ও কেঁদো কাঠ বাপু তুমি সঙ্গে করে নিয়ে এসো। ও আমরা পাব কোথায়, আর টেনেই বা আনবে কে। এই, তা সব কুশল তো।

—এই এক রকম। কেটে যাচ্ছে। তা এখানে কি শুধু বাঘের তেল মালিশ করাতেই আসো না......।

যজ্ঞেশ্বর অমনি হাত তুলে চেঁচিয়ে উঠতো : আরে রামচন্দর, ও সব হ'লো গিয়ে তোমার ছোটলোকের কাণ্ড। যজ্ঞেশ্বর ওর ভেতরে নেই। আসি নেহাৎ না এলে নয়, তাই।

উত্তরটুত্তরগুলো ছিল তার এই রকমই নিরঙ্কুশ।

আর এই যে যেতো টেতো লুকিয়ে চুরিয়ে নয়, একেবারে পাঁচজনের চোখের ওপর দিয়ে। ঐ হাতে বাঘের তেলের শিশি, কাধে কেঁদো কাঠের গুঁড়ি। অন্য কোনদিকে ভ্রুক্ষেপ নেই।

বটুজেঠার দল তো চটেই আগুন। পারে তো তক্ষুনই টুকরো টুকরো করে ফেলে যজ্ঞেশ্বরকে। বলে এত বড় আস্পর্দ্ধা যে পাঁচ জনের নাকের ওপর দিয়ে রোজ রোজ এই অস্থানে কুস্থানে যাবে, আর মুখ বুঁজে তাই সহ্য করবো। দাঁড়াও তোমার আমি······।

তবে ঐ গর্জ্জনই সার। হাজার হ'লেও ম্যাদ্দিনকার একটা লোক তো। ছোটকাদের যে হ'তে দেখেছে। মারবো বললেই তো মারা যায় না।

এই রকমই মন কসাকসি চলেছে। তারপর হঠাৎ একদিন দুপুর বেলা। ইস্কুল আছে কি নেই, ঠিক মনে নেই। অনেকদিনকার ঘটনা তো। মোট কথা বাড়ীতেই আছি। এর মধ্যে বাইরে শুনি ভীষণ গণ্ডগোল হচ্ছে। কি ব্যাপার? এখন সকলেই আমরা ঘরের ভেতর ; কে কাকে কি ব'লবে। তাড়াতাড়ি বাইরে বেরিয়ে গেলুম। দেখি পাড়াশুদ্ধু সব লোক কেউ বালতি, কেউ ক্যানেস্তারা, কেউ বা ঘটি, যে যা পেয়েছে তাই নিয়ে যজ্ঞেশ্বরের বাড়ীর দিকে ছুটে চলেছে। পেছনের খোলার বস্তির মেয়েরাও দেখি সব রাস্তার ওপর দাঁড়িয়ে দু হাতে কপাল চাপড়াচ্ছে। কপাল চাপড়াচ্ছে আর চেঁচাচ্ছে, গেল সব গেল। হায় হায় হায় হায়।

উর্দ্ধশ্বাসে এগিয়ে গিয়ে দেখি যজ্ঞেশ্বরের শোবার ঘরের মটকা ফুঁড়ে আগুনের লক্ষ ফণা পাশের রান্নাঘর আর টিনের বস্তিটাকে ছোবলাচ্ছে। কি ভীষণ! চোখ চেয়ে মানুষের এত বড় সর্ব্বনাশ দেখবার মত দুঃসাহস তখনও হয় নি। চোখ মুখে হাত চেপে ফ্যাঁচ করে কেঁদে ফেললাম। খালি মনে হ'তে লাগল যজ্ঞেশ্বরের কথা। ঈশ্বরজেঠা কোথায়। এখন এগুতেও সাহস হয় না, অথচ কৌতূহলেরও সীমা নেই। হাজার হ'লেও ছেলে মানুষ তো

তখন। কি করি। এক ছুটে শিবমন্দিরের রকে গিয়ে লাফিয়ে উঠলুম। সেখান থেকেও ভাল দেখা যায় না। চড়লাম নিমগাছে। দেখলুম আকাশে গাঢ় কালো ধোঁয়ার কুণ্ডলী সূর্য্যকে আড়াল ক'রে মাটিতে যে কালো ছায়া ফেলেছে তারই আবছায়ে বুড়ো যজ্ঞেশ্বর একান্ত প্রয়োজনীয় এমন গোটাকয়েক জিনিষ সংগ্রহ ক'রে দাঁড়িয়ে আছে আর মাঝে মাঝে চেঁচাচ্ছে, জীবনে কাউকে সাহায্য করিও নি, নেবোও না, হ্যাঁঃ। ও কাউকে কিচ্ছু করতে হবে না, যা পোড়বার পুড়ে যাক।

মাথা খারাপ হ'য়ে গেল নাকি ঈশ্বর জেঠার। আমার তখন এমনি দুঃখ হচ্ছিল।

এই ঘটনার দিন তিনেক পর। দুপুর বেলা বৈঠকখানায় আড্ডা ব'সেছে। বটুজেঠা বিষ্ণুকাকে ব'লছে, চূড়ান্ত তো হ'য়ে গেল। আর দরকার নেই।

বিষ্ণুকা বলেন, আহা বেচারীর একেবারে সাড়ে সর্ব্বনাশ হ'য়ে গেছে হে। কে এমনটি করলে বলতো! সে কি মানুষ না পশু। ছি ছি ছি ছি।

বটুজেঠা মুখ ভেংচে বললে, কি জানি। যা চড়া দিন। এদিকে আগুনের মালসা তো দেখি দিনরাত চব্বিশ ঘণ্টা ওর ঘরের মধ্যে জলেই আছে। কেমন করে হয়তো ধ'রে গিয়ে থাকবে। দৈবের মার। এ কি আর কারো ঠেকাবার যো আছে।

তারপর যজ্ঞেশ্বরের আর কোন সন্ধানই পাওয়া যায় না। কেউ বললে, চলে গেছে যজ্ঞেশ্বর পাড়া ছেড়ে দিয়ে।

কেউ বললে, যজ্ঞেশ্বরের কথা। কত চুলো আছে ওর থাকবার। কোন্ ভাগাড়ে গিয়ে হয় তো পড়ে মরেছে।

আবার কেউ বললে, অসুখ করেছে। দিনরাত ঘরের জানালা দরজা বন্ধ ক'রে পড়ে থাকে। পাশের বস্তির পাঁচীর মা নাকি রাত্তিরে বুড়োকে গোঙাতে শুনেছে।

পরদিন দুপুরবেলা বিষ্টুকা বল্লেন, ওহে বটু, বাস্তবিক লোকটার কি হ'লো বলতো? কেউ বলে এখানে থাকেই না, আবার শুনি অসুখ করেছে খুব। দোর এঁটে মুখ বুঁজে নাকি প'ড়ে আছে চব্বিশ ঘণ্টা। পাঁচীর মা রাত্তিরে নাকি ঘরের ভিতর গোঙানি শুনতে পেয়েছে। চলতো যাই একবার দেখে আসি বাইরে থেকে। ভেতরে নয় নাই ঢুকলুম!

মাথা চুলকে বটু জেঠা বল্লে, যাবেন ? চলুন। আমার কোন আপত্তি নেই।

বিষ্টুকা বল্লেন, না হে ব্যাপারটা কেমন যেন একটু রহস্যময় ঠেকছে। একটু দেখে আসা যাক।

তখন বিষ্টুকা, বটু জেঠা, ছোটকা ও আরও দু চার জন মিলে যজ্ঞেশ্বরকে তো দেখতে যাওয়া হ'লো। আমি থাকলুম সব্বার পেছনে, একটু দূরে। পাছে আবার ছোটকার দাঁত খিঁচুনি আর ধমক খাই—যা বাড়ী যাঃ।

চুপি চুপি তো চ'ল্লুম ওঁদের পেছনে। যজ্ঞেশ্বরের বাড়ী গিয়ে দেখা গেল ঘরের জানালা দরজা সব বন্ধ. কোথাও কারো সাড়া শব্দ নেই। বাইরে থেকে কত হাঁক ডাক—যজ্ঞেশ্বর বাড়ী আছো, ভেতরে কে দরজা খোল, কোন সাড়া নেই। কি করা যায়। শেষকালে ছোটকা পাঁচিল টপকে উঠে ভেতর থেকে খিড়কির দরজা খুলে দিলে। বিষ্টুকাবা তো ভিতরে ঢুকলেন। তারপর অতি সন্তর্পণে এগিয়ে গিয়ে দেখলেন, রোগশীর্ণ হাড়সার যজ্ঞেশ্বর আধপোড়া খাটখানার ওপর টান টান হ'য়ে শুয়ে আছে।

কারাঃ, খেঁকিয়ে উঠলো যজ্ঞেশ্বর। বিষ্টুকা আমতা আমতা ক'রে ব'ল্লেন, এই আমরা। তোমার নাকি খুব অসুখ। তাই.......

দেখতে এয়েছো : যজ্ঞেশ্বর বল্লে। চোখ দুটো ওর চক্ চক্ ক'রে উঠলো।

বটু জেঠা বল্লে, তা বড্ড অসুখ যখন তখন একজন ডাক্তার টাক্তার···।

ডাক্তার : যজ্ঞেশ্বর পাটা গুটিয়ে একটা ঠেলা মেরে বসতে চাইল।

বল্লে, ডাক্তার। ডাক্তার, তা তোমরা এসেছো কেন ?

বিষ্টুকা বল্লে, আমরা। আর কোন কথা নয়। যজ্ঞেশ্বর সমস্ত প্রাণশক্তি নিয়ে একবার জোর গলায় চেঁচিয়ে উঠলো, তোমরা যাও এখান থেকে সব। আমার শান্তি নষ্ট ক'রো না। যাও, যাও।

যজ্ঞেশ্বর হাত জোড় ক'রলে, মাথার বালিশটা ছুঁড়ে মারলে, সামনের হাল্কা টেবিলটা লাথি মেরে উল্টে ফেলে দিলে। যাও। যাও।

যজ্ঞেশ্বর খাট থেকে মাটিতে গড়িয়ে পড়লো। মেজের ওপরকার গেলাসটা ছুঁড়ে মারলে বটু জেঠাকে তাক ক'রে। যাও। যাও।

ওঁরা সব ভয় পেয়ে ছুটে বাইরে পালিয়ে এলেন। পেছন থেকে দড়াম ক'রে যজ্ঞেশ্বর দরজাটা বন্ধ ক'রে দিল শুনতে পেলাম।

এর দু দিন পর। দরজা ভেঙে ঘরে ঢুকে সবাই দেখলো যজ্ঞেশ্বর দাঁত ছিরকুটে শক্ত-কাঠ হ'য়ে ম'রে প'ড়ে আছে বিছানার ওপর। আর ওর কোল ঘেঁসে শুয়ে আছে পদ্মলোচন—যজ্ঞেশ্বরের পোষা কালো হুলো বেড়ালটা। দৃশ্যটা যেন এখনও চোখের ওপর ভাসছে।

খুড়োর চোখ দুটো হঠাৎ কেন যেন ছল ছল ক'রে উঠল। একটু চুপ ক'রে থেকে মুখে হাসি টেনে বল্লেন, কেমন লাগলো, গল্প ?

বিজন ভট্টাচার্য্য

উপনিষদে জড়তত্ত্ব

দ্বাদশ অধ্যায়

২)

দেহ-সৃষ্টি

গতবারের পরিচয়ে আমরা লোকোত্তর 'কেবলঃ শিবঃ' প্রপঞ্চাতীত প্রত্যগাত্মার সম্পর্কে আলোচনা করিতেছিলাম। আমরা দেখিয়াছিলাম প্রত্যগাত্মা দহরকোশ বা Auric Body অঙ্গীকার করিয়া দেহী হন। কিন্তু তাঁহার অন্তর্নিহিত শক্তিপুঞ্জ ব্যঞ্জিত ও ব্যাকৃত করিবার জন্য (ইহারই ইংরাজি নাম Evolution) অপ্রপঞ্চ হইতে পঞ্চভূতের বিকারে গঠিত প্রপঞ্চে তাঁহাকে অবতরণ করিতে হয় এবং তাহার ফলে ভিন্ন ভিন্ন লোকের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। কি কি শক্তি ও কোন কোন লোক? প্রথম লোকেব কথা বলি, তারপর শক্তির কথা বলিব,—লোকের ইংরাজি প্রতিশব্দ Plane। লোক বা Plane বলিলে কি বুঝি? লোক জীবের বিহরণ ভূমি, তাহার লীলাক্ষেত্র। আমরা দেখিয়াছি, উপনিষদের মতে লোক পাঁচটি—প্রথম মনুষ্যলোক বা ভূঃ, দ্বিতীয় পিতৃলোক বা ভুবঃ, তৃতীয় দেবলোক বা স্বঃ, চতুর্থ প্রজাপতিলোক বা মহঃ এবং পঞ্চম ব্রহ্মলোক (যাহার তিনটি ভূমি বা levels—জনঃ, তপঃ ও সত্য—ব্রাহ্মঃ ত্রিভূমিকো লোকঃ)। ঐ স্বর্লোকের আবার দুইটি স্তর বা levels আছে—রূপস্তর ও অ-রূপস্তর।

ঐ পঞ্চ লোক থিয়সফির পরিচিত Five Planes। মনুষ্যলোক থিয়সফির Physical Plane, পিতৃলোক থিয়সফির Astral Plane, দেবলোক থিয়সফির Devachanic Plane, প্রজাপতিলোক থিয়সফির Budhic Plane এবং ব্রহ্মলোক থিয়সফির Nirvanic Plane। আমরা আরও দেখিয়াছি যে ঐ পঞ্চ লোক (five planes), প্রত্যেকে নিজস্ব উপাদানে নির্মিত। কোন্ লোকের কি উপাদান? মনুষ্যলোকের উপাদান ক্ষিতিতত্ত্ব, পিতৃলোকের উপাদান অপ্‌তত্ত্ব, দেবলোকের উপাদান অগ্নিতত্ত্ব, প্রজাপতিলোকের উপাদান বায়ুতত্ত্ব এবং ব্রহ্মলোকের উপাদান ব্যোম বা আকাশতত্ত্ব। বলা বাহুল্য, উপাদানের তারতম্য অনুসারেই ঐ ঐ লোকের স্থূলতা ও সূক্ষ্মতা। মনুষ্যলোক সর্বাপেক্ষা স্থূল;

পিতৃলোক তদপেক্ষা সূক্ষ্ম ; আবার পিতৃলোকের অপেক্ষা দেবলোক সূক্ষ্ম ; তাহার তুলনায় প্রজাপতি লোক সূক্ষ্মতর ; ব্রহ্মলোক কিন্তু সূক্ষ্মতম, সুসূক্ষ্ম।

সহজেই সিদ্ধান্ত করা যায়, প্রপঞ্চে প্রবিষ্ট প্রত্যগাত্মার যখন পর পর উক্ত পাঁচটি লোকই লীলাক্ষেত্র, তখন তাঁহার ঐ ঐ লোকে বিহরণ-উপযোগী শরীর গ্রহণ আবশ্যক। কারণ, যে-ভূমিতে যে যখন বিচরণ করিবে তাহার উপযোগী যান বাহন নহিলে চলিবে কিরূপে ? স্থলে চলিতে রথ হইলেই চলে কিন্তু জলে নৌকা চাই ; আর আকাশে ভ্রমণ জন্য বেলুন বা ব্যোমযানের প্রয়োজন। এই জন্যই প্রত্যগাত্মাকে বহুবিধ শরীর রচনা করিতে হয়।

The soul of man has not one body, but many bodies.—C.W. Leadbeater

এই সব শরীরকে উপনিষদে 'কোশ' বলা হইয়াছে। কোশের মধ্যে যেমন অসি প্রচ্ছন্ন থাকে, সেইরূপ দেহরূপ পুরের মধ্যে জীব প্রচ্ছন্ন থাকেন ; সেইজন্য দেহের সার্থক নাম 'কোশ'।

কোশ কয়টি ? তৈত্তিরীয় উপনিষদে আমরা পুরুষের পর পর পাঁচটি কোশের উল্লেখ পাই—

অন্নাদ্‌পুরুষঃ। স বা এষ পুরুষোঽন্নরসময়ঃ।

তস্মাদ্‌ বা এতস্মাদন্নরসময়াৎ। অন্যোঽন্তর আত্মা প্রাণময়ঃ। তেনৈষ পূর্ণঃ। স বা এষ পুরুষবিধ এব।

তস্মাদ্বা এতস্মাদ্‌ প্রাণময়াৎ। অন্যোঽন্তর আত্মা মনোময়ঃ। তেনৈষ পূর্ণঃ। স বা এষ পুরুষবিধ এব।

তস্মাদ্বা এতস্মাদ্‌ মনোময়াৎ। অন্যোঽন্তর আত্মা বিজ্ঞানময়ঃ। তেনৈষ পূর্ণঃ। স বা এষ পুরুষবিধ এব।

তস্মাদ্বা এতস্মাদ্বিজ্ঞানময়াৎ। অন্যোঽন্তর আত্মানন্দময়ঃ। তেনৈষ পূর্ণঃ। স বা এষ পুরুষবিধ এব।—তৈ, ২।১-৫

অর্থাৎ 'অন্ন হইতে পুরুষ উৎপন্ন হয়। অতএব এই পুরুষ অন্নরসময়। এই অন্নরসময়ের অভ্যন্তরে অন্য প্রাণময় আত্মা আছে—যদ্দ্বারা ইহা পূর্ণ। সে আত্মা পুরুষাকৃতি। সেই প্রাণময়ের অভ্যন্তরে অন্য মনোময় আত্মা আছে, যদ্দ্বারা ইহা পূর্ণ। সে আত্মা পুরুষাকৃতি। সেই মনোময়ের অভ্যন্তরে অন্য বিজ্ঞানময় আত্মা আছে, যদ্দ্বারা ইহা পূর্ণ। সে আত্মা পুরুষাকৃতি। সেই বিজ্ঞানময়ের অভ্যন্তরে অন্য আনন্দময় আত্মা আছে, যদ্দ্বারা ইহা পূর্ণ। সে আত্মা পুরুষাকৃতি।'

অতএব আমরা এখানে পর পর পাঁচটি কোশের উল্লেখ পাইলাম—অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় ও আনন্দময়। তৈত্তিরীয় উপনিষদ্ ভৃগু-বারুণি সংবাদে পর পর ঐ পঞ্চতত্ত্বের উপদেশ করিয়াছেন। ভৃগু পিতা-বরুণকে উপদেশের জন্য উপসন্ন হইলে—অধীহি ভগবো ব্রহ্মেতি—বরুণ, অন্নং ব্রহ্মেতি প্রাণো ব্রহ্মেতি, মনো ব্রহ্মেতি বিজ্ঞানং ব্রহ্মেতি, আনন্দো ব্রহ্মেতি, —এইরূপ স্তরে স্তরে তাঁহার বুদ্ধিকে উত্তোলিত করিয়া উপদেশের সাফল্য বিধান করিয়াছিলেন। অর্থাৎ যাঁহারা জড়বাদী (materialist) তাঁহাদের পক্ষে অন্ন বা matter-ই ব্রহ্ম, যাঁহারা জীববাদী (vitalist) তাঁহাদের পক্ষে প্রাণ বা Life-ই ব্রহ্ম, যাঁহারা আত্মবাদী (psychologist) তাঁহাদের পক্ষে মন বা Mind-ই ব্রহ্ম, যাঁহারা অধ্যাত্মবাদী (spiritualist) তাঁহাদের পক্ষে বিজ্ঞান বা Wisdom-ই ব্রহ্ম, এবং যাঁহারা ব্রহ্মবাদী (Theist) তাঁহাদের পক্ষে আনন্দ বা bliss-ই ব্রহ্ম। ঐ উপনিষদ্ ফলশ্রুতি-স্বরূপ অবসানে বলিতেছেন—

স য এবংবিৎ। অস্মাৎ লোকাৎ প্রেত্য। এতম্ অন্নময়ম্ আত্মানম্ উপসংক্রম্য, এতম্ প্রাণময়ম্ আত্মানম্ উপসংক্রম্য, এতম্ মনোময়ম্ আত্মানম্ উপসংক্রম্য, এতম্ বিজ্ঞানময়ম্ আত্মানম্ উপসংক্রম্য, এতম্ আনন্দময়ম্ আত্মানম্ উপসংক্রম্য ইমান্ লোকান্ কামান্নী কামরূপী অনুসঞ্চরন্ এতৎ সাম গায়ন্ আস্তে—অহম্ অন্নম্ অহম্ অন্নম্ অহম্ অন্নাদঃ অহম্ অন্নাদঃ ইত্যাদি—

অর্থাৎ 'যিনি এই বারুণি বিদ্যা অবগত হ'ন তিনি এই লোক হইতে প্রয়াণ করিয়া, এই অন্নময় আত্মাকে, এই প্রাণময় আত্মাকে, এই মনোময় আত্মাকে, এই বিজ্ঞানময় আত্মাকে, এই আনন্দময় আত্মাকে অতিক্রম করিয়া, নিষ্কামভাবে এই সমস্ত লোক ও কাম উপভোগ করিয়া, এই সাম গান উচ্চারণ করতঃ, নিজেকে বিশ্বের সহিত অভিন্ন অনুভব করেন।'

মৈত্রী উপনিষদের ষষ্ঠ প্রপাঠকেও এই পঞ্চ কোশের উল্লেখ আছে।

অতঃ অন্নম্ আত্মা ইত্যুপাসীত। × × প্রাণো বা অন্নস্য রসঃ মনঃ প্রাণস্য, বিজ্ঞানং মনসঃ আনন্দং বিজ্ঞানস্য ইতি অন্নবান্ প্রাণবান্ মনস্বান্ বিজ্ঞানবান্ আনন্দবান্ চ ভবতি যো হৈবং বেদ—মৈত্রী, ৬।১২-৩

পৈঙ্গল উপনিষদেও আমরা ঐ পঞ্চ কোশের উল্লেখ পাই।

অথ অন্নময়-প্রাণময়-মনোময়-বিজ্ঞানময়-আনন্দময়াঃ পঞ্চ কোশাঃ। ২।৪

ঐ ঐ কোশের পরিচয় দিয়া পৈঙ্গল বলিতেছেন—

অন্নরসেনৈব ভূত্বা অন্নরসেন অভিবৃদ্ধিং প্রাপ্য অন্নরসময়-পৃথিব্যাম্ যৎ বিলীয়তে সঃ

অন্নময়-কোশঃ। কর্মেন্দ্রিয়ৈঃ সহ প্রাণাদি-পঞ্চকং প্রাণময়-কোশঃ। জ্ঞানেন্দ্রিয়ৈঃ সহ মনো মনোময়-কোশঃ। জ্ঞানেন্দ্রিয়ৈঃ সহ বুদ্ধিঃ বিজ্ঞানময়-কোশঃ। স্বরূপাজ্ঞানম্ আনন্দময়-কোশঃ।

কিন্তু তাহা হইলেও উপনিষদের দুই এক স্থলে আনন্দময় কোশের উপর আরও একটি কোশের কথা শুনিতে পাওয়া যায়। তাহার নাম হিরণ্ময় কোশ—হিরণ্ময়ে পরে কোশে বিরজম্ ব্রহ্ম নিষ্কলম্—মুণ্ডক, ২।২।৯

মৈত্রেয়ী উপনিষদেও আমরা ষট্ কোশের উল্লেখ পাই—

ষড়্‌বিকারবিহীনোঽস্মি ষট্‌কোশরহিতোঽস্ম্যহম্—মৈত্রেয়ী, ৩।১৮

অতএব জীবের কোশ পাঁচটি নয় ছয়টি—অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময়, আনন্দময় ও হিরণ্ময়। কোন্ কোশ কোন্ লোকে বিহরণের উপযোগী? অন্নময় কোশ বা physical body মনুষ্য লোক বা physical plane-এর উপযোগী; প্রাণময় কোশ বা astral body পিতৃলোক বা astral plane-এর উপযোগী, মনোময় কোশ বা mental body দেবলোক বা mental plane-এর রূপভূমির উপযোগী, বিজ্ঞানময় কোশ বা causal body দেবলোক বা mental plane-এর অ-রূপভূমির উপযোগী, আনন্দময় কোশ বা bliss body প্রজাপতি লোক বা budhic plane-এর উপযোগী এবং হিরণ্ময় কোশ বা spiritual body ব্রহ্মলোক বা nirvanic plane-এর উপযোগী। ঐ পঞ্চ লোকের উপযোগী জীবের পাঁচটি অবস্থাও আছে—জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তি তুরীয় ও নির্বাণ। এ সম্পর্কে আমরা জীবতত্ত্বে সবিশেষ আলোচনা করিব। এখানে আমাদের লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, জীব জাগ্রৎ অবস্থায় অন্নময় কোশের বাহনে মনুষ্য লোকে বিহরণ করে; স্বপ্নাবস্থায় প্রাণময় কোশের বাহনে পিতৃলোকে বিচরণ করে; স্বল্প সুষুপ্ত অবস্থায় মনোময় কোশের বাহনে দেবলোকের রূপভূমিকায় বিহরণ করে,—গভীর-সুষুপ্ত অবস্থায় বিজ্ঞানময় কোশের বাহনে দেবলোকের অ রূপভূমিকায় বিহরণ করে;—তুরীয়-অবস্থায় আনন্দময় কোশের বাহনে প্রজাপতি লোকে বিহরণ করে এবং তুরীয়াতীত নির্বাণ অবস্থায় হিরণ্ময় কোশের বাহনে ব্রহ্মলোকে বিহরণ করে।

এ প্রসঙ্গে শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের সেই মন্ত্রটি স্মরণ করুন—

স্থূলানি, সূক্ষ্মানি, বহূনি চৈব, রূপাণি দেহী স্বগুণৈর্বৃণোতি—৫।১২

'দেহী (প্রত্যগাত্মা) স্থূল, সূক্ষ্ম, বহুশরীর স্বগুণ দ্বারা রচনা করেন।'

ঐ সকল শরীর আমাদের পরিচিত অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময়, আনন্দময় ও হিরণ্ময় কোশ।

উদ্ধৃত শ্লোকের 'বিবরণে' স্বামী বিজ্ঞান-ভগবান্ লিখিয়াছেন—

স্থূলানি পার্থিবানি শরীরাণি ভূর্লোকবর্তীনি, ততঃ সূক্ষ্মাণি অম্ময়ানি ভুবর্লোকবর্তীনি শরীরাণি ততোঽপি সূক্ষ্মাণি তৈজসানি স্বর্লোকবর্তীনি শরীরাণি, ততোঽপি সূক্ষ্মাণি বায়বীয়ানি মহর্লোক-জনোলোকবর্তীনি শরীরাণি, ততোঽপি সূক্ষ্মাণি শরীরাণি বিয়ন্ময়ানি তপঃসত্যলোকবর্তীনি × × তৎ তৎ লোকবর্তি-তত্তৎ-শরীরারম্ভে তত্তদ্ভূতপ্রাধান্যমেব উক্তম্ ইতি দ্রষ্টব্যম্। × × বহূনি অনেকানি অনেকরূপাণি শরীরাণি দেহী বিজ্ঞানাত্মা স্বগুণৈঃ × × বৃণোতি সংভজতে।

অর্থাৎ বিজ্ঞানাত্মা (monad) কয়েকটি শরীর আশ্রয় করেন—ক্ষিতিতত্ত্বে রচিত ভূর্লোকের উপযোগী পার্থিব শরীর (অন্নময় কোশ), অপ্‌তত্ত্বে রচিত ভুবর্লোকের উপযোগী অপ্‌-ময় শরীর (প্রাণময় কোশ), তেজস্তত্ত্বে রচিত স্বর্লোকের উপযোগী তৈজস শরীর (মনোময় কোশ), বায়ুতত্ত্বে রচিত মহর্লোকের উপযোগী বায়বীয় শরীর (বিজ্ঞানময় কোশ) এবং আকাশ-তত্ত্বে রচিত ব্রহ্মলোকের উপযোগী আকাশীয় শরীর (আনন্দময় কোশ)।

এখানে স্বামী বিজ্ঞান-ভগবান্ মাত্র পাঁচটি কোশের উল্লেখ করিলেন—অর্থাৎ, অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় ও আনন্দময়। আনন্দময়ের উপরিতন যে হিরণ্ময় কোশ তাহার উল্লেখ করিলেন না, অতএব, কোশ যদি পাঁচটি না হইয়া ছয়টি হয়, তবে তাঁহার উক্তির একটু সংশোধন আবশ্যক। অর্থাৎ, স্বর্লোকের রূপস্তরের উপযোগী মনোময় কোশ এবং অরূপস্তরের উপযোগী বিজ্ঞানময় কোশ, উভয়ই তেজস্তত্ত্বে রচিত; এবং মহর্লোকের উপযোগী আনন্দময় কোশই বায়ুতত্ত্বে রচিত, এবং ব্রহ্ম-লোকের উপযোগী হিরণ্ময় কোশই আকাশতত্ত্বে রচিত। তবেই দেখা যাইতেছে—ঐ ঐ শরীর প্রধানতঃ প্রাগুক্ত উপাদানে গঠিত, অর্থাৎ, অন্নময় কোশ ক্ষিতিতত্ত্বে, প্রাণময় কোশ অপ্‌তত্ত্বে, মনোময় ও বিজ্ঞানময় কোশ তেজস্তত্ত্বে, আনন্দময় কোশ বায়ুতত্ত্বে এবং হিরণ্ময় কোশ আকাশতত্ত্বে গঠিত। সুতরাং জীব অন্নময় কোশের বাহনে ভূর্লোকের সহিত, প্রাণময় কোশের বাহনে ভুবর্লোকের সহিত, মনোময় কোশের বাহনে স্বর্লোকের

রূপস্তরের সহিত, বিজ্ঞানময় কোশের বাহনে স্বর্লোকের অরূপস্তরের সহিত এবং আনন্দময় কোশের বাহনে মহর্লোকের সহিত এবং হিরণ্ময় কোশের বাহনে ব্রহ্মলোকের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করে। ঐ বিহরণ ও বিচরণের যান ঐ ঐ শরীর।

নক্সার আকারে প্রদর্শিত হইলে বিষয়টি বিশদ হইতে পারে, এই সম্ভাবনায় নিম্নে একটি চিত্র প্রদত্ত হইল।

লোকের নাম		লোকের উপযোগী কোশের নাম
১। মনুষ্যলোক (ভূঃ) (Physical Plane)		অন্নময় কোশ (Physical Body)
২। পিতৃলোক (ভুবঃ) (Astral Plane)		প্রাণময় (কামময়) কোশ (Astral Body)
৩। দেবলোক (স্বঃ) (Mental Plane)	রূপস্তর (concrete)	মনোময় কোশ (Mental Body)
	অরূপস্তর (Abstract)	বিজ্ঞানময় কোশ (Causal Body)
৪। প্রজাপতিলোক (মহঃ) (Intuitional Plane)		আনন্দময় কোশ (Bliss Body)
৫। ব্রহ্মলোক (জনঃ, তপঃ, সত্য) (Spiritual Plane)		হিরণ্ময় কোশ (Spiritual Body)

ঐ অন্নময়, প্রাণময় ও মনোময় কোশ সম্পর্কে একটি বিষয় লক্ষ্য করিতে হয়। অবশ্য ঐ তিনটি কোশই মূলতঃ ভূতাত্মার অধীন, কিন্তু তাহা হইলেও ঐ তিন কোশের প্রত্যেকেরই একটি স্বতন্ত্র প্রাণ ও সংজ্ঞান আছে—ঐ প্রাণ ও সংজ্ঞান ভূতাত্মার সংজ্ঞান হইতে পৃথক্।

Each of these three bodies has a life and consciousness of its own—quite distinct from the life and consciousness of the Personality who uses them. —C. Jinarajadasa's First Principles of Theosophy, p. 99.

কোশত্রয়-অনুপ্রাণনকারী ঐ প্রাণকে শ্রীযুক্ত জিনরাজদাস 'Body consciousness' বলিয়াছেন। ঐ Body consciousness-এর উৎস কোথায়?

বিষয়টা বেশ কঠিন—যথাসাধ্য বুঝিবার চেষ্টা করি।

বেদে ভগবানকে 'ত্রি-বিক্রম'বলে—ইদং বিষ্ণুর্বিচক্রমে, ত্রেধা নিদধে পদম্—ঋগ্বেদ।

ঐ 'ত্রি+বিক্রম' বা পদক্ষেপকে থিয়সফিতে 'The three outpourings' বা 'Life-waves' বলা হয়। প্রথম বিক্রমে ভগবান্ মাতরি-শ্বা—'মাতরে' (Sea of Virgin matter-এ) বীর্য্যাধান করেন। ইহাই থিয়সফির ভাষায় 'First Life-wave'। ইহা পুরাণের প্রথম পুরুষ ব্রহ্মার কার্য—আস্তত্ত্ব মহতঃ স্রষ্টৃ *। এইবার দ্বিতীয় পুরুষ বিষ্ণু কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন। বিষ্ণুর কার্য কি? দ্বিতীয়ং ত্বণ্ড-সংস্থিতম্—সঙ্ঘাত রচনা। ইহাই থিয়সফির 'Second Life-wave' †। এই Second Life-waveএর সহিত আমাদের অন্নময়, প্রাণময় ও মনোময় কোশের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক (because it enters largely into the composition of these various vehicles)। ঐ Second-Life waveকে থিয়সফিতে 'Elemental Essence' বলা হয়—আমি উহার প্রতি-শব্দরূপে 'ভূতালি' শব্দ ব্যবহার করি।

ঐ ভূতালি লোক হইতে লোকান্তরে অবতরণ করিতে করিতে—স্বর্লোক ও ভুবর্লোক পার হইয়া অবশেষে ভূর্লোকে অবতীর্ণ হয়—Still descending into matter, the life of the second Logos (the second Life wave), after ensouling mental and astral matter, next ensouls physical matter। ভূর্লোকে স্থাবর রাজ্য (mineral kingdom) উত্তীর্ণ হইয়া ঐ ভূতালি জঙ্গম রাজ্যে প্রবেশ করে এবং পাদপ ও পশুর স্তর

---

*Into this sea of virgin matter pours down the Holy Spirit; and by the action of His glorious Vitality, the atoms are awakened to new powers and possibilities of attraction and repulsion.—Man, Visible and Invisible, p. 88.

† His energy is essentially of an order best described as Life-Form; with this energy, He ensouls the matter of the Seven Planes and enables it to build Forms.

উৎক্রমণ করিয়া মানব-স্তরে উত্তীর্ণ হয় এবং যথাক্রমে মানবের অন্নময়, প্রাণময়, ও মনোময় কোশকে অনুপ্রাণিত করে।*

জিনরাজদাস যাহাকে 'Body consciousness' বলিলেন উহার প্রাণ ঐ ভূতালি (elemental essence)। মনোময় কোশস্থ elemental essence-এর সংজ্ঞা 'Mental elemental' (চিন্তনা ভূতালি), প্রাণময় কোশস্থ elemental essence-এর সংজ্ঞা 'Desire elemental' (বাসনা ভূতালি) এবং অন্নময় কোশস্থ elemental essence-এর সংজ্ঞা 'Physical elemental' (চেষ্টনা-ভূতালি)।

This 'Body consciousness' of each vehicle is known as the 'Mental elemental' of the Mind Body, the 'Desire elemental' of the Astral-Body, and the 'Physical elemental' of the Physical Body—First Principles of Theosophy.

ঐ যে তিন ভূতালি—অর্থাৎ চিন্তনা ভূতালি, বাসনা ভূতালি ও চেষ্টনা ভূতালি—উহাদিগের প্রত্যেকের ভূতাত্মার সংজ্ঞান ছাড়া একটি স্বতন্ত্র ও পৃথক্ সংজ্ঞান আছে।

They have a certain blind instinctive consciousness of their own which is entirely apart from the consciousness of the man himself.

সম্প্রতি পশ্চিমে মনোবৈজ্ঞ প্রভৃতির মুখে যে 'Auto-suggestion' (আত্মানুজ্ঞা) প্রভৃতির কথা শুনা যাইতেছে—ঐ অনুজ্ঞার পাত্র আমাদের ঐ ত্রিবিধ ভূতালি—ভূতাত্মা নহেন। এ সকল কথা মনে রাখিলে আমরা psycho-analysis-এর গহনারণ্যে বিভ্রান্ত হইব না।†

সে যাহা হ'ক আমরা কোশের কথায় ফিরিয়া যাই। ঐ ছয় কোশকে অন্য ভাবেও বিভক্ত করা যায়। অন্নময় কোশ জীবের স্থূল শরীর, প্রাণময় ও

---

* Third Life-wave-এর ব্যাপার সম্প্রতি আমাদের আলোচ্য নয়—উহার কার্য ব্যক্তিত্ব-সাধন (individualisation)—তৃতীয়ং সর্বভূতস্থম্—উহা শিবের কার্য।

† এ সম্বন্ধে আমি অন্যত্র এইরূপ লিখিয়াছি—Now in this method, to whom is this suggestion made ? The suggestion is made to the semi-intelligent elemental essence which as the body-elemental, the desire-elemental, and the mind-elemental is the organising factor of the physical, astral and mental bodies which together compose our Personality.

—What is the Psyche in 'Theosophical Gleanings'

মনোময় কোশ মিলিয়া জীবের সূক্ষ্ম শরীর এবং বিজ্ঞানময়, আনন্দময় ও হিরণ্ময় কোশ মিলিয়া জীবের কারণ-শরীর। এ ভাবে জীব 'ত্রিশরীর'—তং বা এতং ত্রিশরীরম্ আত্মানম্—(নৃসিংহ, উত্তর, প্রথমখণ্ড)। উপনিষদ্ স্থূল-শরীরাবচ্ছিন্ন আত্মাকে 'শারীর-আত্মা', সূক্ষ্ম-শরীরাবচ্ছিন্ন আত্মাকে 'তৈজসাত্মা' এবং কারণ-শরীবাবচ্ছিন্ন আত্মাকে 'প্রাজ্ঞ-আত্মা' বলিয়াছেন (বৃহদারণ্যক ৪র্থ অধ্যায়ের ২য় ও ৩য় ব্রাহ্মণ দ্রষ্টব্য)। পাশ্চাত্য পরিভাষায় ঐ শারীরাত্মা = The corporeal soul of the materialist, ঐ তৈজস-আত্মা = The individual soul of the realist এবং ঐ প্রাজ্ঞ-আত্মা = The supreme soul of the idealist

একটু নিবিষ্ট ভাবে দেখিলে বুঝা যায়, ঐ প্রাজ্ঞ-আত্মা প্রপঞ্চে প্রবিষ্ট প্রত্যগাত্মা হইতে অভিন্ন।

পৈঙ্গল উপনিষদেও ঐ তিন শরীরের উল্লেখ আছে। সেখানে উহাদিগের নাম, 'মূলশরীর' 'লিঙ্গশরীর' ও 'কারণশরীর'। পৈঙ্গল উপনিষদ্ মাত্র পঞ্চ কোশের বিবরণ দিয়াছেন। তাঁহার মতে অন্নময় কোশই স্থূলশরীর—তদেব স্থূল শরীবম্। প্রাণময়, মনোময় ও বিজ্ঞানময়—এই কোশত্রয় মিলিয়া লিঙ্গ-শরীব—এতৎ কোশত্রয়ম্ লিঙ্গশরীরম্ ; আর আনন্দময় কোশই কারণ-শরীর—তৎ কাবণ-শরীবম্। অন্যত্র উপনিষদ্ কারণ-শরীরকে বীজ-শরীব (Causal body) বলা হইয়াছে। সেখানে স্থূল, সূক্ষ্ম ও বীজ লইয়া ত্রিবিধ শরীর।

বলা বাহুল্য, পৈঙ্গল উপনিষদ্ যাহাকে লিঙ্গশরীর বলিলেন, তাহা সাংখ্যেব লিঙ্গশরীর নহে। সাংখ্যেরা বলেন—সপ্তদশৈকং লিঙ্গং—সাংখ্য সূত্র, ৩।৯

সপ্তদশৈক অর্থে অষ্টাদশ—পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ তন্মাত্র ও মন, বুদ্ধি এবং অহংকার, এই অষ্টাদশ অবয়ব মিলিয়া সাংখ্যের লিঙ্গ-শরীর। এই লিঙ্গ-শরীর সাংখ্যমতে পুরুষের psychic apparatus বা persona। উহা নিয়ত ও পূর্বোৎপন্ন (Primeval) এবং অনাদি কাল হইতে পুরুষের সহিত সংযুক্ত এবং তদুপহিত পুরুষই জীব। পৈঙ্গল উপনিষদ যে ভাবে শরীরত্রয়ের আলোচনা করিয়াছেন, তাহাতে সাংখ্যমতের কতক সমর্থন পাওয়া যায়। স্থূল শরীরের প্রসঙ্গে পৈঙ্গল বলেন যে, ঈশ্বর পঞ্চীকৃত মহাভূতের অবয়ব দ্বাবা ব্যষ্টি ও সমষ্ট্যাত্মক স্থূলশরীর রচনা করিলেন।

ঈশঃ পঞ্চীকৃতমহাভূতলেশান্ আদায় ব্যষ্টিসমষ্ট্যাত্মকস্থূলশরীরাণি যথাক্রমম্ অকরোৎ।

-সূক্ষ্ম শরীরের প্রসঙ্গে পিঙ্গল বলিতেছেন—

অথ অপঞ্চীকৃতমহাভূতরজোংশভাগত্রয়সমষ্টিতঃ প্রাণম্ অসৃজৎ।

অর্থাৎ, 'অপঞ্চীকৃত মহাভূতের রজোংশভাগ-ত্রয়ের সমষ্টি হইতে প্রাণ সৃজন করিলেন'।

ঐ প্রাণের পঞ্চবৃত্তি—

প্রাণাপানব্যানোদানসমানাঃ প্রাণবৃত্তয়ঃ।

সঙ্গে সঙ্গে কর্মেন্দ্রিয়ের সৃষ্টি হইল—আকাশাদি রজোগুণ-তুরীয়ভাগেন কর্মেন্দ্রিয়ম্ অসৃজৎ। এ কর্মেন্দ্রিয়েরও পঞ্চবৃত্তি—বাক্-পাণি-পাদ-পায়ু-উপস্থাঃ তদ্‌বৃত্তয়ঃ। সঙ্গে সঙ্গে ভূতের সত্ত্বাংশ-ভাগ-ত্রয়-সমষ্টি হইতে অন্তঃ-করণের সৃষ্টি হইল—এবং ভূতসত্ত্বাংশভাগত্রয়সমষ্টিতঃ অন্তঃকরণম্ অসৃজৎ। অন্তঃকরণের চার বৃত্তি—মনঃ, বুদ্ধি, চিত্ত ও অহঙ্কার—মনোবুদ্ধিচিত্তাহঙ্কারাঃ তদ্ বৃত্তয়ঃ। এইবার ভূতসত্ত্বের তুরীয় ভাগ হইতে জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সৃষ্টি হইল—ভূতসত্ত্বতুরীয়ভাগেন জ্ঞানেন্দ্রিয়ম্ অসৃজৎ। ঐ জ্ঞানেন্দ্রিয়েরও পঞ্চবৃত্তি—চক্ষুঃ, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্—শ্রোত্রত্বক্‌চক্ষুর্জিহ্বাঘ্রাণাঃ তদ্ বৃত্তয়ঃ।

আমরা দেখিয়াছি, পৈঙ্গলের মতে কর্মেন্দ্রিয়ের সহিত পঞ্চ প্রাণ প্রাণময় কোশ, জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সহিত মনঃ মনোময় কোশ এবং জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সহিত বুদ্ধি বিজ্ঞানময় কোশ এবং 'এতৎ কোশত্রয়ম্ লিঙ্গশরীরম্'। যাহা হউক এ বিষয়ের আর বিস্তার করিব না।

পাঠককে ইহাই লক্ষ্য করিতে বলি যে, প্রত্যগাত্মা প্রপঞ্চে প্রবিষ্ট হইয়া যখন পঞ্চ লোকের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করেন এবং ঐ পঞ্চ লোকের মধ্যে একটি লোকের যখন দুইটি স্তর—অরূপস্তর ও রূপস্তর—তখন প্রত্যাগাত্মাকে অবশ্যই ছয়টি কোশ রচনা করিতে হয়,—অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময়, আনন্দময় ও হিরণ্ময়। অতএব ঐ ছয়টি কোশ অবশ্যং-ভাবী। প্রপঞ্চে প্রবিষ্ট প্রত্যগাত্মার অন্তর্নিহিত শক্তিপুঞ্জকে ব্যঞ্জিত ও ব্যাকৃত করিবার জন্যও কোশষট্‌কের প্রয়োজন। আগামী বারে আমরা এ বিষয়ের আলোচনা করিব।

হীরেন্দ্রনাথ দত্ত

কবি সিসিল ডেল্যুইস

সুরুতে ডেল্যুইসের কবি মানসে অডেনের গঠনশক্তি বা স্পেণ্ডারের বর্ণিষ্ঠ আবেগ ছিল না। যেকোবিয়ান এবং কেরোলাইন (যাঁরা 'মেটাফিসিক্যাল' নামে খ্যাত) কবিদের সাথে তাঁর অন্তরঙ্গ সান্নিধ্য কিন্তু তখন হতেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। গীতি কবিতার তন্বু সুষমার সাথে বলিষ্ঠ যৌক্তিকতার সমন্বয় ('মার্ভেল' সম্বন্ধে এলিয়টের প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য); এবং কোন স্বীকৃত দার্শনিক পরিপ্রেক্ষিতের নিশ্চিতির আকর্ষণ দূরে ঠেলে নিজের অন্তর্বিরোধী অভিজ্ঞতা-নিচয়ের ভিত্তিতে জীবন্ত দর্শন গড়ে তোলার প্রয়াস: এই উভয় চারিত্রিকেই ডেল্যুইস এবং পূর্বসুরী মেটাফিসিক্যালেরা বিশিষ্ট। কিন্তু যেক্ষেত্রে ডান-কল্পনায় বিশ্বাসবোধ অভিজ্ঞতার সংঘাতে ভঙ্গুর, ডেল্যুইসের মূল্যমান অভিজ্ঞতার সমৃদ্ধিতে দানা বেঁধেছে। সুরে এসেছে নিশ্চিতি। যে স্তব্ধ বেদনা ও তীব্র আর্তনাদ মেটাফিসিক্যাল কাব্যের রক্তকৃষ্ণ ভাঙনকে চিহ্নিত করেছে, ডেল্যুইসের কবিমন তা হতে উত্তীর্ণ হবার প্রয়াসী।

বিকেন্ ভিজিল এবং কন্ট্রি কমেন্ট্স্-এ যে-অনুসন্ধিৎসু কল্পনা বিক্ষিপ্তভাবে বর্তমান, ট্রান্‌সিশ্যনাল পোয়েম কাব্যগ্রন্থে তা' বয়স্ক সঙ্গতি লাভ করেছে। এই দীর্ঘ কবিতাটি বিশ্বব্যাপী অর্থসঙ্কটের সূচনাকালে প্রকাশিত হয়। এটি চার অংশে বিভক্ত: প্রতি অংশ আবার অনেকগুলি খণ্ড কবিতার সমষ্টি। কবিতাটির সাথে সংযুক্ত টীকায় কবি জানিয়েছেন যে এটির "মূল আখ্যানবস্তু হচ্ছে একক মন।" চারটি অংশ হচ্ছে "একক মানসিকতার সন্ধানে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞার চারটি অবস্থার প্রতিচ্ছবি।" এই অবস্থাগুলোকে বর্ণনা করা চলে "দার্শনিক, নৈতিক, মনস্তাত্ত্বিক" এবং "কাব্য প্রেরণাকে অভিজ্ঞতার সাথে সংযুক্ত করবার একটি প্রয়াস" বলে।

দার্শনিক বিচারের সূচনা হোল বাইরের জগতের বিশৃঙ্খলার স্বীকৃতিতে। এদিকে মনেও জমে পুঁজ রক্ত যা

> সেখান হতে বিতাড়িত না হওয়ায়
> বিকৃত করে প্রাণ ইন্দ্রিয়কে
> বিশৃঙ্খলাকে প্রকৃত করে তোলে। (কলেক্‌টেড্ পোয়েম্‌স্ পৃঃ ৯)

এই বীক্ষণার ফলে যে সত্যে পৌঁছন গেল তা হোল এই :

……আমরা পৌঁছব না
কোন জীবনে যতক্ষণ না মুদ্রাঙ্কিত করছি
সব জীবনে চতুষ্কোণ
বিশুদ্ধ সমঞ্জসা মস্তিষ্কের। (ঐ, পৃঃ ৯)

মানুষ যখন নিজের মননশীলতার কেন্দ্রিক শক্তি সম্বন্ধে সচেতন হয়নি, তখনি সম্ভব ছিল চৈন নিরপেক্ষতা। কিন্তু এখন সারা অস্তিত্বকে আমাদের মনের আয়ত্তে আনা আমাদের স্বমার্গ : এ হতে চ্যুতির অর্থ আত্মহত্যা।

যে সময়গত যখন আমরা
স্বাচ্ছন্দ্যে হামাগুড়ি দিতে পারতুম
আলো-আঁধারের মাঝখানে, পারতুম
মাধ্যমিক হতে প্রমাণ করতে সর্বশক্তিমানতা। (ঐ, পৃঃ ১১)

মন এবং বস্তুর দুই শক্তিবিচ্ছুরমাণ প্রান্তের মাঝখানে অস্তিত্ব দুলছে। এরা উভয়েই একান্তভাবে সত্য : জীবন্ত অভিজ্ঞতার কষ্টিপাথরে—মেথুসেলার সহস্র বৎসর সঙ্গতিহীন। ক্যাসাণ্ড্রা থাকত এক নোংরা, ধুলোয় ঘাঘরা-লোটান মেয়ে আব হেলেন দশ বছরের আদব হিসেবে, যদি না এক অন্ধের প্রবল আবেগ তাদের প্রাণবন্ত করে তুলত।

মেটাফিসিক্যালদের মত ডেল্যুইসেরও সমস্যা বাস্তব অস্তিত্ব এবং কামনাজাত কল্পনার সমঞ্জসা বিধান। এ সমস্যা প্রেমের অভিজ্ঞতায় সব চাইতে বেশী পরিস্ফুট। এ সূত্রে ডানের "এক্‌স্টাসি" কবিতাটির সাথে ডেল্যুইসের "উঠে এস, মেথুসেলা" কবিতাটি তুলনীয়। ডানের মত ডেল্যুইসেও প্রেমের দ্বৈত স্বরূপ গম্ভীরভাবে অনুভূত। "একজনের ওষ্ঠে জ্বলছে সূর্য্যচন্দ্রের স্পর্শ," অপরা তার ঘাঘরা রাঙিয়েছে প্রেমিকের হতাশায়। লেখার ঢংও পূর্বসূরীদের স্মরণ করিয়ে দেয়। এ কবিতাটির বিশেষ আবেগগত পটভূমিতে "doddering" শব্দ ডানের অন্য কবিতায় "Sawey pedantique wretch" এর প্রয়োগের সাথে তুলনীয়। কবির মানসিক কাঠামোয় আন্তরিক উচ্ছ্বাস এবং সচ্ছল কৌতুক এই দুই বিরোধী রসেব ভারসাম্য লক্ষ্যণীয়। কিন্তু ডেল্যুইস এক্‌স্টাসির অগভীর সমন্বয়ের সমাধান গ্রহণ করেন নি ; এখানে তাঁর প্রেক্ষিত

অভিজ্ঞতার দ্বৈততার পরে খাড়া হয়েছে : তাই উভয় প্রান্তই শক্তিচ্ছুরমাণ।

দ্বিতীয় অংশে অস্তিত্বের বিশৃঙ্খল বহুত্বের মাঝে মনের একমুখী হবার প্রয়োজনের বিরোধের কথা শুনি। কবিদের বিচ্যুতির ভেতরেও এই সমস্যার সম্মুখীন হবার প্রমাণ মেলে।

> একক মন পাল্লা কষে বিভক্ত বুদ্ধির সাথে
> জন্ম দিয়ে সত্য এবং নিরর্থকের নানা-ছোপ স্বরের। (ঐ, পৃঃ ১৯)

সচেতন মন দেখে গ্রহপুঞ্জ, চোখে পড়ে তাদের বিক্ষিপ্ত অসংলগ্নতা। দ্বন্দ্ব চলে সন্দিগ্ধ মন ('কাত্তব পাইলেট') এবং বিশ্বাসবোধের ('অজগরসাপ যা সর্ব গ্রাস করে') ভেতরে। বুদ্ধির ভেতরে যার সমাধান দুর্লভ তার প্রবল ইঙ্গিত আসে মাঝে মাঝে দুর্বার অভিজ্ঞতায়।

> কিন্তু এক উৎকেন্দ্রিক প্রহর হয়ত আসে, যখন পদ্ধতিরা,
> নক্ষত্রগুলো নয় বিভক্ত করে অন্ধকারকে : তখন জীবনের গতিযন্ত্র
> সশব্দে আঘাত করে তাদের গুপ্ত বাষ্পকক্ষে,
> বিচলিত করে প্রচণ্ডতম সন্ন্যাসীকেও,
> ইঙ্গিত করে সেই যন্ত্রসমূহের মাহুষও যার অন্তর্গত। (ঐ, পৃঃ ২৫)

তখন নিজের মনের শক্তি সম্বন্ধে মানুষের বিশ্বাস আসে, তখন মানুষের মনে হয়

> সে পারে সংহত করতে
> কোটি আত্মা : যেখানে ছিল বিশৃঙ্খলা
> তারি উপরে ডুপা ছড়িয়ে দাঁড়িয়ে নোতুন জগত সৃষ্টি করতে। (ঐ পৃঃ ২৫)

মনের ভেতর হতে এই বিশৃঙ্খলা অতিক্রম করে নোতুন জগৎ সৃষ্টির তাগাদা বস্তুবনিয়াদী বিশ্বাসে আকার গ্রহণ করে।

> এই অর্ণবপোত, মস্তিষ্কের এই কুঠুরী হতে
> বেরিয়ে আসে কপোত, উড়ে ফিরে আসে
> নিশ্চিতির ত্রাণ-পল্লব বহন করে
> প্রবহমাণ বন্যার নীচে জমির প্রতিশ্রুতি নিয়ে। (ঐ, পৃঃ ২৬)

বিশ্বাস জিনিষটা মোটের ওপর একটা নৈতিক সত্য এবং এ সত্যের

কষ্টিপাথর হোল কামনার গভীরতা। দ্বিতীয় অংশে জানা গেল যে কামনার "প্রয়োজন নেই অপর কোন প্রমাণের নিজের আগুন ছাড়া"।

কিন্তু মাত্র কামনা-নির্ভর কোন জগতের অস্তিত্ব যে সম্ভব নয় তৃতীয় অংশের সমস্তাত্বিক বিচারে তা' স্বীকৃত হয়েছে। "চন্দ্রাহত আমি সূর্য্য এবং চন্দ্রের ভেতর হতে রচনা করেছিলাম এক নৈঃসঙ্গ্য" (ঐ, পৃঃ ৪০)।

কিন্তু বস্তুনিরপেক্ষ কোনো সৃষ্টি সম্ভব নয়: তাই স্রষ্টা ক্রমে হৃদয়ঙ্গম করলেন যে ভারসাম্যবিহীন আত্মকেন্দ্রিক বৃত্তি হতে "কিছুই গড়ে উঠতে পারে না আমার পোড়ালির নীচের ছায়াটুকু ছাড়া" (ঐ, পৃঃ ৪০)। কিন্তু এ জ্ঞান বস্তুজগতের সাথে ব্যক্তিমনের সংশ্লেষের কোনো সম্ভাব্য উপায়ের নির্দেশ দেয় না। বুদ্ধির মারফৎ কোনো সমাধান না মেলায় কবি প্রেমের ভেতরে জীবনের সূত্র সন্ধান করছেন।

মাত্র তোমার ভেতরেই
সাক্ষাৎ পেয়েছি নগ্ন আলোকের, তোমার দ্বারাই
হয়েছি অগ্নিশিখায় অভিজ্ঞ পুরুষ
যাতে সৈনিক অস্থি ছাড়া সব কিছু যায় পুড়ে। (ঐ, পৃঃ ৩৯)

কিন্তু নিশ্চিতি এখানেও নেই: হয়ত এখানেও শেষ পর্যন্ত ঠকতে হবে। দিশা না পেয়ে কবি বলছেন যে তাহলে তখন বুঝব যে "আমার হ'ল বলাকার যাত্রা যা যে কোন আকাশে নৈঃসঙ্গ্য রচনা করে" (পৃঃ ৩৯)।

চতুর্থ অংশে এইসব বিচিত্র অভিজ্ঞতা কাব্যপ্রেরণার সাথে যুক্ত হয়েছে: কামনা, প্রেম, আবেগের ভেতর দিয়ে কবির বর্তমান বিশৃঙ্খলার প্রতি প্রতিক্রিয়া সঙ্গতিলাভ করেছে।

বিশৃঙ্খলার যুগে
এই ছিল আমার পক্ষে যথেষ্ট
তার সৌন্দর্য বইয়ের পাতার ওপর দিয়ে চলত
আর তাই ছিল কবিতা। (ঐ পৃঃ ৪৪)

স্পিনোজিয় আত্মানুসন্ধানের ফলে মনের ভেতরকার পুঁজরক্ত নির্গত হোল বটে, কিন্তু বাইরের জগতের বিশৃঙ্খলা সমানই রইল। কবির সান্ত্বনা

রইল শুধু এইটুকু : 'সৌন্দর্য মনেরি রচনা' (পৃঃ ৪৯)। এ প্রসঙ্গে গ্রন্থশেষে স্পিনোজা হতে উদ্ধৃত টীকা অর্থপূর্ণ।

কিন্তু স্পিনোজীয় সৌন্দর্যতত্ত্বে জীবনের নিষ্ঠুর অসঙ্গতির কোন সমাধান মেলে না। "পালকগুচ্ছ হতে লৌহে" কাব্যগ্রন্থে কবি ব্যক্তিমনের ঐক্য হতে আবার তাই বাস্তবজীবনের অনৈক্যের দিকে দৃষ্টি ফিরিয়েছেন। কিন্তু জীবনের কুৎসিৎ বিকৃতি দেখে তাঁর সৌন্দর্যবোধ ভীত পলাতক হয়নি : মৃত্যুর অন্তরে দৃষ্টি ফেলে তিনি তার ভেতরে নবজীবনের সাড়া পেয়েছেন। নিঃস্ব রীতি-নীতির বাঁধনকে ভাঙতে চাইছে মানুষের জীবনশক্তি। মৃত্যুই শেষ কথা নয় : 'তুষারের নীচ হইত ক্রোকাস ফুল জানাচ্ছে, আরো জীবন আসবে আর যাবে' (ঐ, পৃঃ ৬১)।

> বল, সহনের ভেতর দিয়ে কি পাই, মৃত্যু কি হতে বঞ্চিত করে
> প্রেমের প্রমাণ তার স্বজনেঃ অনন্ত নয়
> গাছের পাতা বা লিনেট পাখীর মত খাঁটি হৃদয়ের স্নেহ
> জন্মায়, তারপর মরে, চায়না কোনো আশ্বাস। (ঐ, পৃঃ ৬৩)

জীবনের এই অফুরন্ত আনাগোনার অনুভূতি কবিকে বাইরের জগতের বিশৃঙ্খলার ভেতরে গতিপদ্ধতি আবিষ্কারে সাহায্য করেছে। এ যুগের বঞ্চনার ভেতরে আগত মুক্তির আভাস দেখা যাচ্ছে। কিন্তু মুক্তি আসার পথ বেদনা-সঙ্কুল। তাই কবি তাঁর নবজাত সন্তানকে আহ্বান করে বলছেন ('ফ্রম ফিদারস টু আয়রন' কাব্যগ্রন্থ কবির সন্তানের জন্মের বিষয় নিয়েই লেখা) :

> তোমার জন্ম একান্ত অন্ধকারে
> সেই যুগে যা রেখার পরে আঙুল ভর করে চলেছে
> কিন্তু সীমাচিহ্নকে মুহূর্তের জন্য অতিক্রম করেনি।
> খুলে রাখ তোমার আঙরাখা, হও শীর্ণ
> সহ্য কর অপমান
> বর্ম্ম গুলি নিঃসঙ্গ পাহারা দেও
> গ্রহণ কর তোমার লৌহ খোরাকি। (ঐ, পৃঃ ৮৩)

এ কবিতাটিতে ব্যক্তিগত রেখাপত্রের ওপরে সামাজিক অন্তর্বিরোধ এবং বিরোধমুক্তির প্রয়াস অঙ্কিত হয়েছে। যদিচ কবিতাটি জন্ম উপলক্ষে লেখা, তবু কবির ব্যক্তিগত আশা আকাঙ্ক্ষা, আসন্নবেদনা এক্ষেত্রে গৌণ, মুখ্য উদ্দেশ্য

হ'ল সামাজিক অস্তিত্বের সম্যক উপলব্ধি। জীবন মৃত্যুর মাঝখানে বারবার ওঠানামা করে রেখাটি অবশেষে জীবনের অক্ষয় ঐশ্বর্যে বিশ্বাসের নির্দেশে বিলম্বিত হয়েছে।

কিন্তু আমরা চাই এক নোতুন জগত পুরোন প্রয়াস হতে
যার আশা বীজের মত নিহিত পৃথিবীর ঔরসে
যার প্রত্যুষ অন্ধকার হতে স্বর্ণ টেনে তোলে। (ঐ, পৃঃ ৭৩)

ডেল্ল্যুইসের কাব্যরীতির প্রাণ প্রকৃতির অনুভূতির সাথে সমাজবোধের অন্তরঙ্গ সংশ্লেষ। জীবনের ভেতরে যে সম্ভাব্য শক্তি পুঞ্জীভূত হয়ে আছে কবি তার অপরোক্ষ অনুভূতি প্রকৃতির সাথে পরিচয় হতেই পেয়েছেন।

তবু আমি চেয়ে থাকি আকাশের তরঙ্গের দিকে
সেখানে এত সামান্য পরিবর্তন দেখে বিস্মিত হই
যদিচ সেই পর্যন্ত মণ্ডলের ভেতরে
ঈশ্বর জানেন কী শক্তি উৎক্ষেপের জন্য কুণ্ডলিত হয়ে আছে। (ঐ, পৃঃ ৮৮)

ডেল্ল্যুইসের রচনারীতিতেও এই সংহত উৎক্ষেপমুখী শক্তির অস্তিত্ব অনুভব করি।

"চৌম্বক পাহাড়" গ্রন্থে কবি বস্তুচেতনা এবং পরিচ্ছন্নতর মূল্যবোধের দিকে আরো অনেকটা এগিয়ে গিয়েছেন। চার প্রতিবাদী এবং চার শত্রুর সওয়ালের ভেতর দিয়ে বর্তমান সভ্যতার নিঃস্বতা উদ্‌ঘাটিত হোল। বন্ধু অডেনকে আহ্বান করে তাই কবি বলছেন, হে নিঃসঙ্গ পাখী, এখানে তোমার ডানা মেলবার জায়গা কোথায়। এখানকার জন্ম নিস্ফল, সূর্য হতে মুখ-ফেরানো নেতারা ('বনিয়াদী ওক')

নির্বাসিত করেছে সৎ লোকদের বিতাড়িত করেছে স্রষ্টাকে
এরা ডুবিয়ে দিয়েছে আবাদ জমি বিলাস-সরোবর রচনা করতে
অনাবৃষ্টির সময় এরা সঞ্চিত জলের আধার শুষে দিয়েছে
শুধু লৌহনালা নিয়ে ব্যক্তিগত স্নানাগার আর ফোয়ারা করার জন্য।
(ম্যাগনেটিক মাউন্টেন, ঐ, পৃঃ ১৩৯)

কিন্তু বিক্ষোভ করলেই চলবে না। অডেনের মত ডেল্ল্যুইস মাত্র নিঃস্বতার বিশ্লেষণে তার মূল্যোৎপাটনের ভরসা করেন নি। এই তাসের ঘর দাঁড়িয়ে আছে আমাদের সন্ত্রস্ত নিষ্ক্রিয়তার পরে : আঘাত না করলে এ ধসবে না।

কিন্তু এখনো তাদের ভয় আর উন্মত্ততা আমাদের সংক্রমণ করছে
মাদক বা স্বাতন্ত্র্য এ মতকে নিরাময় করবে না
এখনি অথবা কোনোদিনই নয় অস্ত্র প্রয়োগের এই প্রহর
অতীত হতে বিযুক্ত করার, সেই প্রধান ব্যবচ্ছেদের । ঐ, পৃঃ ১৩৯]

এ ব্যবচ্ছেদের জন্য যে কষ্ট যন্ত্রণা ত্যাগ প্রয়োজন কবির তা অজানা নাই । যারা এই নোতুন পথে দল বেঁধে এল কবি তাদের স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন, এপথে পায়ের নীচে নিশ্চিত মাটি নেই, তীরে না পৌঁছান পর্যন্ত "ঢেউএর পর ঢেউয়ের দেয়াল" (পৃঃ ১৪৯), 'হতে-পারে-বীর' যারা তাদের কোন প্রশ্রয় নেই, দুর্বল-স্নায়ু সহীদের নেতৃত্ব স্বীকৃত হবার কোন ভরসা নেই, যদিও এই "অন্ধকারের ভেতর হতে নোতুন জগৎ বিকশিত হবে" (পৃঃ ১৪৫), তবু 'এখন আমাদের ওপর দিয়ে শীতের অমসৃণ অশ্বারোহন" (পৃঃ ১৪৫) কামনা করলেই বসন্তের উষ্ণ স্পর্শ মেলেনা । কিন্তু বিপ্লবীরা ত' 'দয়ার ভিক্ষা' চায় না ; "ভীষণ স্বর্গে বেদনার সমাপ্তি' (পৃঃ ১৫৩) তাদের কাম্য নয়। যারা পিঠ চাপড়ায়, সস্তা উৎসাহ দেওয়ার নেতৃত্ব করে, ঘুস নিয়ে যে ঘোষকরা শত্রু এগিয়ে আসার কালে বিপন্মুক্তির নির্দেশ দেয়, যারা চায় ভাঙ্গা-বাঁধকে আঠা দিয়ে আটকাতে—তাদের সাথে এদের আমরণ শত্রুতার সম্পর্ক । চার পাশে আজ মৃত্যু নিজেকে বিস্তার করেছে :

আমাদের পেছনে পশ্চিমে আগুন লেলিহান
বিধ্বস্ত জমি, বন্ধ সব কাজকর্ম,
কোনো বীজ জাগছেনা, কোনো শীকারী নয় হুসিয়ার
যারা পোষমানা তারা মরেছে, যারা বন্য তারা পলাতক । (ঐ পৃঃ ১৪২)

এই অবস্থায় সৃষ্টিধর্মী আক্রমণের পূর্ণ দায়িত্ব বিপ্লবীদের হাতে : ব্যক্তিগত খামখেয়ালে অপচয় করার মুহূর্ত অবসর তাদের নেই । রূপান্তরের মূল্য দেবার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে : 'যদিও কেউ কেউ হয়ত শীতের শেষ দেখতে পাবে না" (পৃঃ ১৩৮) । কিন্তু যে "চৌম্বক পাহাড়ে" বিশ্বাস নিয়ে কবির এই অনু-সন্ধান সুরু হয়েছিল, তাই শেষ পর্যন্ত সংগ্রামের শক্তি দেবে। কাব্যগ্রন্থের সূচনাতে তিনি বলেছিলেন :

কোথাও ছাড়িয়ে রেলপথগুলো
বুদ্ধির, দক্ষিণে বা উত্তরে
বিস্তৃত আছে এক চৌম্বক পাহাড়
দৃঢ় সম্বন্ধ করে আকাশকে পৃথিবীর সাথে। (ঐ, পৃঃ ১০৮)

গ্রন্থের শেষে কবি আহ্বান করেছেন আমাদের সেই পাহাড়ের উদ্দেশ্যে একত্র গান গাইতে :

আমাদের চৌম্বক পাহাড়ের ওপরে জলছে এক সংকেত আলো
আমাদের অনেক আশার শাস্তি সে স্বাক্ষরিত করবে, শীঘ্র বা বিলম্বে,
পরিচ্ছন্ন পৃথিবীর ওপরে নির্মল আলো, আর সব মানুষ ফিরে চাইবে
শিশুর চোখের মত, সূর্যমুখীর মত আলোকের দিকে। (ঐ, পৃঃ ১৫৫)

(২)

আন্তর্জাতিক অর্থসঙ্কটের সময় হতেই ব্রিটিশ কবিদের মনে কাব্যের সামাজিক দায়িত্বের চেতনা প্রবল হয়ে উঠে। এলিয়টের ইঙ্গক্যাথলিক অপসরণ সমস্যার কোন সমাধান দেয়নি। ব্রিটিশ কবিদের ভেতরে সম্ভবতঃ শ্রীযুক্ত সি. এস. গ্রিয়েভ (প্রচলিত ছদ্মনাম "হিউ ম্যাকডিয়ারমিড") প্রথম কবি-কল্পনায় মার্ক্সীয় প্রেক্ষিতের সম্পন্ন সম্ভাবনার সুযোগ গ্রহণ করেন। এই সময় "নোতুন স্বাক্ষরের" দল গড়ে ওঠে। মাইকেল রবার্টস্ সম্পাদিত এঁদের দ্বিতীয় সঞ্চয়ন গ্রন্থ "নূতন দেশ"এ ডেল্যুইস "কোনো সাম্যবাদী তরুণের প্রতি" খোলা-চিঠিতে জানালেন যে কবিরা তাঁদের তীক্ষ্ণ অনুভূতির মারফৎ পারিপার্শ্বিকের অন্তরঙ্গ স্বরূপ সর্বপ্রথম উপলব্ধি করতে পারেন। (প্রসঙ্গত পাউণ্ডের উক্তি তুলনীয় : "কবিরা হলেন জাতির পতঙ্গ-শুঁড়"।) যদি সমাজের ভাঙন দেখা দেয় তাও যেমন কবির রচনায় উদ্‌ঘাটিত হবে, যদি নোতুন সংগঠনের সম্ভাবনা দেখা দেয় তাও তার কাব্যে স্পন্দিত হয়ে উঠবে। অবশ্য এ হ'ল সেই কবিদের কথা "যারা নাভিকুণ্ড হতে স্বপ্নজাল বোনে না অথবা অরণ্যে আশ্রয় নেয় না" (নিউ কনট্রি, পৃঃ ২৬)।

কবির দায়িত্ব সম্বন্ধে এই বোধের প্রথম মূল্যবান বিবৃতি প্রকাশিত হয় উনিশ শ' চৌত্রিশ সালে। "কাব্যের-আশা" গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকায় ডেল্যুইস নোতুন কবিদের জবানি দুটি বাক্যে পেশ করেছেন। "জীবিতের

সাথে বাণীবিনিময় করার আগে শব্দদের রক্তপান করতে হবে।......তোমার কবিতা হোক একটি চুম্বন অথবা একটি আঘাত : প্রতিধ্বনি কোন জবাব নয়।" এর পর কবি আধুনিক কাব্যের ঐতিহ্যসূত্র টেনেছেন হপকিন্স এবং ওয়েনের রচনায় : ওয়েনের ভেতরে সমাজ এবং কাব্যের প্রতি যুগ্ম দায়িত্বের বিরোধ বিশ্লেষণ করে তারি ভেতরে সাম্প্রতিক কবিতার ধারা নির্দেশ করেছেন। রাজনৈতিক ধারণা যদি মাত্র প্রচারকার্য বা মুক্তির উপায় হিসেবে ব্যবহৃত হয় তাহলে কাব্যের নবজন্মে তা' কোনো কাজেই লাগে না। "যদি কোনো কবি রাজনৈতিক ধারণার গ্রহীতা হতে ইচ্ছা করেন, তাহলে প্রথমে তাঁকে একজন মানুষ হিসেবে সেই ধারণাগুলোকে গভীর ভাবে অনুভব করতে হবে। কারণ এই বলিষ্ঠ মানব-আবেগ রাজনৈতিক ভাবধারার ওপরে ক্রিয়া করে তাকে কাব্যবস্তু হবার উপযোগী করে তোলে। কাব্যশক্তিকে প্রকৃতপক্ষে কাজ করতে হবে কোন বিশ্লেষমূলক চিন্তাকে নিয়ে নয়, আবেগের দ্বারা মণ্ডিত এবং রূপায়িত চিন্তাই তার বিষয়বস্তু।"

"রচনায় বিপ্লব" নিবন্ধেও ডেল্যুইস এই কথাই বলেছেন। এ যুগের কবিদের প্রধান অসুবিধে এই যে তাদের সমসাময়িক ঐতিহ্য ভাঙনের পথে, অপর পক্ষে নোতুন কোন সংস্কৃতি এখনো গড়ে ওঠেনি। সুতরাং সাম্প্রতিকের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ এবং মহত্তর ভবিষ্যতের প্রতীকী স্বপ্ন আধুনিক কাব্যের উপাদান। এই বিক্ষোভ এবং স্বপ্নকে উচ্ছৃঙ্খল অসঙ্গতি হতে বাঁচতে হলে বিশ্বাসবোধের সংযম প্রয়োজন। এই সঙ্গতির দাম হিসেবে কল্পনাকে যদি সামাজিক প্রয়োজনের কাছে মাঝে মাঝে খাটো করতে হয়, তা করতে হবে। নান্য পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।

(৩)

"কাব্যের আশা" এবং "রচনায় বিপ্লবে" যে প্রেক্ষিতের প্রস্তাবনা করা হয়েছে, "নৃত্যের সময়" কাব্যে কবি তারি প্রয়োগের চেষ্টা পেয়েছেন। গ্রন্থটি একটি দীর্ঘ কবিতা (যার নাম হতে বইটির নামকরণ করা হয়েছে) এবং অনেকগুলি ক্ষুদ্র কবিতার সমষ্টি। কবিতাগুলি বিক্ষোভ, ঘৃণা, আনন্দ, আশা এবং বিশ্বাসের বিচিত্র সমাবেশ : কিন্তু প্রকাশভঙ্গী সর্বদাই দৃঢ়সম্বদ্ধ এবং গতিশীল। প্রথম কবিতাটিতেই শোণিতের স্বাদ : হয় চুম্বন, নয় আঘাত।

আমরাও বেড়ে উঠেছি গাছগুলোর মত
উত্থিত ঝড়কে কণ্ঠস্বর দিতে
আমাদের গানে বাসা বাঁধবে ঈগল পাখী
আমাদের ডানা-ওয়ালা বীজগুলো আগামী কালের বপন।

... ...

যদিও আমরা একবার পড়ি, যদিও আমরা বারবার পড়ি
যদি আমরা এমনো পড়ি যাতে আর কখনো উঠবোনা
আমাদের দিগন্তে সন্তানদের সুর
যখন আমরা তলিয়ে যাব তারা, সুদীর্ঘ হবে। (এ টাইম টু ড্যান্স পৃঃ ৭-৮)

জীবনের প্রতি দায়িত্ব বোধ: কবিকে রূপান্তরের কঠিন কর্তব্য পালনে প্রেরণা দিয়েছে।

দীর্ঘ কবিতাটির প্রথম অংশে বর্ণনা আছে কেমন করে পারার এবং ম'ইনটোশ নামে দুজন সৈনিক একটা প্রাচীন পরিত্যক্ত জীর্ণ উড়ো জাহাজ করে অসংখ্য বিপদের ভেতর দিয়ে অষ্ট্রেলিয়া পৌঁছয়। ভিজে কম্বলের মত কুয়াশা, পেট্রোলের অভাব, বেগড়ানো কলকব্জা, উত্তুঙ্গ আপেনাইন, পাহাড়ে পড়ে যাবার সময় শীকারী বাতাস, গড়িয়ে আসা তুষারের স্তূপ, প্লেনে আগুন ধরা: মৃত্যুর সাথে যুঝতে যুঝতে অবশেষে সেই উন্মাদ খেচর পৌঁছল গন্তব্যস্থানে। এই দুস্তর পথের বর্ণনার ভেতরে কবি আঁকতে চেয়েছেন হৃদয়ের আবেগকম্পিত স্থৈর্যের ওঠাপড়া। এই গতির পেছনে যে রূপক আছে তা' হ'ল কুৎসিৎ বর্তমান হতে সামান্য সঞ্চয় হাতে ভবিষ্যতের দিকে যাত্রা। দ্বিতীয় অংশে আছে কবির বন্ধু হেজেসের মৃত্যুর কথা। 'সে মৃত্যু কবির স্মৃতিতে প্রতিধ্বনি বা প্রতিচ্ছায়ার মত বিস্তৃতি হয়নি: সে দিয়ে গেছে বিদ্যুরিত শক্তি, হৃদয়ে দিয়েছে বল। সে শিখিয়েছে জীবনের আত্মার গান গাইতে যাকে কেউ দাবিয়ে রাখতে পারে না।

মৃত্যুর ভেতরে জীবনের অদম্য শক্তিকে লক্ষ্য করে কবি সবাইকে আহ্বান করলেন নৃত্যের উৎসবে। কিন্তু শোষিত জনসাধারণ (যাদের জন্য বিশেষ করে এই আহ্বান) মুক্ত কণ্ঠে প্রশ্ন করল:

কে সে যে ডাকে নাচতে আমাদের যাদের নাচের দিন সব অতিক্রান্ত,

...   .

যে বিদ্রূপ করে' মরণাতীত আত্মার চতুর কথা বলে

আমাদের কাছে যাদের বাঁচার অনুমতি পত্রও মেলেনি। (ঐ, পৃঃ ৫১)

এ অভিযোগের সত্যতা, কবির জানা। চোখের সামনে নগরীর ফুল-গুলোকে পচতে দেখেই না তিনি স্পিনোজীয় বিশুদ্ধ বুদ্ধি হতে জীবনের যুদ্ধে সক্রিয় অংশ গ্রহণে নেমে এসেছেন। তিনি জানেন যে আজ 'পাখীর গান', 'গোলাপের বিছানা', 'প্রবালের কঙ্কনে' প্রেমের উদ্‌যাপন স্বপ্নমাত্র: আজ শুধু কুমারী কপালে লোলরেখার মালা, অনাহারে রোগে তনুদেহ শীর্ণতা পেয়েছে। তিনি শুনেছেন শীতে অনাবৃত শিশুর বিশীর্ণ কান্না: তার বিছানাটুকুও বন্ধক দেওয়া হয়েছে। আজ একটা প্রাণের দাম সপ্তাহে দু'শিলিং। আজ

যন্ত্র

পাওয়ার লালসার সাথে পা ফেলবার প্রয়োজনে দ্রুত চালিত হয়ে

হত্যা করছে সহস্র সহস্রকে। (ঐ, পৃঃ ৫৬)

কিন্তু তবু নিমিত্তের জ্ঞানেই স্বাধীনতা। কবি লেখেন সহস্রের হৃদয় সেই জ্ঞানে উদ্বুদ্ধ করার ভরসায়।

তোমাদের হাতে ইতিহাস তার আত্মাকে ন্যস্ত করেছে।

নিমজ্জিত ছিলে তোমরা? সমুদ্রতল? কিন্তু সম্প্রতি

আকাশপালগুলো অনুভব করেছে এক জনশ্রুতি, ভূকম্পনযন্ত্রও

কিছু লক্ষ্য করেছে—

তোমাদের নবজাত দিবসের প্রথম নিঃশ্বাস ও কম্পন:

তখন প্রথমে এক অভ্যুৎপাতী ঢেউ মাথা তুলে

তাদের পরিচ্ছন্ন ময়দান আর মসৃণ আলাপের নিঃশ্বাসরোধ করবে

বিক্ষিপ্ত করে দেবে সাম্রাজ্যগুলোকে, ভূচিত্রগুলোকে বোকা বানাবে:

তারপর এক বিরাট জলজীব বিদীর্ণ করে উপরতল

শঙ্কিত সাগরগুলোর—মহাদেশের চাইতেও বিরাট

জেগে উঠবে—এ জগৎ ঝেড়ে ফেলে তার পিঠ হতে

পাথর এবং পোড়ো জমি, অত্যাচারের বহুবিধ

বিশৃঙ্খলা; সূর্যের আলোয় তার উপত্যকাগুলোকে শুকিয়ে,
দৃঢ় এবং তেজস্বী পাহাড়গুলোকে আকাশের দিকে এগিয়ে দিয়ে।
আর্যগণ, তোমরাই সেই জগত
এক নোতুন জগৎ সৃষ্টি করবে, হবে সমগ্র জগত। (ঐ, পৃঃ ৫৭-৫৮)

এই দৃঢ় বিশ্বাসের বলে কবি আহ্বান করেছেন সবাইকে আনন্দ উৎসবে। ভয়ের ভূত সংশয় জাগায়; প্রেমের ভেতর দিয়ে, যৌথ নৃত্যের ভেতর দিয়ে, জীবনের স্বীকৃতির ভেতর দিয়ে বিপ্লবীরা সে ভূতকে নিকাড়িত করে। যারা হাসতে হাসতে প্রাণ দিয়েছে তাদের জন্য দুঃখ করব না :

আমরা তাদের স্মরণ করব যেমন করে উজ্জ্বল ফল স্মরণ করে
রসপ্রবাহ আর সূর্যালোককে। (ঐ, পৃঃ ৬৪)

(৪)

'রচনায় বিপ্লব' পুস্তিকায় ডেল্যুইস বিপ্লব-অতিক্রান্ত যুগে রূপক-সাহিত্যের আবেদনের কথা আলোচনা করেছিলেন। 'নোয়া এবং বন্যা' কবিতাটিতে তিনি বর্ত্তমান সংকটে নিম্নমধ্যবিত্তদের সমস্যা নিয়ে একটি প্রতীক নাট্য রচনা করেছেন। এ রূপকটির সূত্র 'নাচের সময়' গ্রন্থের 'দ্বন্দ্ব' কবিতাটিতে দিয়েছেন। লক্ষ্য করবার বিষয় অডেনের "মৃত্যুর নৃত্য" রূপকনাট্যে যেক্ষেত্রে স্বত্তসর্ব্বস্ব ব্যবস্থার মৃত্যু তামসিকভাবে ঘটেছে এবং স্পেণ্ডারের 'বিচারকের বিচারে' যে ক্ষেত্রে নায়ক সাত্ত্বিকতা সত্ত্বেও (অথবা তারই জন্য) মারণ শক্তির কাছে মার খেল, ডেল্যুইসে সে ক্ষেত্রে সংঘাত, জ্ঞান এবং ইচ্ছাশক্তির প্রয়োগের ভেতর দিয়ে জীবনশক্তি জয়লাভ করেছে। ডেল্যুইসের প্রেক্ষিত চলতি অর্থে ট্র্যাজিক নয় : অডেন রচনার নাওয়ার র‍্যানসম ব্রড্লি থরহ্বাল্ড্দের মত তাঁর রচনায় নিম্নমধ্যবিত্ত নায়ক নায়িকার (যাঁদের লেনিন 'কুপনকাটিয়ে' বলে বর্ণনা করেছেন) অবশ্য সমাপ্তি অসহায় মৃত্যুতে নয়। সাম্যবাদী ফতোয়া হতে উদ্ধৃতিটি ডেল্যুইস মানসের বিশিষ্ট আস্তিক্যের পরিচায়ক। "অবশেষে শ্রেণী সংগ্রাম যখন প্রায় শেষ অবস্থায় পৌঁচেছে তখন শোষক শ্রেণীর ভাঙন এত তীব্র সক্রিয় হয়ে ওঠে যে সে শ্রেণীর একটা অংশ বিপ্লবী শ্রেণীর সাথে হাত মেলাতে বেরিয়ে আসে।" অডেনে মৃত্যুশক্তি জীবনশক্তির চাইতে বেশী সংঘবদ্ধ সক্রিয়। [অডেন সম্বন্ধে বিশদ আলোচনার জন্য ত্রৈমাসিক "নূতন

লেখা", শারদীয়া সংখ্যায় (১৩৪৯) বর্তমান লেখকের অডেন সংক্রান্ত বিস্তৃত প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।] ডেল্যুইসের লিরিক মন সহজেই জীবনের প্রবল আহ্বানকে প্রাধান্য দিয়েছে। [প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য ডেল্যুইস ছদ্মনামে গোয়েন্দা গল্প লিখে থাকেন এবং সম্ভবত সেই গল্পগুলোর আকর্ষিকাশক্তির ব্যাখ্যা এই রোমাঞ্চপ্রিয় লিরিক মানসিকতায় মেলে।] ডেল্যুইস চরিত্রে আভাময় অন্তর্দ্বন্দ্বের জটিলতা নেই। নোয়া এবং বন্যা নাটকে প্রকৃত সংগ্রাম বন্যাস্রোত (বিপ্লবশক্তি) এবং নাগরিকদের (শোষক শ্রেণীর) ভেতরে : দ্বন্দ্ব প্রধানত বাহ্য, ব্যক্তিকেন্দ্রে বহুমুখী সংঘাত এখানে অনুপস্থিত। দুই কণ্ঠস্বরের ভেতরে টালবাহানা নিতান্তই বিশ্লেষী বিতর্কমূলক। শ্রেণীসংগ্রামের শেষ মুহূর্তে নিম্নমধ্যবিত্তশ্রেণির যে অংশ বিপ্লবশক্তির সাথে যোগ দেবে বলে মার্ক্সবাদীর বিশ্বাস, নোয়া তারি প্রতিনিধি। আকাশ নদী সাগর হতে বন্যার স্রোত বাঁধ ভেঙে ছুটে আসছে পুরোনো জীবনযাত্রাকে গ্রাস করতে। নাগরিকেরা নোয়াকে অনুরোধ করছে এই বিদ্রোহী বন্যাদের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষায় নেতৃত্ব দেবার জন্য। নোয়ার মনে দ্বন্দ্ব উঠেছে :

> গতকাল আর আগামী প্রত্যুষের মাঝখানে
> এই অগ্রসর ভূখণ্ডে দাঁড়িয়ে, মৃত্যুমুখী স্রোতে
> আর তার প্রতিস্রোতের চৌমাথায় আমি বিমূঢ় ভাবছি
> আমার পরবর্তী নিয়োগ কোন পথে। (নোয়া এ্যাণ্ড দি ওয়াটার্স্ পৃঃ ৪০)

নাগরিকেরা তাঁকে বোঝাতে চাইল বন্যাস্রোত (অর্থাৎ জনসাধারণ) তাঁর পরে অত্যাচার করবে, তাঁর স্বাধীনতা কেড়ে নেবে, তাঁর সূক্ষ্ম অনুভূতিকে ঘৃণা এবং বিদ্রূপ করবে ; তারা তাঁকে স্মরণ করাল পুরোনো স্মৃতির কথা, তাঁকে একনেতৃত্বের প্রলোভন দেখাল। তারা বন্যার দলে ভাঙন আনতে চাইল আত্মহা বিকৃত দেশপ্রেমের বুলি আউড়ে, ধনী এবং দরিদ্রের ভেতর কাল্পনিক ভ্রাতৃত্বের কথা বলে, নেতাদের স্বার্থপরতার কথা উল্লেখ করে। কিন্তু জলের স্রোত টলল না, বরং তাদের মিলিত কণ্ঠস্বর নোয়ার মনে বিপ্লব আনল।

> শেখ দেশ বদলের প্রত্যয়, অনুভূতি দীর্ঘতর
> সূর্যালোকের: নিশ্চিত হও, তোমার হারাবার মত আছে শুধু শীত
> আর বিশ্বাস কর এই বন্যার ওপরে আবৃত আছে রমণীয়তর দেশ। (ঐ, পৃঃ ৪২)

জীবনের এই বলিষ্ঠ আহ্বান নোয়ার মনে সাড়া জাগাল। বুঝতে পারলেন কেমন করে নিয়ম-বাঁধা জীবনযাত্রা তাঁর মনের সচেতন প্রতিবাদ এবং কামনাকে এতদিন অসাড় করে রেখেছিল : দৃষ্টিকে এত বিক্ষিপ্ত করেছিল যে

ছিল না আর কিছু
বুকের দ্রুত স্পন্দন ছাড়া,
আর নিমজ্জনের আতঙ্ক, পূর্ণ বিলোপের কামনা। (ঐ, পৃঃ ৪৮)

বুঝতে পারলেন এই বন্যাস্রোত এসেছে 'পৃথিবীকে মুক্ত করতে, বলাৎকার করতে নয়" (পৃঃ ৪৯) নোয়া বিপ্লবশক্তির সাথে হাত মেলালেন; নাগরিক প্রতিরোধ স্রোতের টানে ভেসে গেল। তারপর কবি উদ্‌ঘাটিত করলেন আমাদের সামনে সেই মহৎ ভবিষ্যত যা বাস্তব করার জন্য এখনো দীর্ঘকাল একলক্ষ্য হয়ে কাজ করতে হবে। যখন বন্যাস্রোত অবশেষে থামবে, তখন

পাহাড়ের পাশ বেয়ে নীচে গড়িয়ে নামবে জলস্রোত
খুঁজে নেবে তাদের সমতল, তাদের বিস্তৃত কাঁধে পরবে সূর্যকে
বিবাহ করতে উপত্যকাদের ; সেই মিলিত আলিঙ্গনে
জন্ম নেবে—সূর্যমুখী গাছ আর রেকর্ড ফসলের চাইতে দীর্ঘতর এক জাতি
যার পূর্বছবি দেখেছিল নোয়া প্রতিশোধী বন্যার অবগুণ্ঠিত মুখে। (ঐ, পৃঃ ৫৮)

(৫)

শ্রেণীদ্বন্দ্বের পটভূমিতে মৃত্যু অনাহূত আগন্তুক নয়, বরং বঞ্চক কুৎসিত অর্থলোভী সভ্যতার মৃত্যুর ভেতর দিয়েই জীবন মুক্তিলাভ করে। তাছাড়া মৃত্যুও জীবনের এক স্বাভাবিক সহজ ঘটনা, তাকে ভয় করাটাই হাস্যকর। কিন্তু যে খুনীরা পরাজয়ের ভয়ে উন্মত্ত হয়ে সহস্রের জীবনে মৃত্যুকে দ্রুত সক্রিয় করে তোলে, জীবনের চোখে তাদের মার্জনা নেই।

তাদের—তোমার সেই সব নারকী সাহায্যকারীদের—জবাব দিতে হবে
খাদ্যহীন, অগ্নিহীন ঘরে আত্মঘাতীদের জন্যে
জলপাই-সবুজ খালের পারে শীর্ণ নুয়ে আসা খর্বিত
হৃদয়গুলোর জন্য, তাদের উন্মাদ ইতস্তত অগ্নিক্ষেপে
অসময়ে বিদীর্ণ কুসুম-কিশোরগুলির জন্য। (ওভারচারস্ টু ডেথ, পৃঃ ২৯)

আমরা যারা অপ্রশস্ত রুগ্ন গলিতে বাস করি, তাদের কাছে মৃত্যু সুদূরও নয়, কাহিনীও নয়, প্রায় পারিবারিক বন্ধুর মত। আমাদের শিশুরা মৃত্যুর সাথে খেলা করে : ঘরে পথে কাজের জায়গায় তার সাথে প্রায়ই আমাদের মোলাকাৎ ঘটে। কিন্তু যারা আমাদের দয়া করার ভান করে চিরকাল চাবুক মেরে এসেছে, যারা মুখে স্বাধীনতার কথা ব'লে পেছনে মুঠোয় করে শৃঙ্খল নিয়ে এসেছে, তারা আজ বাতাসে তাদের নিশ্চিত মৃত্যুর ঘ্রাণ পেয়ে অশ্বের মত চঞ্চল হয়ে উঠেছে। যখন সময় আসবে এই কুৎসিৎ ছিন্ন জীবনকে পরিচ্ছন্ন করবার, তখন হে মৃত্যু, তোমার বসিয়তনামা তামিল করবার জন্য আমাদের ওপর নির্ভর করতে পার। (ঐ, পৃঃ ৩৫)

ব্যাধিগ্রস্ত বর্তমান হতে সুস্থ ভবিষ্যতে যাবার এই দায়িত্বপূর্ণ মুহূর্তে সব উজ্জ্বল আনন্দই পলায়নের পাপে ছায়াচ্ছন্ন হয়ে আসে। "আজ শুধু জীবনের জন্য সক্রিয় হওয়া ছাড়া আর কোনো কিছুই নিষ্পাপ নয়" (ঐ পৃঃ ৩৭)। "আলো কি কক্ষ হতে বেরিয়ে এসে জীবনের জোয়ারে ঝাঁপ দেবে না" ("প্রশ্ন-গুলি" কবিতা দ্রষ্টব্য)? "আজ নেমে এস বিক্ষোভের বন্যায় শুষ্ক হৃদয়ে গভীরতর নালা কাটো, শুষ্ক অস্থি উজ্জীবিত কর গানে" (ঐ, পৃঃ ৬২)।

"মৃত্যুর প্রতি আহ্বানের" অর্থ এই। স্পেনের অন্তর্যুদ্ধের একটি ঘটনা দিয়ে (অডেনের চীন এবং স্পেণ্ডারের ভিয়েনা স্মরনীয়) ডেল্যুইস এই মহৎ সত্যটি বুঝিয়েছেন। 'উনিশ শ' সাইত্রিশ সালের মার্চ মাসে গণতান্ত্রিক স্পেন-রাষ্ট্রের 'নাবারা' এবং আর তিনখানি ছোট পোত 'গালদামেস্' নামে জিনিষ পত্র-ভরা পলাতক একখানি জাহাজকে পাহারা দিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। পথে দস্যু ফ্রাঙ্কোর দলের বিরাট যুদ্ধজাহাজ কানাবিয়াসের সাথে তাদের সাক্ষাৎ ঘটল। তারপর নাবারা এবং অন্য পোত কটি কেমন করে এই শক্তিশালী শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই করল, কি অদম্য সাহস এবং উদ্যম নিয়ে 'নাবারা' একা এই দস্যুর সাথে মৃত্যু পর্যন্ত সংগ্রাম চালাল, তারি উদ্দীপনাময় বর্ণনা করেছেন কবি। এরা নিতান্ত সাধারণ লোক, মৃত্যু এরা চায়নি; কিন্তু মৃত্যু যখন এল তখন এরা ঘাড় নামিয়ে সন্ধি করল না, স্বাধীনতার প্রেমে বলীয়ান এই মুষ্টিমেয় নিতান্ত নগণ্য লোক সভ্যতার ইতিহাসে চিরকালের মত স্বাক্ষর রেখে গেল।

এই সকল লোকেরা, যারা তাদের জীবনের কাছে কোনো পৌরাণিক ঔজ্জ্বল্য
প্রার্থনা করেনি,
তারা জীবনের পরিচিত পথগুলোকে এত ভালবেসেছিল যে তারা বেছে নিল
তাদের হৃদয়ের বন্যতায় পরাজয়ের চাইতে মৃত্যুকে। (ঐ, পৃঃ ৫২)

স্বাধীনতার এই মজ্জাগত কামনা কবিকল্পনার উৎস: এরি সূত্রেই মাত্র কবির কাব্যের প্রতি দায়িত্ব এবং সমাজের প্রতি দায়িত্ব সামঞ্জস্য পেতে পারে।

ডেল্যুইসের সাম্প্রতিক রচনা ক্রমশঃ উচ্ছাস হতে গাম্ভীর্য, জটিল রীতিপদ্ধতি হতে প্রাঞ্জল স্বাচ্ছন্দ্য, বেদনাময় অনুসন্ধান হতে প্রেক্ষিতের শান্তির দিকে ঝুঁকেছে। যুদ্ধের প্রতি তাঁর প্রতিক্রিয়া কতখানি এই গঠনের পটভূমিতে ব্যাখ্যা করা সম্ভব বর্তমান প্রবন্ধে এবিষয়ে আলোচনা করব না। কিন্তু লেখার ঢং যে মেটাফিসিক্যাল কবিমনের 'ডান' প্রান্ত হতে "মার্ভেল" প্রান্তের দিকে ঝুঁকেছে, এর ভেতরে আধুনিক কাব্যের নবতম ধারার সন্ধান পাই। ব্যবহারিক মতান্তর হেতু মালবিকাগ্নিমিত্রোক্ত (২য় অঙ্ক, ২য় দৃশ্য) শিথিল সমাধিস্থের ত্রুটির কথা বলা অযৌক্তিক মনে করি। বরঞ্চ তাঁর সাম্প্রতিক কবিতা পড়লে একথাই মনে হয় যে দান্তের এই বিখ্যাত উক্তি তিনি ভোলেননি; Chi pinge figure, sinon pus esser lei, non la puo porre, ছবির বিষয়ের সাথে একাত্মা না হলে ছবি আঁকা যায় না।

শিবনারায়ণ রায়

ভারতীয় সমাজ-পদ্ধতির উৎপত্তি ও বিবর্ত্তনের ইতিহাস

বিবাহ পদ্ধতি

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

বর্ণাশ্রমীয় সনাতনী বিবাহ-পদ্ধতি হইতেছে খৃষ্টধর্ম্মের রোমান ক্যাথলিক ও গ্রীক্ অর্থডক্স সম্প্রদায়ের ন্যায় ধর্ম্মগত বিবাহ (sacramental marriage). এই পদ্ধতি অনুযায়ী, বিবাহ চিরস্থায়ী ও পরকাল পর্য্যন্ত বিস্তৃত, তাহাতে স্বামী ও স্ত্রীর বিচ্ছেদ হইতে পারে না *। কিন্তু বৌদ্ধদের বিবাহ আইনগত (civil marriage), অর্থাৎ ধর্ম্মগত বিবাহ নয়। স্মৃতিসমূহে নানাবিধ বিবাহ পদ্ধতির কথা উল্লেখ আছে, তন্মধ্যে 'ব্রাহ্ম' বিবাহ-ই সমাজে স্থায়ী হইয়া গিয়াছে। হোমাগ্নি সাক্ষী করিয়া এই বিবাহ-পদ্ধতির সহিত প্রাচীন রোমানদের *confarreatio* বিবাহের মিল আছে। হিন্দুর এইসব বিবাহ-পদ্ধতির বিশ্লেষণ করিলে এখনও "কাড়িয়া নিয়া বিবাহ" (wife by capture) পদ্ধতিরই রূপান্তর মাত্র দেখিতে পাওয়া যায়। ঐতিহাসিকযুগে 'কাড়িয়া নিয়া' বিবাহের প্রকৃষ্ট নিদর্শন—রাষ্ট্রকূটরাজ ইন্দ্ররাজ কর্ত্তৃক চালুক্যরাজ দুহিতাকে বিবাহস্থল হইতে যুদ্ধে কাড়িয়া নিয়া রাক্ষস বিবাহে দৃষ্ট হয় (vide Sanjan Plates of Amoghavarsha E I. Vol. XVIII. Pp. 251-252)। এই 'কাড়িয়া নিয়া বিবাহ'-এর একটি উন্নতাবস্থা হইতেছে কন্যাপক্ষের পণ বা শুল্ক গ্রহণ করা। হিন্দুর অনেক জাতির মধ্যে এখনও কন্যাপক্ষ পণ গ্রহণ করিয়া থাকে। ভারতের মুসলমান সমাজেও কন্যাপক্ষে অনেক যায়গায়—যেমন, পূর্ব্ব বাঙ্গলার অনেক স্থলে পণ গ্রহণ করা হয়। ইহার পরের স্তর হইতেছে বরপক্ষের পণ গ্রহণ করা। ইহা তথাকথিত উচ্চ ও শিক্ষিত জাতিদের মধ্যে প্রচলিত হইয়াছে। তাঁহাদের পক্ষে এই পণকে ইংরেজী 'Dowry' (হিন্দি—'দহেজ্') প্রভৃতি নামে ঢাকিয়া রাখা হয়।

---

* Golapchandra Sarkar-Sastri—A Treatise on Hindu Law, P155.

জাতিতাত্ত্বিক ক্রমবিকাশের ধারায় দেখা যায় যে প্রথমে Totemistic অথবা অন্য উপায়ে সমাজবদ্ধ মানবের কৌমের বাহিরে বিবাহ প্রথা (exogamy) ছিল; কারণ সগোত্রে বিবাহ সেই সময় নিষিদ্ধ ছিল, তজ্জন্য অন্য কৌম বা কুলের কন্যা কাড়িয়া নিয়া বিবাহ করিত। ইহার ফলে রক্তপাত হইত। পরবর্ত্তীকালে কন্যার পিতা কন্যার বিনিময়ে অর্থ গ্রহণ করিত। ইহাই হইতেছে 'পণ' বা 'শুল্ক'। এখনও অশিক্ষিত এবং তথাকথিত নিম্নজাতিদের মধ্যে উক্ত প্রথা বিদ্যমান রহিয়াছে। কিন্তু লেখক বাঙ্গলার বিভিন্ন জেলায় পবিভ্রমণ করিয়া দেখিয়াছেন যে, এক্ষণে এই বিষয়ে একটা পরিবর্ত্তন চলিতেছে। একই জাতিতে বরপক্ষে ও কন্যাপক্ষে পণ লইবার প্রথা চলিতেছে। যেখানে বর শিক্ষিত ও অবস্থাপন্ন সেখানে বরপক্ষ পণ দাবী করিতেছে। উচ্চজাতীয় লোকদের ভিতর শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে পণের পরিমাণ অসম্ভব বাড়িয়া চলিতেছে। বিভিন্ন প্রকার আন্দোলনেও উহা দূরীভূত হইতেছে না। পণ বা dowry নেওয়া একটা অর্থনৈতিক ব্যাপার, ইহা ধর্ম্মের অঙ্গ নহে।

হিন্দুর বিবাহের আনুসঙ্গিক অনুষ্ঠানগুলি সেই প্রাচীনকালের 'কাড়িয়া নিয়া বিবাহ' প্রথার কথাই স্মরণ করাইয়া দেয়। হিন্দীভাষীদের ঘোড়ায় চড়িয়া তরবারী হস্তে বিবাহ এবং বাঙ্গলার হিন্দুর টোপর (helmet) ও জাঁতি, পুরাতন কাড়িয়া নিবার উদ্যোগের স্মরণ-চিহ্ন বলিয়া অনুমিত হয়। হিন্দু-বিবাহে স্ত্রীর মর্য্যাদা স্বামীর ব্যক্তিগত সম্পত্তির ন্যায় হয়। তাহার আর কোন ব্যক্তিত্ব থাকে না। গৌতম বলিতেছেন "স্ত্রী স্বাধীনা হইবে না......স্বামীর অমতে কার্য্য করিবে না (১৮), আবার মনু বলিতেছেন "ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমর্হতি"; এমন কি, তাহাদিগকে ধর্ম্মকর্ম্ম ও বৈদিকমন্ত্র হইতে বহিষ্কৃত করা হইয়াছে (৯।১৮), বিষ্ণুসংহিতা (২৫।১-১৭) স্ত্রীলোকের বাল্য, যৌবন ও বার্দ্ধক্যে পিতা, স্বামী ও পুত্রের বশে থাকিবার ব্যবস্থা করিয়াছে। অবশ্য প্রাচীন জার্ম্মাণ ইহুদী ও অন্যান্য জাতীয় স্ত্রীলোকদেরও এই অবস্থা হইত (১)।

অন্যদিকে দেখিতে পাওয়া যায় যে স্মৃতিতে যে-বিধানই থাকুক না কেন কৌটিল্যে (২) বিবাহে অবস্থা বিশেষে বিচ্ছেদ (পরস্পরম্ দ্বেষান্ মোক্ষ)

১। J. J. Meyer—Sexual Life in Ancient India, Vol II. P523.

২। R. Shamasastry—Kautilya's Arthasastra, Pp187—202.

ব্যবস্থা আছে (Bk. III, Chap. III, 155) ও স্ত্রীলোকের স্বামী নিরুদ্দিষ্ট হইলে পুনঃ বিবাহের বিধান আছে (Bk. III, Chap. IV, 158); বিচারকের হুকুম অনুসারে স্ত্রীলোক যাহাকে ইচ্ছা বিবাহ করিতে পারিত (Bk. III, Chap. IV, 159), বিধবা বিবাহের ব্যবস্থা রহিয়াছে (Bk. III, Chap. II, 152). পুনঃ 'ক্ষেত্র হইতে বীজ শ্রেষ্ঠ' কিনা এই বিতর্কে কৌটিল্য বলিয়াছেন 'পুত্র'—পিতা এবং মাতা, উভয় হইতে জাত (Bk. III, Chap. VII, 164) [এই সিদ্ধান্ত আজকালকার জীবতত্ত্ববিদ্‌দের সিদ্ধান্তের সহিত মিলে: পিতা ও মাতার দেহের সমান সংখ্যক chromosome-র একত্র মিলনে একটি মানব প্রাণীর সৃষ্টি হয়; সুতরাং দেখা যায় যে উভয়েই সমানভাবে একটি জীব-সৃষ্টি ব্যাপারে সহায়তা করে।] বহুপরে পরাশর স্মৃতিতে (৪।২৬) উক্ত হইয়াছে "নষ্টে মৃতে প্রব্রাজতে ক্লীবে চ পতিতৌ পতৌ। পঞ্চাস্বাপাৎসু নারীনাং পতিরণ্যো বিধিয়তে" (স্বামী যদি নিরুদ্দিষ্ট হয়, মৃত হয়, প্রব্রজ্যা অবলম্বন করে, ক্লীব বলিয়া স্থির হয় অথবা পতিত হয়, তাহা হইলে নারী পত্যন্তর গ্রহণ করিবে) (৩)। নারদস্মৃতিতেও এই শ্লোক আছে (১২।৯৭)। আবার অনেক শূদ্র জাতির মধ্যে আজও বিচ্ছেদ প্রথা প্রচলিত আছে। হিন্দীভাষী শূদ্রদের মধ্যে বিবাহে তালাক (divorce) ও পুনর্বিবাহ এবং বিধবা-বিবাহ প্রচলিত আছে। জাতি পঞ্চায়েতের অনুজ্ঞা নিয়া কিম্বা প্রথম স্বামীর নিকট হইতে 'ছাড় চিঠি' প্রাপ্ত হইয়া পুনর্বিবাহ (সাগাই, নিকা) হয় (৪)। বাঙ্গলার তথাকথিত নিম্নজাতীয় কতিপয় অসৎ শূদ্র জাতির মধ্যে এই প্রকার প্রথা আছে। তবে বাঙ্গলায় ব্রাহ্মণ্যবাদ বেশী প্রবল বলিয়া উচ্চশ্রেণীর শূদ্রদের মধ্যে এই প্রথা নাই; কোন কোন জাতির মধ্যে তাহা উঠিয়া গিয়াছে এবং উঠিয়া যাইতেছে।

হিন্দুর বিবাহ প্রথা সম্বন্ধে আলোচনা করিলে বাল্য-বিবাহের কথা উঠে। বাল্য বিবাহ মুসলমান যুগে হিন্দুর প্রথা বা লোকাচার হইয়াছিল বলিয়া অনেকে অনুমান করেন এবং অনেকেই তজ্জন্য শাস্ত্রীয় বিধান অনুসন্ধান করিতেন।

৩। এই শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াই বিদ্যাসাগর মহাশয় বিধবা-বিবাহ আন্দোলন চালাইয়াছিলেন।

৪। G. Sastri—Op. Cit. P161.

ভাস ও কালিদাসের নাটক সমূহে, ভবভূতির 'মালতী মাধব', কাব্যের নল-দময়ন্তী, পৌরাণিক দ্রৌপদী, সুভদ্রা ও রুক্মিনী প্রভৃতির গল্পে বাল্য বিবাহের কথা পাওয়া যায় না। আবার বাঙ্গলার-বাহিরে বাল্যবিবাহ সংশোধক পারিবারিক ব্যবস্থাও আছে। প্রাচীন পুস্তকেও এই সম্পর্কে নিষেধ-বিধি আছে (নির্ণয় সিন্ধুধৃত—অশ্বলায়ন বচন) (৫) ; বাঙ্গলায় ইহার অভাবেই Consent Age Bill গভর্ণমেণ্টকে পাশ করিতে হইয়াছিল।

হিন্দুর বিবাহ-পদ্ধতির বিবর্ত্তনের সঙ্গে পাশ্চাত্য দেশ সমূহের বিবর্ত্তনের মিল আছে। জলি বলেন, গৃহ্যসূত্রোক্ত বিবাহ-ক্রিয়াগুলি দেখিলে মনে হয় যে এইগুলি 'কড়িয়া নিয়া বিবাহ' প্রথা হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। এই প্রকারের বিবাহ প্রথা অতি প্রাচীন ; অন্যান্য ইণ্ডো-জার্ম্মাণ জাতিসমূহের মধ্যেও ইহার বিস্তার ছিল (৬)। এই প্রথা exogamy (স্বগোত্রের বাহিরে বিবাহ) প্রথার সহিত সংশ্লিষ্ট (৭)। বিবাহের ক্রিয়াকর্ম্মাদি সম্পর্কে তিনি বলেন, "সম্প্রদান, পাণিগ্রহণ, পাণিগ্রহণ মন্ত্র, সপ্তপদী গমন, 'বিবাহ' (গৃহে প্রত্যাগমন) প্রভৃতি কতকাংশে ইণ্ডো-ইউরোপীয়ান জাতির অতি আদিমকাল (বিভিন্ন আর্য্যভাষী-দের অবিভাজ্য অবস্থা) প্রসূত এবং উহা এখনও প্রচলিত (৮)। অধুনা পাশ্চাত্য ভূখণ্ডের উন্নততর দেশসমূহের মধ্যে free-choice marriage (তরুণ-তরুণীর স্বয়ং পছন্দ করিয়া বিবাহ) বিবাহ বিবর্ত্তিত হইয়াছে। ভারতেও হাল-ফ্যাসানের তরুণ-তরুণীদের মধ্যে ইহার প্রচলন আরম্ভ হইয়াছে (৯)।

৫। Quoted by Sastri, P113.

৬। হিন্দুর বিবাহ পদ্ধতির সহিত অন্যান্য দেশের প্রথার তুলনা সম্পর্কে Durgan—Mutter recht und Raubehe ; L. V. Schraveder—Hotch Zeits Gebrauche ; Schrader—Sprachver gluchung und urgeschicht ; Kluchevsky—History of Russia. দ্রষ্টব্য

৭। Jolly—Op. cit. P50.

৮। Jolly—Op. cit. Pp. 53—54.

৯। বিশাল ভারত—"কুল, গোষ্ঠী ও রাষ্ট্রীয়তা", ৫ম, ১৯৪২ ; দেশ—পরিবার, কুল ও এক জাতিত্ব, ১৯৪২, পৃঃ ৯৬, ৯৮, ১১১—১১৪ (৯খ) Annanta Ayer—Mysore Caste & Tribes, (৯ক) Quoted by Sastri, P 11, Sloka 9.

ইউরোপে বিবাহের বর্ত্তমান সাংসারিক পরিণতি হইতেছে single family (এক পরিবার)। ইহার অর্থ, যুবক বিবাহের পর পৃথক সংসার স্থাপন করে। ভারতে এখনও এই পারিবারিক প্রতিষ্ঠান সর্ব্বজনীন হয় নাই। পুরাতন যৌথ-পরিবার প্রথা (Joint-family system) এখনও প্রচলিত আছে, যদিও তাহা নানাভাবেই ভাঙ্গিতেছে।

হিন্দু রমণীর বিবাহের পর স্বামীগৃহে তাহার প্রতি কিরূপ ব্যবহার করা হইত এবং তাহাকে কি অবস্থার মধ্যে অবস্থান করিতে হইত তাহা বৈদিক যুগের সমাজ সম্পর্কিত বিষয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে আলোচিত হইয়াছে। কিন্তু পরবর্ত্তী যুগের স্মৃতি ও সাহিত্যের মধ্যে বিবাহিতা স্ত্রীলোকের অবস্থাই এখন অনুসন্ধানের বিষয়বস্তু। বিষ্ণুসংহিতা (৩।৯) বলিতেছে, স্ত্রীলোকদের রক্ষণাবেক্ষণের নিমিত্ত ক্লীব নিযুক্ত করিবে। পুনঃ রাজ অন্তঃপুরে উষ্ণীষধারী ক্লীবের বিচরণ করিবার, অর্থাৎ পাহাড়া দিবার ব্যবস্থা রহিয়াছে (কাম, ৭ স।৪১)। সংস্কৃত নাটক সমূহে "রাজাবরোধ" ও প্রহরী দ্বারা তাহার পাহাড়া দেওয়ার (ভাসের 'অবিমারক' দ্রষ্টব্য) প্রথার উল্লেখ আছে। মাঘের 'শিশুপালবধ' নামক কাব্যে (৫।১৭) "সবিদল্ল" নামক কঞ্চুকী জাতীয় প্রহরীদের উল্লেখ আছে। আর মুসলমানযুগে চৈতন্য-ভক্ত উড়িষ্যার রাজা প্রতাপরুদ্রের অন্তঃপুরেও 'সৌরিদল্ল নামক খোজার কথা সাহিত্যে প্রাপ্ত হওয়া যায়:

> সৌরিদল্ল আসিলা রাজাস্থানে
>
> * * * *
>
> খোজা কহে দেবী সব পাঠাইলা মোরে"। (প্রবোধ-চন্দ্রোদয়; বাঙ্গলা, ১০ম অঙ্ক)

হিন্দুর সামন্তযুগে রাজ অন্তঃপুরে খোজা বা অন্য প্রকারের প্রহরী থাকিত; স্ত্রীলোকদের তথায় অবরোধের মধ্যে থাকিতে হইত। ক্লীব, কুব্জ, বামন ও স্ত্রীলোক', এইসব লইয়াই যে রাজ অন্তঃপুর হইত তাহার প্রমাণ সাহিত্যে পাওয়া যায়। এই রাজাবরোধ মধ্যে নানা প্রকারের প্রেমের ও রাজনীতির ষড়যন্ত্রও যে সংঘটিত হইত তাহার প্রমাণ সাহিত্য এবং কৌটিল্যের পুস্তকে প্রাপ্ত হওয়া যায়। বস্তুতঃ পূর্ব্ব-রোমীয় সাম্রাজ্যের রাজধানী 'কনষ্টান্টিনোপাল' এবং হালের মাঞ্চুদের রাজধানী 'পেকিং' পর্য্যন্ত প্রাচ্য সম্রাটদের হারেমের মধ্যে

যেসব ব্যবস্থা ছিল এবং লীলা ও কাণ্ড সংঘটিত হইত সামন্ততান্ত্রিকযুগের হিন্দুরাজাদের রাজাররোধেও যে তাহার ব্যতিক্রম ঘটিত না তাহা সংস্কৃত সাহিত্য পাঠে অবগত হওয়া যায়। বঙ্কিমবাবুর রাজসিংহের হারেমের চিত্রে ভাসের 'অবিমারকে'র রাজরোধের চিত্র প্রতিফলিত হইয়াছে। সত্যের খাতিরে ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, অন্যান্য প্রাচ্য রাজাদের অন্তঃপুরের জীবন হইতে হিন্দুরাজাদের অন্তঃপুর জীবন পৃথক ছিল না।

এই প্রসঙ্গে কথা উঠিতে পারে যে তৎকালে হিন্দু রমণীর অবগুণ্ঠন ছিল কি না? সংস্কৃত নাটকাদি পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, সামন্তযুগে অবগুণ্ঠন কুলবতী রমণীর চিহ্ন ছিল (মৃচ্ছকটিক-নাটক—বারনারী বসন্তসেনা রাজার নিকট হইতে অবগুণ্ঠন পাইয়া চারুদত্তের স্ত্রী হয়)।

হিন্দু বিবাহের শেষকথা এই যে, উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের দ্রাবীড়ভাষীদের বিবাহের প্রথার মধ্যে একটা খুব বড় ব্যবধান বিদ্যমান রহিয়াছে—ইহা হইতেছে; দক্ষিণের cross-cousin marriage, অর্থাৎ বর তাহার মাতুল-কন্যা অথবা পিতৃস্বসার কন্যাকে বিবাহ করে। কিন্তু উত্তরে স্মৃতিতে ইহা নিষিদ্ধ হইয়াছে, তথায় এই প্রকারের বিবাহকে incest বলা হয়। বৌধায়ন স্মৃতিতে (প্রশ্ন ১) এইজন্য "দক্ষিণে মাতুলকন্যা বিবাহ" প্রচলিত বলিয়া সমালোচনা করা হইয়াছে এবং মনুও ইহা নিষেধ করিয়াছেন (১১।১৭২), শুক্রনীতিতেও এই বিষয় সম্পর্কে কটাক্ষ করা হইয়াছে। অথচ শাক্যদের ভিতরে, অর্জুন ও সুভদ্রার বিবাহে কবি ভাসের 'অবিমারক' নাটকে এবম্প্রকারের বিবাহের উল্লেখ আছে। আবার ঋগ্বেদেও এবম্প্রকারের বিবাহের আভাষ আছে (৯ক) (যেমন, একজনের মাতুলকন্যা কিম্বা পিতৃস্বসার কন্যা তাহার প্রাপ্য) যাহা হউক, দক্ষিণে এই প্রথা ব্রাহ্মণ হইতে শূদ্রের মধ্যে পর্য্যন্তও প্রচলিত (৯)। আছে এবং তদনুযায়ী স্মৃতি ব্যবস্থাও তাহাদের মধ্যে আছে (৯খ)। আবার উড়িষ্যার খোন্দজাতির মধ্যেও এই প্রথা দেখিতে পাওয়া যায়। লেখক বাকুড়ার বিষ্ণুপুর রাজ-গোষ্ঠির সমাজে এই যুগে এই প্রকারের একটি বিবাহের কথা শ্রবণ করিয়াছেন। পশ্চিমবঙ্গে ও ছোটনাগপুরের ক্ষত্রিয় ভূস্বামীদের মধ্যে এই প্রকার বিবাহ প্রথা আছে (Shastri, P. 126)

নরতাত্ত্বিকেরা বলেন, অষ্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসিদের মধ্যে cross-cousin marriage প্রচলিত আছে। তাঁহাদের মতে ইহা exogamy প্রভৃত বিবাহ-পদ্ধতির বিবর্ত্তনের অতি নিম্নাবস্থা। কিন্তু এই প্রথা ভারতে বিশেষতঃ আজ দ্রাবীড়ভাষীদের মধ্যে আবদ্ধ।

এক্ষণে হিন্দুর বিবাহ-পদ্ধতির সঙ্গে বহুস্বামীত্বের প্রশ্নটি উঠে। মহাভারতের দ্রৌপদীর বিবাহের গল্প লইয়া আজ পর্য্যন্ত কত বিতর্ক চলিতেছে। কিন্তু অনুসন্ধানকারীরা বলেন, এই প্রথা অনেক হিন্দু জাতির মধ্যে প্রাচীনকালে প্রচলিত ছিল এবং আজও তাহা আছে। শুক্রনীতিতে মধ্যদেশের শিল্পী কর্ম্মকার জাতিদের "পবাচিন" (polyandry) প্রথা (Ch. IV p. 97) ছিল বলিয়া উল্লেখ আছে। এক্ষণে হিমালয়ের তিব্বতীয় জাতির পাহাড়ীদের মধ্যে (পাঞ্জাব পর্ব্বত, কুমাউনের সর্ব্ববর্ণের হিন্দু) দ্রৌপদীর বিবাহের ন্যায় (১০) এবং মালাবারের নায়ার (১০ক) তিয়া, ভেল্লালা, জাতিসমূহের মধ্যে বহুস্বামীত্ব প্রথা আছে। ভারতের বাহিরে বহুস্বামীত্ব প্রাচীন স্পার্টান্, ইণ্ডো-জার্ম্মান এবং ইসলামের পূর্ব্ব খৃষ্টীয় আরবদের মধ্যে প্রচলিত ছিল (১১)।

তৎপর নিয়োগ (levirate, উশনঃ, ৫।৮৯-৯০) এবং দেবরকে বিবাহ (junior levirate) প্রথা (গৌতম, ১৮) এবং তদভাবে সপিণ্ডদ্বারা পুত্রোৎপাদন প্রথা (যাজ্ঞবল্ক্য, ১।৬৮-৬৯) প্রাচীন ভারতে ছিল। দেবরকে বিবাহ করা উড়িষ্যার শূদ্রদের মধ্যে এখনও প্রচলিত আছে বলিয়া শোনা যায়। উত্তর-ভারতের একটি প্রবল জাতির মধ্যে দ্রৌপদীর পঞ্চ স্বামীর সহিত সংসার করার ন্যায় অবৈধভাবে দেবরদের সহিত যৌন সম্বন্ধে বাস করার প্রথা লুক্কায়িতভাবে প্রচলিত আছে বলিয়া একটি অপবাদ আছে।

১০। Jolly—Richt und Sitte, P48. (১০ক) শিক্ষিত নায়ারেরা বলেন, আজকাল এই প্রথা অন্তর্হিত হইয়াছে।

১১। Die Frau in der Kultur geschichte", P118 quoted by J. J. Meyer op. cit. Vol I. Pp 170-171 f ; Edward Meyer—Geschichte des Altertumes, I. I. I, P26 f Quoted by J. J. Meyer, Vol. I. p 119 ; Dargun—Mutter recht und Raubehe, Ch. III, P45 ; Roberson Smith—Kinship and marriage in Early Arabia".

এইজন্য ব্রাহ্মণেরা ইহাদিগকে ঘৃণা করেন। এই প্রকারের বহুস্বামীত্বের পশ্চাতে থাকে একটি অর্থনৈতিক কারণ। যেখানে সেই কারণ অপসৃত হইতেছে সেইস্থলে উক্ত প্রথাও অন্তর্হিত হইতেছে।

বিবাহের পর কি সামাজিক বাতাবরণের মধ্যে হিন্দু নব-দম্পতি বাস করিত এবং এখনও করিয়া থাকে তদ্বিষয়ে এখন অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হওয়া যাক্। আমেরিকান সমাজতত্ত্ববিদ্‌গণ দুই প্রকারের রীতির সমাজ নির্দ্ধারণ করিয়াছেন: (ক) closed society (অর্গলাবদ্ধ সমাজ); (খ) open society (মুক্ত সমাজ)। তাঁহারা প্রাচ্য সমাজকে প্রথমোক্ত ব্যবস্থার অন্তর্গত বলেন। অবশ্য ইউরোপের প্রাচীন দেশগুলির সমাজও এই পদ্ধতির মধ্যে পড়ে, যদিচ তাহারাও দ্রুতগতিতে অগ্রসর হইতেছে। এমতাবস্থায় আগন্তুক অথবা নূতন বন্ধু কোন গৃহস্থের বাড়ীতে গেলে একেবারে সে অন্তঃপুরে আনীত হয় না; তাহার সহিত বন্ধুত্ব বহির্বাটিতেই গণ্ডীভূত থাকে। দ্বিতীয় প্রকারটি আমেরিকার সংযুক্ত রাষ্ট্রের (United States) নূতন সমাজ। এই সমাজে কোন অতিথি অথবা নূতন বন্ধু গৃহস্থের বাড়ীতে আসিলে তাহাকে অন্দর মহলে গ্রহণ করা হয়, অর্থাৎ গৃহকর্ত্তা তাঁহার স্ত্রী-পুত্রদের সহিত তাঁহার পরিচয় করিয়া দেন। তিনি আত্মীয়ের ন্যায়ই বাড়ীর সকলের সহিত অবাধে মেলামেশা করিতে পারেন। এইজন্য আমেরিকার গৃহে বার্হিমহল ও অন্দর মহল নাই। ইউরোপেও তাহা নাই, কিন্তু কার্য্যতঃ কমবেশী আছে। ভারতের সমাজ চিরকালই প্রথমোক্ত প্রকারের। বৈদিকযুগের 'বহির্সদনম্' হইতে আজকালকার 'বৈঠকখানা' পর্য্যন্ত এই প্রথারই সাক্ষ্য বহন করিতেছে। অতিথি বা নূতন বন্ধু পরিবারের সহিত মিশিতে পারে না। তবে হাল ফ্যাসানের ইউরোপীয় ভাবাপন্ন বাড়ীতে নূতন প্রথা অবলম্বিত হয়।

হিন্দুর সমাজ অধিকাংশ স্থলে এখনও গোষ্ঠীগত কমুনিসম্ (family communism) বিবর্ত্তনের স্তরে আছে বলিয়া অনুমিত হয়। ইহারই শেষ চিহ্ন যৌথ-পরিবার (joint-family system) এবং মিতাক্ষরা আইনে পৈতৃক সম্পত্তিতে (অপ্রতিবন্ধ দায়) গোষ্ঠিগত অধিকার। কিন্তু বাঙ্গলায় দায়াধিকার বিষয় পৈতৃক সম্পত্তিতে পিতার ব্যক্তিগত অধিকার (individual right in property) প্রথা বিবর্দ্ধিত হইয়াছে (১২)। এইরূপ কথিত হয় যে, এই প্রথা আইন সম্পর্কে আরও অগ্রসর অবস্থা। ক্রমশঃ

শ্রীভূপেন্দ্রনাথ দত্ত

১২। D. F. Mulla—Principles of Hindu Law, 3rd Edn. P16; Pp191-192.

অস্ত রৌদ্র

(১)

হায়, হায়, হায়,

একাকী মাঠে সোনার ধূলি

পুড়ছে খুলি।

হীরে আকাশ।

মরু বাতাস, রুদ্রহাস।

মধ্যনীল, ঊর্ধ্বে চিল, খোলা নিখিল।

কুণ্ডলি' ওঠে আগর ঘুম

দগ্ধ ধূম:

নেই, নেই, নেই, নেই।

বাজে ঝিঝিরি ঝাঁঝর হাড়ের দগ্ধ ডাল

খরতান, খরতাল।

বহুদূরে নদী জানে না কিছুই

বিরল ধারা,

ছায়াগ্রামে, মাঠে, গাছে ধ'রে আছে

ত্রিসংসারা॥

(২)

প্রবলদিনের সূর্যগলিতে প্রাণের বেগ;

ধায় দ্রুতধার

মাস, দিন, সংসার

অহর্জরম্, চক্রচরণ, শঙ্কাহরণ।

মণিমৃন্ময় ধরা দিঙ্‌ময়,

উবে-যাওয়া ঢেউ, পুনর্মেঘ।

তারি জলে ঘাট, ঘাটে চলে খেয়া,

নগরের বাটে হাটে দেয়ানেয়া—

আবহ তাই।

প্রত্যেকে আসি, প্রত্যেকে যাই

(৩)

অস্থি-র গায়ে জ্যোৎস্না পড়েছে।
যারা ছিল চ'লে গেছে।
বুঝবেনা, দেখ॥
রাত্রি করেছে॥

অমিয় চক্রবর্ত্তী

চায়ের টেবিলে

জনরক্ষার জনতায় নামো, জীবনমরণ
প্রশ্ন যেখানে, সেখানে না হয় সময়হরণ
করবে বলেই নেমে এসো দেখি, তোমরা সবাই
হাত মেলাও তো বাজারের ভিড়ে, সমালোচনায়
যোগ দিও তবে, চাল পাবে দেখো জনায় জনায়—
—পার্টির শ্লোগানে জোগান্ দেবে তো, কিউ করো ভাই?

—কথাটা কি খুব নতুন ঠেকছে? তোমার হৃদয়
অনেক মনের ছবিঘর জানো? জয় পরাজয়
প্রথমে টিকেটজানলার ধারে, তারপরে না
স্বয়ম্বরার সম্মুখে আসা কপালজোরে।
কতো ক্ষুধার্ত কতকাল বলো হাওয়ায় ঘোরে—
—শুকনো হাওয়ায় কিউ ভরে যায়, পেট ভরে না?

—হাসি নয় লিলি, পাহাড়তলীর বাইরে নীড়ে
যে মূকবধির শান্তিতে আছ, কালের চিড়ে
সেখানে বিরাট ভাঙন ঘনায়, হে স্বদেশিনী,
তার গুরুগুরু হৃদয়ে কি শোনো—
—হৃদয়টা কি
আজকে প্রথম ডাক শুনিয়েছে? হাসব না কি?
চা দিই? চোরাই বাজারে পেয়েছি দু মণ চিনি।

বিষ্ণু দে

কাব্যে শব্দ-চিত্র ও রবীন্দ্রনাথ

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

৩। তৃতীয় এবং শ্রেষ্ঠ প্রকারের শব্দ-চিত্র।

পূর্ব্বোল্লিখিত দুই প্রকার শব্দ-চিত্রই অল্পাধিক পরিমাণে শব্দের ধ্বনি বৈচিত্র্যের উপর নির্ভর করে, এবং উহার সার্থকতা ভাষাবিৎ মার্জ্জিত রুচি ব্যক্তিমাত্রই ন্যূনাধিক হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন। উহা হইতে উন্নততর আর এক প্রকার শব্দ-চিত্র আছে; ইহাতে শব্দের ধ্বনির কোনও প্রত্যক্ষ কার্য্য নাই, কিন্তু বাক্যের অর্থের অতীতে একটী অতি সূক্ষ্ম (subtle) কার্য্য আছে, উহা হইতেছে—একটী দৃশ্য, বা কোনও নৈসর্গিক বা অন্য যে কোনও প্রকার অবস্থা কবি ঠিক যে ভাবে কল্পনায় প্রত্যক্ষ করিতেছেন তাহা সুনির্ব্বাচিত শব্দের সাহায্যে সুস্পষ্ট (vivid) ও সম্যকভাবে পাঠকেরও কল্পনায় ফুটাইয়া তোলা। এ স্থলে কবি একটী দৃশ্য বর্ণনা করিতে গিয়া সমগ্র দৃশ্যটীর খুঁটীনাটী বর্ণনার প্রয়াস করেন না, কিন্তু তাঁহার ব্যবহৃত শব্দগুলি, এক অজ্ঞাত প্রণালী দ্বারা ভাবসাহচর্য্য হেতু পরস্পর সংশ্লিষ্ট সকল খুঁটীনাটী সমেত সমগ্র দৃশ্যটী পাঠকেরও কল্পনায় জাগায়। দৃষ্টান্ত—

> বারি ঝরে ঝর ঝর ভরা বাদরে
> আকাশভাঙ্গা আকুল ধারা কোথাও না ধরে।

রসজ্ঞ পাঠক নিজ কল্পনায় কবির কল্পনাদৃষ্ট সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করিতে পারেন কিন্তু কাব্যজগতের এই কার্য্য প্রণালীর কারণ ব্যাখ্যা করিতে পারেন না, শুধু বলিতে পারেন ইহা শব্দের চমৎকারিত্ব বা গুণ। যথা—

> If chance the radiant sun with farewell sweet
> Extend his evening beam, the fields revive,
> The birds their notes renew, and bleating herds
> Attest their joy, that hill and valley rings.
>
> —Paradise Lost, Book II.

(মেঘাচ্ছন্ন আকাশ হইতে বারিপাতের পর) বেলাশেষে অস্তগামী সূর্য্যের শেষ উজ্জ্বল আলোক-রশ্মি মেঘ-নির্ম্মুক্ত আকাশ হইতে হঠাৎ প্রসারিত হইয়া ধরাপৃষ্ঠে সর্ব্বত্র সজীবতা ও জীবজগতে আনন্দ কোলাহলের সৃষ্টি করে।

উল্লিখিত চরণ কয়টীর শব্দ পৃথক এবং সম্মিলিত ভাবে তাহাদের কার্য্য দ্বারা কবির কল্পনায় উদ্ভাসিত দৃশ্যের সম্যক আলোক-চিত্র আমাদের কল্পনায় ফুটাইয়া তুলে ("a perfect rendering of the poet's vision)। এ স্থলে চিত্রণ কার্য্য পূর্ব্বোল্লিখিত দ্বিতীয় প্রকারের শব্দ-চিত্রের ন্যায় কোনও বাক্যের ধ্বনির উপর নির্ভর করিতেছে না।

নাটক ও মহাকাব্যে এই প্রকার বর্ণনার সুযোগ অল্প; কেননা সেখানে movement অথবা energy of action প্রয়োজন হয়; এজন্য Shakespeare-এর নাটকের মধ্যে শব্দ-চিত্রের দৃষ্টান্ত বেশী নাই; কিন্তু যেখানে তিনি কবিত্ব শক্তি প্রকাশের সুযোগ পাইয়াছেন তাহার কোন কোনও স্থলে শব্দ-চিত্রের শ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। Shakespeare এবং Milton-এর পর প্রায় দেড়শত বৎসর ব্যবধান অন্তে পুনরায় ইংরাজী সাহিত্যে কাব্যের যুগ আসে উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে। সেই সময়ের Wordsworth, Shelley, Keats ও Bryron প্রভৃতি সকল কবিদের কাব্যেই অল্পাধিক পরিমাণে শব্দ-চিত্রের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়; কিন্তু Keats এই বিষয়ে সর্ব্বাগ্রগণ্য। শব্দের ধ্বনি দ্বারা প্রকটিত চিত্রণের দৃষ্টান্ত ছাড়িয়া দিয়া Keats এর কাব্য হইতে কেবল পূর্ব্বোক্ত শ্রেষ্ঠ (তৃতীয়) প্রকারের শব্দ-চিত্রের দৃষ্টান্ত দেওয়া হইতেছে।

The Eve of St. Agnes নামক কবিতার আরম্ভে শীতের প্রভাব-বর্ণনা হইতেছে—

> St. Agnes' Eve—Ah bitter chill it was!
> The owl, for all his feathers, was a-cold;
> The hare limped trembling through the frozen grass,
> And silent was the flock in wooly fold:
> Numb were the Beadsman's fingers, while he told
> His rosary, while his frosted breath...
> Seemed taking flight for heaven.

ইংরাজ সমালোচকগণ এস্থলে শব্দ-চিত্রের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন পাইয়াছেন। প্রত্যেকটী বর্ণনার শব্দগুলির সুষ্ঠু (apt) প্রয়োগ হইয়াছে; সবগুলিই প্রবল শীতবোধ প্রকাশ করিতেছে, এবং তাহাদের একত্র সমাবেশ "makes us feel the chill to our bones।" নানা ইন্দ্রিয়ের অনুভূতির মধ্য দিয়া (Milton যাহাকে "sensuous" বলিয়াছেন) শীত বোধক বর্ণনা নানাভাবে শীতের

চিত্র আমাদের মানসনেত্রে উজ্জ্বলভাবে আঁকিয়া দিতেছে ; ইহা Keats-এর সৌন্দর্য্য সৃষ্টির একটী বিশিষ্ট নিদর্শন।

এই প্রকার বর্ণনা লক্ষ্য করিয়া Oxford বিশ্ববিদ্যালয়ের সুপ্রসিদ্ধ অধ্যাপক W. J. Courthope * লিখিয়াছেন, "Keats possessed this [the genius of a creator] ; his end and aim in poetry was to find words to clothe the images of Beauty that blossomed in his fancy, in forms and colours analogous to those of painting...In poems involving picturesque episodes...Keat's faculty of word-painting shines with incomparable brilliancy".

"Word-painting" এই বাক্যের ব্যবহার বোধ হয় ইংরাজীতে Courthopeই প্রথমে করিয়াছেন (সংস্কৃত অলঙ্কার-শাস্ত্রে "শব্দ-চিত্র" এই বাক্যের ব্যবহার বহু পূর্ব্ব হইতেই আছে—ইহা উল্লিখিত হইয়াছে)। Courthope এর পূর্ব্বে ম্যাথু আর্নল্ড ইংরাজ কবি Keats এর নৈপুণ্যকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন 'in the faculty of naturalistic interpretation, in what we call natural magic, he ranks with Shakespeare।" কয়েকটি শব্দের সাহায্যে এই প্রকার তুলিকাকার্য্য, শুধু তুলিকাকার্য্য নয়—শ্রবণ-শক্তির কার্য্য সম্পন্ন করা magic বলিয়াই মনে হয়। একজন সমালোচক বলিয়াছেন—"The process is a kind of hypnotism"। কবি hypnotiser, রসগ্রাহী পাঠক তাঁহার unresisting medium। ক্ষণেকের জন্য আমরা কবির unresisting medium হইলে, সূর্য্যালোকে উদ্ভাসিত কক্ষ মধ্যে বসিয়াই কবির ঐন্দ্রজালিক-বাক্য-রচনা সাহায্যে কল্পনানেত্রে দেখিতে পাইব—

আষাঢ়ে নব আনন্দ, উৎসব নব
অতি গভীর, অতি গভীর, নীল অম্বরে ডম্বরু বাজে,
যেন রে প্রলয়ঙ্করী শঙ্করী নাচে।

এই রূপে কবি—কবির ভাষায়ই বলি—"জলে স্থলে কত ছলে মায়াজাল গাঁথিয়া" পাঠকের "অলস-নয়ন" সম্মুখে কত বর্ণের ছবি আঁকিয়া ধরেন।

শব্দের সাহায্যে এই প্রকার ঐন্দ্রজালিক চিত্রাঙ্কণের চরম নিদর্শন আমরা পাই যেখানে একটীমাত্র শব্দ বা শব্দসমষ্টি (phrase) দ্বারা এইরূপ চিত্রাঙ্কণ কার্য্য সম্পন্ন হয়। ইংরাজী সাহিত্যে এই প্রকার চিত্রাঙ্কণের দৃষ্টান্ত সর্ব্ব প্রথমে পাওয়া যায় Shakespeare এর লেখায়, এবং তাঁহার এই ঐন্দ্রজালিক কার্য্য

* (1842-1917)

আবিষ্কার করেন সম্ভবত: Coleridge, যিনি একাধারে কবি ও সমালোচক। তিনি Shakespeare-এর Tempest হইতে নিম্নলিখিত দৃষ্টান্তটী উদ্ধৃত করিয়া মন্তব্য করিয়াছেন—"The power of poetry is, by a single word perhaps, to instil that energy into the mind, which compels the imagination to produce the picture" ; ইহার দ্বারা তিনি বলিতে চান যে কবি কোনও দৃশ্য বা অবস্থা বর্ণনা করিতে গিয়া তাহার খুঁটীনাটী দ্বারা তাঁহার দৃশ্যপট পূর্ণ না করিয়া সুনির্ব্বাচিত একটী মাত্র বাক্য দ্বারা পাঠকের কল্পনা শক্তিকে জাগ্রত করিবেন, এবং পাঠক তখন নিজ কল্পনাশক্তি দ্বারা ঐ বিশেষ একটী বাক্য সংশ্লিষ্ট সকল খুঁটীনাটী অবস্থা ভাবসাহচর্য্য হেতু দেখিতে পাইবেন এবং এইরূপে সমস্ত ছবিটী আপনা হইতেই তাঁহার মানস পটে ফুটিয়া উঠিবে। দৃষ্টান্তটী এই—

> One midnight,
> Fated to the purpose did Antonio open
> The gates of Milan ; and in the dead of darkness,
> The ministers for the purpose hurried thence
> Me, and thy crying self.

ইহার উপর Coleridge মন্তব্য করিতেছেন, 'Here, by introducing a single happy epithet, "crying", in the last line, a complete picture is presented to the mind, and in the production of such pictures the power of genius consists"। প্রস্পেরো দুর্ব্বৃত্ত ভ্রাতা কর্ত্তৃক রাজ্য হইতে তাড়িত হইতেছেন ; মাতৃহীনা শিশু কন্যা (Miranda)-কে ক্রন্দন রত দেখিয়া তাহাকে সান্ত্বনাদানে অনভ্যস্ত থাকায় পিতা (Prospero) কতখানি বিড়ম্বিত ও কাতর বোধ করিতেছিলেন—এই সমস্ত 'crying' কথাটীতে পরোক্ষে ব্যক্ত হইতেছে। কবিগুরু একস্থানে বলিয়াছেন "কথার মানে বোঝাটাই মানুষের পক্ষে সকলের চেয়ে বড় জিনিষ নয়। শিক্ষার সকলের চেয়ে বড় অঙ্গটা বুঝাইয়া দেওয়া নহে,—মনের মধ্যে ঘা দেওয়া" ; সেইরূপ বলা যায়, কবির বর্ণনাশক্তির শ্রেষ্ঠ নিদর্শন—সাধারণ অর্থের অতীতে পাঠকের কল্পনাকে একটী শব্দ বা শব্দ সমষ্টিদ্বারা 'ঘা' দিয়া জাগ্রত করা।

শব্দচিত্রের বিভিন্ন স্তর নিরূপণ এইখানে শেষ হইল ; এক্ষণে রবীন্দ্রনাথের কাব্যে ইহার ব্যবহার সম্বন্ধে আলোচনা করা যাউক। কবিবরের কাব্য হইতে বিভিন্ন প্রকারের শব্দ-চিত্রের দুই একটী দৃষ্টান্ত যথাস্থানে দেওয়া হইয়াছে ; কিন্তু কোনও কোনও স্থলে দুই তিন প্রকার শব্দ-চিত্রের দৃষ্টান্ত একই পূর্ণ বাক্যের মধ্যে পাওয়া যায়, এজন্য কোনও একটী শ্রেণীর মধ্যে সেগুলির স্থান হয় না। প্রথমতঃ দেখা যায়, তাঁহার লেখার মধ্যে সর্ব্বনিম্নস্তরের শব্দানুকারী বাক্যের ব্যবহারও আছে ; এগুলির অধিকাংশই তাঁহার প্রথম জীবনের কবিতাগুলিতে—যে সময়ের লেখা সম্পর্কে তিনি বলিতেছেন—"(তখন) কাব্যের ভাষা আমার কাছে ধরা দেয়নি···পাইনি ভাষাভারতীর প্রসাদ" ; যেমন প্রভাত সংগীতে "নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গে"—

টলমল জল করে থল থল,
কল কল করি ধরেছে তান।

কিন্তু এই প্রকার শব্দানুকার আবার উচ্চস্তরের (তৃতীয় শ্রেণীর) শব্দ-চিত্রের সহিত একত্রে গ্রথিত পাওয়া যায়—

পিছনে ঝরিছে ঝর ঝর জল
গুরু গুরু দেয়া ডাকে—

এই শব্দানুকারের সঙ্গেই আছে—

মুখে এসে পড়ে অরুণ কিরণ
ছিন্ন মেঘের ফাঁকে।

"ছিন্ন মেঘের ফাঁকে"—এই শব্দসমষ্টি দ্বারা যে প্রাকৃতিক অবস্থা বর্ণনা করা হইতেছে তাহা শুধু সম্পূর্ণ নয়, ইহা অপেক্ষা vivid ও apt বর্ণনা আর হইতে পারে বলিয়া মনে হয় না। খণ্ড বা শ্রেণী বিভাগ করিয়া দেখিলে কোনও বস্তুরই সৌন্দর্য্য সম্যক উপভোগ করা যায় না, যদিও বিভাগ বা বিশ্লেষণই সমালোচকের কার্য্য ; Wordsworth বলিয়াছেন "we murder to dissect।" এজন্য রবীন্দ্রনাথের শব্দ-চিত্রের শ্রেণী বিভাগ না করিয়া উহার সৌন্দর্য্য উপ-ভোগের চেষ্টা করা যাউক। দৃষ্টান্ত সংগ্রহের মধ্যেও বিড়ম্বনা—"কারণ বাঁশ বনে ডোম কাণা ;" এজন্য যে সকল দৃষ্টান্ত (তাঁহার সঙ্গীতের মধ্য হইতে) বহুকাল হইতে স্মৃতিপটে জাগরুক রহিয়াছে তাহার কয়েকটী মাত্র উদ্ধৃত হইতেছে।—

(১) আজ বারি ঝরে ঝর ঝর ভরা বাদরে।……
আকাশ ভাঙা আকুল ধারা কোথাও না ধরে।
শালের বনে থেকে থেকে ঝড় দোলা দেয় হেঁকে হেঁকে
জল ছুটে যায় এঁকে বেঁকে মাঠের পরে।
আজ মেঘের জটা উড়িয়ে দিয়ে নৃত্য কে করে।

(২) আমার সকল কাঁটা ধন্য ক'রে ফুটবে গো ফুল ফুটবে
আমার সকল ব্যথা রঙীন হ'য়ে গোলাপ হয়ে উঠবে।

"It is not merely physical resemblances that are best indicated by imagery. Thoughts and sentiments are often poetically enforced by a comparison, which in pure reason is not to the point."—H. C. Beeching.

(৩) সজল হাওয়া বহে বেগে, পাগল নদী উঠে জেগে
আকাশ ঘিরে কাজল মেঘে তমাল বনে আঁধার করে।…

শব্দগুলি অতি সুষ্ঠুভাবে কেবল দৃশ্যটীকেই ফুটাইতেছে তাহা নয়, দৃশ্যের অতীতে মনের আকুল নিবেদনের দ্যোতক ;—The special quality of the particular passion will show itself in the quality of the words. We shall feel it in them, even though we are not able to describe it"—H. C. Beeching—

Keats-এর Eve of St. Agnes নামক কবিতার প্রথম হইতে শীতবোধ জ্ঞাপক ছয়টী চরণ পূর্ব্বেই উদ্ধৃত হইয়াছে; উহা ইংরাজ সমালোচকদিগের মতে শব্দ-চিত্রের চূড়ান্ত নিদর্শন। রবীন্দ্রনাথের একটী সমগ্র সঙ্গীতে বিভিন্ন ঋতুগুলি সম্পূর্ণ মূর্ত্ত হইয়াছে: উহা আমাদের বাংলা কবিতায় শব্দ-চিত্রের অপূর্ব্ব উদাহরণ—*

বিশ্ববীণা রবে বিশ্বজন মোহিছে……
নব বসন্তে, নব আনন্দ, উৎসব নব।
অতি মঞ্জুল, শুনি মঞ্জুল গুঞ্জন কুঞ্জে
শুনি রে শুনি মর্ম্মর পল্লব-পুঞ্জে…
পিক-কূজন পুষ্পবনে বিজনে,

এখানে 'মঞ্জুল' শব্দ 'মধুর' এই অর্থ প্রকাশ ভিন্ন 'গুঞ্জন' এই শব্দানুকারের ভাবের অনুপূরক।

* এইরূপ sustained word-painting-এর দৃষ্টান্ত বাংলা বা ইংরাজী অন্য কোনও কবিতায় লেখকের চোখে পড়ে নাই।

মৃদু বায়ু হিল্লোল-বিলোল বিভোল বিশাল সরোবর মাঝে,
কলগীত সুললিত বাজে।
(শব্দানুকারের প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত)

এখানে 'ল' কেবল অর্থহীন অনুপ্রাসমাত্র নয়,—'হিল্লোল' শব্দে উহা দ্বিত্ব হইয়া বায়ুর তরঙ্গায়িত ভাব ও উহার প্রভাবে জলের অনুরূপ ভাব প্রকাশে সহায়তা করিতেছে।

আষাঢ়ে নব আনন্দ, উৎসব নব।
অতি গম্ভীর, নীল অম্বরে ডম্বরু বাজে,
যেন রে প্রলয়ঙ্করী শঙ্করী নাচে।

বর্ষাঋতুর সাধারণ বাহ্যিক বিশিষ্ট রূপের ধারণা শব্দানুকারের দ্বারা, ও তৎসহ উপমা দ্বারা প্রকাশিত।

শব্দানুকার—　　করে গর্জ্জন নির্ঝরিণী সঘনে,
হের ক্ষুব্ধ ভয়াল বিশাল নিরাল পিয়াল তমাল-বিতানে
উঠে রব ভৈরব তানে।

'ক্ষুব্ধ' শব্দ বাতাহত বৃক্ষের অবস্থা সম্যক প্রকাশক ; 'ভয়াল' মেঘান্ধকারে বৃক্ষের তদবস্থার আকৃতি প্রকাশে অনুপূরক ; তৎপরে 'আ' স্বরের পুনঃ পুনঃ বিন্যাস দৃশ্যের বিশালত্ব সম্যক প্রকাশ করে।

পবন মল্লার গীত গাহিছে আঁধার রাতে ;
উন্মাদিনী সৌদামিনী রঙ্গভরে নৃত্য করে অম্বর তলে।

'সৌদামিনী'—সুশ্রব ও সৌন্দর্য্যভাব প্রকাশক ; 'উন্মাদিনী' ও 'নৃত্য' 'অম্বরতলে' বিদ্যুতের খেলার দৃশ্য কত সুন্দরতর ভাবে চিত্রিত করিতেছে। 'বিদ্যুতের খেলা'র সহিত তুলনা করিলে শব্দ চয়নের (বিশেষভাবে 'নৃত্য করে') সার্থকতা উপলব্ধি হইবে।

আশ্বিনে নব আনন্দ, উৎসব নব।
অতি নির্ম্মল, অতি নির্ম্মল উজ্জল সাজে,
ভুবনে নব শারদলক্ষ্মী বিরাজে।
নব ইন্দুলেখা অলকে ঝলকে ;

তৃতীয় প্রকারের শব্দ চিত্র (ভাব সাহচর্য্য)। এস্থলে 'ল' এর ব্যবহার বিশেষ দ্রষ্টব্য।

অতি নির্ম্মল হাস-বিভাস-বিকাশ আকাশ নীলাম্বুজ মাঝে
শ্বেত ভুজে শ্বেত বীণা বাজে।

'আ' স্বর দৃশ্যের বিস্তৃতিভাবদ্যোতক।

উঠিছে আলাপ মৃদু মধুর বেহাগ তানে,
চন্দ্রকরে উল্লসিত ফুল্লবনে ঝিল্লিরবে তন্দ্রা আনে রে,
দিকে দিকে কত বাণী…

যুক্ত 'ল' ও তৎপূর্ব্বের দীর্ঘস্বর 'ঝিল্লিরবের' বৈশিষ্ট্য উঠা ও নামা বুঝাইতে wonderfully apt ও suggestive. *

উচ্চস্তরের শব্দ-চিত্রের সার্থকতা নির্ভর করে association of ideas বা ভাব-সাহচর্য্যের উপর। বাংলা ভাষা যে ভাবে আমাদের মনে ভাব-সাহচর্য্য দ্বারা কল্পনাকে জাগ্রত করিয়া শব্দ দ্বারা চিত্রণ কার্য্য সম্পন্ন করে, ইংরাজী ভাষা সেইভাবে সেই কার্য্য সকলের নিকট করিতে পারে না ; এজন্য Keats বা অন্যান্য ইংরাজ কবিদিগের সহিত রবীন্দ্রনাথের শব্দ-চিত্রের তুলনা করা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। তবে ইহা বলা যাইতে পারে যে পাশ্চাত্য কবিদিগের সমালোচকগণের ন্যায় রবীন্দ্রনাথের শিল্পনৈপুণ্যের এই ঐন্দ্রজালিক শক্তি ("natural magic") ব্যাখ্যা করিবার জন্য আমাদের মধ্যে Mathew Arnold বা Courthope আজিও লেখনী ধারণ করেন নাই। ভাবপ্রবণ বাংলাদেশে কবিদিগের ভাবের ব্যাখ্যাতেই সকল শক্তি নিয়োজিত হইতে দেখা যায়। রচনানৈপুণ্যকে বাদ দিয়া কাব্যের সৌন্দর্য্যবোধ আংশিক পরিমাণে হয় মাত্র, এবং উহা হইতে প্রকৃত রসবোধ জন্মে না। রবীন্দ্রনাথের রচনা-নৈপুণ্য-সম্পদের বিশাল ভাণ্ডার উন্মুক্ত করিয়া এক একটি রত্ন কবে জগতের সম্মুখে ধরা হইবে তাহারই প্রতীক্ষা করিতেছি।

শ্রীপ্রফুল্লকুমার দাস

---

* ইহা Keats কয়েকটি চরণ দ্বারা বর্ণনা করিয়াছেন :—

Borne aloft

Or sinking as the light wind lives or dies

Hedge-crickets sing.

পুস্তক-পরিচয়

ভারতের রাষ্ট্রীয় ইতিহাসের খসড়া :—শ্রীপ্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ। মূল্য—এক টাকা চারি আনা।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে বৃটিশ শাসন ভারতে যে বিপ্লব ঘটায়, তা মাত্র কামের, লোভের, ধর্ষণের, জাতীয় অসদ্‌বুদ্ধির তাণ্ডবই নয়। ছবির এক দিকে জাতি-সংবদ্ধ মানবের, বলের পরীক্ষায় পরাজিত, ভিন্নগোষ্ঠীর হতভাগ্যদের প্রতি নির্মম শাসনের ও শোষণের ইতিহাস শোণিতের দুরপনেয় রেখায় উজ্জ্বল। সর্বজনবিদিত, অনস্বীকার্য, মর্মন্তুদ কাহিনী।

কিন্তু আর এক দিকও আছে। সেটা বণিক্ শ্রেণীর গণতান্ত্রিক বিপ্লবের ও জয়যাত্রার ইতিহাস। লাঙ্গল ও গ্রাম-শিল্পের উপর নির্ভর করে সামন্তরাজগণ যে রাষ্ট্র, সমাজ সভ্যতা ও ধর্ম্ম গড়ে তুলেছিলেন, বাষ্পীয় শক্তির ও মেশিনের অগ্রদূতরূপে জাতীয় ও অন্তর্জাতিক শিল্পের ধনপতিগণ গণতন্ত্রের পতাকা উড়িয়ে দেশে দেশে অভিযান শুরু করলেন তার বিরুদ্ধে। মধ্যযুগীয় ও সামন্ততান্ত্রিক সভ্যতা ইংলণ্ডে দূর হলো ইংরেজ ধনপতির, নাগরিকের ও জন-সাধারণের সম্মিলিত শক্তিতে। প্রথম ফরাসী রাষ্ট্রবিপ্লবের ফলে ফ্রান্সে ফরাসী ধনপতি ও মধ্যবিত্ত দল রাষ্ট্রের অধিপতি হলো।

কিন্তু ভাগ্যদেবতার কী নির্মম পরিহাস। ভারতবর্ষে সামন্ততন্ত্র ধ্বংসের গুরুদায়িত্ব বহন করে এলো ইংরেজ ধণিকশ্রেণী ও তাঁদের তাঁবেদার ক্ষুদে বণিক ও বেকার ছোট সাহেবের দল। আত্মপুষ্টিই যাদের চরম ও পরম বাইবেল সেই বণিকশ্রেণী অশ্রুর ও শোণিতের বন্যা প্রবাহিত না করে কবে আর মানুষের কি মঙ্গল করেছে? তবু মঙ্গল তারা কিছু করেছেই। ভারতবর্ষকে তারা আন্তর্জাতিক রঙ্গমঞ্চে দাঁড় করিয়েছে যেখান থেকে পালাবার আর কোন পথই খোলা নেই। কালিদাসের কাব্যের পৃথিবী এই ভারত আজ হিমাচল লঙ্ঘন করে, দুরন্তব পূর্ব ও পশ্চিম সমুদ্র অতিক্রম ক'রে সীমা হারিয়েছে ভৌগোলিক পৃথিবীর গোলাবর্তে। নিছক সুদের, মুনাফার ও স্বার্থের খাতিরেই ইংরেজ ভারতের গ্রামশিল্প নষ্ট ক'রে যন্ত্রবাজ বিভূতিকে নিমন্ত্রণ ক'রে এনেছে নূতনতরো মান্ত্রিক মায়ায় ভারতবর্ষকে ফলে, জলে, প্রাচুর্যে

সমৃদ্ধ করার জন্যে। প্রাক্তন সামন্তরাজগণ এখন 'রাজ্যহীন সিংহাসনে অত্যুক্তির রাজা'; বৈদেশিক বণিকের পরওয়ানা পেয়ে সামন্ততন্ত্রের ভুক্তাবশেষ আহারের লজ্জায় আকাশ বাতাস বিষিয়ে তুলেছেন। এদিকে ইতিহাসের অলঙ্ঘ্য বিধানে ভারতবর্ষেও একদিকে বণিক্ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণী ও অন্যদিকে শ্রমিক শ্রেণীর উদ্ভব হয়েছে। ইংরেজ বণিক্ ভারতে যে সকল সমস্যার অবতারণা করেছে কিন্তু সমাধান করেনি ও করতে চায় না, ভারতবর্ষের ধনিক-মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ও শ্রমিকদের স্কন্ধে সে সব বৈপ্লবিক কর্তব্যের গুরুভার ন্যস্ত হয়েছে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলাদেশে নবোত্থিত এই ধনিক ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে আমরা দেখি 'শিক্ষিত' সম্প্রদায়ের ছদ্মবেশে। আরো বিস্ময়ের কথা, এঁদের বৈপ্লবিক প্রচেষ্টা প্রথম দেখা দিল ধর্মান্দোলনে ও সমাজ সংস্কারে; কিন্তু এই সকল প্রচেষ্টার মূলে ছিল অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক প্রেরণা, নবযুগের উপযোগী আইডিয়লজির কঠোর অনুসন্ধান। যুগপ্রবর্তক রাজা রামমোহন রায় ভারতে এই শ্রেণীর প্রথম ও নানাদিক থেকে সর্বপ্রধান নেতা। তিনি যে রাজনৈতিক আদর্শের দ্বারা ও আন্তর্জাতিকতার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েই ব্রাহ্ম সমাজ প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন একথা প্রভাত গঙ্গোপাধ্যায় দেখিয়েছেন এবং আলোচ্য এই পুস্তকটিতে রামমোহনের সময় থেকে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন পর্যন্ত বাংলার তথা ভারতের রাষ্ট্রীয় ইতিহাসে ব্রাহ্ম সমাজের নেতৃবৃন্দের কৃতিত্ব ও নেতৃত্ব ধারাবাহিকভাবে আলোচনা করেছেন।

ব্রাহ্মসমাজই ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলার সর্বপ্রধান বৈপ্লবিক আন্দোলন, মূলে অর্থনৈতিক, লক্ষ্যে রাজনৈতিক, বহিরঙ্গে ধর্মানুষ্ঠানিক। ধনতান্ত্রিক, জাতীয়-গণতান্ত্রিক বিপ্লবের পূর্বাভাস ও অঙ্গক্ষেপরূপে য়ুরোপে দেখা দিয়েছিল রিফর্মেশান, ভারতে দেখা দিল ব্রাহ্ম সমাজ, প্রার্থনা সমাজ, ও ওহাবি আন্দোলন, আর্য সমাজ, ইত্যাদি। ব্রাহ্ম সমাজের প্রতীকত্বে চালিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর রাজনৈতিক অর্থনৈতিক আন্দোলনের মধ্যে আমরা নিম্নলিখিত আদর্শগুলি দেখি—(১) আন্তর্জাতিকতা—একেশ্বরবাদ, ধর্মসমন্বয় ও দর্শন সমন্বয়রূপে; (২) সামন্ততন্ত্রবিনাশ—সিপাহী বিদ্রোহে সামন্ততন্ত্রের শেষ মৃত্যুতাণ্ডব দেখে যা আতঙ্কে দেশে রাজভক্তির বন্যা ছুটিয়েছিল; জাতিভেদ তুলে দিয়ে যা

শ্রমিককে শ্রম বিক্রয়ের জন্য মুক্তিদান করতে চেয়েছিল, সমাজ সংস্কারের দ্বারা যা প্রতিক্রিয়াশীল সামন্ততান্ত্রিক সংস্কৃতির রূপান্তর করতে চেষ্টা করেছিল ; (৩) রাষ্ট্রশক্তির অধিকার—বৃটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি, বৃটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েসান, ভারত সভা, ইণ্ডিয়ান লীগ, ষ্টুডেন্ট্‌স্ অ্যাসোসিয়েশন, ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের কর্মপ্রচেষ্টায়, এবং সর্বশেষে ও সর্বোপরি জাতীয় কংগ্রেসে যোগদান করে ; (৪) গণ-আন্দোলন—নীলকর আন্দোলন, রায়ত সভা ও চা-কুলি আন্দোলন ইত্যাদির ভিতর দিয়ে ; (৫) নারীর সর্বাঙ্গীন মুক্তি—স্ত্রীশিক্ষা, নারীজাগরণ, বিধবা-বিবাহ ইত্যাদি আন্দোলনে (নারীর মুক্তি বৈপ্লবিক অগ্রগতির একটি প্রধান সমাজবৈজ্ঞানিক মাপকাঠি) ; (৬) ভারতীয় শিল্পোন্নতি—মূলতঃ ভারতীয় পুঁজিপতিদের নেতৃত্বে মেশিন-চালিত কারখানার প্রতিষ্ঠায়, আবার নিম্ন-মধ্যবিত্ত শ্রেণীর তাগিদে গৃহশিল্পের স্তুতিতে ; স্বাদেশিকের সভায়, শিল্প প্রদর্শনীতে, স্বদেশী ও বয়কট অন্দোলনে আমরা বৈপ্লবিক অর্থনৈতিক আকৃতির আভাস পাই ; (৭) অখণ্ড ভারতবোধ—রামমোহন রায় যার প্রথম উদ্‌গাতা ; বৈদেশিক মূলধনের একাধিপত্যে ও সঙ্কোচনীতির অনুসরণে অখণ্ড ভারতবোধ ক্রমাগতই ব্যাহত হয়ে নৈরাশ্যমূলক প্রাদেশিকতায় ও সাম্প্রদায়িকতায় আত্মহত্যা করার প্রয়াস পেয়েছে।

প্রভাতবাবুর বইটি অতিশয় চিন্তাকর্ষক হয়েছে। রাজনীতি, অর্থনীতি, ধর্ম সমাজসংস্কার, এইগুলিকে খোপে খোপে বিভক্ত করে আলাদা ভাবে যাঁরা দেখেন না—তাঁরাই প্রভাতবাবুর লিখিত এই খসড়াটির প্রকৃত ঐতিহাসিক মূল্য নিরূপণ করতে পারবেন এই আমার বিশ্বাস এবং সেই জন্যই ধান ভাণতে এতটা শিবের গীত গেয়েছি। উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা, সামন্ত-তান্ত্রিক ক্রান্তিকালের বাংলা, আমাদের চোখে রোমান্সে জড়িত। আমাদের পিতামহেরা সরল বিশ্বাসে মনে করতেন স্বর্গে যাওয়ার সোজা সিঁড়ি নিকটেই কোথাও আছে ; শুধু সুযুক্তির দ্বারা, বৈদেশিক সুকৃতির বলে, সহজেই তার সন্ধান মিলবে—বিশেষ করে টম্‌সন, হ্যারী, হিউমএর দল যদি কৃপাপরবশ হয়ে একটু পথ বাতলে দেন। তবু একথা ভুললে চলবে না, তাঁদের রাজভক্তির মধ্যেও বিপ্লবের বীজ নিহিত ছিল, সরল বিশ্বাসের মধ্যেও নবাঙ্কুরের বীর্য সুপ্ত ছিল যা মহা্ মহীরুহে পরিণত হয়ে আজ বিশ্বব্যাপী ঝঞ্ঝাতেও ভেঙে পড়্‌ছে

না। তাই ঊনবিংশ শতাব্দীর নমস্য নেতাদের কীর্তিকাহিনী উপন্যাসের চেয়েও আমাদের কাছে রোমাঞ্চকর মনে হয়। উপন্যাসের মতই এক নিঃশ্বাসে প্রভাত বাবুর বইটি পড়েছি।

অমরেন্দ্রপ্রসাদ মিত্র

পরশুরামের কুঠার (গল্পের বই)—সুবোধ ঘোষ। পূর্ব্বাশা। দাম ১৷৷০ টাকা। পৃঃ ১৫৬।

সুবোধ ঘোষের ছোট গল্প পাঠককে যে-রকম গভীরভাবে আলোড়িত ও অভিভূত করে তার তুলনা সমসাময়িক কথাসাহিত্যে বিরল। নব্য জীবন-বেদকে আশ্রয় করে তাঁর গল্প গ'ড়ে ওঠার জন্তে সংস্কারবিদ্ধ মন যেমন নাড়া পায়, তেমনি বাছাই করা নতুন বিষয় তাঁর লেখার কৌশলে বিচিত্র আখ্যানে রূপায়িত হ'চ্ছে ব'লে অনুশীলিত চিত্তও ভাবাবিষ্ট হয়। এই দুই গুণের সমন্বয়ে তাঁর গল্প হ'য়ে দাঁড়ায় এ-যুগের রোমান্স। মনে রাখতে হ'বে, এ-রোমান্স বস্তুকেন্দ্রিক ও বিজ্ঞাননির্ভর।

প্রেরণা যে সাহিত্য-সৃষ্টির উৎস নয়, সচেতন শিল্পীর প্রয়াস থেকেই যে উদ্ভূত হয় সার্থক সাহিত্য তার প্রমাণ সুবোধ বাবুর রচনা। তাঁর আলোচ্য বইয়ে সাতটি ছোট গল্প আছে: পরশুরামের কুঠার, ন তস্থৌ, নির্বন্ধ, গরল, অমিয় ভেল, কর্ণফুলির ডাক, উচলে চড়িনু, তমসাবৃতা। প্রত্যেকটি গল্পে সমাজ বা জীবন সম্বন্ধে তাঁর কোনো-না-কোনো বক্তব্য উহ্য আছে। অনবধানের ফলে সে-ইঙ্গিত যদিও বা কেউ ধরতে না পারেন তা'হলেও তিনি কিন্তু খুশি হ'বেন গল্পটা পড়ে। তার কারণ, বাস্তব অভিজ্ঞতার ওপর কল্পনার রং চড়িয়ে লেখক গল্পের মধ্যে এমন সব ঘটনা ও চরিত্র সৃষ্টি করেন যা পাঠকের কৌতূহল উদ্রিক্ত ক'রে টেনে নিয়ে যায় তাঁকে শেষ পর্য্যন্ত। সুবোধবাবুর গল্পের বৈশিষ্ট্যই এই।

প্রথম গল্পে দেখতে পাই, ভর্ত্তৃহীনা ধনিয়ার মাতৃত্ব কি ভাবে খর্ব্ব হ'চ্ছে বর্ত্তমান সমাজের নিরর্থক বিধানের চাপে। 'পরশুরামের কুঠার' নামটি অর্থ-গূঢ়। লেখক এখানে নিপুণভাবে ছুরি চালিয়েছেন সমাজের বিস্ফোটকের ওপর। 'ন তস্থৌ' রসে-রূপে একটি উৎকৃষ্ট গল্প। প্রাক্তন ও ইদানীন্তন ঐতিহ্যের মধ্যে

যে দুরত্যয় ব্যবধান এবং এই পরিবর্তন যে অনিবার্য্য, উপাধ্যায় আর তার ছেলে সোমনাথের দ্বন্দ্বের ভেতর দিয়ে তা চমৎকার ফুটেছে। 'নির্বন্ধ' গল্পে চিত্রপুর থানার ছোট জমাদার কড়ে খাঁ-র চরিত্র লেখকের এক আশ্চর্য্য সৃষ্টি। 'গরল অমিয় ভেল' গল্পে কুরূপা মালা বিশ্বাসের ট্র্যাজিডি পাঠকের মন স্পর্শ না করে পারে না। এই গল্পের আঙ্গিক অভিনব। কিন্তু গল্পটি প্রথমে যখন সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হয় তখন এর আরম্ভ অন্য রকম ছিল। প্রচারক চৌধুরী মশাই কার প্রমাদে মালা বিশ্বাসকে হটিয়ে দিয়ে গল্পের প্রথমেই স্থান লাভ করলেন, বুঝলাম না। 'কর্ণফুলির ডাক' গল্পের নায়ক হ'লো চল্লিশ টাকা মাইনের ইতিহাসের মাষ্টার ব্রুবেশ। "কিন্তু এটাই তার পরিচয়ের সব নয়। সে ইতিহাসের মানুষ। যে মানুষের মনের বনের শাখায় পৃথিবীর সুখ-দুঃখের পাখীর দল কলরব করে ফেরে। প্রতি মুহূর্ত্তের সংগ্রামে সুন্দর এই পৃথিবীর রূপের বালাই নিয়ে সে এক এক সময় মুগ্ধ হ'য়ে যায়। যে দ্বন্দ্বের মহিমায় হিমগিরি আকাশ ছুঁয়েছে, ধানের ক্ষেত হয়েছে সবুজ, চেতনার রঙে রাঙা হ'য়ে উঠলো মানুষ। যে পরিবর্ত্তনের স্রোতে পদার্থ গলে গিয়ে হ'লো প্রবৃত্তি—সুখের হাসি, বিরহের বেদনা। মানুষ যেখানে স্বয়ং বিধাতা হ'য়ে আপন পরিণাম গড়ে তোলে আপন হাতে।" এই ব্রুবেশের স্কুল গেল ভেঙে যুদ্ধের দরুন। কিন্তু কাজ যাওয়ায় ব্রুবেশ মুষড়ে পড়ল না। চাকরি খোঁজার সঙ্গে সঙ্গে সে ভাবতে লাগল বর্ত্তমান যুদ্ধের আসল রূপটা কি। চট্টগ্রামে বোমা পড়ার খবর পেয়ে সে স্থির থাকতে পারল না, দেশের মাটির মান বাঁচাবার জন্যে জীবন পণ করে ঝাঁপিয়ে পড়ল সমর-তরঙ্গে। এ ধরণের গল্প লেখা অতি কঠিন ব্যাপার। কিন্তু লেখকের বর্ণনার কৌশলে এই গল্প অসাধারণ হ'য়ে উঠেছে। 'উচলে চড়িনু' গল্পে অনেক সূক্ষ্ম কাজ আছে। অভ্র খনির ওভারম্যান দিনেশের প্রতি মজুরনী বিলাসী আর ইরানী যাযাবরী সারা-র ভালোবাসা কেমন ক'রে ব্যর্থ হ'য়ে গেল মধ্যবিত্ত বাঙালীর স্বভাবসুলভ দুর্ব্বলতার জন্যে, লেখকের এই-টাই প্রতিপাদ্য। 'তমসাবৃতা' এই বইয়ের আর একটি শ্রেষ্ঠ গল্প। ধূলগড়া গ্রামের বাউরী বিধবা সুন্দরী জবা-কে কেন্দ্র ক'রে গড়ে উঠেছে এই কাহিনী। গ্রামের দুর্দ্দশা চরমে এসে পৌঁছুলে জবা কেমন ক'রে তার স্বাতন্ত্র্যের নির্ম্মোক ছেড়ে অন্যান্য বাউরী মেয়েদের সঙ্গে যোগ দিয়ে রাত্রির অন্ধকারে ক্ষেতে কাজ

করতে সুরু করল, এবং চাষীকুলের দুঃখ বরণ ক'রে আত্মরতির গ্লানিমুক্ত হলো, লেখক তা ফুটিয়ে তুলেছেন অসামান্য দক্ষতার সঙ্গে। এ রকম নিখুঁত গল্প বাংলা সাহিত্যে বেশি নেই।

সুবোধবাবুর ভাষা যেমন উপযোগী তেমনি বলিষ্ঠ। শব্দের এমন সুমিত প্রয়োগ বর্ত্তমানে অন্যান্য লেখকের রচনায় বড়ো একটা দেখা যায় না। 'ন তস্থৌ' গল্পে সপ্তাবরণ বিষ্ণুমন্দির আর 'উচলে চড়িনু' গল্পে অভ্রের খনির বর্ণনা পড়ে সকলেই মুগ্ধ হবেন। তাঁর ভাষার নমুনাস্বরূপ 'ন তস্থৌ' গল্প থেকে একটা জায়গা উদ্ধৃত করছি: "এই মূর্ত্তিলোকের রূপ ও হৃদয় সে আজ যেন বুকের কাছে অনুভব করছে। এই বিরাট সুরমন্দিরের প্রাঙ্গণে যেন স্তব্ধ হ'য়ে রয়েছে এক উদ্দাম জয়জয়ন্তী রাগ। মূর্চ্ছাহত হ'য়ে রয়েছে এক প্রাচীন বৈভব। এই ন্যগ্রোধ আর নাগরঙ্গবনে উৎসবের প্রদীপ যদি আর একবার ঝলসে ওঠে, দেখা দেবে শত শত জীবন্ত নরনারীর রূপ। তার মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে মিশ্রেব মেয়ে কাঞ্চন, কপালে কাশ্মীর পত্রের লিখা—সুন্দর। ওর কুন্তলস্খলিত একটি ফুল কুড়িয়ে নিতে মন আকুল হ'য়ে ছুটবে। কিন্তু এ নিশির ডাকের ঘোর আর কতক্ষণ। চাঁদ ডুবে গেল। দিনের আলোতে মাটি হ'য়ে দেখা দেবে এই রূপময় অতীত। কাঞ্চন বাতিল হ'য়ে গেছে চিরদিনের জন্য।"

'ফসিল' গল্পের বইয়ে সুবোধবাবুর শক্তির যে বিকাশ দেখা গিয়েছিল "পরশুরামের কুঠারে" তা' আরো পরিণত হয়েছে। তাঁর নতুন দৃষ্টিভঙ্গি ও মনোগ্রাহী লিপিচাতুর্য্যের গুণে গল্পগুলি বাংলা সাহিত্যে এক নতুন অধ্যায়ের সূত্রপাত করল।

অমিয়কুমার গঙ্গোপাধ্যায়

শ্রীকুন্দভূষণ ভাদুড়ী কর্ত্তৃক পরিচয় প্রেস, ৮ বি, দীনবন্ধু লেন,
কলিকাতা হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।